৪ খণ্ড একত্রে

আউলিয়ায়ে চিশ্‌ত

যাঁদের পদধূলিতে ধন্য এ ধরার কোল

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

[illegible]

আউলিয়ায়ে চিশত

(যাঁদের পদধূলিতে ধন্য এ ধরার কোল)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

প্রথম খণ্ড

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ও
হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

আউলিয়ায়ে চিশত

(যাঁদের পদধূলিতে ধন্য এ ধরার কোল)

গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আজিজুল বারী

প্রথম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৮

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

প্রকাশক

শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

পাণ্ডুলিপি

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

০১৭৩ ২৪৯ ৮২৮৮

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা

গ্রন্থকার

হাদিয়ায়ে সওয়াব

দীর্ঘদিনের নিদ্রাহীন একনিষ্ঠ গবেষণার ফসল এ গ্রন্থখানা হাদিয়ায়ে সওয়াব হিসাবে উৎসর্গ করছি আমার উভয় স্ত্রী ও আদুরে সন্তানাদির প্রতি যাদের উপর আমার নেক দৃষ্টি ও দু'আ কখনো থামবে না মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

আমার স্ত্রীদ্বয় হলেন-

সুলতানা খানম বারী

ও

মমতাজ বেগম বারী

আমার আদুরে কলিজার টুকরোগুলো হলো-

সামিনা রুখসানা বারী, ভাষা সিলভিয়া বারী, আলী হুসাইন মুহাম্মদ সুলতান বারী (জুবায়ের), মুহাম্মদ কাওসার রাসূল বারী (এমরাজ), মেহরাজ ইবনে বারী (শাহরাজ)

এবং

হাফিজা খানম বুশরা ও মুসলিমা খানম জাকিরা।

আল্লাহ পাক তাদের সকলকে হায়াতে তায়্যিবাহ দিন ও তাঁর প্রিয় বান্দা-বান্দীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

সূচিপত্র

পরিচালকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্মৃতিবিজড়িত, সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থল সুবিদ বাজারের আলী সেন্টারে স্থাপিত, আপনাদের সুপরিচিত খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়ার গবেষণা বিভাগ থেকে **'আওয়িলায়ে চিশত'** শিরোনামের এ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে। খানক্বায়ে আমীনিয়ার গবেষক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী এই বিরাট গ্রন্থের লেখক। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই বিশিষ্ট মুরীদ ও আমার ইযাজতপ্রাপ্ত খলিফা দীর্ঘদিন গবেষণা করে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। খানক্বার সাথে সম্পৃক্ত সবার পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাঁকে দীর্ঘ হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আমীন।

অত্র গ্রন্থে বিশ্ববিখ্যাত **'তরীকায়ে চশিতিয়া'**র একটি শাখার মরহুম৪২জনস্বনামধন্য, আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহপ্রাপ্ত মাশাইখে আজমের জীবনালোচনা স্থান পেয়েছে। ছরকারে দু'আলম, আখিরী জামানার গণনাতীত মানুষের ভরসাস্থল ও পথপ্রদর্শক, রোজ কিয়ামতে শাফাআতের অধিকারী, সর্বযুগের সকল পরহেজগার, মুত্তাকী, ওলিআল্লাহ, মাশায়িখ, গউস, কুতুব ও আবদালের অন্তরাত্মা ও নয়ণের মণি, আশিকীনদের সর্দার, রাহামাতুল্লি আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনচরিত থেকে শুরু করে আমার শায়খ [এবং লেখকেরও মুর্শিদ] কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত বুজুর্গদের জীবনবৃত্তান্ত চমৎকার, সাবলীল, ইশকের ভাষায় গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই বিরাট গ্রন্থটি পাঠ করে সকলেই আধ্যাত্মিক খোরাক লাভ করবেন। সেসাথে চিশতীয়া তরীকার স্বরূপ পাঠকদের অন্তরে সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবে। গ্রন্থ পাঠকালে ইশকে ইলাহীর ছোঁয়া পেয়ে সবার জীবন ধন্য হোক, এই কামনা করছি।

গ্রন্থখানা প্রিন্ট করে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আমাদের দীর্ঘদিনের। আল্লাহ চাহে তো কোনো আশিকে দ্বীন ব্যক্তি প্রকাশনার অর্থ যোগান দেবেন- এটাই আশা। আল্লাহ পাক আমারেদকে সঠিকভাবে দ্বীন বুঝা ও তাসাওউফ তথা তাযকিয়ায়ে নফসের গুরুত্ব অনুধাবনে সাহায্য করুন। আমীন।

ফারুক আহমদ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, আলী সেন্টার, সিলেট।

২৭/১১/২০১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় আমি অধম অজ্ঞতার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থেকেও পৃথিবীবিখ্যাত সুফি তরীকা '**চিশতিয়া**'র মাশাইখদের জীবন ও সাধনার উপর গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করছি। এরপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ নবী, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তিনিই হচ্ছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যমণি। তাঁরই মাধ্যমে মহান আরশের অধিপতি মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পছন্দসই দ্বীন '**ইসলামকে**' সারা বিশ্বের মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবিক সকল জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন পেয়ারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরো সালাত ও সালাম পেশ করছি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আপনজন, আহলে-আওলাদ, পাক-পবিত্র বিবিগণ ও আল্লাহ যাঁদের প্রতি রাজী সেই আসহাবে কিরামের প্রতি।

এরপর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার তরীকতের মুর্শিদ যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি, কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে। তাঁর পবিত্র জীবনটি ছিলো অনন্যসাধারণ। সুহবত পেয়ে যারা ধন্য হয়েছেন তাদের মধ্যে মহান রাব্বুল আলামীন এ অধমকেও শরীক করেছেন। আমি এজন্য প্রভুর দরবারে চিরকৃতজ্ঞ। আল্লাহ! আমার প্রিয় শায়খকে আপনি জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

আল্লাহর ওলিরা প্রভুর নির্বাচিতজন। তাঁরা হচ্ছেন সৃষ্টির আশীর্বাদ। মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা মহামূল্যবান পরশপাথর। তাঁদের সুহবত সৌভাগ্যের আলোকবর্তিকা। যুগে যুগে কতো মানুষ তাসাওউফের মাশাইখদের দ্বারা দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন তার হিসাব কারো জানা নেই। তাদের পদধূলিতে ধন্য সমগ্র সৃষ্টি। তাঁরা মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার একান্ত আপনজন, বন্ধু, নৈকট্যশীল বান্দা। তাঁদের মহামূল্যবান জীবনবৃত্তান্ত, সাধনার স্বরূপ, আল্লাহপ্রাপ্তির কাহিনী, ইলমে মা'রিফাতের রাস্তায় ভ্রমণের ইতিকথা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য বিরাট উপকারী। তাঁদের জীবন আমাদের আদর্শ। ঈমানের দৃঢ়তা অর্জনের সূত্র। খোদান্বেষার উপাদেয়। এসব সত্যপোলব্ধি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে '**আউলিয়ায়ে চিশত**' গ্রন্থ রচনার প্রয়াস।

যদিও চিশতিয়া তরীকার নাম আজকের আফগানিস্তানের এক নিভৃত ছোট্টশহর '**চিশত**' এর নামানুসারে হয়েছে, তথাপি এই সিলসিলার সুফি দরবেশ এবং মুরীদানের সংখ্যা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী। বাস্তবে পুরো উপমহাদেশে মহাত্মন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আগমনের পর থেকে চিশতিয়া তরীকা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তা এখনও বিদ্যমান আছে। যেহেতু খাজা সাহেব ঈসায়ী দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে ভারতে এসেছিলেন তাই বলা যায় গত আটশত বছর ধরে এই অঞ্চলে চিশতিয়া তরীকার জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে।

চিশতিয়া তরীকার উপর বেশ কিছু গ্রন্থাদি ইতোমধ্যে রচিত হয়েছে। তবে বক্ষ্যমাণ কিতাবে সচরাচর রচিত গ্রন্থাদি থেকে পাঠকরা কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করবেন। চিশতি মাশাইখদের সংখ্যা অনেক। সুতরাং এখানে সবার উপর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থ প্রণয়নের লক্ষ্য হলো আমাদের (মানে আমার পীর সাহেব হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত) চিশতি সিলসিলার শাইখুল মাশাইখের জীবনালোচনা। সুতরাং নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত মোট ৪২ জন মহাত্মনের জীবন, কর্ম, হালত ও সাধনা নিয়ে আলোচনার মধ্যেই আমাদের

গবেষণা সীমিত থাকবে। সবার অবগতির জন্য ভূমিকায় সুফি তরীকার উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনার প্রয়াস পাচ্ছি।

চিশতিয়া তরীকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পরিচিতি

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে সর্বাপেক্ষা পুরাতন সুফি তরীকা হলো চিশতিয়া। তবে অন্যান্য হক্কানী সুফি তরীকার সঙ্গে চিশতিয়া তরীকার মিল বিদ্যমান। আজকের বিশ্বের শতাধিক সুফি তরীকাপন্থী মানুষ মরক্কো থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত আছেন। ইসলামের ইতিহাসের ১৪০০ বছরব্যাপী সুফিতত্ত্ব তথা ইলমে তাসাওউফ মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে বিরাট প্রভাব ও ভূমিকা রেখে আসছে। তাসাওউফকে সঠিকভাবে অনুধাবন না করে অনেকেই যুগ যুগ ধরে একে বিদআত, পথভ্রষ্টতা, বাতিল এমনকি কুফরী বলতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু '**ইসলাহুন নাফস**' এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাধনে জড়িত ইসলামের সঠিক আধ্যাত্মিকতা তথা সুফিতত্ত্ব তার স্বস্থানে স্বগৌরবে ঠিকে আছে এবং বৃহত্তর মুসলিম উম্মার হিদায়াতের সূত্র হিসাবে সর্বত্র খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

তরীকার উৎপত্তি

চিশতিয়া তরীকা ৯৩০ ঈসায়ী সালে আফগানিস্তানের হিরাত অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করে। চিশত নামক একটি ছোট্ট শহরে এর উৎপত্তি। অধিকাংশ গবেষকের মতে চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বর্তমান সিরিয়া (শাম) অঞ্চল থেকে আগত মহাত্মন এক সুফি ওলিআল্লাহ হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কথিত আছে হযরত শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা বাগদাদে অবস্থানরত তাঁর মুর্শিদ হযরত খাজা মুমশাদ আলী দিনওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত থাকাকালে খাজা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "হে তরীকতের সালিক! তোমার নামটি কি, বলো?" তিনি জবাব দিলেন, আমার নাম আবু ইসহাক শামী। খাজা সাহেব বললেন, "আজ থেকে তোমার নাম হবে আবু ইসহাক শামী চিশতি। আর তোমার পরে যে কেউই এই সিলসিলার সদস্য হবে সেও চিশতি নামে পরিচিত হবে।" সুতরাং স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আফগানিস্তানের হিরাতে এসে চিশত নামক জনপদে বসবাস শুরু করেন।

হযরত শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঈসায়ী দশম শতকে চিশত শহরে এসে তাসাওউফচর্চা শুরু করেছিলেন। এই শহরটি হিরাত থেকে ৯৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত। স্থানীয় আমীরের পুত্র আবু আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। হযরত শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় খলিফার উপর দায়িত্ব অর্পণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে হযরত আবদাল চিশতির নেতৃত্বে '**চিশতিয়া তরীকা**' হিরাত অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই তরীকার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহ। তিনি ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতকে ভারতের আজমীরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কথিত আছে একদা তিনি স্বপ্নযোগে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হিন্দুস্থানে এসে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন।

প্রাথমিক যুগের এই তরীকার অন্যান্য মহাত্মন সুফি অলিআল্লাহদের মধ্যে খাজা মাওদুদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নিযামুদ্দীন আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মুহাম্মদ বাদশা কাদিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই গ্রন্থে চিশতিয়া তরীকার ৪২ জন মহাত্মন ওলিআল্লাহর জীবন ও সাধনার উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। তবে প্রথমে তরীকার বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুটা দৃষ্টিপাত করা যাক।

চিশতিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্য

এই তরীকা 'ইশকে ইলাহী' বা আল্লাহপ্রেমের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। তরীকার সিলসিলা অবশ্যই আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে প্রিয় নবীজী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা পরবর্তীতে তরীকার পূর্ণ শাজারা লিপিবদ্ধ করবো।

নিম্নোক্ত ১০টি বিষয়ের উপর এই তরীকা বিশেষ নজর দিয়ে থাকে

১. শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ।
২. স্বীয় শায়খ বা পীরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ বিনাপ্রশ্নে মানা।
৩. দুনিয়াদারিত্বের প্রতি অনীহা।
৪. জাগতিক ক্ষমতার লোভ থেকে দূরে থাকা।
৫. গরীব-দুঃখীদের পাশে এসে দাঁড়ানো।
৬. মানবতার সেবা করা।
৭. অন্যান্য সুফি তরীকার প্রতি সহিঞ্চুতা ও সম্মান প্রদর্শন।
৮. একমাত্র সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা, সৃষ্ট বস্তুর প্রতি ভরসা না করা।
৯. কোনো কাশফ-কারামত প্রকাশ পেলে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা।
১০. নিজের হালত একমাত্র স্বীয় পীরের নিকট ছাড়া অন্য কারোর কাছে প্রকাশ না করা।

প্রাথমিক যুগে চল্লিশ দিনের '**চিল্লা**' পালনের নিয়ম ছিলো। দীর্ঘ চল্লিশ দিন একাকী থেকে আল্লাহর জিকির-মুরাকাবা ও ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকাকে চিল্লা বলে। আধুনিক যুগে চিল্লা পালনের প্রতি আগ্রহ তেমন বেশী আর অবশিষ্ট থাকে নি। চিল্লা পালনের সময় বেঁচে থাকার জন্য জরুরী রসদ-পত্র ছাড়া আর কিছুই সাথে রাখার নিয়ম নেই। মোটকথা দুনিয়ার আকর্ষণ ও চাকচিক্য থেকে নিজেকে দূরে রেখে একমনে আল্লাহর ইবাদতে রত থাকার জন্যই চিল্লা পালন করা হতো। অতীতে চিশতিয়া তরীকায় উচ্চাঙ্গের প্রেমের কবিতা তথা '**সামা**' শ্রবণ বৈধ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এটাও পরিহার করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় চিশতিয়া তরীকা

বর্তমানে এই তরীকার পীর-মুরীদের সংখ্যা আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বেশী। এই অঞ্চলে চারটি প্রসিদ্ধ তরীকা তথা চিশতিয়া, কাদিরিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া ও নকশবন্দিয়া তরীকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন তরীকা হলো

চিশতিয়া। এর প্রমাণ হিসাবে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আগমন ও তরীকার গোড়াপত্তন যথেষ্ট বলে আমাদের ধারণা। দ্বাদশ ঈসায়ী শতকে তাঁর আগমনের পূর্বে অন্য তিনটি সুফি তরীকা অত্র অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিলো বলে কোন প্রমাণ মিলে না। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অষ্টম অধঃস্তনখলিফা ছিলেন।

ভারতবর্ষে হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (বাবা ফরিদ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরে দক্ষিণ এশিয়ায় চিশতিয়া তরীকা দু'টি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। উভয় শখাই তাঁর দু'জন বিশিষ্ট খলিফার নামানুসারে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ শাখা দু'টি হলো চিশতিয়া নিযামিয়া (হযরত নিযামউদ্দীন আওলিয়ার নামানুসারে) এবং চিশতিয়া সাবিরিয়া (হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী'র নামানুসারে)। নিযামিয়া শাখার প্রসিদ্ধ শায়খদের মধ্যে নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং খাজা বন্দে নেওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম শায়খ নিযামউদ্দীন আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা এবং দ্বিতীয় শায়খ চেরাগে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের খলিফা ছিলেন। তবে এই মূল দু'টি উপশাখা থেকে পরবর্তীতে আরোও একাধিক প্রশাখার উদ্ভব ঘটে।

ঈসায়ী সপ্তদশ শতকে বেশিরভাগ নতুন প্রশাখা আত্মপ্রকাশ করে। এসব শাখা-প্রশাখার মূল কারণ ছিলো একাধিক উচ্চ পর্যায়ের ওলিআল্লাহদের আবির্ভাব এবং তাঁদের কর্তৃক সুফি তরীকাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। এছাড়া চিশতিয়া তরীকার জিকির-মুরাকাবা ও অন্যান্য ইবাদাত পদ্ধতি ইত্যাদির সংস্কারের প্রয়োজন জরুরী মনে করে মাশাইখে কিরাম তৎপর হয়ে ওঠেন। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ ঈসায়ী শতকে যেসব নতুন উপশাখার জন্ম নেয় তার একটি তালিকা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

১. চিশতিয়া নিযামিয়া আশরাফিয়া তরীকা: প্রতিষ্ঠাতা হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এটা চিশতিয়া নিযামিয়া শাখার আরেকটি উপশাখা।

২. চিশতিয়া সাবিরিয়া ইমদাদিয়া তরীকা: হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। এটা মূলত চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীকার উপশাখা।

৩. চিশতিয়া কাদিরিয়া নিযামিয়া নিয়াযিয়া তরীকা: হযরত শাহ নিয়ায আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই উপশাখার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মূল চিশতিয়া নিযামিয়া তরীকায় সুফি তরীকার আরেক প্রধান শাখা কাদিরিয়া তরীকাকেও একত্রিত করার প্রয়াস পান।

৪. চিশতিয়া নিযামিয়া হাবিবিয়া তরীকা: হিজরি ত্রয়োদশ শতকে খাজা হাবীব আলী শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক ভারতের হায়দরাবাদে এই তরীকার উদ্ভব ঘটে। এটাও চিশতিয়া নিযামিয়া তরীকার একটি উপশাখা।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মূল চিশতিয়া তরীকা অনেকটি উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। উপরের চারটি উপশাখা ছাড়াও পরবর্তীতে চিশতিয়া, রশীদিয়া, কুদ্দুসিয়া, হুসাইনিয়া, সাবিরিয়া ইত্যাদি অনেক নামে '**শাজারাহ**' প্রকাশ হতে দেখা যায়। আসলে এসব হওয়ার মূল কারণ হলো চিশতিয়াদের অন্যান্য সুফি তরীকার সঙ্গে সংমিশ্রণ। এ কারণে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ চারটি তরীকার উপরই মুরীদদেরকে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই চারটি হলো চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া, কাদিরিয়া ও নকশবন্দিয়া তরীকা। তবে এটা সত্য যে, মুরীদকে সাধারণত মূল তরীকার নিয়মানুসারেই প্রাথমিক জিকির-মুরাকাবার সবক দেওয়া হয়ে থাকে।

চিশতিয়া তরীকার প্রাথমিক সবক

চিশতিয়া তরীকার অজিফা ও জিকির-মুরাকাবা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। আর তরীকতের রাস্তায় স্বীয় শায়খ বা মুর্শিদের প্রতিটি নির্দেশ পালন হলো অবশ্যকরণীয়। অন্যথায় মাকছুদ পূর্ণ হবার নয়।

প্রথমেই ফাতিহা পাঠ ও সওয়াব রিসানী (সওয়াব প্রদান) করতে হয়। এর নিয়ম হলো: ১১ বার ইস্তিগফার, ৩ বার বিসমিল্লাহসহ ফাতিহা পাঠ, এরপর বিসমিল্লাহসহ ৩ বার সূরা ইখলাস, তৎপর ১১ বার দরূদ শরীফ পড়ে মুনাজাতের মাধ্যমে সওয়াব রিসানী করা। সাধারণত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে-আওলাদ এবং সাহাবায়ে কিরাম, দুনিয়ার সকল পীর-আউলিয়ার রূহ, চিশতিয়া তরীকার সকল আউলিয়ার রূহ এবং খাস করে মা-বাবার (মৃত হলে রূহের উপর) হায়াতে তায়্যিবাহ এবং স্বীয় পীর সাহেবের হায়াতে তায়্যিবার প্রতি সওয়াব রিসানী করা হয়। তারপর কিবলামুখী হয়ে বসে জিকির শুরু করতে হবে। প্রথম-দিকে মুরীদকে ছয় তাসবীহ, তাসবীহে ফাতিমী, দমের জিকির ইত্যাদি ছবক দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর এক জরবী, দুই জরবী, ইসমে যাত, তেরো তাসবীহ জিকির করতে হয়। এরপর শুরু হবে মুরাকাবা (ধ্যান)।

প্রথম সবক ৬ তাসবীহ

মুরীদকে শায়খ বাইআত করার পর ৬ তাসবীহ নিয়মিত পালনের নির্দেশ দেন। এটার নিয়ম হলো: ফযর ও মাগরিবের নামায শেষে **'সুবহানাল্লাহ' ১০০ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' ১০০ বার, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ১০০ বার এবং 'আল্লাহুআকবার' ১০০ বার** মনোযোগসহ পাঠ করা। তারপর দরূদ **শরীফ ১০০ বার ও আস্তাগফিরুল্লাহ ১০০ বার।** এই ৬ তাসবীহ নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ করতে না পারলেও অন্য কোন সময় পাঠ করে নিলেও চলবে। তবে স্বেচ্ছায় এই তাসবীহ পরিহার করা উচিৎ নয়। এটা জপমালা মনে করে পাঠ করা জরুরী।

তাসবীহে ফাতিমী

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে এই তাসবীহ পাঠ করতে হয়। নিয়ম হলো: **'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আল-হামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার** খুব মনোযোগসহ পাঠ করা।

উক্ত উভয় তাসবীহ মনোযোগসহ পাঠ করলে মনের মধ্যে ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। হয়তো বা মুরীদের আধ্যাত্মিক অবস্থার রদবদল ঘটবে। কোনো বিশেষ স্বপ্ন বা অন্য কোনো '**হালের**' অবস্থা আত্মপ্রকাশ করলে স্বীয় মুর্শিদ ছাড়া আর কারো কাছে ব্যক্ত করতে নেই। মুর্শিদ হলেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। তিনি বুঝতে পারবেন মুরীদের হাল-হাক্বিকাত। আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমরা সকলেই রোগা। সুলুকের রাস্তায় পদার্পণ করলেই দেখা যায় আমাদের আধ্যাত্মিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নফসে আম্মারা (খারাপ চিন্তা-ভাবনার উদ্যোক্তা) ও শয়তানের প্ররোচনায় আমরা জর্জরিত হতে থাকি। আল্লাহর রাস্তায় চলতে সৃষ্টি হয় শত বাধা। কিন্তু নিজেকে শক্তভাবে ইবাদাত-বন্দেগীতে ডুবিয়ে রাখলে এবং শায়খের বাতলে দেওয়া আ'মল তথা তাসবীহাত নিয়মিত করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ, সকল বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে মনজিলে মকসুদের দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা করা যায়।

পাস-আনফাস

চিশতি শায়খরা মুরীদদেরকে '**পাস-আনফাস**' নামক একটি জিকিরের তা'লিম দিয়ে থাকেন। পাস-আনফাস অর্থ দমের জিকির। শ্বাস-নিঃশ্বাস দ্বারা মানুষ জ্যান্ত। জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই ক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে। সুতরাং সজ্ঞানে যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করি, তখন আল্লাহর নাম মনে মনে স্মরণ করতে পারি। অনুরূপ শ্বাস ফেলার সময়ও তাঁর পবিত্র স্মরণ দ্বারা নিজেকে '**ইবাদতের**' মধ্যে লিপ্ত রাখতে সক্ষম হতে পারি।

হিসাব করে দেখা গেছে মানুষ দৈনিক অন্তত ২৪ হাজার বার শ্বাস গ্রহণ ও নির্গত করে। সুফিদের কথা হলো, একটি শ্বাসও যেনো আল্লাহর স্মরণ ছাড়া '**নষ্ট হয়ে**' না যায়। তবে এই জিকির '**জারি**' করতে হলে সব সময় চেষ্টা-সাধনা করতে

হবে। এই জিকিরের নিয়ম হলো: শ্বাস যখন ভেতরে নেওয়া হবে তখন মনে মনে **'আল্লাহ্'** শব্দটি স্মরণ করা। এরপর যখন শ্বাস ছাড়া হয় তখন খিয়াল রাখা **'হু'** শব্দটি। উভয় ক্ষেত্রে মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে নেই। শুধু ভাবনার মাধ্যমে এই জিকির করতে হবে। অন্তরের মধ্যে খিয়াল দ্বারা এই জিকির করা হয় বলেই এটা সর্বাবস্থায় করা জায়িয। যেমন প্রস্রাব-পায়খানার সময় বা এমনকি স্ত্রী-সহবাসের সময়ও এই জিকির অব্যাহত রাখলে কোনো ক্ষতি নেই।

লতিফার পরিচিতি

সাধারণত লতিফার দিকে খিয়াল রেখে জিকির-মুরাকাবা করতে হয়। চিশতিয়া তরীকা অনুযায়ী মানবদেহে মোট **১০**টি লতিফা [সূক্ষ্ম কেন্দ্র] আছে। এগুলো হলো:

১. কলব - বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে;
২. রূহ - ডান স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে কিছুটা বুকের দিকে;
৩. সির - কলব ও রূহের মধ্যখানে বুকের কড়ার নিকট;
৪. খফী - কপালের মধ্যে সিজদার স্থানে;
৫. আখফা - মাথার তালুর মাঝখানে;
৬. নফস - নাভিমূলে;
৭. আব; ৮. আতশ; ৯. খাক; এবং ১০. বাদ - এ চারটি দেহের সর্বত্র বিরাজমান।

১. লতিফায়ে কলব: এই লতিফার রং হলো লাল। মানবিক সকল কার্য এই লতিফার মাধ্যমেই অনুধাবন হয়। একে জিকিরের মাধ্যমে জাগ্রত করে তুললেই সত্যিকার '**জিন্দাদিল**' হওয়া যায়। সুফিয়ায়ে কিরাম সকল লতিফার রাজা '**কলব**' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাথমিক অবস্থায় সালিককে এই কলবের দিকে খিয়াল করে জিকির করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কলব এর আভিধানিক অর্থ হৃৎপিণ্ড। তবে তাসাওউফের পরিভাষায় কলবের অর্থ হলো '**রূহানী হৃদয়**'। কলবের স্বরূপ ও কার্যকারিতা বিভিন্ন সুফি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন: কারো মতে এই কলবই হলো সকল আধ্যাত্মিকতার মূল। এখানেই ঐশী নূরের ঝলক প্রতিফলিত

হয়। হাক্বিকাতের নূর দ্বারা সালিককে যখন আল্লাহ তা'আলা নূরান্বিত করেন তখন এই কলবই সে নূরপ্রাপ্তির স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়। অন্যরা বলেন, কলব হলো ইশক বা ঐশীপ্রেমের দরজা। তবে অধিকাংশ মাশাইখের মতে কলব হলো দু'টি যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর '**যুদ্ধক্ষেত্র**'। এর প্রথমটির সেনাপতি '**নফস**' আর দ্বিতীয়টির সেনাপতি '**রূহ**'। নফস (মূলত নফসে আম্মারা- খারাপ প্রবৃত্তি) নামক সেনাপতি যদি যুদ্ধে জয়ী হয়ে পড়ে তাহলে কলব হবে তার নিয়ন্ত্রণে। অপরদিকে রূহ (নফসে মুতমায়িন্নাহ) নামক সেনাপতি যদি বিজয়ী হয় তাহলে কলব হবে আলোকিত ও আল্লাহপ্রেমে আসক্ত এবং মকবুলিয়াতের ওয়াসিলা।

জিকির, মুরাক্বাবা, মুজাহাদা ইত্যাদি সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো উক্ত কলবকে পরিষ্কারকরণ। কারণ আল্লাহ ছাড়া সবকিছু তথা গাইরুল্লাহ দ্বারা কলব মরিচাযুক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অন্ধকার কলবে হাক্বিকাতের নূর প্রতিফলিত হয় না। ঠিক যেরূপ অপরিচ্ছন্ন আরশির মধ্যে প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে না, ঠিক তদ্রূপ সত্যের আলো দ্বারা অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার কলব নূরান্বিত হয় না। সুতরাং সালিককে তার কলব পরিষ্কার রাখার আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। এতে কলবের অবস্থা উন্নততর ও নফসে আম্মারার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে।

উক্ত নিয়মিত জিকির-মুরাক্বাবা দ্বারা পরিষ্কার রাখার আরেক নাম হলো '**তাযকিয়ায়ে ক্বলব**'। সুফি সকল তরীকায়ই বলা হয়েছে, তাযকিয়ায়ে ক্বলব একান্ত জরুরী। তবে তা অর্জনের পদ্ধতি ভিন্ন। চিশতিয়া তরীকায় জিকির-মুরাক্বাবা দ্বারা পরিষ্কার করার সর্বাধিক উত্তম পদ্ধতি হলো '**ইশকে ইলাহী**'র মাধ্যমে জিকির-মুরাক্বাবা করা। অর্থাৎ ইশক এর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ইশকের অগ্নি দ্বারা কলবের যাবতীয় মরিচাকে দগ্ধ করে দেওয়া। ইশকে ইলাহীর গুরুত্ব চিশতিয়া তরীকায় বেশী থাকার কারণেই অধিকাংশ '**মজযূব**' (আল্লাহর ধ্যানে সদামগ্ন ব্যক্তি) এই তরীকাভুক্ত বলেই দেখা যায়।

২. লতিফায়ে রূহ: এই লতিফার রং সাদা। এই লতিফা জাগ্রত বা জিকির দ্বারা জিন্দা হয়ে ওঠলে সালিকের নিকট আলমে আ'রাফ বা আলমে বরযখের সকল দৃশ্যাবলী উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সুফিদের মধ্যে লতিফায়ে রূহের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের

উপর বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ সুফির মতে রূহ সৃষ্ট। এটা মৃত্যুর পর '**ইল্লিয়্যিন**' বা '**সিজ্জিন**'-এর অধিবাসী হয়। প্রথমটি নেককার লোকের ও শেষেরটি বদকার লোকের রূহের বাসস্থান হবে। তবে এ বাসস্থান অস্থায়ী। রোজ হাশরের দিন সকলেই নিজের রূহসহ সশরীরে ময়দানে জমায়েত হবেন শেষবিচারের জন্য।

'**তাজাল্লিয়ে রূহ**' বা আলোকিত রূহ এর স্তরে উন্নীত হতে হবে যে কোনো তরীকতের সালিককে। শরীয়তের প্রতিটি নির্দেশ মানা, সুন্নাতের পাবন্দ এবং পরহেজগারী হলো তাজাল্লিয়ে রূহ এর স্তরে উপনীত হওয়ার চাবিকাঠি। চিশতিয়া তরীকায় তাই শরীয়তের উপর সম্পূর্ণরূপে অটল থাকার শক্ত তাগিদ এসেছে।

৩. লতিফায়ে সির: এই ঐশী লতিফার রং সবুজ। লাওহে মাহফুজের সাথে এর সংযোগ। এই লতিফা জিন্দা হয়ে ওঠলে '**আলমে মিছাল**' এর হাক্বিকাত সালিকের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে। আমরা বলতে পারি এই লতিফাটি হলো মানবিক '**চেতনা**'র সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'**সির**' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো '**গোপন**'। সিরকে জিকির-মুরাক্বাবা দ্বারা '**শূন্য**' করতে হবে। একে বলে '**তাক্বলিয়ায়ে সির**'। এখানে শূন্যকরণ অর্থ হলো যাবতীয় জাগতিক চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত করা। কারণ হাক্বিকাত লাভের পথে বাধা বা পর্দা হলো এসব বিষয়।

সির ও রূহ এই উভয় লতিফার সমন্বিত রূপের নাম '**রূহে ইনসানী**' (মানবাত্মা)। অন্য কথায় '**আয়ান**'। রূহে ইনসানীর উচ্চ স্তরে আরোহণকৃত সালিকের নিকট '**লাওহে মাহফুজে**' সংরক্ষিত অনেক ব্যাপার উন্মোচন হয়ে পড়ে। একেই বলে '**কাশফ**'।

৪. লতিফায়ে খফি: এই লতিফার যুগসূত্র '**কিতাবে মারকূম**' বা লিখিত কিতাবের সঙ্গে। খফি শব্দের অর্থ হলো, রহস্যজনক গোপনীয়তা। এটাকে '**অন্তর্জ্ঞানের**' সঙ্গে সুফিরা তুলনা করেছেন। এই লতিফা জাগ্রত হলে অন্তর্দৃষ্টিপ্রখর হবে। এই লতীফার রং নীল।

৫. লতিফায়ে আখফা: আখফা শব্দের অর্থ গভীরভাবে রহস্যময়। এটার অবস্থানও মানব মস্তিষ্কের গভীরে, ঠিক কেন্দ্রে। সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন, সালিকের জন্য এই লতিফাকে '**জাগ্রত**' করাই হলো মূল লক্ষ্য। এর রং কালো। এটাকে '**নুক্বতায়ে ওয়াহিদা**' বা একত্বের বিন্দু নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লি সরাসরি এই বিন্দুতেই প্রতিফলিত হয়। এখানেই সংরক্ষিত আছে জগতের গুপ্ত রহস্য। বলা হয়, '**মানুষের জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে**'- এই বাণীর মর্ম অনুধাবনের লতিফা হলো আখফা। মূলত সত্যিকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হাক্বিকাতের জ্ঞানের সূত্র হলো এই লতিফা। তবে এখানে প্রবেশাধিকার সরাসরি সম্ভব নয়। অন্যান্য সকল লতিফার স্তর ডিঙ্গানো ছাড়া এর ধারেকাছেও যাওয়া যাবে না। আখফা ও খফির সমন্বয়কে '**রূহে আজম**' বা বিরাট রূহ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অপর নাম সাবিতা।

৬. লতিফায়ে নফস: এই লতিফার রং হলুদ। নফসের অর্থ '**আপন**', '**নিজ**', '**চেতনা**' ইত্যাদি। মানুষের শ্বাস-নিশ্বাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক। বলা হয়, নফস দ্বারাই আমরা জ্যান্ত। অথচ এই নফসই হলো সকল অনিষ্টের মূল। কিন্তু একে কুরবানী দেওয়া যায় না। এর কুরবানী অর্থ মৃত্যু। তবে হ্যাঁ, সুফিয়ায়ে কিরাম কঠোর সাধনা দ্বারা নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। একে দুর্বল করে দেন। ফলে সে দুনিয়াবী পাপ-পঙ্কিলতার দিকে সালিককে আর ধাবমান করতে সক্ষম হয় না।

জীবনচলার পথে দুনিয়াবী যাকিছু চাহিদা আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয় তা সব্বই নফসের কাজ। সে স্বয়ং হালাল বা হারাম এর তোয়াক্কা করে না। তার নিজের স্বাদ ও ইচ্ছা পূরণে যে কোন উপায়-অবলম্বন খুঁজবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণহীন '**নফস**'ই মানুষকে অধঃপতিত করে। তরীকতের রাস্তায় যারা ভ্রমণে আছেন, তাদের জন্য নফসে আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা অনেকটা সহজ। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা ঈমানদার অথচ পীর-মুরীদীর প্রতি অনাগ্রহ কিংবা এ রাস্তাকে সঠিক মনে করেন না- তাদের পক্ষে নফসকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন ব্যাপার। মানুষ অবশ্যই হালাল-হারামের ভেদাভেদ করতে জানে। শরীয়তের নির্দেশনা সম্পর্কেও অধিকাংশ মানুষ ওয়াকিফহাল। নিজেকে হালালের সঙ্গে

সম্পৃক্তকরণ, সঠিক ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা জীবন গঠন ইত্যাদি তো মানুষের আয়ত্তাধীন। এরপরও কেন পীর-মুরীদী? নিজে নিজে চেষ্টা-সাধনা করলেই তো হয়?

উক্ত প্রশ্নের জবাব হলো, নফসের এক অতি চতুর বন্ধু আছে। তার নাম শয়তান। নফসের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সে কাজে লাগায়। তার ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্র নফস। শয়তানের প্রতারণা-প্ররোচনা ও নফসের হালাল-হারামের বাছ-বিচারহীন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। এরূপ প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হলে এমন একজন '**গাইড**' বা নফসের চিকিৎসক দরকার যিনি এসব ব্যাপারে পুরোদমে ওয়াকিফহাল। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনা মেনে চললে নফস ও তার ধূসর শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর এই কামিল ব্যক্তিই হচ্ছেন তরীকতের মুর্শিদ বা পীর। পীরের দায়িত্ব মুরীদকে পাপাসক্তি থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাতে রূপান্তরের পথ বাতলে দেওয়া। সুতরাং যারা এখনো সঠিক ইসলামী রূহানিয়্যাতের উপর সন্দেহ পোষণ করেন, তাদের উচিৎ পুনঃবিবেচনা করা। বরং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন কামিল মুর্শিদের হাতে বাইআত (তাওবাহ) গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করুন- আমি এটুকু পরামর্শ দিচ্ছি।

তাযকিয়ায়ে নফস- তাসাওউফের মূল

তাসাওউফে '**তাযকিয়ায়ে নফস**' বা নফসের পরিশুদ্ধি কেন্দ্রীয় বিষয়। এটা অর্জনই সকল চেষ্টা-সাধনার মূল লক্ষ্য। প্রাথমিক অবস্থায় নফস মূলত '**নফসে আম্মারা**' (নির্দেশমূলক নফস) হিসাবে বিরাজমান থাকে। এই আত্মকেন্দ্রিক, নিম্নস্তরের নফসকে যে কোন উপায়ে উচ্চতর পরিশুদ্ধ নফসে পরিণত করা চাই।এই পরিষ্কারকরণ ক্রিয়ার নামই তাসাওউফ। বিভিন্ন '**রাস্তা**' বা পদ্ধতির মাধ্যমে এটা সাধিত হতে পারে।

সুফিয়ায়ে কিরাম ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগেই তাযকিয়ায়ে নফসের একাধিক পথ বা তরীকা আবিষ্কার করে গেছেন। স্তরে স্তরে নফসকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে উপনীত করতে হবে। এসব স্তরকে বলে মাক্বামাত।

অধিকাংশ সুফির মতে তাযকিয়ায়ে নফসের মোট ৭টি মূল মাক্বাম আছে। এ সাতটি অতিক্রম করে যেতেই হবে। একটি এক্সপ্রেস ট্রেন তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পূর্বে রাস্তায় কয়েকটি প্রধান স্টেশনে থেমে থেমে যায়। এ স্টেশনগুলো উপেক্ষা করার উপায় নেই। তবে মাঝখানে আরো অসংখ্য অপ্রধান স্টেশন থাকে। ওগুলোতে এক্সপ্রেস ট্রেন না থামলেও লকেল ট্রেন থামবে। আমাদের আত্মিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে মুরীদ হওয়ার সময় কোন্ ট্রেনের যাত্রী হয়েছি- লকেল না এক্সপ্রেস। যদি নামায, রোযা, সুন্নাতের পাবন্দ, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মানা এবং পরহেজগারী অবলম্বন ইত্যাদি সৎ গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকি তাহলে মুর্শিদের নিকট শরণাপন্ন হওয়ার পরই হয়তো তরীকতের এক্সপ্রেস ট্রেনে আরোহণের যোগ্য হয়ে যেতে পারি। এটা হবে আমাদের জন্য অধিক সৌভাগ্যের কারণ। আল্লাহর ইচ্ছা হলে, ৭টি স্টেশনে কালক্ষেপণ হয়তো তেমন বেশীদিন স্থায়ী হবে না- মাক্বামে মাকছুদ তথা গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবেন দয়াপরবশ হয়ে। আর মনে রাখা জরুরী, আল্লাহর দয়া ও মুহাব্বাত ছাড়া এ রাস্তায় চলে উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে, আমাদের মধ্যে যদি ইসলামের মৌলিক বিষয়ে অধিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে মুরীদ হওয়ার সময় হয়তো লকেল ট্রেনের যাত্রী হওয়ার বিকল্প থাকবে না। হয়তো অনেকদিন চলে যাবে ট্রেনের টিকিট পেতে। এরপরও মুরীদ হয়ে চেষ্টা-সাধনা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ বৈ-কি। এই মুরীদ হওয়াটাই আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা হয়ে যেতে পারে।

নফসের ক্রমোন্নতির স্তর

পবিত্র কুরআনে উত্তম নফসকে ‘**নফসে মুতমায়িন্নাহ**’ বলা হয়েছে। এই স্তরে উপনীত হওয়াই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং স্বার্থকতা। সুফিয়ায়ে কিরাম নফসের ক্রমোন্নতির তিনটি স্তর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলো হলো **১. নফসে আম্মারা (নির্দেশমূলক নফস), ২. নফসে লাওওয়ামা (আত্মসমালোচনামূলকনফস)** এবং **৩. নফসে মুতমায়িন্নাহ (প্রশান্ত নফস)**। শেষোক্ত নফসকে সুফিয়ায়ে কিরাম ‘**নফসে সাফিয়্যাহ ও কামিলা**’ (পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত আত্মা, আল্লাহর সম্মুখে বিরাজমান) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে কামনা করছি, এই গ্রন্থে আলোচিত চিশতি মাশায়িখে কিরামের ওয়াসিলায় আমাদেরকে উচ্চতর

মাক্বামে উপনীত হতে তিনি যেনো মুহাব্বাতের দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি নজর দেন। আমীন।

এই গ্রন্থখানা আমার দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল। এটা সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত বলা মোটেই উচিৎ হবে না। মানবিকভাবে যেটুকু সম্ভব সঠিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে নিজের ভাষায় বর্ণনা তুলে ধরেছি চিশতিয়া তরীকার মহাত্মন সুফিয়ায়ে কিরামের জীবনের ওপর। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সঠিক দ্বীনদারী, তাযকিয়ায়ে নফস এবং ইলমে মা'রিফাতের উৎস, জগতের আশীর্বাদ, সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, নবীদের সর্দার, শেষ নবী, আল্লাহর একান্ত মাহবুব, ফখরে আলম, পেয়ারে নবীজী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনালোচনা দিয়ে গ্রন্থের শুরু এবং আমার প্রিয়, শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও সাধনার উপর বর্ণনা দ্বারা এর শেষ।

প্রকাশের সুবিধার্থে গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত করেছি। প্রথম এ খণ্ডে আছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র জীবনালোচনা এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জীবনচরিত। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আরিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত চিশতি পীর-মাশাইখের জীবনালোচনা। তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে গাঙ্গুহ শরীফের জগতখ্যাত অলি হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে কুতবুল ইরশাদ হযরত শায়খ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত মাশাইখের জীবন ও হালতের উপর বর্ণনা। চতুর্থ খণ্ডে কুতবে আলম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে আমার প্রিয় মুর্শিদ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত মোট তিনজন মুহাক্কিক ওলির জীবন ও সাধনার উপর বিস্তারিত আলোচনা।

শেষ খণ্ডের পরিশিষ্টে সবার জ্ঞাতার্থে তুলে ধরেছি তাসাওউফ পরিভাষাকোষ, কতিপয় জিকির, শুগল ও মুরাক্বাবা পদ্ধতি, খানক্বাহ ও এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং চিশতি সুফি তরীকার বিভিন্ন সিলসিলার কয়েকটি নক্সা। আশাকরি এতে সকলে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক গুণিজন আমাকে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। খাস করে আমার মরহুম আব্বাজান হাজী আলী আসগর সাহেব, আমার অসুস্থ আম্মাজান হাজিয়্যা মমরাজ বিবি। তাঁদের আদর-কদর, মায়া-মুহাব্বাত ও লালন-পালনের ধার কোনদিন শোধ হবে না। আরো স্মরণ করছিহযরত কুতবে যামানের জলিলুল কদর খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী এবং হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহির খলিফা হযরত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদির সন্তান মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসানকে। তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা কখনো বিস্মৃত হবার নয়। আমি তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। লেখালেখি জীবনের সাথী বন্ধুবর কবি আবদুল মুকিত মুখতারকেও স্মরণ করছি এ মুহূর্তে। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় তার সঙ্গলাভ ছিলো আমার জন্য বিরাট উপকারী। আরো অনেকের কথা মনে পড়ছে যাদের সুহবত ও উপদেশ থেকে লাভবান হয়েছি। যেমন, হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বিতীয় সাহেবজাদা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্বারী, বন্ধুবর হযরত শায়খ ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী (যার দাওয়াতে প্রথম হজ্জের সফরে যাই ও মক্কা মুয়াজ্জমায় কুতবে যামানের হাতে বাইআত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি), কলামিস্ট মরহুম দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ সাহেবের (ভাতিজার সন্তান) নাতি বৃটেন প্রবাসী দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী, সুহৃদ লেখক মাওলানা জালালুদ্দীন কালারুখী, লেখক-কলামিস্ট শাহজাহান সিরাজ, হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট মুরীদা বৃটেন প্রবাসী তাপসী হুসনুল আম্বিয়া চৌধুরী (যার দাওয়াতে আমি কুতবে যামানের হাতে বাইআত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি) এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক সাহেব (যাঁর সাথে বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে)।

ভুল-ত্রুটির জন্য আমি সর্বাগ্রে রাহমান-রাহীম-গাফফার-ওয়াদুদ মহান প্রতিপালক আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের নিকট যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তবে দয়াকরে আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সতর্কতার সাথে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সর্বদাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
শা'বান ১৪৩৩ হিজরি, জুলাই ২০১২ ঈসায়ী।

প্রারম্ভ

চিশতিয়া তরীকার শাজারাহ মুবারক

চিশতিয়া তরীকার ইতিহাস ও জিকির-মুরাকাবার পদ্ধতির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কিতাব প্রণয়নের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে চিশতিয়া তরীকার একটি বিশেষ সিলসিলার প্রসিদ্ধ মাশাইখদের জীবন, কর্ম ও তরীকতের খিদমাতের উপর যেটুকু সম্ভব তথ্যনির্ভর আলোচনা। তবে তরীকার পরিচিতি ও ইতিহাসের উপর কিছুটা ওয়াকিফহাল থাকাও জরুরী। এ কারণেই দীর্ঘ ভূমিকাটির সংযোজন। যা হোক, প্রথমেই এই তরীকার শাজারাহ মুবারক এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

তামামী তারিফ জানো সেই সে খোদার,
পাপীদেরকে যে দিয়েছেন দু'আর অধিকার,
দরূদ ও সালাম ভেজি নবীজীর উপরে,
শাফিউল উম্মত যিনি হাশরের বিচারে।

-খলীফায়ে মাদানী শায়খ লুৎফুর রাহমান বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
তাঁর স্বরচিত '**শাজারায়ে তায়্যিবা**'র প্রারম্ভিক চারটি পংক্তি।

আমরা ভূমিকায় উল্লেখ করেছি যে, চিশতিয়া তরীকা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দু'জন খলীফার নামানুসারে তা দু'টি মূল উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এর প্রথমটি হলো চিশতিয়া নিযামিয়া (হযরত নিযামউদ্দীন আওলিয়ার নামানুসারে) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে চিশতিয়া সাবিরিয়া (হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারীর নামানুসারে)। এরপর উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং অনেকগুলো উপশাখার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বলা যায় ভারতে চিশতিয়া তরীকার সিলসিলা বা শাজারাহ হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর ও তাঁর পূর্বেকার সকল অলিআল্লাহদের সঙ্গে পরবর্তী যাবতীয় শাখারই মিল বিদ্যমান। অর্থাৎ রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত এবং এখান থেকে হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে চিশতিয়া তরীকার সিলসিলা একই। হযরত নিযামউদ্দীন আওলিয়ার খলীফাদের মধ্যে বিভিন্ন সিলসিলা স্থাপিত হয়েছে এবং একইভাবে হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারীর খলীফাদের মধ্যেও অনেক সিলসিলার জন্মলাভ করেছে। নিম্নে আমরা প্রথমে মূল শাজারাহ মুবারক তুলে ধরছি। তারপর ভারতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ উপশাখাগুলোর তালিকা লিপিবদ্ধ করা হবে।

খাতামুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত চিশতিয়া তরীকার শাজারাহ মুবারক

সায়্যিদিল ক্বাওনাইন, খাতামুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু
হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ আবুল ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা ফুযাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ সুলতান ইব্রাহীম বিন আদহাম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ হুজাইফা মারআ'শী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা আবু হুবাইরাহ বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (তরীকার প্রতিষ্ঠাতা)
হযরত শায়খ খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা আবু মুহাম্মদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শায়খ খাজা আবু ইউসুফ বিন সাম’আন হুসাইনী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা মাওদুদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা শরীফ জিন্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

চিশতিয়া-সাবিরিয়া-রশীদিয়া শাজারাহ মুবারক

হযরত শায়খ আলাউদ্দীন আলী আহমাদ সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ আহমদ আব্দুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ আহমদ আরিফ সাহেব রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ মুহাম্মদ আরিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ জালালুদ্দীন জলীল তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ আবু সাঈদ আসআদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ আব্দুল হাদী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ আব্দুল বারী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
হযরত শায়খ হাজী আব্দুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শায়খ মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শায়খ মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

কুতবে যামান হযরত শায়খ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

শাইখুল ইসলাম হযরত শায়খ মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শায়খ ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

চিশতিয়া তরীকার আরোও অনেক মহাত্মন পীর-মাশাইখ অলিআল্লাহ পুরো বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ছিলেন এবং এখনও আছেন। ভারত উপমহাদেশের অনেক ওলিআল্লাহর নাম উপরোক্ত তালিকায় নেই। এর কারণ হলো আমার শায়খ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের সিলসিলার উপরই আমাদের গবেষণা সীমিত। সুতরাং এই প্রথম খণ্ডের মূল বিষয়ের দিকে এবার মনোনিবেশ করছি- যা হলো, চিশতিয়া-সাবিরিয়া-ইমদাদিয়া-রশীদিয়া তরীকাভুক্ত মাশাইখদের জীবনালোচনা।

উদ্ধারিয়া নেও আছি বিপদে অধীর,
আম্বিয়া আউলিয়া গৌছ কুতুবের খাতির।
বেহেশ্ত, দিদার, চাই এলাহী আল-আমিন,
আরজ কবুল আল্লাহ করো- আমীন।

-শায়খ লুৎফুর রাহমান বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
তাঁর স্বরচিত ‘**শাজারায়ে তায়্যিবা**’র শেষের চারটি পংক্তি।

পরিচ্ছেদ ১

সায়্যিদিল ক্বাওনাইন, খাতামুন্নাবিয়্যিন
হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(পৃথিবীতে শুভাগমন: ৫৩ হিজরিপূর্ব, বিদায়গ্রহণ: ১০ হিজরি; রওজা মুবারক: মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ)

আমি অতি নগণ্য এক নাচিজ আল্লাহর গোলামের পক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা, নবী ও রাসূল, গোটা বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, শরীয়ত ও তরীকতের ইমামদের ইমাম, কিয়ামতের কঠিন দিনে উম্মতের শাফায়াতের অধিকারী হযরত মুহাম্মদ আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পবিত্র জীবনের উপর আলোচনার সাহস খুঁজে পাচ্ছি না। চিশতিয়া তরীকার শাজারাহ মুবারকের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবশ্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নাম মুবারক আসে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় হক্কানী সুফি তরীকার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ নাম মুবারক তাঁরই। সুতরাং অজ্ঞতা ও ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পবিত্র জীবনের উপর কিছুটা আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। অন্যথায় পুরো কিতাবখানি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি অধম গুনাহগার সংকোচ বোধসহ একমাত্র মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে ও তাঁর উপর ভরসা করে এই কঠিন কাজে হাত দিলাম। হে আল্লাহ! এই অধম দুর্বল ঈমানদার গুনাহগার মানুষটির প্রতি আপনি রাহমাতের দৃষ্টি দিন এবং এই কাজে আমাকে সাহায্য করুন। আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মহান জীবনালোচনার ক্ষমতা ও জ্ঞান আদৌ আমার নেই। একমাত্র আপনার অনুগ্রহ ও করুণা আমার সম্বল। আপনি আমার কলমকে সঠিক তথ্যনির্ভর আলোচনা লিপিবদ্ধ করতে দৃঢ় রাখুন।

জগতে শুভাগমন ও নামকরণ

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত, আসহাবে ফীলের বছর তথা হস্তীবাহিনী দ্বারা ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা যে বছর মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল সে বছরই রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরার বুকে শুভাগমন করেন। ঠিক কোন তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে, শুভ জন্মের দিন ছিলো সোমবার এবং সময় ছিলো সুবহে সাদিক। তারিখের ব্যাপারে চারটি রিওয়ায়েত বিদ্যমান: ২য়, ৮ম, ১০ম ও ১২তম রবিউল আউয়াল। এছাড়া ঈসায়ী ৫৭০ এবং কারো কারো মতে ৫৭১ সন হযরতের জন্মের বছর ছিলো বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিশ্ব-ভূবন আলোকিত করে হিদায়াতের নূরের রবি একদিকে মক্কা মুকাররমায় মা আমিনার কোলে উদিত হলেন আর অপরদিকে ভীষণ ভূমিকম্পে পারস্যের সম্রাট খসরুর রাজপ্রাসাদ ধ্বসে পড়লো। অগ্নিপূজার হাজার বছরের নিদর্শন যুগ যুগব্যাপী জ্বলন্ত অনির্বাণ অগ্নিশিখা নিভে গেল। শুকিয়ে গেল পারস্য উপসাগর। এসব অলৌকিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণ হলো যে, আখিরী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মনোনীত মহাসত্যের মহান দ্বীন মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে ধরার বুকে শুভাগমন করেছেন। তাঁর জন্মক্ষণে স্বীয় স্নেহময়ী মা আমিনার উদর হতে নূরের ঝলক সৃষ্টি হয়েছিল যার আলোতে সারা বিশ্বজগৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য। সীরাত লেখকগণ হযরতের জন্মক্ষণের সময়কার আরোও অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সবই ছিলো আখিরী নবীর শুভাগমনের নিদর্শন।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরতের '**মুহাম্মদ**' নামটি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব রেখেছিলেন। জন্মের পর আরবের রীতি অনুযায়ী শিশু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের '**আক্বীকা**' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আব্দুল মুত্তালিব। সবাই যখন জিজ্ঞেস করলেন, শিশুর নাম কি রেখেছেন? তিনি তখন বলে উঠলেন, "**মুহাম্মদ**"। সকলে অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, মুহাম্মদ! এই নামটি তো আমরা

কেউ কোনদিন শোনি নি! আব্দুল মুত্তালিবের মুখ থেকে এই নতুন নামটি যেনো অদৃশ্যের ইশারায় বেরিয়ে আসে। সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামকরণ হলো '**মুহাম্মদ**'। তবে তাঁর মাতা আমিনাও একটি নাম রাখেন আর তাহলো- '**আহমদ**'। উভয় নামই ঐশি ইশারায় রাখা হয়েছিল। মুহাম্মদ (محمد) শব্দের অর্থ প্রশংসিত আর আহমদ (احمد) অর্থ প্রশংসাকারী। বলাই বাহুল্য আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। এছাড়া মানবজাতির মধ্যে মহান আল্লাহ পাকের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসা যে ব্যক্তি করেছেন তিনিও ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তাঁর উভয় নামই স্বার্থক হয়েছে। এ দু'টো নাম ছাড়াও হযরতের আরো অনেক গুণবাচক নাম ছিলো।

দুগ্ধমাতা হালিমার গৃহে গমন ও শৈশবকাল

আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছিলেন। এরপর আরবের প্রথানুযায়ী তাঁকে দুগ্ধ পানের জন্য ধাত্রী মা হালিমার গৃহে গমন করতে হয়েছিল। সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মা হালিমার গৃহে গমন করার পর থেকেই বরকত নাজিল হতে থাকে। বিবি হালিমার উট, বকরি ইত্যাদি পোষা পশুর মধ্যে এই বরকত আত্মপ্রকাশ করে। এগুলো অতিরিক্ত দুধ যোগান দিতে থাকে। হালিমার সংসারে উত্তরোত্তর উন্নয়ন হওয়া শুরু হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এসেছে। তবে বিবি হালিমার গৃহে থাকাকালে চার বছর বয়সের সময় শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সীনা ছাকের ঘটনাটি ঘটে। তাঁর জীবনে আরোও তিনবার সীনা ছাক হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়বার সীনা ছাক হয়েছিল দশ বছর বয়সের সময়। তৃতীয়বার এই মু'জিযা ঘটে নুবুওয়াত-প্রাপ্তির প্রাক্কালে এবং চতুর্থবার সীনা ছাকের ঘটনা ঘটে মিরাজে গমনের পূর্ব মুহূর্তে।

সীনা ছাক কী?

সীনা ছাকের ঘটনাকে আরবীতে '**শাককে সদর**' (شق صدر) বলে। শাক অর্থ চিরা ও সদর অর্থ সীনা বা বক্ষ। সাধারণ অর্থে সীনা ছাক হলো বক্ষ চিরে কিছু দূষিত বস্তু হৃদযন্ত্র থেকে বের করে ফেলা। কিন্তু আহলে তাসাওউফ মহাত্মনরা বলেছেন, সীনা ছাকের ঘটনা একটি বিরাট শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আমাদের কলব (قلب) এর দু'টি দ্বার আছে। এর একটি নফসের দিকে আর অপরটি রূহের দিকে। প্রথমটি হলো সদর বা বক্ষ। রূহের দ্বারটির তুলনায় বক্ষেরটি সংকীর্ণ। আধ্যাত্মিক দিক থেকে মানুষের কলব বিশাল ও প্রশস্ত একটি উপাদান। এতে গচ্ছিত আছে ভালো ও মন্দের অনেক উপাদান। যেমন বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, দান, অল্পেতুষ্টি, অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা-প্রেম ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী। অপরদিকে এই কলবেই আছে নাফসানী বিভিন্ন উপাদান যা সাধারণত আমরা খারাপ প্রকৃতি বলে জানি। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, ক্রোধ, লালসা, লোভ, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। এখন যে মুহূর্তে সুযোগ মিলে শয়তান নফসের দ্বার দিয়ে কলবে প্রবেশ করে উপরে উল্লেখিত মানবিক কু-স্বভাবগুলোকে উত্তেজিত করে তুলে। এতে এমনিতেই সংকীর্ণ নফসের দিকের দরোজাটি আরো সরু হয়ে পড়ে আর মানুষের মধ্যে কু-স্বভাব স্থায়িত্ব লাভ করে বসে।

সংকোচিত কলবকে প্রশস্ত করার দরকার আছে যাতেকরে এর মধ্যস্থ সু-প্রবৃত্তিগুলো সাবলীল হয়ে ওঠে। কারণ, কু-স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানুষের ভালো অভ্যাস ও ইচ্ছাকে সবল করা। দু'টি উপায়ে কলবের দ্বারকে প্রশস্ত করা সম্ভব। এর প্রথমটি শারীরিক ও দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদেরকেও 'আধ্যাত্মিকভাবে' বক্ষ প্রসারিত করা হয়ে থাকে। আর এভাবে বক্ষ সম্প্রসারণকে বলে '**শরহে সদর**'। আর দৈহিকভাবে বক্ষ সম্প্রসারণের নাম '**শাককে সদর**'। আল্লাহ পাক যে তাঁর প্রিয় বান্দা ও নবী-রাসূলদের বক্ষ সম্প্রসারণ করেন তার সরাসরি উল্লেখ আছে পবিত্র কুরআন শরীফে। ইরশাদ হয়েছে:

يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ, অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন- যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন।" [আন-আম : ১২৫]।

আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে অতীতের যাবতীয় নবী-রাসূল, ওলিআল্লাহ, শহীদ, সিদ্দীক, সালেহ ও ফিরিশতার সম্মিলিত কামালত, বুজুর্গী এবং জ্ঞানের অধিকারী করা ছিলো মহান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। আর এই অভিপ্রায় পূরণের লক্ষ্যেই তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বক্ষ প্রশস্তকরণের জন্য আধ্যাত্মিক ও দৈহিক এই উভয়বিদ উপায় অবলম্বন করেছিলেন। কারণ শুধুমাত্র যে কোনো একটি বক্ষ-সম্প্রসারণ ক্রিয়া যাবতীয় মা'রিফাত, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও কামালত বহনের যোগ্য বিশাল প্রশস্ত কলবে পরিণত করা যথেষ্ট হতে পারতো না। তাই '**বক্ষ সম্প্রসারণ**' (شرح صدر) এবং '**বক্ষ-বিদারণ**' (شق صدر) এই উভয়বিদ প্রশস্তকরণ ক্রিয়া চারবার সম্পন্ন করে মহান আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের পক্ষে গ্রহণ, বহণ ও ধারণযোগ্য সর্বাধিক জাহির ও বাতিন জ্ঞানের অধিকারী করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কালামে পাকে উল্লেখ আছে:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

অর্থাৎ: "আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেই নি?" [ইনশিরাহ : ১]।

অধিকাংশ মুফাস্সিরীনে কিরাম এই আয়াতে 'শরহে সদর' ও 'শাককে সদর' এ উভয়বিদ বক্ষ সম্প্রসারণের ব্যাপারে বলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বক্ষ বিদারণ তথা 'শাককে সদর' এর ঘটনা শুধুমাত্র আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একক একটি বৈশিষ্ট্য। এরূপ মু'জিযা সাধারণ মানুষ তো নয়-ই, অন্য কোনো নবী বা রাসূলের ক্ষেত্রেও প্রকাশ পায় নি। অন্য কথায়, ফিরিশতা কর্তৃক শাককে সদরের ঘটনার কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া

যায় নি। জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

আমরা এখানে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনে সর্বমোট যে চারবার বক্ষ-বিদারণ তথা শাককে সদর এর ঘটনা ঘটেছিল তা সহীহ হাদীস ও কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। দৈহিকভাবে বক্ষ-বিদারণের ঘটনাকে কিছু আধুনিকতাবাদী লেখক-গবেষক মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে থাকেন। কিন্তু বক্ষ-বিদারণের ঘটনা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ যেমন সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (ইবনে কাছীর), তাবাকাত (ইবনে সা'দ), আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা (কাসতাল্লানী), ফাতহুল বারী (ইবনে হাজার আসকালানী), সীরাতে ইবনে হিশাম (ইবনে হিশাম), মুসনাদে আহমদ, খাসাইসুল কুবরা (জালালুদ্দীন সুয়ূতী), বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ইত্যাদি ছাড়াও আরো অসংখ্য সীরাতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে সহীহ-শুদ্ধ প্রমাণসহ।

সুতরাং এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের জমহুর আলীমের ঐকমত্য যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্ষ-বিদারণ তথা দৈহিক শাককে সদরের ঘটনাটি ছিলো বাস্তব। এটাকে যারা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক একটি ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন তারা উপরে উল্লেখিত অসংখ্য সহীহ বর্ণনার বিরোধিতা করছেন মাত্র। আল-মাওয়াহিব গ্রন্থে আল্লামা কাসতাল্লানী এবং যুরকানী কর্তৃক শরহে মাওয়াহিব কিতাবে বলা হয়েছে, নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্ষ-বিদারণ তথা দৈহিক সীনা ছাকের ঘটনাকে বিশ্বাস করা মু'মিনদের জন্য 'ওয়াজিব'।

মাতৃবিয়োগ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট পাঁচ বছর ধাত্রীমাতা বিবি হালিমা সা'দিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তবে আপন মাতা বিবি আমিনার গৃহে প্রত্যাবর্তনের মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই তিনি দুঃখের সাগরে ভেসে গেলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

বিবি আমিনার গৃহে উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নামক একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। পরবর্তীতে এই মহিলা সাহাবিয়্যাহ, মুক্ত হয়ে যান। এই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বিবি আমিনা একদা ছয় বছরের শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ ইয়াসরিব (মদীনা) ভ্রমণে যাত্রা করলেন। ইয়াসরিব ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহের মাতুতালয়। কিছু কিছু সীরাত লেখকের মতে এই সফরের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। বিবি আমিনা তাঁর আদরের দুলালকে স্বীয় স্বামীর কবরটি জিয়ারত করানোরও নিয়ত করেছিলেন। যা হোক, মাতা-পুত্র ও পরিচারিকা উম্মে আইমান উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চললেন। কয়েকদিন পর তারা ইয়াসরিবে এসে উপনীত হন। এখানে হযরতের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাতা সালমা বিনতে আমর বানূ আদিয়্যা ইবনুন নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন, বিধায় তারা এই বংশের ‘দারুন-নাবিগা’য় অবস্থান করেন। উল্লেখ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের জন্ম ও শৈশবকাল এখানেই কেটেছিল।

দারুন-নাবিগায় দীর্ঘ এক মাস অবস্থানের পর বিবি আমিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আবওয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছলে আমিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং একমাত্র প্রাণপ্রিয় আদুরে দুলালের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে এই ধরার কোল থেকে চিরতরেবিদায় গ্রহণ করলেন। উম্মে আইমান শিশু মুহাম্মদ মুস্তফাকে নিয়ে এই বিপদক্ষণে বিরাট ধৈর্য ধারণ করলেন ও আমিনাকে সেখানেই দাফন করে দ্রুত মক্কা শরীফের পথে পাড়ি জমালেন। এই করুণ হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিপটে জাগরুক ছিলো। হিজরতের পর বানূ আদিয়্যা ইবনুন-নাজ্জার এর মনযিল ও আবাসস্থল অতিক্রমকালে তিনি একবার বলেছিলেন: “শৈশবে আমি যখন আমার মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, তখন বানূ আদিয়্যার এই স্থানে আমি আমার মাতুতালয়ের শিশুদের সাথে খেলা করতাম এবং টিলার উপর বসে থাকা পাখীদেরকে আমরা সবাই উড়িয়ে দিতাম।” এরপর তিনি দারুন-নাবিগার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন: “আমার মাতা এবং আমি এখানেই

এসেছিলাম। এই গৃহের মধ্যেই আমার পিতা আব্দুল্লাহর কবর রয়েছে। আর এই ঝিলের জলেই আমি প্রচুর সাঁতার কেটেছি।”

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে মক্কা শরীফ পৌঁছে আমিনার মৃত্যুর দুঃসংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে বর্ণনা করলেন। আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং পিতামাতাহীন অসহায় আদুরে পৌত্রের ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। নিজের পুত্র-পৌত্রদের তুলনায় অধিক বেশী আদর করে তিনি শিশু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন করতে থাকেন। সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, আব্দুল মুত্তালিব তার আদুরে নাতি ছাড়া খাওয়া-পিনা করতেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামও অবাধে স্বীয় দাদার নিকট আসা-যাওয়া করতেন, তার আসনে উঠে বসে যেতেন। কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কাবা শরীফের পাশেই একটি বড় আসন পাতা ছিলো। গোষ্ঠির অন্যান্য সকলেই এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আব্দুল মুত্তালিবের চতুর্পার্শ্বে বসতেন। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে আদর করে নিজের কাছে এনে আসনে বসিয়ে দিতেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে সেখান থেকে নেমে আসতে বলতেন, তখন আব্দুল মুত্তালিব তাদের থামিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে মন্তব্য করতেন, আমার এই সন্তানকে এখানে বসতে দাও। সে ভবিষ্যতে এমন বড় মসনদের অধিকারী হবে যা ইতোমধ্যে কোনো আরব ব্যক্তির ভাগ্যে জুটে নি এবং কোনো কালেও জুটবে না। তিনি হযরতের একান্ত পরিচারিকা উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকেও সতর্ক করে দিতেন যে, তিনি যেনো তাঁকে দেখাশোনার ক্ষেত্রে একটুও অলস কিংবা উদাসীন না হোন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা এই দায়িত্ব অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতি ও দৃঢ়চিত্তে পালন করেছিলেন। এই ভাগ্যবতী মহিলার আসল নাম ছিলো বারাকাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকারসূত্রে আবিসিনীয় হাবসী এই ক্রীতদাসীর মালিক হোন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তিনি উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে চিরতরে মুক্ত করে দেন।

পরবর্তীতে হযরতের পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলেই তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

পিতা-মাতা হারা শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দু'বছর স্বীয় দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অফুরন্ত স্নেহ-মমতায় লালিত পালিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কারণ দুই বছর পরই তিনি পরলোকগমণ করেন। এই মৃত্যুতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকাহত হয়েছিলেন এবং তিনি অনেকের মতো চোখের পানি আটকে রাখতে পারেন নি। বাস্তবে কুরাইশদের প্রসিদ্ধ এই নেতার মৃত্যুতে পুরো মক্কা শহরই শোকাকুল ছিল। আব্দুল মুত্তালিব তার দীর্ঘ জীবনে (কারো মতে তিনি ১৪০ বছর জীবিত ছিলেন) অনেককিছু দেখেছেন। আবরাহা কর্তৃক মক্কা শহর আক্রমণ থেকে যমযম কূপ আবিষ্কার ও হযরতের পিতা আব্দুল্লাহকে 'কুরবানী' করার সংকল্প এবং পরে একশত উট দ্বারা কাফফারা প্রদান ইত্যাদি সবই তার হতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মক্কা শহরের অবিসংবাদিত নেতা। সুতরাং তার মৃত্যুর পর স্বভাবতই মক্কা শহরে কয়েক দিন যাবৎ শোক পালিত হয়। বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিতামহের জানাযায় সকলের সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে শৈশব-কৈশোর- যৌবনকাল

বর্ণিত আছে আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুশয্যায় থেকে আদুরে নাতির ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বীয় পুত্র আবু তালিবের হস্তে সোপর্দ করে যান। আবু তালিব অত্যন্ত হৃদয়বান প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের তত্ত্বাবধান সঠিক ও পূর্ণ দায়িত্বশীলতার মধ্যে পালন করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পরে কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন দক্ষ ব্যবসায়ীও ছিলেন এবং সময় সময় তদানীন্তন পৃথিবীর বিখ্যাত পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের কেন্দ্র সিরিয়ার দামেস্ক শহরে প্রায়ই বাণিজ্য ভ্রমণে যেতেন। সুতরাং হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন মাত্র নয় বছর পূর্ণ হয়েছে, তখনই চাচার সঙ্গে তিনি সিরিয়ায় সর্বপ্রথম বাণিজ্য ভ্রমণে যান। এই ভ্রমণেই 'বাহীরা' নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটি কিছু কিছু সীরাত লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। '**সীরাতুন-নবী**' গ্রন্থের লেখক আল্লামা শিবলী নোমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও '**নবীয়ে রাহমাত**' গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেন নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ যৌবনকালে আরেকবার সিরিয়ায় বাণিজ্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার একজন কর্মকর্তা হিসাবে এই ভ্রমণে যান। তাঁর বয়স তখন ২৫ বছর ছিলো। এই বাণিজ্য সফরে তিনি প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন এবং তার সবই স্বীয় চাচা আবু তালিবের হাতে হস্তান্তর করেন। এই বছরই খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চল্লিশ বছর বয়স্কা (কোন কোন রিওয়ায়েত মতে ৪৫ বছর বয়স্কা) বিধবা সতী-সাধ্বী খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা স্বেচ্ছায় পঁচিশ বছর বয়সের তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে এতোই ভালোবাসতেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকাবস্থায় খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তানের জননী হোন। কন্যা সন্তানদের নাম হলো রুকাইয়া, জায়নব, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না। পুত্র সন্তানদের নাম হলো আব্দুল্লাহ, তায়্যিব, তাহির এবং কাসিম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হযরতের আরেক পুত্র সন্তানের নাম ছিলো ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু। মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহার গর্ভে এই সন্তানের জন্ম হয় মদীনা মুনুওয়ারায়। পুত্রদের সকলেই বাল্য বয়সে পরলোকগমণ করেন। চারজন কন্যা সš‘ানের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন।

কাবাঘরে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ, আল-আমীন খেতাবে ভূষিত হওয়া, খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, সন্তানাদির পিতা হওয়া, হিলফুল ফুযুল সংস্থায় নেতৃত্ব প্রদান এবং ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সবই তাঁর যৌবনকালীন সময়ে সংঘটিত হয়। নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় ঘনিয়ে আসলে পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানসিক অবস্থায় রদবদল শুরু হয়। তিনি দিন দিন ভাবুক হয়ে ওঠেন এবং নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

নুবুওয়াত প্রাপ্তি

মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম থেকে ৩ মাইল দূরে ঐতিহাসিক হেরা পর্বতটি অবস্থিত। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট্ট গুহা আছে যাকে গারে হেরা বলে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান্ত একাকী ও নীরবে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যে এই গুহাটি বেছে নিলেন। তিনি খাবার ও পানীয়সহ একাধারে কয়েকদিন অবস্থান করতেন এই গুহাটিতে। নিশ্চয় আল্লাহর অদৃশ্য ইঙ্গিতে এই বিশেষ পাহাড় ও এর মধ্যস্থিত গুহাটি নুবুওয়াত প্রাপ্তির স্থান হিসাবে তিনি পছন্দ করেছিলেন। যারা পবিত্র মক্কা শহরে গিয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই পড়েছে যে, এই পাহাড়খানা মক্কাস্থ অন্যান্য সকল পাহাড়-পর্বত ও টিলার তুলনায় একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমানে 'জাবালে নূর' নামক এই পাহাড়ের উপরস্থ অংশটি কিবলার দিকে 'সিজদাবনত' আছে বলে প্রতীয়মান হয়। গুহার সন্নিকট থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ আগের যুগে স্পষ্ট দেখা যেতো। এখন অবশ্য অনেক উঁচু ও বিরাট বড় বড় অট্টালিকায় ঘেরা মসজিদুল হারাম এবং বাইতুল্লাহ শরীফ ঐ পাহাড় থেকে আর আগের মতো তেমন পরিষ্কারভাবে দেখায় না।

ঠিক কতদিন তিনি জাবালে হেরায় আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়েছিলেন এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ দীর্ঘ ১১ কিংবা ১২ বছর পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। যা হোক, নবীজীর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখন যে তিনি

ঘন ঘন সেখানে গিয়েছিলেন এবং সময় সময় এক মাস পর্যন্ত একাধারে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাতেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বিশেষ করে পবিত্র রমজান শরীফে তিনি হেরা গুহায় থেকে যেতে বেশী পছন্দ করতেন। এই রমজান শরীফেরই একটি মুবারক রাতে তাঁর প্রতি প্রথম ওহী নাজিল হয়।

নুবুওয়াত-প্রাপ্তির ৬ মাস পূর্ব থেকেই অত্যধিক পরিমাণ সত্যস্বপ্ন দেখতে লাগলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হেরা পর্বতে আসা যাওয়ার সময়ও তিনি শুনতে পেতেন কে যেনো বলছে, "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!"। গুহার মধ্যে থেকে তিনি মুজাহাদা, ত্যাগ স্বীকার ও রিয়াজতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহির ভার বহনের যোগ্যতা অর্জন করেন। এরপর একদা জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম সূরা আলাক্ব এর প্রথম পাঁচটি আয়াত শরীফ নিয়ে হেরা গুহায় আত্মপ্রকাশ করলেন। ঠিক কিভাবে ওহী নাযিলের সূচনা ঘটে তা বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি প্রখ্যাত হাদীস থেকে নিম্নে তুলে ধরছি।

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রথম প্রথম ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী প্রেরণ শুরু হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা ভোরের আলোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। আর তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে লাগলেন। তাই হেরা গুহায় চলে যেতেন আর পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে এক নাগাড়ে কয়েক রাত পর্যন্ত তাহান্নুস করতেন। তাহান্নুস হলো বিশেষ এক নিয়মে ইবাদত বন্দেগী করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার দাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর বিবি খাদীজার কাছে আসলে তিনি আবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে নিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে সত্য এসে পৌঁছল। ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ু-ন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করেন। আমি এতে প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি বললাম,

আমি তো পড়তে জানি না। তিনি আমাকে আবার ধরলেন এবং ছেড়ে বললেন, আপনি পড়-ন! আমি আবার বললাম, আমি পড়তে জানি না। এরপর তিনি আমাকে তৃতীয়বারের মতো খুব জোরে ধরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: ... ... اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ [ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক্ব ... ...]" [বুখারী]

সর্বপ্রথম এই ওহী নাযিলের পরই কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার আকষ্মিকতায় ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে স্বগৃহে ছুটে গিয়ে হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বলতে লাগলেন, "আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও! আমার বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে!"। এতদশ্রবণে বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তাঁকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি সবকিছু খুলে বললেন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ স্ত্রী। তিনি স্বীয় স্বামী সম্পর্কে যা কিছু গত ১৫ বছরের বিবাহিত জীবনে অবগত হয়েছিলেন তা ইতোমধ্যে আর কেউ বুঝতে পারেন নি। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য, তাঁর চলাফেরা ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বাত, তাঁর পবিত্র চেহারায় সদা প্রকাশিত স্বর্গীয় নূর ইত্যাদি সবকিছুই খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নিকট স্বচ্ছ পানির মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি জানতেন, এই মহাপুরুষ নিশ্চয়ই কোনো মহান দায়িত্বপালন হেতু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তি। সুতরাং তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহনপূর্বক তার ভার হালকা করেন, অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির-যত্ন ও মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে চলতে গিয়ে তাকলিফ ও বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করেন।" [বুখারী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ:) প্রণীত 'নবীয়ে রহমত' [বঙ্গানুবাদ] থেকে উদ্ধৃত]

এরূপ সান্ত্বনা প্রদানের পর বিবি খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জার নিকট চলে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী আলিম। অতিরিক্ত বয়স হওয়ার দরুন তিনি তখন অন্ধ। সবকিছু অবগত হয়ে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! ইনিই তো সেই মঙ্গলময় বার্তাবাহক জিব্রাঈল ফিরিশতা! যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নুবুওয়াতের প্রচারকালে যদি আমি শক্তিশালী যুবক থাকতাম! হায়, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শ্রবণ করে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সত্যিই কি আমার লোক আমাকে দেশান্তর করবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ন্যায় যাঁরা আপনার পূর্বে এরূপ সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, জগদ্বাসী তাঁদের সঙ্গেও শত্রুতা না করে ছাড়ে নি।" [বুখারী]

এরপর প্রায় দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ ওহী অবতীর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে হতাশ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত একদা তাঁর প্রতি সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হলো। এ সম্পর্কে যাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন, "একদা আমি পথ চলার সময় আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ শ্রবণ করলাম। উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম হেরা গুহায় যে ফিরিশতা আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি আসমান যমীনের মধ্যখানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। আমি এতে ভীষণ ভয় পেলাম। ভয়ার্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা ঢেকে দাও। কম্বলে ঢাকা অবস্থায় আমার উপর পবিত্র কুরআনের সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হলো:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ*

“হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, আপনি লোকদিগকে সতর্ক করুন। আপনার প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।” [সূরা মুদ্দাস্সির : ১-৫]

এরপর নিয়মিত ওহী নাযিল হতে থাকে। কিন্তু ওহীর ভার বহন করা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিলো। একটি হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, “প্রথম প্রথম যখন ওহী নাযিল হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্মরণ রাখার জন্য অনেক কষ্ট করতেন। জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম ওহী পড়ে শোনাবার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওষ্ঠদ্বয় মুবারক নাড়তে শুরু করতেন।” এরপর পবিত্র কুরআনের এই ক’টি আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ*

“আপনি তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার উদ্দেশে আপনার ওষ্ঠদ্বয় নড়াবেন না; পবিত্র কুরআন আপনার অন্তরে সংরক্ষণ আমারই দায়িত্ব; অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন; এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।” (ক্বিয়ামাহ : ১৬-১৯)

জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম কর্তৃক তিনবার আলিঙ্গনের রহস্য

নুবুওয়াত-প্রাপ্তির প্রাক্কালে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম যখন বলছিলেন, “اِقْرَأْ - আপনি পড়ুন!”, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার পর্যন্ত একই কথার জবাবে বলেছিলেন, “আমি পড়তে জানি না”। তবে এই তিনবারই জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন

করেছিলেন। তৃতীয়বার শেষে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হলো: .... اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ।

আলিঙ্গনের কারণ ও রহস্য বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। চিশতিয়া তরীকার উপর শাইখুল হাদীস হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থ "মাশাইখ-ই-চিশত"-এ যে বর্ণনা এসেছে তা থেকে এখানে কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।

তাফসীরে আযীযিতে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম কর্তৃক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আলিঙ্গনের ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, আলিঙ্গনের মূল কারণ ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে ফিরিশতাসূলভ ক্ষমতা ও দক্ষতা হস্তান্তর করা। এ ধরনের হস্তান্তরকেই বলে 'তাওয়াজ্জুহ'। তাওয়াজ্জুর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও ঐশী শক্তি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। তাওয়াজ্জুহ মোট চার ধরনের:

১. তাওয়াজ্জুহে ইন'ইকাসী (تَوَجُّهِ اِنْعِكَاسِى) বা প্রতিবিম্বমূলক তাওয়াজ্জুহ: এই তাওয়াজ্জুর দৃষ্টান্ত হলো, কোনো এক ব্যক্তি আতর ব্যবহার করলেন। এখন এই ব্যক্তি যেখানে থাকবেন তার চতুর্পাশ্বস্থ সকলেই এই আতরের সুঘ্রাণ পাবেন। কিন্তু এই ঘ্রাণ ততক্ষণ পর্যন্তই পাওয়া যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি উপস্থিত থাকবেন। তার অনুপস্থিতিতে ঘ্রাণ আর অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং এই তাওয়াজ্জুহ হলো সর্বাপেক্ষা দুর্বল তাওয়াজ্জুহ।

২. তাওয়াজ্জুহে ইলক্বায়ী (تَوَجُّهِ اِلْقَائِ) বা প্রেরণামূলক তাওয়াজ্জুহ: এরূপ তাওয়াজ্জুর উপমা হলো, কেউ একটি হারিকেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলো এবং তৈল ভরে এতে আগুন ধরালো। এই ধরনের তাওয়াজ্জুর প্রভাব প্রথমটির তুলনায় অনেক বেশী। তাওয়াজ্জুহ প্রদানকারীর প্রস্থানের পরও এর প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু

সামান্য কারণে এটাও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। যেমন, বাতির সলতা কিংবা তৈল শেষ হয়ে যাওয়া। সুতরাং এরূপ তাওয়াজ্জুহও স্থায়ী নয়।

৩. তাওয়াজ্জুহে ইসলাহী (تَوَجُّهِ اِصْلَاحِی) বা সংশোধনমূলক তাওয়াজ্জুহ: এরূপ তাওয়াজ্জুর উপমা হলো, একটি বিরাট দিঘিতে প্রচুর পানি জমা আছে এবং এর পানি পাওয়ার জন্য একটি খাল কাটা হয়েছে। পানির স্রোতে অনেকগুলো বাঁধা-বিপত্তি নির্মূল হয়ে যাবে এবং নাব্যতা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু কোনো এক সময় বাঁধা-বিপত্তির শক্তি এতো বেশী হয়ে পড়বে যে, শেষ পর্যন্ত খালটি বন্ধ হয়ে যাবে। এ ধরনের তাওয়াজ্জুর প্রভাব অবশ্য প্রথমোক্ত দু'টি থেকে অনেক বেশী হয়ে থাকে কিন্তু এরপরও তা স্থায়ী নয়।

৪. তাওয়াজ্জুহে ইত্তিহাদী (تَوَجُّهِ اِتِّحَادِیْ) বা একীকরণ তাওয়াজ্জুহ: এই তাওয়াজ্জুর মাধ্যমে মুর্শিদ তার নিজের রূহকে মুরীদের রূহের সঙ্গে 'একীকরণ' সাধন করেন। এই তাওয়াজ্জুহ এতোই শক্তিশালী যে, ক্ষণকালের জন্য উভয় রূহ একটিতে পরিণত হয়ে যায়। দু'টি আত্মা একক একটিতে রূপান্তরের ফলে মুরীদের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব পড়ে। তখন তিনি আর বার বার স্বীয় মুর্শিদের নিকট থেকে তাওয়াজ্জুর প্রয়োজন বোধ করেন না। বরং এই তাওয়াজ্জুহ শেষে তিনি নিজেই 'শায়খ' বা মুর্শিদের স্তরে উপনিত হন। অন্যকে তাওয়াজ্জুহ প্রদানের ক্ষমতা তার মধ্যে স্থায়িত্বলাভ করে। এরূপ তাওয়াজ্জুহ অবশ্য অত্যল্প ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মুর্শিদ যাকে খিলাফত প্রদান করেন শুধুমাত্র তাকেই এই তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ভূষিত করে থাকেন।

উপরোক্ত চতুর্থ ধরনের তাওয়াজ্জুর একটি ঘটনা হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন থেকে পাওয়া যায়। হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দীসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। একদা হযরত বাকী বিল্লাহর ঘরে কয়েকজন মেহমান আসলেন। কিন্তু ঘরে খাবার বলতে কিছুই ছিলো না। নিকটস্থ একটি রুটি তৈরীর কারখানার মালিক যখন শোনতে পেলেন যে, বাকী বিল্লাহর বাড়িতে মেহমান এসেছেন তখন তিনি খুব যত্নসহ বেশ

কিছু খাবার পাকিয়ে নিয়ে আসলেন। হযরত বাকী বিল্লাহ এতে এতোই আনন্দিত হলেন যে, নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, "হে বন্ধু! যা ইচ্ছা তুমি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারো!" লোকটি জবাবে বললেন, "আমাকে আপনার মতো বানিয়ে দিন!"। তিনি জবাব দিলেন, "তুমি এটা সহ্য করতে পারবি না।" কিন্তু আবদারকারী ছিলেন নাছোড়বান্দা, বললেন "এছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।" কয়েকবার তাকে সতর্ক করেও বাকী বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থামাতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তাকে ইত্তিহাদী তাওয়াজ্জুহ প্রদান করলেন।

হযরত লোকটিকে নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন। তাওয়াজ্জুহ শেষে যখন উভয়ে বেরিয়ে আসলেন তখন দেখা গেল তাদের চেহারা পর্যন্ত একই ধরনের হয়ে গেছে। তবে শায়খ বাকী বিল্লাহ যদিও সজ্ঞানে ছিলেন কিন্তু বেচারা রুটি নির্মাতা সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। এই অবস্থায় থেকেই তৃতীয় দিবসে তার মৃত্যু হয়ে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউ'ন (انا لله وانا اليه راجعون)।

উক্তরূপ ইত্তিহাদী তাওয়াজ্জুহ হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করেছিলেন। তবে যেহেতু আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবুওয়াত-প্রাপ্তির যোগ্যতা ইতোমধ্যেই আল্লাহর ইচ্ছায় অর্জন করে নিয়েছিলেন, তাই এই তাওয়াজ্জুর প্রভাব তিনি অনায়াসেই সহ্য করতে পেরেছিলেন। এরপরও তাঁর শরীর মুবারকে জ্বর এসে গিয়েছিল। তাই ঘরে পৌঁছে খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে বার বার বলছিলেন, আমাকে জড়িয়ে দাও! আমাকে জড়িয়ে দাও!

দাওয়াত ও তাবলীগ

স্বভাবতই যাদের সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো তাদেরকেই প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে সর্বপ্রথম যিনি এই দাওয়াত অকপটে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন হযরতের একান্ত বন্ধুজন ও প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। এরপর আলী ইবনেআবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যায়িদ বিন হারিসা

রাদ্বিআল্লাহু আনহু, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রায় দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ গোপনে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত ছিলো। শুধু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, তাঁর নবদীক্ষিত সাহাবীরাও দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজে জড়িত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা ও সফলতা লাভ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁরই দাওয়াতের ফলে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, যুবায়ির ইবনে আওয়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ইসলামে দীক্ষিত হন। এই গোপনে দাওয়াতী কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলেন তাঁর হাবীবকে। ইরশাদ হলো:

"وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ"

এবং

"وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"

"তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও।" [২৬ : ২১৪-২১৫]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন। তিনি প্রথমেই আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসলেন। আহার শেষে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন আবু লাহাব অশ্লীল বাক্যবাণে এই প্রচেষ্টার জোর বাধা প্রধান করলো।

এরপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আবার নির্দেশ এলো:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"আপনি যে বিষয় আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।" [১৫ : ৯৪]

এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফ নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে মক্কাবাসীদের আহ্বান করলেন। কোনো বিশেষ ব্যাপার ব্যক্ত করতে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে ডাক দেওয়ার রিওয়াজ ছিলো তখনকার মক্কা শহরে। সুতরাং তাঁর ডাকে সবাই জমায়েত হলো। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি বলি, ঐ পাহাড়ের অপরপ্রান্তে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে। এরা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই সমস্বরে বললো, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কারণ আপনি মিথ্যাবাদী নন। এরপর তিনি মক্কার একেকটি গোত্রের নাম ধরে ধরে বললেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যদি ইহ-পরকালের সাফল্য কামনা করে থাকো তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। এখানেও আবু লাহাব অত্যন্ত মন্দ ভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আচরণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা লাহাব নাযিল হয়। এই সূরায় আবু লাহাবকে লানত করা হয়েছে।

দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করে তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কুরাইশরা বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লো। তারা লক্ষ্য করলো নতুনএই ধর্মমত হেতু তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। সুতরাং তারা যে কোনো উপায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দমিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলো।

প্রথমে তারা জাগতিক বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কাজটি সারার চেষ্টা চালালো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। অবশেষে তারা কঠোরতা অবলম্বন করার হুমকি দিল।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একদা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বললো, “আবু তালিব! আপনি আমাদের মধ্যে একজন প্রবীণ জ্ঞানবান ব্যক্তি। আমরা ইতোমধ্যে আরেকবার আপনার নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে এই নতুন ধর্মমত প্রচার করতে নিষেধ করুন। আপনি তা উপেক্ষা করে গেছেন। আল্লাহর কসম! আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। আমাদের উপাস্য দেবদেবীর উপর দোষারোপ আর কতো সহ্য করবো। হয় আপনি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন না হয় আমরা তাঁর ও আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো যতক্ষণ না আমাদের কোনো এক পক্ষ খতম হয়ে যায়।”

আবু তালিবের বয়স কম ছিলো না। একে তো বয়সের ভার তার উপর নেতা হিসাবে তিনি চাচ্ছিলেন না যে, নিজস্ব জাতিগোষ্ঠির বিচ্ছিন্নতা ঘটুক। অপরদিকে এটাও তার উদ্দেশ্য ছিলো না যে, আপন ভাতিজাকে তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দিতে। তিনি উভয় কুল যাতে রক্ষা পায় সে ভাবনা করছিলেন। তাই তিনি একদিন স্বীয় ভাতিজার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, “প্রিয় ভাতিজা আমার! তোমার গোষ্ঠির লোকেরা আমার কাছে এসেছিল। তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তোমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলেছে। এখন দয়া করে আমার দিকে একটু খেয়াল দাও। নিজের জানেরও মায়া করো। আমার ওপর এত বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই।”

প্রিয় চাচার মনে দুর্বলতা এসেছে লক্ষ্য করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ভাবলেন হয়তো তিনি আর তাঁকে সাহায্য-সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারবেন না। কুরাইশদের একটি প্রস্তাব ছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান তা তারা তাঁকে প্রদান করবে।এমনকি তিনি যদি রাজত্ব চান কিংবা আরবের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী চান তাহলেও তারা দ্বিধা করবে না। কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে শুধুমাত্র এই দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দিতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালিবকে বললেন: “চাচাজান!

আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও তুলে দেয় তথাপি আমার কাজ থেকে বিরত হবো না। হয় আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করবেন না হয় এটা করতে করতে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।” কথা শেষ হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো।

ভাতিজার কণ্ঠে এরূপ দৃঢ় সংকল্পের কথা শ্রবণ করে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, “ভাতিজা! আমার কাছে এসো। যাও! তোমার মনে যা চায় বলো। যেভাবে ইচ্ছে তোমার প্রচার কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।”

কুরাইশ কর্তৃক চরম নির্যাতন

কুরাইশরা দাওয়াত পেয়ে ইসলাম-গ্রহণ থেকে শুধু দূরেই থাকে নি বরং কিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসরণকারীদেরকে স্তব্ধ করবে সে চিন্তায় মগ্ন হলো। তারা অনুরোধ, প্রলোভন, অসৌজন্যমূলক আচরণ, কঠোর কথাবার্তা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত নওমুসলিমদের উপর শারীরিক নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে দিল। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তিবল কম থাকায় তারা নির্বিচারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই সময় হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু, খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু, সুহায়ব ইবনে সিনান আর-রূমী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আবু ফুকায়হা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও তাঁর মাতা সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা, পিতা ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং ভ্রাতা আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, লাবীবা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, যিন্নীরা বা যানবারা রূমিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, উম্মু উবায়স (বা ’উনায়স) রাদ্বিআল্লাহু আনহা, আন-নাহদিয়্যা ও তাঁর কন্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর মাতা হামামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা প্রমুখ সাহাবী/সাহাবিয়া কুরাইশদের এমন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যে তাঁদের উপর দৈহিক অত্যাচারের ঘটনাবলী শ্রবণ করলে গাঁ শিউরে ওঠে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে ঈমানের

নূর প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা কখনো নিভে যায় নি। এদের কেউ কেউ নির্যাতনের ফলে শহীদও হয়েছেন। মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ। নরাধম আবু জাহিল তাঁকে বর্শার আঘাতে হত্যা করে। এছাড়া তাঁর স্বামী ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু নির্যাতনের ফলে শহীদ হোন। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে তিনি হলেন প্রথম শহীদ। শুধু তাই নয়, এই দম্পতি শহীদী দরোজা লাভ করার পর তাঁদের আদুরে সন্তান হযরত খাব্বাব ইবনে ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুরাইশদের চরম দৈহিক নির্যাতনের শিকার হোন। একদা আরেক সাহাবী তাঁকে শুধুমাত্র একটি পাজামা পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। লক্ষ্য করলেন, তাঁর পিঠে প্রচুর দাগ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কিসের দাগ? খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, কুরাইশগণ মক্কার কঙ্করময় মরুভূমিতে আমাকে যে শাস্তি দিত এগুলো তারই চিহ্ন। এই পরিবারের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি একদা এই নৃশংসতা স্বচক্ষে অবলোকন করে পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: "হে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পরিবার! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত" [বাইহাকী]।

হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘটনা সবার জানা। কিন্তু ঈমানের কী বিরাট শক্তি! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখে এসব মহাত্মন সাহাবীরা ঈমানের নূরে নূরান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁদের ঈমান হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত যাবতীয় মুসলমানের ঈমানের তুলনায় বহু বহু গুণ বেশী। তাঁদের তুলনা নেই। এরা ঈমানের জন্য যেরূপ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। এছাড়া দেশত্যাগসহ জান-মাল কুরবানী করেছেন, জিহাদের মাঠে সহাস্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। দ্বীনের জন্য তাঁদের অবদানের তুলনা নেই। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের যুগকে 'সর্বোত্তম যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে ওঠলো। ইতোমধ্যে হযরতের চাচা হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এরপরও কুরাইশরা থামলো না। যে কোন মূল্যে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। সুতরাং এই নির্যাতন থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় তা ভেবে একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে বললেন, সম্ভব হলে তোমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করো। সেখানে একজন হৃদয়বান বাদশাহ আছেন। তিনি হকপন্থী ব্যক্তি। সে দেশে কারোর উপর অন্যায় অত্যাচার হয় না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা না করেন ততদিন তোমরা সেখানে নিরাপদে অবস্থান করতে পারবে। সুতরাং ১২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা (মতান্তরে ১২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা বা ১০ জন পুরুষ ৪ জন মহিলা কিংবা ১২ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলার কথাও বলা হয়েছে) আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত করেন। এই দলে ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

হিজরতকারীদের কথা কুরাইশরা অবগত হয়ে তাঁদের পেছনে ছুটে গেল। উদ্দেশ্য তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা। কিন্তু মুসলমানগণ সতর্কতার সাথে সমুদ্র তীর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছুয়েই দু'টি নৌকা ভাড়া করে নিয়ে উপকূল এলাকা ছেড়ে সমুদ্রপথে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এদিকে কাফিররা সমুদ্র তীরে পৌঁছুয়ে নৌকো চলে গেছে জেনে বিফলমনোরথে ফিরে এলো। হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীর অনুমতিক্রমে পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে দ্বীন পালন করতে থাকেন। তবে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কার সকল মুশরিক মুসলমান হয়ে গেছে। এ সংবাদ যখন হাবশায় পৌঁছুলো তখন সাহাবায়ে কিরাম ভাবলেন, আর এখানে থেকে লাভ নেই। সুতরাং তারা মক্কা শরীফ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কার নিকটবর্তী হয়েই কিন্তু আসল সত্য তাঁদের নিকট ধরা পড়লো। সুতরাং তারা ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত অনেকেই আর ফিরে না যেয়ে গোপনে মক্কা শরীফ প্রবেশ

করলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনামতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হাবশায় ফিরে গিয়েছিলেন।

হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত

মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের মাত্রা কমলো না বরং আরো বেড়ে ওঠলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে মুসলমানদের একটি বড় দল হাবশায় হিজরত করলেন। এই দলে ৯৮ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা ছিলেন বলে বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরতের চাচা জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কুরাইশরা এদেরকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। দু'জন বিজ্ঞ কুরাইশ দূত অনেক উপঢৌকনসহ সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন আমর ইবনুল আস, যিনি পরবর্তীতে মিশর বিজয়ী প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অবশ্য তখনও মুসলমান হন নি। তার সঙ্গী ছিলেন উমারা ইবনুল ওয়ালীদ (কারো কারো মতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ রবীআ)। এরা দরবারে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত কৌশলে উপঢৌকনগুলো নাজ্জাশীকে উপহার করলেন এবং সভাসদবর্গের সাথে আগেই আলোচনা করে তাদেরকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসলেন।

খৃষ্টান সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে কুরাইশ দূতদ্বয় তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন, "হে মহামহিম বাদশাহ! আমাদের কিছু নির্বোধ লোক স্বীয় কওমের দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনাদের দ্বীনকেও মানে না। তারা একটি মনগড়া দ্বীনের অনুসরণ করে। এ নতুন দ্বীন সম্পর্কে আপনিও কিছু জানেন না আমরাও জানি না। আমাদের বংশের সম্ভ্রান্ত কিছু ব্যক্তি আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, আপনাকে অনুরোধ জানানো- এসব ধর্মত্যাগীদের তাদের কওমের নিকট ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।" সভাসদবর্গ আগে থেকেই কুরাইশদের পরামর্শ অনুযায়ী বলে উঠলো, হে মহামতি বাদশাহ! এই লোকগুলো সত্য বলেছেন। আমাদের মনে হয় এসব ভ্রান্ত লোকগুলোকে তাদের কওমের নিকট প্রেরণ করে দেওয়াই হবে উচিত কাজ।

সম্রাট নাজ্জাশী কিন্তু এসব কথায় সহজে মাথা নত করার পাত্র ছিলেন না। রাগান্বিত হয়ে বললেন, এই তথাকথিত ভ্রান্ত লোকগুলো কোথায়? কুরাইশরা বললো, তারা আপনার রাজ্যে বসবাস করছে। বাদশা বললেন, তোমাদের কথায় আমি কখনো তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না। আমাকে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তাদেরকেই আগে জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি অভিযোগ সত্য হয় তখন আমি তাদেরকে এই দূতদ্বয়ের হাতে সোপর্দ করতে পারি। সুতরাং হিজরতকারী সাহাবীদেরকে সম্রাটের দরবারে ডেকে পাঠানো হলো। সাহাবায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সকলের পক্ষে সম্রাটের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু দেবেন।

এরপর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীরা শুধুমাত্র সালাম জানালেন- সিজদা করলেন না। এতে সম্রাটের সভাসদর্গা রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা বাদশাহকে সিজদা করলেন না? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করি, আর কাউকে নয়। নাজ্জাশী জানতে চাইলেন, স্বীয় কওমের ধর্ম ত্যাগ করে তোমরা কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেছো? তোমরা তো খৃস্টধর্ম কিংবা সমসাময়িক অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের অনুসারী নও। জাফর ইবনে আবি তালিব জবাব দিলেন, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, তাঁর সাথে কাউকে শরীকও করি না।

এবার নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, এই দ্বীন কে এনেছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি। হে বাদশাহ! আমরা যাহিলী যুগের এক জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম। মৃত জন্তুর গোশত আহার করতাম, অশ্লীলতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতাম না, প্রতিবেশীর প্রতি খারাপ ব্যবহারে লিপ্ত ছিলাম। সবলরা দুর্বলকে অত্যাচার করতো। এই অবস্থায় আমরা দিনাতিপাত করেছি। এরপর আল্লাহ পাক আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, আমানতদারিতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে জানি। তিনিই আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি

দাওয়াত দিলেন, তাঁরই ইবাদত করা ও তাঁকে শরীক না করতে বললেন। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব মূর্তির ইবাদত করে তা বর্জন করো- এগুলো মিথ্যা। এতে কোনো লাভ নেই বরং বিরাট ক্ষতি। তিনি আমাদেরকে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিলেনআত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আমানতের মালের হিফাজত করা, অশ্লীলতা বর্জন, প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করা ইত্যাদি। আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছি। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাদের কওম এতে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। নির্যাতন নিপীড়নে আমাদের জীবন বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদেরকে আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করিয়ে পূর্বের ন্যায় মূর্তি পূজায় নিয়ে যাওয়া। এই অসহ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে রেহাই ও আমাদের দ্বীন পালনে স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা আপনার দেশে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা আশা করি আপনার মতো স্বনামধন্য ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আমদেরকে অত্যাচারে ঠেলে দেবেন না।

হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক এই বক্তব্য সম্রাট নাজ্জাশীকে অনেকটা প্রভাবিত করলো। তিনি এবার নতুন ধর্মমত সম্পর্কে আরো জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তিনি যা এনেছেন তার কিছুটা কি তোমার নিকট আছে? জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আছে। নাজ্জাশী তা শোনতে ইচ্ছাপোষণ করলেন। জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা মরিয়মের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করতে লাগলেন। সম্রাট নাজ্জাশীর চোখ দু'টো গড়িয়ে অশ্রু পড়তে লাগলো। তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। সভাসদবর্গসহ উপস্থিত সবাই কাঁদতে লাগলেন।

নাজ্জাশী বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এই আয়াতগুলো ও ঈসা আলাইহিস্সালাম যা এনেছিলেন তা একই উৎস থেকে এসেছে। এরপর তিনি আমর ইবনে আসের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোকগুলো কি তোমাদের দাস? ইবনে আস জবাব দিলেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এরা কি তোমাদের নিকট ঋণগ্রস্ত? ইবনে আস আবার জবাব দিলেন, জি না। নাজ্জাশী বললেন, তাহলে তোমরা চলে যাও। আমি কখনো এদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো না।

আমর ইবনে আস খুব কূটকৌশলী ছিলেন। তিনি বের হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আগামীকাল এমন এক বিষয় বাদশাহর দরবারে উত্থাপন করবো যে, এর দ্বারা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করে ছাড়বো। পরদিন দরবারে গিয়ে বললেন, রাজন! এরা ঈসা আলাইহিস্সালাম সম্পর্কে মারাত্মক আপত্তিকর কথা বলে। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তিনি বললেন, তারা ঈসা আলাইহিস্সালাম সম্পর্কে কী এমন মারাত্মক ধারণা রাখে? তাদেরকে দরবারে হাজির করো!

জাফর ইবনে আবি তালিব এবং অন্যান্য সাহাবা জানতেন, ঈসা আলাইহিস্সালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু বলেছেন তা-ই তাঁরা ব্যক্ত করবেন। সবার অনুমতিক্রমে এবারও জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সকলের পক্ষে বাদশাহর দরবারে ভাষ্যকার নির্বাচিত হলেন।

নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তিনি স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। তার ডানে আমর ইবনে আস এবং বায়ে উমারা। উভয় দিকে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক পাদ্রী।

এরপর নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস্সালাম সম্পর্কে কী বলো? জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, “আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন আমরা তা-ই বলি। তিনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি কুমারী মরিয়মের উদরে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর রূপ ফুঁকে দিয়ে তাঁরে অস্তিত্বদান করেন।” এটা শ্রবণ করে নাজ্জাশী হাতদ্বয় মাটিতে মারলেন এবং সেখান থেকে একখণ্ড কাষ্ঠ উঠিয়ে বললেন, “তুমি যা বলেছো ঈসা ইবনে মরিয়ম এই কাষ্ঠখণ্ডের পরিমাণও বেশী কিছু নন।” একথা শোনে সভাসদবর্গের সবাই ফিস ফিস শব্দ করতে লাগলো। তিনি আবার বললেন, ‘তোমরা যাই বলো না কেন, ঈশ্বর সম্পর্কে আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি।’ তিনি এবার মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদ। যে তোমাদের অভিসম্পাত দেবে তাকে জরিমানা করা হবে। এক পাহাড় স্বর্ণ দিলেও আমি কাউকে তোমাদের

উপর আঘাত করতে দেবো না। ওদের (কুরাইশদের) উপঢৌকন তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও; ওসব আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

কুরাইশ দূতদ্বয় বিফল মনোরথে দেশে ফিরে আসলেন। আবিসিনিয়ায় আগত মুসলমান মুহাজিররা নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'আ ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইসলাম-গ্রহণ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম দিকে ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'আয় আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে বিরাট মর্যাদার অধিকারী করে দিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সত্যিই চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর।

হযরত উমর একদা কুরাইশ নেতা আবু জাহিল ও অন্যান্যদের প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য সংকল্প করে বসলেন। তিনি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। উমর কী তখন জানতেন, এই ভ্রমণটি ছিলো তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়? তিনি যে শীঘ্রই সত্যের সন্ধান পেয়ে যাবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কারণ ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু'আ করে নিয়েছিলেন যে, "হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহিল কিংবা উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও!"। লক্ষণীয় যে, তিনি দু'আর সময় উভয়ের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে বলেন নি- যে কোনো একজনের জন্য আল্লাহর দরবারে আবদার করেন। আল্লাহ পাক উমরকেই পছন্দ করলেন।

পথিমধ্যে নু'আম ইবনে আব্দুল্লাহ নামক এক নওমুসলিমের সঙ্গে উমরের সাক্ষাৎ ঘটলো। নু'আম বুঝতে পারলেন, উমর নিশ্চয়ই কোনো কঠিন সংকল্প

করেছেন তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই উমর! এভাবে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

'মুহাম্মদের শিরচ্ছেদ করবো!' কঠিন ভাষায় জবাব দিলেন উমর। নু'আম একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আগে তোমার নিজের ঘর সামলাও- তুমি কি জানো না, তোমার বোন ও তার স্বামী ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছেন?'

উমর গর্জে উঠলেন, 'কী বললে? আমি এক্ষুণি তাদের শায়েস্তা করে নেবো!' এই বলে তিনি ছুটে গেলেন বোনের বাড়িতে। তিনি শুনতে পেলেন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি। বুঝতে পারলেন, সত্যিই এরা মুসলমান হয়ে গেছেন। ঘরের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত উমরের বোন ও তার স্বামীকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ভাইয়ের আগমনে ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা কুরআনের পাতাটি লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আত্মগোপন করলেন। ভগ্নিপতি দরজা খোলার পর উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে দেখাও!'। এই বলে তিনি স্বীয় ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীকে রক্ষার্থে ফাতিমা এগিয়ে আসলে তাকেও তিনি প্রহার করলেন। এতে ফাতিমার শরীর ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসলো। উমর বোনের রক্ত দেখে থেমে গেলেন। তিনি কিছুটা লজ্জাবোধ করে বললেন: 'তোমরা কী পাঠ করছিলে? আমাকে একটু দেখাও। আমার শুধু জানা দরকার তোমাদের এই নতুন দ্বীনটি কি জিনিস।' হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর কণ্ঠে নম্রতার ভাব লক্ষ্য করে বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি উভয়ে আশান্বিত হলেন। তবে যেমন ভাই তেমন বোন- ফাতিমা উত্তেজিত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'আপনি অপবিত্র! যান গোসল করে আসুন।'

সুতরাং উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু গোসল করে আসলেন। ইতোমধ্যে বেশ উত্তেজিত ও আশান্বিত হয়ে আত্মগোপনে থাকা হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিআল্লাহু আনহু বেরিয়ে আসলেন। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঐ কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হা এর প্রথম কটি আয়াত শরীফ পাঠ করলেন:

طٰهٰ * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰى * تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا * الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّه‘ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى * اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى *

“ত্বোয়া-হা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।” (ত্বা-হা: ১-৮)

পাঠ শেষে তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, ‘আহ! কী অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী এই আয়াতমালা!’ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না- ঈমানী নূরের ঝলক তাঁর অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে দেহ-তনু-মনে জেগে তুললো রোমাঞ্চকর শিহরণ। বললেন, “আমাকে এক্ষুণি বলো, কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়?”।

শিক্ষক খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু আনন্দের আতিশয্যে হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে জানালেন, ‘হে উমর! গতকালই আমি শ্রবণ করেছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’আ করেছেন, হে আল্লাহ! আবু জাহিল কিংবা উমরের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দাও। সেই পবিত্র মুখের দু’আর ফলেই আপনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন।’

এরপর তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল আকরামে উপস্থিত হলেন। দরোজায় কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে উমরকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

নিঃসংকোচে উমরকে ভেতরে আসতে দাও। হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত বিপদের আশঙ্কায় উমরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন আসল খবর। তিনি উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাপড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হে উমর! তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছো?" হযরত উমর তৎক্ষণাৎ কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন। আকস্মিক ও অভাবনীয় এই ঘটনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে উঠলেন, "আল্লা-হু আকবার!"। সাহাবায়ে কিরামও এতো সজোরে 'আল্লা-হু আকবার' ধ্বনি তুললেন, এতে আশপাশ এলাকা প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। এরপর উমর তখনই আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুফর নিজেকে সাড়ম্বরে প্রকাশ করছে আর আমরা হক্ব দীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কেনো তা গোপন করবো? উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এই দৃঢ় সাহসী উক্তিতে উপস্থিত ত্রিশ-চল্লিশ জন সাহাবী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলে পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে যেয়ে প্রকাশ্যে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করলেন। সেখানে অনেক কাফির ছিলো, কিন্তু নীরবে এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন ছাড়া তাদের কারোর সাহসে দেয় নি উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে চ্যালেঞ্জ করার।

কুরাইশদের কর্তৃক সামাজিক বয়কট

মহাবীর হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের মতো প্রভাবশীল ব্যক্তিদের ইসলাম-গ্রহণ হেতু মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরাট ফায়দা হলেও কুরাইশদের দুশমনী একটুও কমে নি। বরং তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। সেমতে নুবুওয়াতের ৭ম বছরের ১লা মুহাররম থেকে কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর যাবতীয় পরিবারবর্গকে সামাজিক বয়কটের শিকার করে।

মক্কার অদূরে শা’ব আবি তালিব নামক উপত্যকায় তাদেরকে বন্দী করে রাখলো। উপত্যকা থেকে তাঁদের কাউকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। মক্কার কেউ বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ পেলো না- উপত্যকার বাইরে এসে খাবার দাবারসহ জীবন রক্ষার জন্য জরুরী কোনো বস্তু পর্যন্ত সংগ্রহের অধিকার তাদের ছিলো না।

সামাজিক এই অমানুষিক বয়কটে আক্রান্ত হয়ে সবাই জর্জরিত হয়ে পড়লেন। খাবারের চরম অভাব হেতু শিশু-মহিলা এবং বৃদ্ধরা উপবাসে থেকে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর পরিবারবর্গের উপর এতো বড় বিপদ আপতিত হয় নি। নরাধম কাফিররা সবাই মিলে এমন জঘন্য মহাসঙ্কটে পতিত করে নবী-পরিবারকে। তারা একটি কাগজে বয়কটের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করে কাবা শরীফের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। এই দলীলে মক্কার বড় বড় কাফির নেতাদের সই ছিলো। দলিল লেখক ছিলো নরাধম মানসি ইবনে ইকরিমা আবারদী। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়াতে শস্তি দিয়েছেন। যে হাতদ্বয় দ্বারা সে লিখেছিল তা তিনি চেতনহীন করে দিয়েছিলেন।

সুদীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ এই বয়কট স্থায়ী ছিলো। আহ! এই সময়ে নবী-পরিবারের উপর কী না কষ্ট! কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সবাই তা সহ্য করে গিয়েছেন। এই চরম বিপদের দিনেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ হন নি। অবশেষে এক দু’জন মুশরিকদের মনেও দয়ার উদ্রেক ঘটলো। মুসলমানদের উপর এরূপ চরম নির্যাতন উচিত হয় নি ভেবে তারা ব্যাপারটি নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলো। এদিকে কাবা শরীফের দেওয়ালে লটকানো ঐ কাগজের টুকরো বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে একজাতীয় উই পোকা তা খেয়ে ফেলে। একমাত্র আল্লাহর নামটি অক্ষত ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন।

এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে জানালেন। তিনি মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহের সামনে গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে কথা বললেন। চুক্তিপত্র বা বয়কটের দলীলটি যে উই পোকায়

খেয়ে ফেলেছে তা তাদের জানিয়ে দিয়ে বয়কট অবসানের দাবী জানালেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর চুক্তিপত্র সত্যিই উই পোকা খেয়ে ফেলেছে দেখে কুরাইশরা লজ্জায় মাথা নত করলো। এদিকে আবদে মনাফ ও কুসাই গোত্রের লোকগণ ঘোষণা দিলো, আমরা এই বয়কট মানি না! শীঘ্রই বয়কটের অবসান ঘটলো। যুহায়র ও তার সাথীগণ নাঙ্গা তরবারি হস্তে ছুটে গেলেন শি'ব আবি তালিবের দিকে। অভ্যন্তরীণ সকল মুসলমানদেরকে তারা মুক্ত করে দিলেন। এভাবেই দীর্ঘ ৩ কিংবা মতান্তরে ২ বছর কঠিন বিপদে আপতিত থেকে নুবুওয়াতের দশম সালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপরিবারে মুক্ত হলেন।

গিরিসঙ্কট থেকে বের হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর চাচা আবু তালিবসহ হিশাম ও মুত্তালিব গোত্রের সকল নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা আল্লাহর ঘরের সামনে গিয়ে গিলাফে ধরে এই চরম দুর্ভোগের জন্য দায়ী কুরাইশ মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদদু'আ করলেন:

"হে আল্লাহ! যারা আমাদের উপর এই জঘন্য যুলুম করেছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, আমাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে, আমাদের পক্ষে তুমি এর বদলা নিও"।

দুঃখের বছর (عام الحزن)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনে বিরাট দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ পতিত হয়েছে। কাফিরদের জ্বালা-যন্ত্রণা তো ছিলোই সেসাথে ইয়াতীম অবস্থায় পৃথিবীতে আসা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ছিলো দুঃখ-ভারাক্রান্ত। তবে যে দু'জন মানুষ তাঁকে কঠিন বিপদ-আপদের সময় কাছে থেকে সর্বাধিক বেশী সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন তাঁরা হলেন হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এবং চাচা আবু তালিব। তাঁদের জীবদ্দশায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এই দু'জনকেও তাঁর থেকে চিরতরে দূরে সরিয়ে দিলেন।

তখন নুবুওয়াতের ১০ম বছর। হযরত ও পরিবারবর্গ সবেমাত্র সামাজিক বয়কট থেকে মুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘ দিন শি'ব আবি তালিবে দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটানোর পর ক'টা দিন যেতে না যেতেই সান্ত্বনাদাত্রী প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করলেন। এর অল্পদিনের মাথায় চাচা আবু তালিবও এই ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এই দু'টি মৃত্যুর ফলে হযরতের যেনো ডানা ভেঙ্গে পড়লো। কুরাইশ কাফির-মুশরিকরা সুযোগ বুঝে তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করলো। একান্ত আপনজনদের হারানো এবং সেসাথে কুরাইশদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে তিনি নিরাপত্তাহীন ও অসহায় বোধ করলেন। এ কারণেই এই বছরটিকে ''আমুল হুযন' বা দুঃখের বছর নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা মক্কা শরীফের বিখ্যাত কবরস্থান 'জান্নাতুল মা'ল্লা'তে সমাহিত আছেন।

তায়েফ গমন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্দিক থেকে ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে আপতিত হয়েও তাঁর পবিত্র মিশন চালিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা রেখে তিনি তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। তবে মক্কা শহরে এই কাজের মাধ্যমে তেমন বেশী সফলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। আপাতত তিনি মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দূরবর্তী জনবহুল তায়েফ শহরে যেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সফরসঙ্গী হিসাবে প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নির্বাচিত করে নুবুওয়াতের ১০ম বছর শাওয়াল মাসে তিনি তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছকীফ নামক একটি প্রভাবশালী গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তবে এদের কাছ থেকে কোনো আশানুরূপ জবাব মিললো না- বরং তারা তাঁকে কটাক্ষপূর্ণ কিছু বাক্য শুনিয়ে দিল। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুরোধ করলেন, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করলে না, তবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমার বিষয়টি

গোপন রেখো। কিন্তু এতে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠলো। হৈ-হল্লা ও চিৎকার দিয়ে সেখানে অনেক লোক জড়ো করে দিল। সবাই তাঁকে ঘিরে ফেললো এবং বিভিন্ন ধরনের খারাপ উক্তির মাধ্যমে তাঁকে উত্যক্ত করে তোলার চেষ্টা করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে এক মাস তায়েফে থেকে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। ছকীফ গোত্রের নিকট থেকে ফিরে তিনি তায়েফের বিভিন্ন প্রভাবশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা কেউই দাওয়াত গ্রহণ করলো তো না-ই, উপরন্তু তারা তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলো। তাদের বেওকুফ দাসদাসীদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। এরা অত্যন্ত বে-আদবীপূর্ণ আচরণ করতে লাগলো দু'জাহানের বাদশাহ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে। এমনকি তারা তাঁকে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে পবিত্র দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। প্রচণ্ড আঘাতে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর মুবারক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। প্রিয় পালকপুত্র হযরত যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নবীজীকে রক্ষা করতে। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে অনেক পাথরের আঘাত নিজে সহ্য করে দ্রুত চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র পদদ্বয়ে রক্ত জমা হয়ে পড়লো। এদিকে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে রক্ষা করতে যেয়ে পাথরের আঘাতে তাঁরও মাথা ফেটে গেল। এরপর কোনমতে একটি বাগানের দেওয়ালের পাশে গিয়ে উভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আপাতত নরাধম হামলাকারীদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেলেন।

সেখানে একটি আঙ্গুর গাছ ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির নীচে বসে পড়লেন। অত্যন্ত ক্লান্ত, রক্তে রঞ্জিত, ব্যথিত, ক্ষুধার্ত এবং নিরাশপূর্ণ অবস্থায় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রুভরা চোখে মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে হাত উত্তোলন করে দু'আ করতে লাগলেন।

না জানি কোন্ বদদু’আ করে তায়েফবাসীকে আজ ধ্বংস করে দেওয়া হবে! কিন্তু না, দয়াল নবীজী এক হৃদয় নিংড়ানো দু’আ করলেন নিজেরই অক্ষমতা স্বীকার করে! তিনি আল্লাহর পবিত্র দরবারে আকুতি-মিনতি করে বললেন:

“হে আল্লাহ! আপনার দরবারে আমি আমার দুর্বলতার ফরিয়াদ জানাই, আমার মধ্যে হিকমাতের অভাব আছে। আমি দুর্বল। ওগো সর্বাধিক দয়াময় আল্লাহ তা’আলা! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করেছেন? দূরবর্তী কারো নিকট, যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে অথবা শত্রুর নিকট যাকে আমার মালিক বানিয়ে দেবেন? যদি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ না থাকে তবে আমার আর কোনও পরোয়া নেই। অবশ্যই আপনার ক্ষমা আমার জন্য প্রশস্ত। আমি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকে অথবা আমার প্রতি আপনার কঠোরতা প্রদর্শন করা হতে। আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাচ্ছি যার দ্বারা যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়। আমি আপনারই সন্তুষ্টি চাই। নেক কাজ করার কিংবা অন্যায় ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি একমাত্র আপনার কাছ থেকেই আমি পেয়ে থাকি”।

যাদুল মাআদে বর্ণিত আছে, উক্ত দু’আ শেষে আল্লাহ তা’আলা পাহাড়সমূহের ফিরিশতাদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হাবীবের নিকট। তারা অবতরণ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে দু’টি পাহাড়ের মাঝে তায়েফ নগর অবস্থিত, আপনি দু’আ করুন এ দু'টো একত্রে মিলিয়ে দিয়ে তায়েফবাসী সবাইকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য। আমরা এ কাজের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মায়ার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা এ কী বলছো? আমাকে আল্লাহ পাক মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন- ধ্বংসের জন্য নয়। তারা যা করেছে তা আমার দুর্বলতা হেতু করেছে- আমি তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝাতে পারি নি। আমি তো আশাবাদী তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর হাবীবের কী মুহাব্বাত মানুষের জন্য! এতো জঘন্যভাবে অপমানিত ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন যে সম্প্রদায়ের কাছে তাদের প্রতি এই অকল্পনীয় ব্যবহার! প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপম

চরিত্র মাধুর্যের চিত্র কতো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে তায়েফের এই ঘটনা থেকে। শিক্ষা হিসাবে ইসলামের দায়ীদের জন্য এই ঘটনাটি চিরদিন যাবৎ আদর্শ হয়ে থাকবে।

তায়েফের ঘটনাবলী থেকে আরো একটি চিরন্তন সত্য দিবালোকের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে- আর তাহলো, ধন-সম্পদের মোহে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। সে সত্যকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে বসে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে এই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

“যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, সেখানকার ধনাঢ্য অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা-সহ প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতো, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না” [সূরা সাবা : ৩৪-৩৫]।

আল-মি’রাজ (المعراج)

সকল নবী-রাসূলের জীবনেই আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে কিছু অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এসব ‘মু’জিযাহ’ (مُعْجِزَةٌ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং নবী-রাসূলদের মু’জিযা সত্য এবং তার উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অঙ্গ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবুওয়াতী জিন্দেগীতেও অসংখ্য মু’জিযা প্রকাশ পেয়েছিল। কোনো কোনো সীরাত লেখক ১ হাজারেরও বেশী মু’জিযা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাবতীয় মু’জিযার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো মু’জিযা হলো পবিত্র কুরআন শরীফ। মহান এই ঐশীগ্রন্থ একটি জ্যান্ত মু’জিযা। আর এর পরবর্তী স্থানে আছে হুজুরের নভোভ্রমণ বা মি’রাজ। এমন অত্যাশ্চর্য মু’জিযা অপর কোনো নবীর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় নি। মি’রাজের দু’টি দিক আছে। যেহেতু মি’রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে মি’রাজে গমণ করেন, তাই মু’মিনদের জন্য এ থেকে আখিরাতের জিন্দেগীতে যে আমরা সশরীরে ঊর্ধ্বজগতে যাবো তার নমুনা ভেসে এসেছে। অপরদিকে দুনিয়ার জীবনে ‘আধ্যাত্মিক ভ্রমণের’ সূত্রও এই মি’রাজ। এজন্য বলা হয়েছে ‘আসছোলাতু মি’রাজুল মু’মিনীন’ - নামায মু’মিনের জন্য মি’রাজ।

পবিত্র মি’রাজের ঘটনাকে দু’টি ভাগে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সশরীরে মক্কা শরীফের মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ- যাকে আরবীতে ‘ইসরা’ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ রাতের ভ্রমণ। মাসজিদুল আকসা থেকে সপ্ত আসমান পেরিয়ে বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি ভ্রমণ শেষে আরশে আজীম পর্যন্ত ভ্রমণকে বলে ‘মি’রাজ’ বা ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ। তবে উভয় ভ্রমণকেই পারিভাষিক অর্থে একত্রে মি’রাজ বলে। ঠিক কোন্ সময় মি’রাজ সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশের মতে নুবুওয়াতের দশম বছর রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ইশা থেকে ফযরের মধ্যে তা সংঘটিত হয়।

পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে ঠিক কোথায় ঘুমন্ত ছিলেন সে ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি তাঁর ফুফু হযরত উম্মে হানী রাদ্বিআল্লাহু আনহার ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম এর ডাকে সেখান থেকে উঠে বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন হিজরে ইসমাঈল (বা হাতীমে) চলে যান। সেখানে পৌঁছার পর তিনি পুনরায় নিদ্রামগ্ন হন। তখন তাঁকে ফিরিশতা আবার জাগিয়ে তুলে বুরাকে চড়িয়ে যাত্রা শুরু করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সেখানে সকল আম্বিয়া আলাইহিস্সালাম এর রূহের সাথে নিজে ইমামতি করে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের প্রাক্কালে তাঁর সম্মুখে দুগ্ধ ও শুরার দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলো। তিনি দুগ্ধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম মন্তব্য করলেন, আপনি যদি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেতো। এরপর শুরু হলো মি'রাজের পর্ব।

নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম একে একে প্রথম থেকে সপ্তম আসমানের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে গেলেন। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারেই দ্বাররক্ষী ফিরিশতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ হলো: ফিরিশতারা প্রশ্ন করলেন, 'হে জিব্রাঈল! আপনার সাথী কে? তাঁকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে?' ইত্যাদি। জিব্রাঈল প্রত্যেকবারই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় দিলেন এবং স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপনীত হতে তাঁকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে- তা অবগত করলেন। দ্বাররক্ষীরা তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দিল। তিনি প্রত্যেক আসমানেই একেকজন পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ নবীর সাক্ষাৎ পেলেন।

প্রথম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত আদম আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। আদম আলাইহিস্সালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সুসন্তান', 'সৎকর্মশীল', 'সত্য নবী' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করে অসংখ্য ফিরিশতা ছাড়াও দেখা হলো হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁরা উভয়ে

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সম্ভাষণ জানালেন। তৃতীয় আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। তাঁর সাথে অনেক কথাবার্তার পর চতুর্থ আসমানে আরোহণ করে দেখতে পেলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্সালামকে। এরপর পঞ্চম আসমানে সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত হারুন আলাইহিস্সালাম এর সঙ্গে। ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলিত হলেন যথাক্রমে হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম এর সাথে। তাঁদের সবার সাথেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথোপকথন হয়েছে। সবাই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা ও মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

সিদরাতুল মুনতাহায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম আরো ঊর্ধ্বলোকে গমন করে ‘সিদরাতুল মুনতাহা’ তথা বদরিকা বৃক্ষের নিকটে যেয়ে পৌঁছলেন। এখানে তিনি পবিত্র কাবাঘরের অনুরূপ একটি ইবাদাতগৃহ দেখতে পেলেন। এই গৃহের নাম ‘বাইতুল মা’মুর’। এই পবিত্র ঘরকে সত্তুর হাজার ফিরিশতা দৈনিক তাওয়াফ করেন। একজন ফিরিশতাকে একবার তাওয়াফ শেষে আরেকবার করার জন্য সত্তুর হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ঊর্ধ্বে ‘রফরফের’ মাধ্যমে আরোহণ করলেন। এই শেষ সফরে জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম যেতে অপারগতা জানালেন। কারণ হিসাবে বললেন, আর যদি এক কদম আমি অগ্রসর হই তাহলে আমার সকল পাখা আল্লাহর তাজাল্লিতে জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে!

আল্লাহর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে যেয়ে পৌঁছলেন। আরোহণের সময় মনে পড়লো হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম এর কথা। তুর পাহাড়ে আরোহণ শেষে একটি বৃক্ষের নিকট আল্লাহর তাজাল্লির সম্মুখে পৌঁছার পর আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘হে মূসা! তুমি পবিত্র স্থানে আগমন করেছো, তোমার জুতা খুলে ফেলো!’। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজীমে আরোহণের পূর্বে নিজের পা মুবারকে যে খড়ম ছিলো তা খুলে ফেলার

জন্য উদ্যত হলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী উচ্চারিত হলো, 'হে আমার হাবীব! আপনি জুতা খোলার চেষ্টা করবেন না। আপনার পাদুকার স্পর্শ পেলে আমার আরশ ধন্য হবে!' সুবহানাল্লাহ! আমাদের নবীজীর মর্যাদা স্বয়ং মহাপ্রভুর দরবারে কতো ঊর্ধ্বে!

অতঃপর একান্ত সঙ্গোপনে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা তাঁর হাবীবের সাথে কথোপকথন করলেন যার সঠিক বর্ণনা আমি অধমের কলম থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। তবে মি'রাজ হতে প্রত্যাবর্তনকালে কয়েকটি বিশেষ উপহার আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন। এগুলো হলো: ১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২. শিরকের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারলে অন্যান্য যে কোনো গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা এবং ৩. সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত।

আল-মি'রাজ এমন এক বিস্ময়কর ও বিরাট ঘটনা যে, এর পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ঘটনা সংঘটিত হওয়াকালে পৃথিবীতে 'সময়' অতিবাহিত হয় নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে সময়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। সাত আসমান, আট বেহেশত, সাত দোযখ, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশে আজীম ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভ্রমণ করিয়ে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবকিছু অবলোকন করিয়ে অনেক জ্ঞান দান করেন এই মি'রাজের রাতে। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা তাঁর অন্তরাত্মা ভরপুর করে দেন। এরূপ একটি বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে সময়কে স্তব্ধ রাখা একান্ত জরুরী ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যদি কেউ আলোকের গতিতে চলতে পারে তাহলে তার উপর দিয়ে 'সময়ের' গতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। আর মি'রাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাহন বুরাকের গতি ছিলো আলোকের গতি থেকে দ্রুত- তার একেক পদক্ষেপ ছিলো দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত।

মি'রাজের ঘটনা ছিলো বাস্তব এবং সশরীরে এই ভ্রমণ হয়েছিল। এ ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু সে যুগের কাফির, মুশরিকদের

মতো আজকের যুগের কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা এই মি'রাজের ঘটনাকে মানতে নারাজ। এমনকি কোনো কোনো দুর্বল 'ঈমানদার' ব্যক্তিরাও একে 'আধ্যাত্মিক', 'স্বাপ্নিক' ইত্যাদি উপায়ে হওয়ার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। আমরা জোর গলায় বলবো, যে মহান আল্লাহ তা'আলা 'কুন' শব্দের মাধ্যমে সারা মহাবিশ্বসহ, বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসী ইত্যাদি বিরাট বিরাট জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন সেই অসীম ক্ষমতাধর প্রভুর পক্ষে তাঁর হাবীবকে সময় নামক উপাদানকে সাময়িকভাবে গতিহীন রেখে, পুরো মহাবিশ্ব ঘুরিয়ে দেখানো মোটেই কঠিন কিছু নয়। তাঁর জন্য সবকিছুই অতি সহজ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। মি'রাজের ঘটনা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আমরা শ্রবণ করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

মি'রাজের রাতে অসংখ্য অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে অনেক অপূর্ব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআন শরীফে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল" [বনী ইসরাঈল : ১] এবং

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى * لَقَدْ رَأٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"তাঁর চোখ না অন্যদিকে ঝুঁকেছে আর না সীমা অতিক্রম করেছে। তিনি তাঁর প্রতিপালকের কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শনই না প্রত্যক্ষ করেছেন" [সূরা নাজম : ১৭-১৮]।

মদীনায় হিজরতের পূর্বাভাস

মি'রাজের ঘটনার পরে এবং এর পূর্বে তায়েফের ব্যর্থ ও দুঃখজনক সফর শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিরাশ না হয়ে তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। মক্কা শহর ও আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের নিকট যেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়ের আহ্বান জানালেন। তিনি কালব, ফিজারা, আমির ইবনে সা'সা, হানীফা, শায়বান, হারিস, কা'ব, কিনদা প্রভৃতি গোত্রের নিকট দাওয়াত পৌঁছালেন। মক্কা শরীফের বাৎসরিক প্রসিদ্ধ তিন মেলা তথা 'যুল মাজায', 'মাজান্না' এবং 'উকাজ' মেলায় গিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কুরাইশ নেতাদের কৌশল ও অপপ্রচারের ফলে কেউই ইসলাম গ্রহণ করলো না- বরং অনেকে তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলো। তাদের সবাই এই দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো।

আকাবার প্রথম বাইআত: কিন্তু এই চরম নিরাশার মধ্যেও একদা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে ওঠলো আল্লাহর অপরিসীম কৃপায়। বর্তমান জামারাতের নিকটে আকাবা নামক উপত্যকায় ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র জামাআতের সঙ্গে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ ঘটলো। এরা প্রাচীন প্রথানুযায়ী হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ (তখনকার নাম ইয়াসরিব) থেকে এসেছিলেন। মদীনার প্রখ্যাত 'খাজরাজ' গোত্রের এসব হজ্জযাত্রীদের নাম ছিলো: ১. আসআদ ইবনে যিয়ারা, ২. 'আওফ ইবনে হারিস, ৩ রাফি' ইবনে মালিক, ৪. কুতবা ইবনে 'আমীর, ৫. 'উকবা ইবনে 'আমির এবং ৬. জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন)। নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাঁরা সবাই সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে নিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তারা সহজেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়।

এরপর সবাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অঙ্গীকার করেন যে, দেশে প্রত্যাবর্তন শেষে তাঁরা সকলে ইসলামের দায়ী হিসাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এই ঘটনাই হলো 'আকাবার প্রথম বাইআত'।

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত: অনেক সীরাত লেখক উপরোক্ত আকাবার বাইআতকে ঠিক 'বাইআত' বলেন নি। সুতরাং কারো কারো মতে আকাবার বাইআত মোট দু'টি। তবে আসলে এতে কোন মতানৈক্য নেই বরং বর্ণনার মধ্যে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন মাত্র। যা হোক আমরা মোট তিনটি বাইআত হয়েছিল বলে এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রথম বাইআতের ছ'জন পুরুষ তাঁদের অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে তাঁরা দীর্ঘ এক বছর যাবৎ দ্বীনের সফল দায়ী হিসাবে কাজ করেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে মদীনা শরীফের প্রখ্যাত গোত্রদ্বয় 'আওস ও খাজরাজ বংশের সবার ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের আলোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। নুবুওয়াতের একাদশ বছরে অর্থাৎ আকাবার প্রথম বাইআতের পরবর্তী বছরেই হজ্জের মাওসুমে উপস্থিত হলেন পূর্বোক্ত ছয় ব্যক্তি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো সাতজন। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ এসে আকাবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষক হিসাবে মদীনা মুনুওয়ারায় প্রেরণ করা হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজে নির্বাচিত করলেন হযরত মুসআব ইবনে উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।

হযরত উমায়ার রাদ্বিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেযায়। আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেন। সুতরাং মদীনা মুনুওয়ারায় ইসলামের দীপ্তিময় আলো দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো।

আকাবার তৃতীয় বাইআত: এই বাইআতকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বাইআত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যা হোক এটাই মদীনা শরীফে হিজরতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ এই বাইআতের সময় মদীনা শরীফ থেকে আগত ৭৩ জন মুসলমান হজ্জযাত্রী আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর হাতে বাইআত গ্রহণের পরই তাঁকে হিজরত করার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। তাঁরা বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিসহ সকল মুসলমান মক্কা শরীফ থেকে হিজরত-পূর্বক আমাদের ইয়াসরিবে গমন করলে আমরা আপন পরিবার-পরিজনসহ আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধান করতাম।" সবাই অঙ্গীকারও করলেন যে, "এজন্য যদি আমাদেরকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়, তবুও আমরা পিছপা হবো না- আমরা প্রস্তুত আছি এবং সকল ব্যাপারে আমরা আপনাকেই অনুসরণ করবো।"

বলা বাহুল্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোমধ্যেই হিজরতের আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন তাই তিনি বিনাবাক্যে তাঁদের দাওয়াত কবুল করে নিয়ে বললেন, "আজ হতে তোমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আমারও প্রতিশোধ স্পৃহা বলে গণ্য হবে এবং তোমাদের ক্ষমা প্রদর্শন আমারও ক্ষমা প্রদর্শন বলে বিবেচিত হবে। আমি তোমাদেরই একজন আর তোমরাও আমারই।"

মদীনায় হিজরত

মক্কা শরীফের তখনকার কুখ্যাত কাফির-মুশরিকরা শেষ পর্যন্ত পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়ার এক ঘৃণিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। মক্কাস্থ তখনকার চারটি প্রধান গোত্রের সবাই এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় জড়িত হলো। তারা জানতো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পর বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে- এমনকি হাসিম গোত্রের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাঁধতে পারে। তাই তারা সকল গোত্রের পক্ষ থেকে চারজন নওজোয়ানকে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য নির্বাচিত করলো। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আর যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়ে দিলেন এবং মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করলেন।

কুরাইশরা নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘর ঘেরাও করে নিল। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম কুদরতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের সামন দিয়ে চলে গেলেন অথচ কেউ তাঁকে দেখলোই না! একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে

ছিটাতে ছিটাতে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা ইয়া-সীনের “ফা-আগশাইনাহুম ফাহুম লা-ইয়াবসিরূন” পর্যন্ত পাঠরত অবস্থায় তিনি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসলেন- কেউ টেরও পেলো না। নিজের বিছানায় রেখে আসলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে এভাবে রেখে আসার মূল কারণ ছিলো, নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমাকৃত মানুষের মালামাল সমজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য। জানা থাকা দরকার, শুধু মুসলমানদের মালামাল তাঁর নিকট জমা ছিলো না- কট্টর বিরোধীরাও তাঁকে এতোই বিশ্বাস করতো যে, তাঁর চরম বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের মালামাল নির্বিঘেœ নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমানত হিসাবে রেখে দিত। যা হোক, অল্প বয়স্ক আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য বিছানায় এভাবে শুয়ে থাকা সত্যিই বিরাট সাহসের পরিচায়ক ছিলো। কারণ, ঘরের ভেতর ঢুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেয়ে কাফিররা হযরত আলীকে রাগের আতিশয্যে সহজেই হত্যা করতে পারতো। তবে শেষ পর্যন্ত তা করা থেকে বিরত থাকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ায় কিন্তু পুরো মক্কা শহরব্যাপী এক হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেলে। যে কোনো মূল্যে তারা তাঁকে হত্যা করতে যারপরনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বাড়িতে যেয়ে পৌঁছলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে তিনি ঐ রাতেই মক্কা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে সুর পর্বতের উপর আরোহণ করলেন। পর্বতশৃঙ্গের একটি গুহায় উভয়ে প্রবেশ করে আত্মগোপন করলেন। দীর্ঘ তিনদিন এখানে অবস্থান করতে হয়েছিল। অপরদিকে শত্রুপক্ষ তাঁকে খুঁজে না পেয়ে খুব পেরেশান হয়ে উঠলো।আবু জাহিল ঘোষণা দিল, “যে কেউ মুহাম্মদের মস্তক আমার নিকট এনে দেবে আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দেবো”। এ ঘোষণার ফলে চতুর্দিকে লোকজন দলে দলে বেরিয়ে আসলো। সবারই ইচ্ছা একশত উঠ পুরস্কার হিসাবে লুফে নেওয়া।

পুরো মক্কা শহরে খোঁজাখুঁজির পরও কাফিররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধান পেলো না। শেষ পর্যন্ত একদল লোক সুর পাহাড়ে আরোহণ করে ঐ গুহার একেবারে নিকটে এসে হাজির হলো। একসময় গুহার ভেতর থেকে তাদের পা দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠলো। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন কী হবে? দুশমনদের সংখ্যা অনেক আর আমরা মাত্র দু'জন!" তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন: "তুমি ভুল বলছো আবু বকর! আমরা দু'জন নই- তিনজন। মনে রেখো, আমাদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ পাক আছেন! ভয়ের কোনো কারণ নেই। তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন।" পবিত্র কুরআন শরীফে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা তাওবাহ : ৪০]

আল্লাহর কী অপূর্ব কুদরত! কুরাইশরা দেখতে পেলো গুহার মুখে প্রকাণ্ড এক মাকড়সার জাল। এছাড়া একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটানোর জন্য তা দিচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে তারা ভাবতেই পারলো না যে, এই গুহার ভেতর কেউ থাকতে পারে! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে দুর্বলতম মাকড়সার একটি জাল ও একজোড়া কবুতর দ্বারা দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করে দিলেন। একমাত্র তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু করার ক্ষমতা নাই।

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ফাতাহ]

রাতের অন্ধকারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর গোলাম আমির ইবনে ফাহিরা যাত্রা করলেন মদীনা মুনুওয়ারার পথে। পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেগভরা কণ্ঠে বললেন: "হে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! কতো সুন্দর শহর তুমি, আর আমার কতো প্রিয় ভালোবাসার তুমি! যদি আমার জাতি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতাম না।"

সচরাচর রাস্তা পরিত্যাগ করে অন্য এক রাস্তায় তাঁরা পাড়ি জমালেন। কুরাইশরা তাঁদের কোনো সন্ধানই পেলো না। তবে মুদলিজ গোত্রের সর্দার সুরাকা ইবনে মালিক একশত উটের লোভ সামলাতে না পেরে হিজরতকারীদের পশ্চাদ্বাবন করলো। অশ্বারোহী সুরাকা যখন মুবারক সেই কাফিলার নিকটবর্তী হলো তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুটা বিচলিত হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীকে সান্ত্বনাদান করলেন এবং সাথে সাথে এই দু'আও করলেন: "আয় আল্লাহ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা তাকে (সুরাকাকে) দমন করুন"। সুবহানাল্লাহ! দু'আর সাথে সাথেই সুরাকার ঘোড়ার পাগুলো বালুকার মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেলো। সে আর আগে পা বাড়াতে পারলো না। সুরাকা এই অবস্থা দেখে বুঝতে সক্ষম হলেন, যা তিনি ইচ্ছা করেছেন তা তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হবে এবং হিজরতকারী এই কাফিলা সাধারণ নয়। তাই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে সাথে সাথে ক্ষমা করে দিলেন। এছাড়া তার ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন: "হে সুরাকা! সে সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন পারস্য সম্রাটের কঙ্কন তুমি তোমার হাতে পরবে?" পরবর্তীতে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সামনে যখন পারস্য সম্রাট কিসরার কঙ্কন, কোমরবন্দ, মেখলা ও শাহী মুকুট এনে হাজির করা হলো তখন তিনি এই সুরাকাকে ওগুলো পরার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কুবা পল্লীতে অবস্থান

যে ভ্রমণ পুরো মানবজাতির ইতিহাসকে সর্বকালের জন্য পরিবর্তন করে দিয়েছিল সেই হিজরতের ভ্রমণ শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। অবশ্য পাঁচ শতাধিক আনসারসহ মদীনার আবালবৃদ্ধবনিতা এই মুবারক কাফিলাকে এমন এক অপূর্ব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিল যে, ইতিহাসে তার তুলনা খুবই বিরল। বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে এই অভ্যর্থনার বর্ণনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মদীনার কিশোর-কিশোরীরা ধপ বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলো:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَتِ الْبِوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَادَعىٰ لِلّٰهِ دَاعٍ

اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا * جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

ছানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদের উদয় ঘটেছে।
যতোদিন আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একজনও থাকবে, ততোদিন আমাদের উপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে।
আমাদের মধ্যে প্রেরিত ওহে সজ্জন! আপনি বাধ্যতামূলক আনুগত্যের নির্দেশ নিয়ে এসেছেন।

এই ঐতিহাসিক দিনটি ছিলো ১২ রবিউল আউয়াল হিজরি ১ম সন, ৩১শে মে ৬২২ ঈসায়ী। কুবা পল্লীতে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদই ছিলো ইসলামের প্রথম মসজিদ। এছাড়া এখানেই সর্বপ্রথম জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঐতিহাসিক এই উভয় স্থানে দর্শনার্থীদের জন্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতান্তরে ১৪ দিন পর্যন্ত কুবায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনার মূল শহরের দিকে অগ্রসর হোন।

অসংখ্য আনসার পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বীয় উট আল-কাসওয়ায় আরোহণ করে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। আনসার গোত্রপতিরা বার বার তাঁকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাতে

থাকেন। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনীর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। বললেন, এটা আদিষ্ট হয়েছে। যেখানে গিয়ে এটা বসে পড়বে সেখানেই হবে তাঁর আবাসস্থল। আনসারদের কারো মনে দুঃখ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত বর্তমান মসজিদে নববী যেখানে অবস্থিত সেখানে এসে উটনী বসে পড়লো। সে যুগে এই জায়গাটি ছিলো একটি উন্মুক্ত ময়দান। তবে নিকটস্থ বাড়িটি ছিলো প্রখ্যাত আনসার সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর। তিনি তো খুশীতে পঞ্চমুখ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই বাড়িতে মেহমান হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন।

মদীনা শরীফ পৌঁছেই তিনি উটনী যেস্থানে বসেছিল সেই ময়দান দু'জন ইয়াতীম ছেলের নিকট থেকে ক্রয় করে নিলেন। এরপর সেখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিলেন। এরপর তিনি স্ব-পরিবারে নিজের বাড়িতে যেয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে মাত্র ১০ বছর বয়স্ক হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হযরতের নিকট হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্রটিকে আপনার খাদিম হিসাবে আমি দান করতে চাই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাসের মাতার এই আবদার গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজীর গৃহে খাদিম হিসাবে ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়েরউপর বেশ কিছু হাদীস শরীফ আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে পেয়েছি।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনা শরীফ পৌঁছার স্বল্পকাল পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এই ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণের কাজে স্বয়ং আল্লাহর হাবীবও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইট বহনকালে তিনি আবৃত্তি করতেন:

اللّٰهُمَّ لا عيش الا عيش الاخرة

فاغفر الانصار والمهاجرة

হে আল্লাহ! আখিরাতের পুরস্কারই তো প্রকৃত পুরস্কার;
অতএব, আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি দয়া করুন।

আনসার ও মুহাজিররা উক্ত কবিতা পুনরাবৃত্তি করতে করতে তাঁকে অনুসরণ করতেন। সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব সুন্দর ও আনন্দময় ছিলো সে দৃশ্য!

প্রথম হিজরি

হুজুরে পাক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের উপর অত্যল্প কিছু বর্ণনা তুলে ধরা ছাড়া আর বেশী গভীর গবেষণা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। চিশতি শায়খদের জীবনালোচনার পূর্বে সব তরীকার মূল সূত্র তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যময় জীবনের উপর আলোকপাত একান্ত জরুরী মনে করেই এই লেখার অবতারণা। যা হোক, এখন আমরা হযরতের মাদানী জিন্দেগীর দশটি বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী একে একে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

এই হিজরিতেই সর্বপ্রথম আযানের প্রথা শুরু হয়। নামাযে আসার জন্য ‘ডাক’ দেওয়ার ব্যাপারে সাহাবারা বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। কেউ বললেন একটি পতাকা উত্তোলন করা যাবে; কেউ বললেন, শিঙ্গা বাজানো যায়; অন্যরা বললেন, ঘণ্টা বাজিয়ে নামাযে আসার ইঙ্গিত দেওয়া যাবে। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসব মনঃপুত হলো না- এসব উপায় অন্যান্য ধর্মেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামের জন্য একক একটি ব্যবস্থা থাকা জরুরী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের

যে কোনো ঐতিহ্য অনুসরণ মুসলমানদের জন্য আদৌ ঠিক নয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত এসে গেলো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখলেন, একজন ফিরিশতা এসে তাঁকে আযানের বাক্যগুলো শিক্ষা দিচ্ছেন। পরে জানা গেলো হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও অনুরূপ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এভাবে ডেকে মানুষকে নামাযের জন্য মসজিদে জড়ো করার প্রস্তাবটি ভালো লাগলো- তাই তিনি হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সর্বপ্রথম আযান দিতে নির্দেশ দিলেন।

এ বছরই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাথমিক দিনগুলোতেই আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরের শা'বান মাসে হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্ত্রী হিসাবে বসবাস শুরু করেন- যদিও তাঁর বিবাহ বেশ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরি

এ বছর রমজান মাসের রোজা, যাকাত, ঈদের নামায এবং সাদক্বায়ে ফিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তখনও মুসলমানদের কিবলা ছিলো বাইতুল মাক্বদিস। এ বছর মসজিদে ক্বিবলাতাইনে নামাযরত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরীফের দিকে ঘুরিয়ে কিবলা পরিবর্তন করা হয়। সুতরাং মক্কা শরীফের বাইতুল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব-মুসলিমের কিবলা হিসাবে নির্দিষ্ট হলো। প্রথম ঈদুল আযহার নামাযও এ বছর সংঘটিত হয়।

এ বছরের রমজান মাসের ১৭ তারিখ বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রখ্যাত যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন। অপরদিকে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো ৯৫০ জন। কিন্তু স্বয়ং রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং এক মহান বিজয় প্রদান করেন। এই যুদ্ধে মক্কাস্থ বড়

বড় কাফির মুশরিক নেতারা নিহত হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ১৪ জন। এদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন আনসার এবং বাকী ৬ জন মুহাজির। কাফিরদের নিহতের সংখ্যা ছিলো মোট ৭০ জন। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বেশে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন।এই যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদেরকে সামরিক শক্তি হিসাবে দৃঢ়পদ করে তুলে। পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে 'বদরী' খেতাব প্রদান করা হয়।

যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে সাহায্যের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। এই দু'আটুকু মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দু'আ করেন: "হে আল্লাহ! যদি তুমি এই ক্ষুদ্র জামাআতটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত করবার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ করো। ও আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য চাই; তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।"

বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় তোমরা ছিলে অসহায়। অতএব আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো" [সূরা আলে-ইমরান : ১২৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا *

"আর স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দান করেন যে, আমি সাথে আছি তোমাদের।" [সূরা আনফাল : ১২]।

তৃতীয় হিজরি

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে প্রথম মৃত্যুবরণকারী সাহাবীর নাম ছিলো উসমান বিন মা'জুন রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ বছর তাঁর মৃত্যু হয়। মদীনা মুনুওয়ারার প্রখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। এ বছরের রমজান মাসে হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় হিজরির সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো জঙ্গে উহুদ। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে মদীনার উপকণ্ঠে ৭০০ মুসলিম বাহিনী ৩০০০ কাফির সৈন্যদের সঙ্গে চরম মরণপণ সমর-পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে ছোট্ট এক টিলায় থাকার নির্দেশ প্রদান করলেন। বললেন যুদ্ধের সময় তোমরা আমার নির্দেশ ছাড়া এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। এদিক থেকে কাফিরদের অশ্বারোহী বাহিনী হামলা করতে পারে। তাদেরকে যে কোনো মূল্য তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই নির্দেশের উপর অটল থাকতে ব্যর্থ হওয়ায়, যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফির অশ্বারোহী বাহিনী পেছন দিক থেকে হামলা করে মুসলমানদের অবস্থা নাজুক করে ফেললো। নিশ্চিত বিজয় মুহূর্তে পলায়নরত কাফিরদেরকে দেখে ঐ ৫০ তীরন্দাজদের অধিকাংশ গনিমতের মাল তুলে নিতে স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন। তাদের আমীর আবদুল্লাহ বিন যুবাইরসহ **১১** জন স্বস্থান পরিত্যাগ করলেন না। তারা সেখানেই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এদিকে স্থানত্যাগকারীরা ভেবেছিলেন যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাফিররা পলায়ন করছে, তাহলে এখানে অবস্থানের আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের এই মারাত্মক ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত অনেক সাহাবীকে শাহাদতবরণ করতে হয়েছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবননাশের আশঙ্কা দাঁড়ায়। কাফিররা তাঁকে ঘিরে ফেলে। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, শহীদ হয়ে তাঁকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে যান। এরপরও উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস নামক এক নরাধম কাফিরের প্রচণ্ড প্রস্তরাঘাতে

পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দন্ত মুবারক শহীদ হয়ে যায়। ইবনে কুমাইয়্যাহ নামক আরেক কাফির তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত হানে। এই আঘাতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল, তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর এক কাফির গুজব তুললো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ পুরো যুদ্ধের ময়দানব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো। এতে কাফিররা যুদ্ধের উৎসাহ হারিয়ে ফেললো। এদিকে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিল চরম দুঃখ-বেদনা। এভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো।

উহুদ যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আসাদুল্লাহ হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ ৭০ জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল কারো পক্ষেই ছিলো না। কাফিররা এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এমনটি ভাবা ঠিক নয়। যুদ্ধের ময়দান থেকেই তারা ফিরে যায়। বিজয়ী হলে তারা অবশ্যই মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে মদীনা শরীফ দখল করার উদ্দেশ্যে হামলা করতো। যুদ্ধ শেষে (তখনও) কাফির নেতা আবু সুফিয়ান মুহাজির প্রখ্যাত সাহাবীদের নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী গারে উহুদ নামে একটি স্থানে অবস্থান করলেন। আবু সুফিয়ানের ডাকাডাকি তাঁদের কর্ণগোচর হচ্ছিল। কিন্তু নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কথা বলতে নিষেধ করলেন। শেষ পর্যন্ত যখন আবু সুফিয়ান বললেন, "যুদ্ধ পাশা খেলার মতো অনিয়মে ভরা। আজ কারো জয় হচ্ছে তো কাল জয় হচ্ছে অন্যের। দেবতা হোবলের জয় হোক!" এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, উমর! ওকে বলো, "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। তিনি ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই। আমাদের নিহতরা যাবে জান্নাতে আর তাদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে!" উমর ইবনে খাত্তাবের কণ্ঠে আবু সুফিয়ান এসব কথা শোনে জবাব দিলেন, "আমাদের রয়েছে উয্যা দেবতা-তোমাদের উয্যা নাই!"

সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা এর জবাব কি দেবো?"। তিনি বললেন, "তোমরা বলো, الله مولنا ولامولى لكم-"আল্লাহ আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নাই!" এরপর যখন

উভয় পক্ষ যার তার গন্তব্যপথে রওয়ানা হয়ে গেলেন তখন, কাফিরদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জের সুরে একজন বললো, "হে মুসলমানগণ! আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় আমরা তোমাদের মুকাবিলা করবো"। এতদশ্রবণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে জবাব দিতে বললেন, "বলো! হ্যাঁ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এই তারিখই বহাল রইলো।"

এদিকে মদীনা মুনুওয়ারায় যুদ্ধের খবর দ্রুত পৌঁছে গেল। মহিলা, কিশোর-কিশোরী ও বৃদ্ধরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কাফিররা বিজয়ী হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অসংখ্য মুসলিম সৈন্য নিহত হয়েছেন। এরূপ খবর শ্রবণে তারা ভীষণ মনঃক্ষুন্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুরুষ-মহিলাদের অনেকেই ছুটে চললেন উহুদের দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানা গেলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন তখন তারা সুস্থির বোধ করলেন। যদিও অনেকেই তাদের নিকটাত্মীয়- পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র ইত্যাদি হারিয়েছিলেন, তথাপি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন দেখে সকলে সেসব হারানোজনদের দুঃখ ভুলে গেলেন। নবীজীর প্রতি ভালোবাসার কী অপূর্ব নিদর্শন!

চতুর্থ হিজরি

এ বছর হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরের সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিলো বীর মাউনায় ৬৯ জন সাহাবীর করুণ শাহাদাতবরণ। এদের সকলেই হাফিজ ও অনেকে আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলেন। একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু জীবন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে করুণ এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনার উপর সঠিক বর্ণনা আমরা বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থ থেকে এখানে তুলে ধরছি।

নজদ অঞ্চলের আমির বিন মালিক নামক এক ব্যক্তি একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে। তবে সে তার গোত্রকে ভয়

করে সুতরাং একদল বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানবান সাহাবী যদি সেখানে ইসলামের দাওয়াতের জন্য পাঠানো হয়, তাহলে বেশ উপকার হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। সত্তুর জন সাহাবীর এক কাফিলা যখন বীর মাউনা নামক স্থানে পৌঁছুলো তখন বনী সুলায়ম এর উসাইয়্যা, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্র সম্মিলিতভাবে একরূপ নিরস্ত্র এই কাফিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাহাবারা যেটুকু সম্ভব প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন কিন্তু একমাত্র কা'ব ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পান। তিনি পরবর্তীকালে খন্দক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ লাভ করেন।

বীর মাউনায় হযরত ইবনে মিলহান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জাব্বার ইবনে সুলমা নামক একব্যক্তি হত্যা করেছিল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সাহাবী যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা শ্রবণ করে এই ঘাতক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন: আমাকে ইসলামের দিকে যে জিনিস ধাবিত করেছিল তা ছিলো এই যে, আমি বীর মাউনায় ইবনে মিলহানের দিকে বল্লম নিক্ষেপ করি। এটা তাঁর বক্ষদেশ ভেদ করে গেল। তিনি এ সময় যে বাক্য তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিলো: "কাবার প্রতিপালকের কসম! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি, হয়েছি সফলকাম"। তিনি আরো বলেন, এই বাক্যটি শ্রবণ করে আমি অবাক হলাম। আমি তাঁকে হত্যা করলাম, আর তিনি মৃত্যুর সময় বললেন, সফলকাম হয়েছি! পরবর্তীতে বুঝতে সক্ষম হলাম, শাহাদাতবরণের অমিয় সুধাপানে আত্মহারা হয়ে তিনি এরূপ বলেছিলেন। আমি তাই এই মহান ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করলাম ও ইসলামে দীক্ষিত হলাম।

বীর মাউনার এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবতই খুব বেশী মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে সেখানে প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল।

এ বছরের রবিউল আওয়াল মাসে ইয়াহুদী গোত্র বনী নাদিরের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অভিযান সংঘটিত হয়। এই গোত্রটি ছিলো ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ও হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। উদ্দেশ্য ছিলো বনী আমিরের দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনা করা। বনী আমিরের সঙ্গে এদের মৈত্রী চুক্তি ছিলো। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে প্রকাশ্যে খুব ভালো মিষ্ট ব্যবহারের ভান করে এবং গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

সাহাবায়ে কিরামসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘরের দেওয়াল সংলগ্ন স্থানে বসা ছিলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলো যে, এরূপ সুযোগ আর কোনদিন মিলবে না। উপর থেকে তাঁর মস্তকে বড় একটি পাথর ছুড়ে মারতে পারলেই হয়! তাঁর থেকে আমরা চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে যাবো। তাঁদের এই গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে সাথে সাথে সেখান থেকে উঠে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং এদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের আয়োজন শুরু হলো।

একদল মুজাহিদসহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাদিরে পৌঁছে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলেন। দীর্ঘ ৬ দিন অবরোধ রাখার পর বনী নাদিরের নেতারা প্রস্তাব দিলো যে, তারা উট যা বহন করতে পারে সে পরিমাণ মালামাল নিয়ে এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত- অবশ্য কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। সুতরাং বিনা রক্তপাতেই বনু নাদিরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করা হলো। এই অভিযানের সময়ই সুরা পান নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাজিল হয়।

এ হিজরির শাওয়াল মাসে উম্মে সালামাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। অপরদিকে তাঁর স্ত্রী হযরত জায়নাব বিনতে খুজাইমাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা মাত্র ৮ মসের বৈবাহিক জীবন অতিক্রান্ত করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পঞ্চম হিজরি

এ হিজরির মুহাররম মাসে 'যাতুর রিক্বা' অভিযান সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদের দুষ্ট বনী মাহারিব ও বনী ছা'লাবা গোত্রদ্বয়কে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নাখল নামক স্থানে পৌঁছার পর অনেকের পায়ে ফোসকা পড়ে যায়, কারণ উটের সংখ্যা কম থাকায় অধিকাংশ মুজাহিদকে হেটে যেতে হয়েছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের ৬ জনের মধ্যে মাত্র ১টি উট ছিলো। ফলে পদব্রজে চলতে গিয়ে সকলের পায়ে ফোসকা পড়ে যায় এবং পায়ের নখ পর্যন্ত উপড়ে যায়।" এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য লোকে নিজেদের পায়ে পট্টি বেঁধেছিলেন। এজন্য এ যুদ্ধ গাযওয়া যাতুর রিক্বা বা পট্টিওয়ালা যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করে। তবে আসলে যুদ্ধ হয় নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসময় সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামাযও আদায় করেন।

এই যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। সাহাবায়ে কিরামও অন্যান্য বৃক্ষরাজির ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বীয় তলোয়ার গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমাদের তন্দ্রা এসে গেলো। কিছুক্ষণ পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাক দিলেন। সেখানে গিয়ে দেখি এক বেদুঈন বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবগত করলেন, এই লোকটি আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে আমার তলোয়ার হাতে তুলে নেয়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমার মাথার উপর তলোয়ারখানা উঁচিয়ে রেখেছে। সে বললো: এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? আমি জবাব দিলাম: আল্লাহ। এই দেখো, সে এখন বসে আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো সাজা দিলেন না। আসলে লোকটির হাতদ্বয় সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গিয়েছিল।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অশ্ব থেকে পড়ে যেয়ে আহত হন এবং মাশরাবায় তিনি ৫দিন অবস্থান করেন; হযরত জওয়ারিয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন; মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার চেষ্টা করে। পরে স্বয়ং আল্লাহ পাক হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার উত্তম নিষ্কলুষ চরিত্রের স্বীকৃতি হিসাবে আয়াত নাযিল করেন। অপবাদকারীদেরকে সনাক্ত করে শরয়ী নিয়মানুযায়ী ৮০ দুররা মারা হয়।

খন্দকের যুদ্ধ

এ হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো খন্দকের যুদ্ধ। একে আরবীতে গাযওয়ায়ে আহযাব বলে। এ বছরের (অর্থাৎ ৫ম হিজরির) শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সূচনা হয়। মক্কার কুরাইশ কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে নও-মুসলিমদের এটিই ছিলো চূড়ান্ত যুদ্ধ। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। এই বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যেয়ে মুসলমানরা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হোন। সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, সে সময় মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল" [সূরা আহযাব : ১০-১১]।

কুরাইশ, ইয়াহুদী ও গাফফান গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত এই বিরাট ফৌজ যখন মদীনার পানে অগ্রসর হলো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতির নাজুকতা সকলকে জানালেন। এরপর পরামর্শ হলো কী করা যায়। অনেকের প্রস্তাব শেষে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্যদের একটি অতি পরিচিত ও কার্যকর সামরিক কৌশল হলো পরিখা খনন করা। অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে এই কৌশল বেশ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা মদীনা শরীফের যেসব এলাকা দিয়ে হামলার আশঙ্কা করছি সেখানে খন্দক বা খাল খনন করতে পারি। আরবদের নিকট এই কৌশল ছিলো সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পছন্দ করলেন। সুতরাং মদীনার উত্তর-পশ্চিম দিকের ময়দানে খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন। এদিক থেকেই মদীনা শরীফ আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সর্বাধিক।

প্রতি চল্লিশ হাত পর্যন্ত খন্দক খননে দশ জন করে সাহাবা নিযুক্ত করা হলো। খন্দকের দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার হাত, অর্থাৎ ২৫০০ গজ (১.৩ কি.মি)। এর গভীরতা ছিলো সাত থেকে দশ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ১০ হাত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক খননে নিজে শরীক হোন। এ সময় শৈত্যপ্রবাহ বেশ তীব্র ছিলো। খাদ্যের পরিমাণ সীমিত থাকায় একাধারে তিন-চারদিন পর্যন্ত অত্যল্প খাবার খেয়ে কিংবা উপবাসে থাকতে হয়েছিলো সাহাবায়ে কিরামকে। হযরত আবু তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা ক্ষুধার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম এবং নিজেদের পেট খুলে দেখালাম। আমাদের পেটে তখন একটি করে পাথর বাঁধা ছিলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থা দেখে নিজের পেট মুবারক উন্মুক্ত করলেন। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে দু'টি পাথর বাঁধা আছে। এরূপ ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন ভাটা পড়ে নি- কারণ, তাঁরা যা করছিলেন তা ছিলো সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে: একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে খন্দকের নিকট যেয়ে দেখতে পেলেন ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে মুহাজির ও আনসাররা খনন কার্যে লিপ্ত আছেন। তাদের নিকট না ছিলো কোনো গোলাম কিংবা কর্মচারী যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সাহাবায়ে কিরামের এই কঠিন পরিশ্রম দেখে পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মুবারক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'আ উচ্চারিত হলো:

اللّٰهُمَّ لا عيش الا عيش الاخرة * فاغفر الانصار والمهاجرة *

“হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; অতএব আনসার ও মুহাজিরদের তুমি ক্ষমা করো।”

উপরোক্ত দু'আ যখন খননকারীদের কর্ণগোচর হলো তখন তাঁরাও বলতে লাগলেন:

نحن الذين بايعوا محمدا * علٰى الجهاد مابقينا ابدًا

“আমরা তো তারাই, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের জীবন প্রদীপ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেছি।”

খন্দক খননকালে এক বিরাট পাথর সামনে পড়লো। সাহাবাদের কেউই একে ভাঙ্গতে পারছিলেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানোর পর তিনি নিজেই কোদাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসলেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে এমন জোরে আঘাত হানলেন যে, পাথরটি এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেলো। সাথে সাথে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, “আল্লা-হু আকবার!” ধ্বনি। বললেন, আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার আঘাত করার ফলে পাথরখানার আরেক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তিনি আবারো ‘আল্লা-হু আকবার!’ ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের চোখে মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। এরপর আবার প্রচণ্ড আঘাত করলেন পাথরের উপর- এতে তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল। এবার আরো জোরে উচ্চারণ করলেন ‘আল্লা-হু আকবার!’ ধ্বনি, বললেন, আমাকে ইয়ামনের চাবিগুচ্ছও দেওয়া হয়েছে। এখনই আমি সান'আ শহরের তোরণ অবলোকন করছি। সুবহানাল্লাহ! এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করছিলেন যখন আরবের বিরাট এক বাহিনী কর্তৃক মুসলমানরা পরিবেষ্টিত হচ্ছিলেন, তাদের জান-মালের তথা অস্তিত্বের নিশ্চয়তা পর্যন্ত ছিলো না। তীব্র শৈত্য প্রবাহ, ক্ষুধা, অভাব-অনটন ও বিরাট ক্লান্তিক্ষণে এই কথাগুলো যেনো সাহাবায়ে কিরামের কান-মন-দৃষ্টিতে দীর্ঘ ট্যানেল শেষে ক্ষীণ আলোর আভা ছিলো। কারণ, তাঁরা জানতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন হতে যাচ্ছে। আর তা অবশ্যই হয়েছিল। হযরতের মক্কী জিন্দেগী শেষ হতে না হতেই সিরিয়া, পারস্য, মিশর, ইয়ামন ইত্যাদি অঞ্চলের বিরাট বিরাট শক্তিধর রাজাধিরাজদের পরাজিত করে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি মু'জিযা প্রকাশিত হয়। এখানে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি। খননকারীরা যখন কোন পাথর ভাঙ্গার ব্যাপারে কষ্টের সম্মুখীন হতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের পানি দ্বারা কুলি করতেন ও কিছু পাঠ করে দু'আ করে এই পানি পাথরে ছিটিয়ে দিতে বলতেন। এতে পাথরগুলো বালির ঢিবির মতো নরম হয়ে যেতো; খাবারের মধ্যে এমন বরকত হতো যে, অনেক লোক সামান্য খাবারেও তৃপ্ত হতেন এমনকি সমগ্র বাহিনীই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের দিন খননকাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় এক বিরাট প্রস্তর দেখা দিলো। এটা খন্দক খননে বাঁধার সৃষ্টি করছিলো, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, আমি নামছি। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র পেটে পাথর বাঁধা আছে। আমরা এ সময় তিনদিন যাবৎ উপবাসে ভুগছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাথরে কোদাল দিয়ে আঘাত হানার সাথে সাথে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে নিজের গৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। ঘরে পৌঁছে স্ত্রীকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে আমার ধৈর্য রাখতে পারছি না। তুমি খানাপিনার কোনো ব্যবস্থা করো। স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ- কিছু যব আর ঐ বকরির বাচ্চা দ্বারা খাওয়ানো যাবে। বাচ্চাটি জবাই করো। সুতরাং রান্নার ব্যবস্থা করে ফিরে গেলাম পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে। তাঁকে বললাম, আমি অল্প কিছু খানার ব্যবস্থা করেছি। আপনি দু'এক জনকে সাথে নিয়ে

চলুন। তিনি জানতে চাইলেন খানার পরিমাণ কি? আমি বিস্তারিত বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, এতো অনেক বেশী খাবার! তুমি ফিরে যাও। তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত ডেগচি চুলা থেকে নামাবে না এবং রুটি উনুন থেকে বের করবে না। এরপর সবাইকে ডেকে বললেন, হে লোকসকল বিসমিল্লাহ বলো! সকল আনসার ও মুহাজির দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমার বাড়িতে মেহমানদারির জন্য সবাইকে দাওয়াত করলেন। বললেন, জাবির এক বিরাট দাওয়াতের আয়োজন করেছে, আমরা সবাই তার বাড়িতে যেয়ে মেহমানদারী করবো। বাড়ি পৌঁছে আমি স্ত্রীকে বললাম, খবর রাখো কিছু? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত লোকদের নিয়ে তোমার বাড়িতে খেতে আসছেন! স্ত্রী বললেন, খাবারের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেছেন কি? তাকে আমি সব খুলে বললাম। ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে লোকসকল ভিড় করো না। সবাই বসে যাওয়ার পর তিনি ডেগচির ঢাকনা না খুলে রুটি ও গোস্ত পরিবেশন করতে বললেন। সুবহানাল্লাহ! সবাই পেট পুরে খেলেন কিন্তু রুটি ও গোস্ত শেষ হলো না। তিনি বললেন, এবার তোমার গৃহের সকলে খেয়ে নাও।

কুরাইশদের কর্তৃক মদীনা অবরোধ

দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কুরাইশরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে ছাউনি ফেললো। খন্দকের অপরদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'লা পাহাড়কে পেছনে রেখে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যবাহিনীসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান নিলেন। শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী সৈন্য সামনে এসে খন্দকের পারে থমকে দাঁড়ালো। তারা এরূপ যুদ্ধকৌশল কখনো অবলোকন করে নি। একটি স্থানে খন্দকের প্রশস্ততা কিছু কম ছিলো। সেদিকে আরবের প্রখ্যাত অশ্বারোহী বীর আমর ইবনে আবদুদ অগ্রসর হয়ে হাঁক ছাড়লো: কে এমন আছে যে, আমার মুকাবিলা করবে? হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এগিয়ে এসে বললেন, আমর! তুমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলে যে, কুরাইশদের কেউ তোমাকে দু'টো বিষয়ে দাওয়াত করলে তার একটি তুমি অবশ্যই কবুল করবে। আমর স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে আল্লাহ, তদীয় রাসূল ও ইসলামের দিকে দাওয়াত করছি। সে বললো,

আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই! হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি! সে বললো, ভাতিজা! আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করতে চাই।

আমর এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। শুরু হলো যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শের-ঈ-খোদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তলোয়ারের আঘাতে আমরের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। আমরের সঙ্গী নওফাল এই অবস্থা দেখে দ্রুত সেখান থেকে পালালো।

খন্দকের যুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষ তেমন বেশী হয় নি। বার বার শত্রুরা খন্দক পার হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলো। আবু সুফিয়ান ভাবলেন, মদীনার মুসলমানদেরকে জব্দ করার একটি পথ হলো পুরো শহরকে অবরোধ করে রাখা। এতে সবাই অনাহারে অর্ধাহারে জর্জরিত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। সুতরাং অবরোধের পন্থাই তারা বেছে নিল। দীর্ঘ এক মাস এই অবরোধ স্থায়ী ছিলো। এমনিতেই সে বছর ছিলো আকাল- তার উপর এই অবরোধের ফলে মদীনা মুনুওয়ারায় কোনো পণ্যদ্রব্য বাইর থেকে আসছিলো না। ফলে সবার উপর নেমে আসে প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা। এদিকে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন হলো। তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে চাই। আসলে তা ছিলো না- এ ছিলো তাদের পালাবার একটি কৌশল মাত্র।

ভয় ও পেরেশানীর মধ্যে মুসলিম বাহিনী কালাতিপাত করছিলেন। শত্রুবাহিনী অবরোধ ওঠানোর কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছিলো না। একদিন গাতাফান গোত্রের নু'আম ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওমের অজান্তে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আপনার অভিপ্রায়মাফিক হুকুম করুন। তিনি বললেন, যুদ্ধ হলো কৌশল বা হিকমাতের নাম। তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে পারো। শত্রুপক্ষের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরাতে তুমি চেষ্টা চালাও। তার চেষ্টার ফলে বনী কুরাইজা ও কুরাইশদের মধ্যে

বিশ্বস্ততার সন্দেহ সৃষ্টি হলো। পরিণতিতে তাদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি ভয়ের সঞ্চার হলো। সুতরাং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা কুরাইশদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এদিকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে গেল। এক রাতে কাফির-মুশরিক বাহিনীর উপর দিয়ে এমন এক প্রবল শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলো যে, তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে পড়তে লাগলো। রান্নার সরঞ্জামাদি উল্টে-পাল্টে পড়লো। এই করুণ অবস্থাদৃষ্টে আবু সুফিয়ান বললেন, হে কুরাইশগণ! এখন আর এখানে অবস্থান করার উপায় বাকী নেই। আমাদের খচ্চর ও ঘোড়াগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। বনী কুরাইজা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। খুব ভয়ঙ্কর এই প্রবল ঝড়-তুফানে যে কী বিরাট কিয়ামত কাণ্ড ঘটাচ্ছে তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। আমাদের কোনো আশ্রয়স্থলই নিরাপদ ও অক্ষত নেই। এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। আমি ফিরে যাবার ইচ্ছা করছি। আবু সুফিয়ান এটুকু বলে নিজের উটে আরোহণ করে যেতে লাগলেন। পুরো কুরাইশ বাহিনী তার অনুসরণ করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করছিলেন। মুসলমানদের গোয়েন্দা হুজাইফা ইবনে ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহু এসে তাঁর নিকট সব সংবাদ দিলেন। সুতরাং খন্দক যুদ্ধের অবসান হলো। ভোর হতেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য-সামন্তদের নিয়ে মদীনা মুনুওয়ারায় ফিরে আসলেন। পবিত্র কুরআনে করীমে খন্দকের ঘটনার বর্ণনা এসেছে এভাবে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

“হে মু’মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন” [সূরা আহযাব : ৯]। আরোও ইরশাদ হয়েছে:

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

"আল্লাহ পাক কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায় নি। যুদ্ধ করতে আল্লাহই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী" [সূরা আহযাব : ২৫]।

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ৭ জন শহীদ হয়েছিলেন। অপরদিকে মুশরিকদের পক্ষে নিহত হয়েছিল ৪ জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধের পর বলেছিলেন: এ বছরের পর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হবে না। বরং তোমরাই তাদের ওপর হামলা করবে।

খন্দকের যুদ্ধের পরই বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী ইয়াহুদী গোত্র বনী কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত হয়। তাদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক বিচারকার্যে মনোনীত হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুযায়ী ছয় শত পুরুষ বন্দীদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই ইয়াহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে সফল অভিযান শেষে মদীনা শরীফ শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য তাদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হলো।

ষষ্ঠ হিজরি

এ বছরে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুপুত্র হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহু সে সময় মারা যান। মদীনা শরীফে গুজব উঠলো, এই মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক বিদ্যমান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে অবগত করলেন: তাঁর সন্তানের মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্যগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। তোমরা বরং এ সময় নামায আদায় করবে। এই নামাযকে বলে, সালাতুল কুসূফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আদায় করেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

এই হিজরির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। এই সত্য স্বপ্নের কাল, মাস বা বছর নির্ধারিত ছিলো না। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এই স্বপ্ন শ্রবণে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠলেন। কারণ, তাঁরা নিশ্চিত জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নও ওহীর মতো মহাসত্য। দীর্ঘ ছয় বছর মুহাজিররা নিজ জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত। মক্কা শরীফের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও সম্মানবোধ অস্থিমজ্জায় জড়িত হয়ে আছে, সেখানে ফিরে যেতে তাই সবাই উদ্গ্রীব। নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যেয়ে পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার সৌভাগ্য হয়তো অচিরেই পূর্ণ হবে এই ভেবে সকলেই অধীর অপেক্ষায় রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, এই বছরই পবিত্র উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সুতরাং হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। উমরার ইহরাম বেঁধে সবাই মক্কার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গতিরোধ করলেন। জানা গেল কুরাইশরা তাঁর আগমনে ভীষণ অস্থির ও ঘাবড়ে গেছে। তিনি হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দূত হিসাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, হে উসমান! তুমি তাদের গিয়ে বলো, আমরা যুদ্ধের জন্য আসি নি। আমরা উমরা পালনের নিয়তে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ইসলামের দাওয়াতও দেবে।

বাইআতে রিদ্বওয়ান

উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসছিলেন না। তারপর সংবাদ পাওয়া গেল যে, কুরাইশরা তাঁকে শহীদ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সকলকে একত্রিত করে এই দুঃসংবাদ জানালেন। এরপর তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে সবাইকে বাইআত গ্রহণের আহ্বান করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। তাঁর আহ্বানে ১৪০০ সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে আল্লাহর রাসূলকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বাইআতের জন্য সর্বপ্রথম হাত বাড়ালেন হযরত আবু সিনান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এরপর সকলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এই বাইআতই ‘বাইআতে রিদ্বওয়ান’ নামে প্রসিদ্ধ। এক মুনাফিক ছাড়া সকলেই বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু উপস্থিত থাকলে তিনিও বাইআতে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাত মুবারক দেখিয়ে সবাইকে বললেন, এই হাত উসমানের। অর্থাৎ তাঁর উভয় হস্ত মুবারক একটা আরেকটার উপর রেখে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে বাইআত করলেন।

বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা বেহেশতে প্রবেশ করবেন। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বাইআত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

“মু’মিনগণ যখন বৃক্ষের নীচে আপনার হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেছিল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের হৃদয়ে যা ছিলো সে ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয়” [সূরা ফাতাহ : ১৮]।

আরও ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ * فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ * وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"যারা তোমার হাতে বাইআত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাইআত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন" [সূরা ফাতাহ : ১০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাইআত সম্পর্কে বলেন: "ইনশাআল্লাহ! এই বৃক্ষের নীচে যারা বাইআত করেছে, তাদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"। একথা শ্রবণে হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا

"তোমাদের প্রত্যেকেই এটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" [১৯ : ৭১]।

এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটাও বলেছেন:

"অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো"।

বাইআত শেষ হওয়ার পর আসন্ন যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এমন সময় সকলে দেখতে পেলেন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসছেন। এতে অবশ্যই সবাই যারপরনেই আনন্দিত হলেন, তাঁদের উদ্বেগ ও অশান্তির অবসান হলো। হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু জানালেন যে, কুরাইশরা একা উমরাহ করার জন্য তাঁকে বলেছিলো, তিনি তা অস্বীকার করেন।

এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে রেখেছিল। পরে তারা জানালো, মুসলমানরা মরণপণ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাই তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়।

এদিকে কুরাইশরা বুঝতে সক্ষম হলো যে, মুসলমানরা সত্যিই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেন নি- তাই তাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র সীমিত ছিলো। সবাই মিলে দুরভিসন্ধি করলো যে, এই সুযোগে মুসলমানদেরকে খতম করে দেওয়া যায়। তাই তারা একদল অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলো। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলো মিরকায। তারা একটি গোপন পথে মুসলমানদের নিকটবর্তী হলো আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আসলে মুসলিম বাহিনী মোটেই অপ্রস্তুত ছিলো না- তারা পুরো কাফিলা পাহারার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একদল দক্ষ সৈন্য কুরাইশদের ঘিরে ফেলেন ও প্রায় সবাইকে বন্দী করতে সক্ষম হন। শুধুমাত্র সেনাপতি মিরকায পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের সকলকেই বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। তাঁর মহানুভবতা কুরাইশদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।

সন্ধির প্রয়াস

কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব দিলো। তারা একে একে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে লাগলো। প্রথমে আসলো উরওয়া ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী। সে কিছু অসংযত উক্তি করেছিল বিধায় তার দ্বারা কোনো কাজ হলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাত লক্ষ্য করে সে অভিভূত হয়েছিল। সে মক্কা শরীফ ফিরে যেয়ে বললো, “আমি বড় বড় রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়েছি। তাদের শান-শওকত দেখেছি কিন্তু আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের সাহাবীগণ তাঁকে যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন তা বিশ্বজগতের কোথাও দেখি নি।”

এরপর প্রতিনিধি হিসাবে হুলায়াস ইবনে আলকামা, মিরকায ইবনে হাফস এবং সবশেষে সুহায়ল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা চূড়ান্ত করা ও

চুক্তি সম্পাদনের জন্যই সে দূত হিসাবে এসেছিল। যা হোক কুরাইশদের শর্তাবলীর অনুকূলে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হলো। ঐতিহাসিক এই সন্ধির ক'টি শর্ত ছিলো:

১. এ বছর মুসলমানগণ উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন।

২. আগামী বছর এই মুলতবী উমরা কাযা করতে পারবেন। তবে মাত্র তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থানের অনুমতি পাবেন।

৩. কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া উমরা পালনের সময় আর কোনো অস্ত্র আনতে পারবেন না।

৪. মক্কায় অবস্থানরত কোনো মুসলমান মদীনায় চলে গেলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু মদীনা হতে কেউ মক্কায় চলে আসলে তাকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হবে না।

৫. এই সন্ধি দশ বছর বলবৎ থাকবে।

بامسك اللّٰهم

সুহাইল খুব বিচক্ষণ লোক ছিলো। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু চুক্তিপত্র লিখতে বসলেন। তিনি প্রথমেই লিখলেন, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, সুহাইল বাঁধা দিয়ে বললো, থামুন! রাহমান ও রহীম কে আমরা জানি না। আমরা লিখে থাকি- بامسك اللّٰهم (হে আল্লাহ! তোমার নামে), সুতরাং তা-ই লিখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ঠিক আছে, এটাই লিখো। এরপর লিখা হলো:

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله

"এটা সেই চুক্তিপত্র যার প্রতি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীকৃতি প্রদান করেছেন"। সুহাইল এবারও বাঁধা দিয়ে বললো, থামুন! আমরা যদি মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূল মেনে নিতাম তাহলে আপনাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হতো কেন? বরং লিখুন: محمد بن عبد الله অর্থাৎ 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ'। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। এরপরও তুমি যা চাও তা-ই লিখা হবে। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি কিছুতেই 'رسول الله' শব্দটি

কাটতে পারবো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও- আমিই তা কেটে দিচ্ছি। তিনি তা কেটে দেওয়ার পর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেই স্থানে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ' শব্দ ক'টি লিখে দিলেন।

বন্দী অবস্থায় আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর আগমন

চুক্তিপত্র তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। শৃঙ্খল বেষ্টিত অবস্থায় কুরাইশ দূত সুহাইলের পুত্র হযরত আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেথায় এসে উপস্থিত হলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে আবদার করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মদীনা শরীফ নিয়ে যান। চরম নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।

স্বীয় পুত্রকে দেখে সুহাইল এগিয়ে এসে আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর গালে একটি চপেটাঘাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে দাবী করলো, চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী আমার পুত্রকে অবশ্যই আমার হাতে ফিরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সুহাইল! এখনও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয় নি। অন্তত আমার খাতিরে আবূ জান্দালকে আমাদের সাথে যেতে দাও। কিন্তু সুহাইল কিছুতেই তা মানলো না। সুতরাং অগত্যা আবূ জান্দালকে সুহাইলের নিকট ফেরৎ দিতে হলো। এদিকে চরম নির্যাতনের শিকার হযরত আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা এ কী করছো? এই যালিমদের হাতে আমাকে ফেরৎ দিচ্ছো। দয়া করে আমাকে রক্ষা করো! তাঁর এই আবদার শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন আবূ জান্দালের এই অবস্থা দেখে ক্ষোভে ও দুঃখে জ্বলছিলেন- কিন্তু মুখে কিছুই উচ্চারণ করলেন না। অবশেষে যখন আবূ জান্দালকে মুশরিকরা টেনেহেঁচড়ে মক্কাভিমুখে নিয়ে যাওয়া

শুরু করলো তখন উমর ইবনে খাত্তাবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন: "হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধরো। এরা মুশরিক, তাদের রক্ত আল্লাহর নিকট কুকুরের রক্ততুল্য!"

শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করলেন। মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আওফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাহল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী। মুশরিক পক্ষে সাক্ষী হিসাবে ছিলো: মিরকায ইবনে হাফস, হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উযযা প্রমুখ।

সন্ধির শর্তে হযরত উমরের প্রতিক্রিয়া

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী প্রায় সবগুলোই ছিলো মুশরিকদের পক্ষে। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সবাই দুঃখে ফেটে পড়ছিলেন কিন্তু মুখে কিছু উচ্চারণ করছিলেন না। তবে ভবিষ্যৎ খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: আপনি যে আল্লাহর রাসূল তা কি সত্য নয়? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূল। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আবার প্রশ্ন করলেন, আমরা যে পথে আছি তা কি ন্যায় ও সত্যের পথ নয়? আর কাফিরগণ যে পথে আছে তা কি অন্যায় ও অসত্যের পথ নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, নিশ্চয়। উমর আবার বললেন, তবে দীনের কাজে আমরা এতো দুর্বলতা দেখাই কেন? এতো অপমান কেন সহ্য করবো? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। আমি কিছুতেই তাঁর আদেশ অমান্য করবো না। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি বলেন নাই আমরা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করবো? তিনি জবাব দিলেন, তবে এই বছরই তাওয়াফ

করবো তা বলি নি। উমর, ধৈর্য ধরো। অচিরেই আমরা সকলে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবো।

হুদাইবিয়া থেকেই মুসলমানরা কুরবানী সেরে মাথা মু-ন করে ইহরাম থেকে মুক্ত হলেন। এরপর আরো তিনদিন হুদাইবিয়ায় অবস্থান করে কাফিলা মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কাফিলার প্রায় সবাই দুঃখে জর্জরিত। তাঁদের ধারণা মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কুরাউল গামীম নামক স্থানে কাফিলা এসে পৌঁছার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে হঠাৎ ওহী নাযিলের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হলো। তিনি একটু পরই বললেন, হে আমার সাহাবীগণ! তোমাদের রব অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

“নিশ্চয় আমি তোমাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়” [সূরা ফাতাহ : ১]।

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে বিজয়ের ঘোষণা শ্রবণ করে বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, এটা কী বিজয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্ত স্বরে প্রফুল্লচিত্তে বললেন, হ্যাঁ, এটাই বিজয়। হযরত উমরের মনে সান্ত্বনা আসলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ঐতিহাসিক সন্ধিই মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত বিজয়ের কারণ হবে। আর তা-ই ছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবূ বাসির রাদ্বিআল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে আসেন। মুশরিকরা সাথে সাথে সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরৎ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তি পাঠিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে আবূ বাসিরকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাতে তুলে দিলেন। আবূ বাসির বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এসেছি। আপনি আমাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “এটা সন্ধির শর্ত। তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা তোমার জন্য কোনো পন্থা বের করে দেবেন।”

মক্কার দু'জন দেহরক্ষী আবূ বাসিরকে নিয়ে রওয়ানা দিলো। রাস্তায় তিনি একজন দেহরক্ষীর তরবারির প্রশংসা শুরু করলেন। রক্ষী এতে নিজেকে বড়ো ও গৌরবান্বিত মনে করলো। সে এক পর্যায়ে তার ঐ তরবারি হযরত আবূ বাসিরের হাতে তুলে দিল। বললো, "আমি এটা অনেক লোকের উপর ব্যবহার করেছি!" তরবারি হাতে নিয়ে আবূ বাসির তাকে খতম করে দিলেন। ওপর রক্ষী এই দৃশ্য দেখে জীবন নিয়ে পালালো।

আবূ বাসির আবার মদীনা শরীফ ফিরে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আবদার করলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। এখন আমাকে এখানে থাকতে দিন।" কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা আছে। আবূ বাসির ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মদীনা শরীফ থেকে চলে গিয়ে সাগর সৈকতে একটি স্থানে বসবাস শুরু করলেন।

এদিকে হুদাইবিয়া থেকে ফেরৎ যাওয়া সাহাবী আবূ জান্দাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু কিছুদিনের মধ্যেই আবার পালিয়ে আসলেন। তিনি সমুদ্র সৈকতে লুকিয়ে থাকা আবূ বাসিরের সঙ্গে যোগ দিলেন। ধীরে ধীরে মক্কা শরীফ থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানরা এখানে এসে একটি বসতি গড়ে তুললেন। অতি শীঘ্রই বেশ বড়ো একটি উপনিবেশ গড়ে উঠলো। তবে মরুভূমির উপর তাঁদের জীবন ছিলো অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং জীবনরক্ষার্থে তারা কাফির-মুশরিকদের বাণিজ্য কাফিলার উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। মক্কা শরীফ থেকে যেসব কাফিলা এদিকে যাতায়াত করতো তারা এদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সবকিছু লুটপাট করে নিতেন। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা মদীনা শরীফ দূত পাঠিয়ে সন্ধির এই শর্ত বাতিল করার প্রস্তাব দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পত্রযোগে এই সংবাদ আবূ বাসিরের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রখানা হাতে রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। সমুদ্র সৈকতে গড়ে ওঠা মুসলিম

উপনিবেশের সবাই মদীনা মুনুওয়ারায় চলে আসলেন- সে সাথে পরবর্তীতে মক্কা শরীফ থেকে হিজরতকারীরাও বিনা বাধায় আসতে শুরু করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরই প্রখ্যাত মুসলিম সেনানায়ক হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা মদীনা মুনুওয়ারায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলামগ্রহণ করেন। হযরত খালিদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর হাতে সিরিয়া এবং হযরত আমর ইবনে আস এর হাতে মিশর বিজিত হয়েছিল।

সপ্তম হিজরি

এই হিজরিতেই প্রখ্যাত খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কৃত ইয়াহুদীরা এখানে বসবাস শুরু করে। এরপর তারা প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুতরাং এদের দমন-কল্পে হুদাইবিয়ার সন্ধি সমাপ্ত করে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক মাসের ভেতর ১৫০০ মুজাহিদের এক বাহিনী গঠন করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর নির্দেশ মুতাবিক এই যুদ্ধে বাইআতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবারাই শুধু যেতে পেরেছিলেন।

মদীনা শরীফ থেকে খায়বারের দূরত্ব ১২৫ মাইল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মুহাররমের ২০/২১ তারিখ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধ ছিলো দুর্গ কেন্দ্রিক। সর্বমোট ৬টি মতান্তরে ১০টি দুর্গে ইয়াহুদীরা বাস করতো। মুসলমানরা একটার পর আরেকটা দুর্গ দখল করে নেন। সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গের নাম ছিলো কামূস। এটি বার বার আক্রমণ করেও মুসলমানরা দখল করতে ব্যর্থ হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। এই দুর্গ বিজয়ের গৌরব তাকেই আল্লাহ তা'আলা দান করবেন।

সাহাবীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে উঠলো। সবার ভাবনা, কার ভাগ্যে দুর্গ বিজয়ের গৌরব নিহিত আছে। সবাই ভোরে ওঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করলেন। কিন্তু আসলেন না শুধু আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? একজন বললেন, চোখ-ওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করছেন তিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে আনতে বললেন। তিনি আসার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখ-নিঃসৃত লালা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দু'আ করলেন। সুবহানাল্লাহ! সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলীর চোখ ভালো হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা হযরত আলীর হাতে ঝাণ্ডা প্রদানকরে বললেন, "যাও! যুদ্ধ করো যতক্ষণ না বিজয় নিশ্চিত হয়। এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করো না।" অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে প্রথমে শত্রুদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কথাও বলেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঢাল মাটিতে পড়ে যায় এবং এক ইয়াহুদী তা নিয়ে পলায়ন করে। এসময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এমন রূহানী শক্তির সঞ্চার হলো যে, দুর্গের ভারী লৌহ নির্মিত দরজা উপড়িয়ে তা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। যুদ্ধ শেষে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই দরজা ছুড়ে মারলেন। এরপর দেখা গেলো আট জন শক্তিশালী ব্যক্তি একত্রে মিলেও এই দরজাটি ওঠাতে পারছেন না!

দুর্গ বিজিত হলো। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফিরে আসলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শের-ই-খোদা আলীকে চুম্বন করলেন। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ কিসের ক্রন্দন, দুঃখের না আনন্দের?" তিনি জবাব দিলেন, আনন্দের।

এ বছরের অন্যান্য ঘটনা হলো: খায়বারে ধৃতা হযরত সাফিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পন্ন হওয়া; মু'তআ বা অস্থায়ী বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ; মুসলমানদের জন্য গৃহপালিত গাধা ও শিকারী জন্তুর মাংস হারাম হওয়া; এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মাতা হযরত উম্মে রুমান রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যুবরণ ছিলো এ হিজরির বিশেষ ক'টি ঘটনা।

উমরাতুল কাযা

এ বছরের যুল-কা'দা মাসে সন্ধির শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতবী উমরার কাযা আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত সকল সাহাবাসহ আরো অন্যান্য আনসার-মুহাজির এই উমরা পালনে শরীক হলেন। এতোদিন পরে মুহাজিররা তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন- আনন্দের বন্যা সর্বত্র বইতে লাগলো। দুই হাজার সাহাবীর এক বিরাট কাফিলাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী শুধুমাত্র কোষবিদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্র কেউই সাথে নিলেন না। তবে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০০ বীর সাহাবীকে যুদ্ধরক্ষী হিসাবে অস্ত্রশস্ত্রসহ আগেই পাঠিয়ে দিলেন। তবে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন যে, তারা যেনো মক্কা শরীফের হারাম সীমানার ভেতরে না ঢুকেন। এই বাহিনী নির্দেশ মুতাবিক 'মাররায যাহরান' নামক উপত্যকার ইয়াজাজ এলাকায় যেয়ে শিবির স্থাপন করে। কুরাইশরা এদের খবর পেয়ে ঘাবড়ে যায়। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে নিশ্চিত হলো যে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেন নি। সন্ধির শর্ত পুরোপুরিভাবে পালিত হবে।

মক্কা শরীফের দৃশ্য এক আশ্চর্য চিত্র ধারণ করলো। কুরাইশদের অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পাহাড়-পর্বতের উপর আশ্রয় নিলো। তাদের শঙ্কা ছিলো, নগরথেকে তাড়িয়ে দেওয়া এসব মুসলমানরা হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অপরদিকে

অনেকেই আবার দারুন-নাদওয়ার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের কর্মকাণ্ড অবলোকন করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিক দিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। পবিত্র বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হতেই তিনি আবেগভরা কণ্ঠে তালবিয়ার আওয়াজ তুললেন:

لبيك اللّٰهم لبيك * لبيك لاشريك لك لبيك * ان الحمد والنعمة لك والملك *

لاشريك لك *

"হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, প্রভু হে! আমি হাজির। সকল প্রশংসার যোগ্য তুমিই, সকল দান-অনুদান তোমারই আজ্ঞাধীন। রাজত্ব তোমারই কর্তৃত্বাধীন, তোমার কোন শরীক নাই।"

এই অপূর্ব তালবিয়ার ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলো সাহাবাদের হাজারো কণ্ঠ, মুখরিত হয়ে ওঠলো মক্কা শরীফের আকাশ-বাতাস। কাফির-মুশরিকরা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের এই কাফিলার হৃদয় নিংড়ানো কর্মকাণ্ড। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কী অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ। মালিকের দরবারে বান্দার আনুগত্যের কী সুন্দর নমুনা!

সন্ধির শর্তানুযায়ী মুসলমানগণ তিনদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যে সাহাবায়ে কিরাম প্রিয় জন্মভূমি ঘুরে দেখতে লাগলেন। ফেলে যাওয়া বাড়িঘর ও ভিটা দেখে আবেগ-আপ্লুত হলেন- অনেকের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। স্বাধীনভাবে চলতে কেউ কোনো বাধাও দেয় নি। তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে কাফিলাসহ যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হলো। মদীনা শরীফ যাওয়ার পথে 'সরিফ' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি হয়। এখানেই হযরত মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহার সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাত্রিযাপন করেন। আর এই স্থানেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত

মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হিজরি ৬৩ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর এখানেই বিদ্যমান।

আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ষষ্ঠ হিজরির শেষ ভাগ থেকে সপ্তম হিজরির প্রথম ভাগের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রযোগে আরব উপদ্বীপ ও চতুর্দিকের অঞ্চলসমূহের আমীর-উমারা ও শাসকবর্গের নিকট দূত মারফত ইসলামের দাওয়াত দেন। যেসব সম্রাট ও বাদশাহদের নিকট পত্র দেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী এবং মিসরের বাদশাহ মুকাওকিয়াস প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রের মধ্যে দাওয়াতের নমুনা ছিলো এরূপ: " .... আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম কবুল করুন, শান্তি পাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন ... "।

অষ্টম হিজরি

এই হিজরিতেই মূ'তার যুদ্ধ ও মক্কা-বিজয় সংঘটিত হয়। মূ'তার যুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রথম এক বিরাট রোমান ফৌজের মুখোমুখি হয়। আর মক্কা-বিজয় ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কুরাইশ মুশরিকদের বিরুদ্ধে স্থায়ী ও চূড়ান্ত বিজয়। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উভয় ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরছি।

গাযওয়া মূ'তা

মূ'তা সিরিয়া অঞ্চলের একটি জনপদের নাম। মদীনা শরীফ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১১০০ কিলোমিটার। অঞ্চলটি ছিলো রোম সাম্রাজ্যের অধীনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিস ইবনে উমায়ার আল-আযাদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পত্রসহ দূত হিসাবে বুসরা শহরের শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবনে আমর

আল-গাসসানীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু দুষ্ট শুরাহবীল তাঁকে বন্দী করে শহীদ করে দেয়। দূত হত্যা সে যুগেও ভীষণ অন্যায় কাজ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই করুণ সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শুরাহবীল দূত হত্যার মতো অমার্জনীয় অন্যায়ই শুধু করে নি- সে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করলো। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ এবং হুমকি থেকে মদীনাকে রক্ষার্থে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মূ'তা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই অভিযান অষ্টম হিজরির জুমাদাল ঊলা মাসে হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানের পূর্বে মোট তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই তিনজনই যে যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাবেন সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, "যদি যায়িদ নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন জাফর ইবনে আবি তালিব, তিনিও যদি নিহত হন তাহলে সেনাপতি হবেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আর তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে তোমরা কাউকে সেনাপতি হিসাবে নির্বাচিত করবে।"

মূ'তা অভিযানে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা রোমানদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ছিলো। মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে দুশমন বাহিনীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে পতাকা ছিলো। তিনি প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের উপর তরবারির আঘাত হানতে লাগলেন। এক পর্যায়ে শত্রুর বল্লমের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল- তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। পতাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত মুতাবিক জাফর ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু উত্তোলন করলেন। ব্যাপক যুদ্ধ শেষে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "হযরত জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শরীরের সম্মুখদিকে বর্শা ও তরবারির নব্বুই ঊর্ধ্ব আঘাতের দাগ ছিলো।" তিনি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর দ্বীনের পতাকা নির্দেশ মুতাবিক হাতে তুলে নিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি তুমুল যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন।

এরপর পতাকা হাতে নিয়ে সাবিত ইবনে আকরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু চিৎকার দিলেন: হে মুসলমানগণ! তোমরা পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে নতুন সেনাপতি নির্বাচন করো। সবাই সর্বসম্মতভাবে মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর যুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কৌশলে মুসলিম বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। অপরদিকে শত্রু বাহিনী উত্তর দিকে চলে গেল। ইতোমধ্যে রাতের আঁধারে সমগ্র অঞ্চল ঢেকে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা সমীচিন মনে না করে উভয় পক্ষই আপাতত থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

পরদিন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক সুকৌশল অবলম্বন করে শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিলেন। তিনি পুরো মুসলিম বাহিনীকে এমন এক উপায়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন যে, অপরদিক থেকে মনে হচ্ছিল এক বিরাট বাহিনী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সবাই মিলে এমন উচ্চস্বরে 'আল্লা-হু আকবার!' ধ্বনি তুললেন যে, রোমান বাহিনী মনে করলো মদীনা শরীফ থেকে বুঝি সাহায্যকারী বিরাট বাহিনী এসে যোগ দিয়েছে। শত্রুদলে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা আর যুদ্ধ পরিচালনা উচিত হবে না ভেবে ময়দান থেকে চলে গেল। সুতরাং মাত্র ৩০০০ সৈন্যের এই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে এভাবে আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রদান করলেন। সুবহানাল্লাহ!

এই যুদ্ধের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদূর মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে বসে অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যান। বুখারী শরীফসহ সহীহ রিওয়ায়েতে তাঁর এই মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতির শাহাদাতবরণের সংবাদ তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এখন যায়িদ পতাকা হাতে নিল, সে শহীদ হলো। জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হলো। এবার ইবনে রাওয়াহার হাতে পতাকা আছে, সেও শাহাদাতবরণ করেছে (এসব বলার সময় পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো)।" তিনি আরো বললেন, "আল্লাহর তরবারির মধ্যে

একটি তরবারির (অর্থাৎ সাইফুল্লাহর - খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) হাতে এখন পতাকা আছে- আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।"

মূ'তা যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে শহীদ হয়েছিলেন মাত্র ১২ জন। অপরদিকে শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে মোট নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এছাড়া যায়িদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমও যে অসংখ্য শত্রুসৈন্যদের কতল করে শাহাদাতবরণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিলো যে, আরবের যে কোনো গোত্র স্বাধীনভাবে মুসলমান অথবা কুরাইশদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে এবং এতে কোনো পক্ষ বাঁধা দেবে না। এই শর্তানুযায়ী দু'টি পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষকারী গোত্রের একটি মুসলমানদের সঙ্গে এবং অপরটি মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিল। মক্কার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বনী বাকর আর মুসলমানদের সাথে চুক্তি করেছিল বনী খুযা'আ। মক্কার নিকটেই বসবাসকারী বনী খুযা'আ ও মুসলমানদের মধ্যে এই মিত্রতা কুরাইশদের সহ্য হলো না। সুতরাং তারা চিরদুশমন এই গোত্রকে বনী বাকর কর্তৃক আক্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য-সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র প্রদান এমনকি ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, সুহাইল ইবনে আমর প্রমুখ কুরাইশ জওয়ানরা ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়ে বনী খুযা'আর বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করলো না। বনী খুযা'আ অতর্কিত হামলায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তারা ভয়ে প্রাণ-রক্ষার্থে বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পৌত্তলিকরাও হারাম শরীফের ভেতর হত্যাকাণ্ড ঘটাতে ভয় করতো- কিন্তু বনী বাকার গোত্রের সর্দার নাওফাল বললো, "এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাবো না- কা'বাগৃহের মর্যাদা ভুলে যাও! সবাইকে হত্যা করো"। কুরাইশগণ হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত প্রকাশ্যে ভঙ্গ করে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সদলবলে যোগ দিল।

এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই খুযাঈরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করে সাহায্যের প্রার্থনা করলো। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন, সন্ধির শর্তানুসারে এখন খুযাঈদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মম এই অত্যাচারের ঘটনা শ্রবণে তিনি খুব মর্মাহত হলেন। কুরাইশরা যে সন্ধি ভঙ্গের নিমিত্তে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা বুঝতে বাকী রইলো না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে না যেয়ে প্রথমে দূত মারফত নিম্নোক্ত প্রস্তাবাদি পেশ করলেন:

ক. বনী খুযা'আকে তোমরা উপযুক্ত রক্তপণ দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করো;
খ. কিংবা বনী বাকরের সাথে সকল সম্বন্ধ বাতিল করো;
গ. অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল হয়েছে বলে ঘোষণা দাও।

কুরাইশগণ আগে থেকেই হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাই তারা দূতকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে, শেষোক্ত শর্তই আমরা মেনে নিলাম। সুতরাং কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে দিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল বিলম্ব না করে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে বাতিল করে যে বিরাট ভুল করা হয়েছে কুরাইশরা তা অচিরেই উপলব্ধি করলো। মুসলমানদের আক্রমণের মুখে তাদের টিকে থাকা আর সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান দূত হিসাবে মদীনা শরীফ এসে সন্ধি পুনর্বহালের চেষ্টা চালালেন। মদীনা শরীফ এসে আবু সুফিয়ান স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। পিতাকে দেখে তিনি তড়িঘড়ি করে বিছানা তুলে ফেললেন। আবু সুফিয়ান এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বিছানা গুটিয়ে রাখলে কেন?"। উম্মে হাবীবা জবাব দিলেন, "আপনি অপবিত্র! কাফির! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিছানায় বসার উপযুক্ত আপনি নন!" আবু সুফিয়ানের মনে এ কথাগুলো বিরাট প্রভাব ফেললো। তিনি স্বভাবতই মনোক্ষুণ্ন হয়ে বের হয়ে

গেলেন। মসজিদে নববীতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধি পুনর্বহালের প্রস্তাব দিলেন।

তার এই প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মঞ্জুর হলো না। অনেক চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে আবু সুফিয়ান নিজেই ঘোষণা করলেন, 'হে মদীনাবাসীগণ! শুনো, আমি হুদাইবিয়ার সন্ধিকে পুনঃবলবৎ ও সুদৃঢ় করে গেলাম।' এরপর তিনি মদীনা থেকে প্রস্থান করলেন।

আবু সুফিয়ানের ব্যর্থতা হেতু কুরাইশরা অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পতিত হলো। তারা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চরমভাবে পরাজিত হবে তা তারা জানতো। সুতরাং আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তারা ভীষণ ভয় ও শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো।

মক্কা যাত্রা

পবিত্র রমজান মাসের ১০ তারিখ, অষ্টম হিজরি মুতাবিক ১লা জানুয়ারী ৬৩০ ঈসায়ী সালে মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনীসহ রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

তকদির খুললো ইসলামের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানের

মারউ'জ যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাউনি ফেললেন। দশ হাজার সৈন্যের এই বিরাট বাহিনী পুরো বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাতের বেলা সর্বত্র বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। মক্কা শহর থেকে অদূরে অবস্থানরত এই সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হিযাম ও বুদায়াল ইবনে ওয়ারাকাকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলো। কিন্তু ছাউনির নিকটে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাহারারত একদল মুসলিম বাহিনীর হাতে আবু সুফিয়ান বন্দী হলেন। তাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো। সবাই অপেক্ষা করছিলেন ইসলামের এই চরম দুশমনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ উপায়ে হত্যার নির্দেশ দেবেন সেটা শ্রবণ করতে। কিন্তু দয়ার সাগর পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! তোমার মঙ্গল হোক। এখনও কি সময় আসে নি যে, তুমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই?"

হযরত উমরসহ উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। আবু সুফিয়ানের মনে নবীজীর এই করুণা-ভরা দাওয়াত রেখাপাত করলো। তিনি যে ধীরে ধীরে সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছিলেন তা নিজেই বুঝতে পারেন নি। আল্লাহ পাক তাঁর উপর দয়ার দৃষ্টি দিয়েছিলেন- আর তা অবশ্যই স্বীয় প্রিয় হাবীবের ওয়াসিলায় হয়েছিল। আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন: "আপনার জন্য আমার মাতাপিতা কুরবান হোক! আপনি মহান, দয়ালু ও ধৈর্যশীল আর আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারছি, যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ থাকতো তাহলে আজ আমার অবশ্যই কোনো উপকারে আসতো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে আবার বললেন: "হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উপলব্ধির ক্ষমতা দান করুন। তুমি এখনও একথা স্বীকার করবে না যে, আমি আল্লাহর রাসূল?"

কিন্তু আবু সুফিয়ান নির্ভীকভাবে উত্তর করলেন: "আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হতে পানি নি!" একথা শ্রবণ করে হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন: "আর কেনো বিলম্ব করছো আবু সুফিয়ান! ইসলাম কবুল করো!" এবার আবু সুফিয়ানের মনে সত্যের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠলো। তার তকদির খুলে গেল। দৃঢ়কণ্ঠে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করলেন: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী অপরিসীম করুণা! যে ব্যক্তি ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই চরম দুশমন হিসাবে কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন আজ তিনিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আত্মসমর্পণ করলেন- তিনিও এখন থেকে সাহাবা হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হয়ে গেলেন। মাত্র ক'দিনের মধ্যেই আবু সুফিয়ান একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তিনি ইসলামের জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করে একটি চক্ষু বিসর্জন দিয়েছিলেন। তায়েফ অভিযানে এই চক্ষু আহত হয় এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই আবু সুফিয়ানের সন্তান প্রখ্যাত সাহাবী ও সমরনায়ক হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু উমাইয়্যা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দিলেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীকে বাধা না দেয় তাহলে কোন রক্তপাত হবে না। আবু সুফিয়ানের ঘর নিরাপদ থাকবে। আবু সুফিয়ান ফিরে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর কারোর নেই। কেউ যেনো ভুলেও আক্রমণ না করে। এই সংবাদে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারে পালালো। অনেকে পাহাড়ের উপর, নিজের গৃহে এবং আবু সুফিয়ানের ঘরে আত্মগোপন করলো। মহান আল্লাহর অসীম করুণায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা বাধায় পবিত্র মক্কা নগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। তবে তাঁর পবিত্র মস্তক মাটির দিকে অবনমিত ছিলো। উটের মধ্যে সাথে নিলেন প্রিয় পালকপুত্র মু'তা অভিযানে শাহাদাতবরণকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ বিন হারিসার পুত্র হযরত উসামা বিন যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে। চারদিক থেকে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য মক্কা শরীফ প্রবেশ করলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে যে সেনাদল অগ্রসর হয়েছিল তাদেরকে কয়েকজন দুর্দান্ত কুরাইশ জওয়ান আক্রমণ করায় সামান্য যুদ্ধ বাঁধলো। এতে ১২ জন শত্রুসৈন্য নিহত ও ২ জন মুসলমান জিহাদী শাহাদতবরণ করেন। মক্কা বিজয় এভাবে প্রায় রক্তপাতহীনভাবে সুসম্পন্ন হলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরক্ষণে নাজিলকৃত আল্লাহ বাণী:

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" - সফল হলো।

কুরাইশদের উপর মুসলমানদের চুড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হলো।

পবিত্রভূমি মূর্তিমুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বাগৃহের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে হাজারে আসওয়াদে চুমো খেলেন। তারপর কা'বাগৃহের চতুর্দিকে ও ভেতরে অবস্থিত ৩৬০টি মূর্তির সম্মুখে যেয়ে একে একে সবগুলো স্বীয় যষ্টি উত্তোলন করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত পাঠ করতে করতে ভেঙ্গে ফেললেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"এবং বলো, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, আর নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী" [সূরা ইসরা : ৮১]।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'টি প্রাচীন মূর্তি ছিল। এদের নাম ছিলো যথাক্রমে 'ইসাফ' ও 'নায়িলা'। কুরাইশরা বিশ্বাস করতো যে, ইসাফ ছিলো পুরুষ ও নায়িলা ছিলো নারী। একদা এরা হারাম শরীফের ভেতর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এদেরকে পাথরে পরিণত করেছেন। কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে কুরাইশরা দেবতা মনে করে উপাসনা করতো। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে সেদিন এ দু'টোকে ভেঙ্গে চুরমার করা হলো। কাবা শরীফসহ পুরো হারাম এলাকা মূর্তিমুক্ত হলো।

মক্কা শহরের আশপাশ এলাকায় লাত, উযজা, মানাত, সুওয়া ইত্যাদি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন।

বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠে আযান

যুহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে আযান দিলেন। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আত্তাব ও হারিস এই আযান ধ্বনিতে পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করলেন। তারা একেকজন একেকটি মন্তব্য করলেন। আত্তাব বললেন, আমার পিতার ভাগ্য ভালো তাই এই আযান ধ্বনি শ্রবণের পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন! হারিস বললেন, ইসলামের সত্যতা এখনও উপলব্ধি

করতে পরি নি- যদি পারতাম তবে এই ধ্বনি শিরোধার্য করে নিতাম। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান। তাই তার মন্তব্য ছিলো ভিন্ন। তিনি বললেন, আমি কিছু বলবো না। আমাদের নিকটতম কঙ্করগুলো যেয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট তা জানিয়ে দেবে!" তার এই উক্তি সঠিক ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা জানতে পেরেছিলেন, তবে কঙ্করের মাধ্যমে নয়- স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি ওসব নেতাদেরকে বললেন, তোমাদের সকল কথা আমার জানা হয়ে গেছে। এরপর তিনি হুবহু সকল মন্তব্যগুলো বলে দিলেন। এতদশ্রবণে হারিস ও আত্তাব কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তারা বললেন, আমাদের কথাগুলো কেউই শোনতে পায় নি- একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এই সংবাদ আপনাকে জানিয়েছেন। আপনি যে আল্লাহর প্রেরিত নবী তাতে আমাদের আর একবিন্দুও সন্দেহ নাই।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের ইসলাম গ্রহণ

উহুদ যুদ্ধে এই হিন্দই বদর যুদ্ধে নিহত তার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যেয়ে হযরত আমীর হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে কতল করিয়েছিলো এবং তাঁর লাশ কেটে কলিজা বের করে চিবিয়েছিলো। এই দুর্দান্ত নারীও পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা থেকে বঞ্চিত হলো না। সে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে নবীজীর দরবারে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পেরেছিলেন। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সকলকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তবে গুরুতর অপরাধী চারজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে তিনি ক্ষমা দেন নি। ক্ষমার অযোগ্য এরা হলো: ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, মিকইয়াস ইবনে সাবাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আবী সারাহ এবং মিকইয়াসের দু'জন গায়িকা। এদের মধ্যে ইকরিমা ইয়ামনে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইকরিমার পিতা আবু জাহল ইসলামের চরম দুশমন ছিলেন। লোকেরা স্বীয় পিতাকে প্রকাশ্যে গালি দিতে দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, "আমার সামনে যখন মানুষ পিতাকে গালি দেয় তখন আমার ভীষণ লজ্জা হয়"। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বললেন, “মৃত ব্যক্তিগণ তাদের কর্মফল ভোগ করছে- তাদের গালি দেওয়া ঠিক নয়। মৃতদের জীবনের মন্দ দিক ভুলে শুধু তাদের উত্তম দিক নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ”।

হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশীও পেয়ারে নবীজীর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হলেন না। ওয়াহশী ইসলাম কবুল করলেন। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলে দিলেন, “তুমি আর কখনও আমার সম্মুখে এসো না”। ওয়াহশী সাহাবা ছিলেন- কারণ তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। সাহাবা হওয়ার শর্ত তিনি পালন করেছেন। ওয়াহশী হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হন্তা হিসাবে বেঁচে থেকে ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করতেন। তিনি সে-ই বর্শা দিয়েই আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধের সময় নুবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর সেখানে মোট পনের দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সাহাবায়ে কিরামকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কা শরীফের আশপাশ অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন।

হুনায়নের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর যে ক’দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন এর মধ্যেই এই যুদ্ধ বাধে। আরাফাতের ময়দান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে ঘনখেজুর বৃক্ষবিশিষ্ট একটি উপত্যকার নাম হুনায়ন। এখানে হাওয়াযিন ও ছাকীফ নামক দু’টি গোত্র বসবাস করতো। সংখ্যাবহুল, যুদ্ধবাজ, শক্তিশালী এই গোত্রদ্বয় ইসলামের চরম দুশমন ছিলো। ইসলামের ছায়াতলে দলে দলে লোকজন যোগদান করছে দেখে এদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলো। সুতরাং তারা মক্কা শরীফে অবস্থানরত মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট ১২ হাজার মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেক নওমুসলিম ছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের অতর্কিত হামলায় তারা চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ২০০ সাহাবীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় থেকে তরবারি চালনা অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন: “হে লোকসকল! তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ!”

তুমুল যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে দু’আ করলেন। শীঘ্রই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাহায্য আসলো। তিনি ফিরিশতা পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়ে মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিত বিজয় দান করলেন। এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে কাফিরদের উপর ছুড়ে মারলেন। এতে তারা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কাফিররা সাথে নিয়ে আসা তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পদ ও গবাদি পশু পেছনে রেখে পলায়ন করলো। হুনায়নের যুদ্ধে যে স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে, এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিন, যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিলো সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি। বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ নিজ থেকে তাঁর রাসূল ও মু’মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক

সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নি এবং তিনি কাফিদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন। এটাই কাফিরদের কর্মফল” [তাওবাহ : ২৫-২৬]।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন হযরত হালীমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কন্যা শায়মা বিনতে হারিছও ছিলেন। প্রথমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতে পারেন নি। শায়মা বললেন, “আপনি আমার পিঠে একদা কামড় দিয়েছিলেন- এই দাগটি এখনও আছে।” একথা শ্রবণ করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এই মহিলাটিই তাঁর দুধবোন। তিনিতাঁকে সম্মানের সাথে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। শিশুকালের কথা স্মরণ হতেই তাঁর পবিত্র চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো। শায়মা ইসলাম কবুল করলেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় নিজের গোত্রের নিকট চলে গেলেন।

হওয়াযীন ও ছাকীফ গোত্রের একটি দল হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তায়েফ এসে অবস্থান নেয়। এই দলে তাদের নেতা মালিক ইবনে আওফও ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তায়েফ এসে হাজির হন। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শত্রুরা এক বছরের রসদপত্রসহ দুর্গের ভেতর অবস্থান নেয়। মুসলিম বাহিনী দুর্গের নিকটবর্তী হতেই শত্রুরা অজস্র তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো- এতে অনেকেই আহত হলেন এবং শাহাদাতবরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু দূরে সরে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবরোধ তুলে নিলেন। ছাকীফ গোত্রের জন্য তিনি হিদায়াত চেয়ে দু’আ করলেন। এই দু’আ আল্লাহর দরবারে দ্রুত কবুল হয়েছিল। তায়েফ অভিযানে মোট বারোজন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন।

যুদ্ধের পর কাফির বাহিনীর সর্দার মালিক ইবনে আওফসহ উভয় গোত্রেরপ্রায় সকলেই রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। হুনায়নের নিকট জি’রানায় তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে ইহরাম বেধে

মক্কা শরীফ প্রবেশ করে উমরা পালন করলেন। এরপর জি'রানায় ফিরে এসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

নবম হিজরি: তাবুক অভিযান

তাবুক মদীনা শরীফ থেকে সাত শত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। মদীনার মুনাফিকরা মসজিদে দিরার নামে পরিচিত একটি নামেমাত্র মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে বসে কুপরামর্শ করতো। এটা ছিলো তাদের চক্রান্তের আস্তানা। তারা রোমান সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ দিতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন সূত্রে জানতে পারলেন রোমান সম্রাট যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে মদীনা শরীফে বসে সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার চিন্তা বাদ দিয়ে বরং তাবুকের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীসহ যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ দুশমনদেরকে সীমান্তে প্রতিরোধ করাই হলো উত্তম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে ত্রিশ হাজার মুজাহিদের এক বিরাট কাফিলা প্রস্তুত হয়ে গেল। এই যুদ্ধের জন্য সর্বস্তরের মুসলমান সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। যুদ্ধ তহবিলে উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক অর্থকড়ি প্রদান করেন। হযরত আবু বকর তো সবকিছু দান করে দিয়েছিলেন। তাঁকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রশ্ন করলেন, "পরিবার-পরিজনের জন্য কী পরিমাণ রেখে এসেছো?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি"। মহিলা সাহাবীরা হাতের চুড়ি, ব্রেসলেট, পায়ের নুপুর, কানের দুল, গলার হার, আংটি এবং অন্যান্য মূল্যবান স্বর্ণালংকার দান করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের জান-মালের এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত বিসর্জনের ফলেই মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সত্যধর্ম পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের আত্মোৎসর্গ, পরহেজগারী, রাসূলের অনুসরণ ইত্যাদি আমল স্বয়ং আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল, তাই তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে তাঁদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন:

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যারা সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজী হয়েছেন, আর তারাও সকলে আল্লাহর প্রতি রাজী হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, এতে তারা হবে চিরস্থায়ী; এটাই হলো বিরাট সফলতা" [তাওবাহ : ১০০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরির রজব মাসে তাবুকের ময়দানে পৌঁছে ছাউনি স্থাপন করে মোট বিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। রোমানরা মুজাহিদদের দৃঢ় মনোবল ও যুদ্ধের প্রস্তুতি অবলোকন করে ভয় পেয়ে গেল। গাসসানী সৈন্যরা ময়দান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। তাবুকের ময়দানে ফজরের নামায পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত মুজাহিদদের সামনে এক আদর্শিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। সীরাত বিশ্বকোষ থেকে এই অপূর্ব সুন্দর ভাষণের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ পেশ করার পর বললেন, "হে জনগণ! সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব; সবচেয়ে মজবুত রজ্জু হলো তাকওয়ার বাক্য; সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিল্লাত হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাত; সবচেয়ে উত্তম সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত; সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বাক্য হলো আল্লাহর যিকির; সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা হলো আল-কুরআন; ... সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো মিথ্যা কথন; ... যে ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাকে মার্জনা করেন; যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে অধিক প্রতিদান দেন; ... হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন।"

কাফির মুশরিক রোমান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ এই শীতের সময় আর তাবুকথাকা সমীচিন মনে করলেন না। তাছাড়া অভিযানের সফলতা অর্জন হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে খবর এলো তাবুকের অদূরে দুমাতুল জান্দালের খৃস্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদিল মালিক কিন্দী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এটা জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি বাহিনী সেথায় প্রেরণ করেন। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে খালিদ তাদেরকে পরাজিত করে স্বয়ং উকাইদিরকে বন্দী করে নবীজীর খিদমাতে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুক্তি দেন।

তাবুকের যুদ্ধই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ যুদ্ধ যাতে তিনি স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট ২৭টি মতান্তরে ২৮টি যুদ্ধে স্বয়ং নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব যুদ্ধকে বলে গাযওয়া। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সাহাবার নেতৃত্বে মোট ৬০টি যুদ্ধ কিংবা অভিযান সংঘটিত হয়েছিল- এগুলোকে বলে সারিয়্যা।

মসজিদে দিরারে অগ্নিসংযোগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযান শেষে মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে যু-আওয়ান নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো। এতে মুনাফিকদের দিরার মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও চক্রান্ত তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত মালিক ইবনে দুখশুম ও মা'ন ইবনে আদী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দিলেন, ঐ মসজিদ জ্বালিয়ে ফেলো। তাঁরা তাঁর নির্দেশ মুতাবিক ঐ মসজিদে যেয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। মসজিদের অভ্যন্তরে যারা ছিলো তারা জীবন বাঁচিয়ে পালালো।

ইসলামের প্রথম হজ্জ

এই বছরই (নবম হিজরি) মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরজ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করেন। তিনি তিনশত লোকের এক কাফিলা নিয়ে হজ্জে গমন করেন।

এ বছর মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা নামাযে ইমামতি করেন। তাকে কুর্তা প্রদান করেন যা কাফন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জানাযা নামাযের পূর্বমুহূর্তে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা’আলা তো বলেছেন, ‘তাদের জন্য আপনি মাগফিরাত কামনা করেন বা না এবং আপনি যদি ৭০ বারও মাগফিরাত কামনা করেন তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না’”। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন জবাব দিলেন: “আমি যদি জানতাম তাদেরকে ক্ষমা করা হবে তাহলে অবশ্যই আমি ৭০ বারেরও বেশী তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম”। উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে মুনাফিক/কাফিরদের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করে দিলেন। তিনি ইরশাদ করেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

“আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও- বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে” [তাওবাহ : ৮৪]।

আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর মৃত্যুসংবাদ জানার পর সাহাবাদের নিয়ে তিনি ‘গায়িবানা জানাযা’ নামায আদায় করেন। হানাফী মাযহাব মুতাবিক এরূপ গায়িবানা নামায পড়া একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস ছিলো। মুসলমানদের জন্য এরূপ নামায পড়া জায়িয নয়। এ বছর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিআল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়।

দশম হিজরি

নবম হিজরির শেষ ও দশম হিজরির প্রথম দিকে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে অসংখ্য মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে হাজির হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ১০ হাজার সৈন্যসহ মক্কা বিজয় এবং কুরাইশ সরদারদের ইসলাম গ্রহণ সমগ্র আরবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে মদীনা মুনুওয়ারায়। সুতরাং বিদায় হজ্জ বাদে এ বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এসব প্রতিনিধিদলের ব্যাপক আগমন ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ।

বিদায় হজ্জ

দশম হিজরির জিলহাজ্জ মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জ পালন করেন। এই ঐতিহাসিক হজ্জে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন লক্ষাধিক সাহাবী। মদীনা শরীফ থেকে এই বিরাট কাফিলা ২৫ যিলকদ বাদ যুহর যাত্রা শুরু করে। যুল হুলাইফায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধেন ও উচ্চস্বরে তালবিয়া (লাব্বায়িক) পাঠ করা শুরু করেন। লক্ষাধিক হজ্জযাত্রী তাঁর সঙ্গে তালবিয়া পড়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেন। যি-তুওয়া নামক স্থানে এসে কাফিলা রাত্রি যাপন করে।

জিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ দিনের বেলা উচ্চভূমি হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে প্রবেশ করেন। বাইতুল্লাহ শরীফের উপর চোখ পড়তেই তিনি পাঠ করলেন:

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وتَكْرِيْمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً

"হে আল্লাহ! তোমার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা, তাজিম ও তাকরীম এবং ভীতিকর প্রভাব বৃদ্ধি করে দাও।" (তাবারানী)

আরো পাঠ করলেন:

اَللّٰهم اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"হে আল্লাহ! আপনি শন্তিময় শান্তিদাতা আর আপনার পক্ষ হতেই শান্তি আসে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শন্তিসহ বাঁচিয়ে রাখুন।" (বাইহাকী, সুনানে কুবরা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করে ৮ জিলহাজ্জ পর্যন্ত মক্কা শরীফ অবস্থান করেন। অধিকাংশ মতে তিনি ক্বিরান হজ্জ আদায় করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ৮ জিলহাজ্জ যুহরের পূর্বে সমগ্র মুসলিম কাফিলাকে নিয়ে তিনি মীনায় গমন করেন। সেখানে তিনি যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর এই পাঁচ রাকাআত নামায আদায় শেষে, ৯ জিলহাজ্জ ভোরে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তিনি আরাফাতের ময়দানে পৌঁছার পর তাঁর উটনী 'আল-কাসওয়ার' উপর আরোহণ করে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দান করেন। জুমু'আর দিন হওয়াতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামায আদায় করলেন, জুমু'আর নামায পড়লেন না। আরাফাতের প্রখ্যাত জাবালে রাহমাতের নিকট এসে তিনি উকুফ করলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি হাত উত্তোলনকরে আল্লাহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আয় কাটিয়ে দিলেন। দু'আ শেষে কুরআন শরীফের এই আয়াতটি নাযিল হলো:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
* فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ * فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম; অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহের প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল" [সূরা মাইদা : ৩]।

সূর্যাস্তের পর হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পেছনে বসিয়ে উটনীর উপর আরোহণ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন। ফজরের নামাযের পর পূর্বাকাশ ফর্সা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাশ'আরিল হারামের নিকট কিবলামুখী হয়ে বসে তিনি দু'আ, কান্নাকাটি ও যিকির-আযকারে কাটিয়ে দিলেন। এই সময়টিকে বলে 'উকুফে মুজদালিফা'। এরপর তিনি মুজদালিফা থেকে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বরাবরের মতো তালবিয়া পাঠ করতে করতে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। পুরো কাফিলা তাঁকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলো। ওয়াদিয়ে মুহাসসার নামক জায়গাটির মাঝামাঝি আসতেই তিনি তাঁর উটনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন। এই জায়গায়ই আবরাহার হস্তীবাহিনী আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। মুজদালিফা থেকে কুড়িয়ে আনা ৭টি কঙ্কর জামারাতুল আকাবায় স্থাপিত স্তম্ভে শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। এরপর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করলেন।

মীনার কুরবানীর স্থলে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩টি উট স্বহস্তে কুরবানী করেন। হিসাব করে দেখা গেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৬৩ বছর এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। অবশ্য উটের সংখ্যা ছিলো ১০০। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাকী উটগুলো কুরবানী করেন। কুরবানী শেষে ক্ষৌরকারকে মাথা মুণ্ডানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। মুণ্ডিত কেশ মুবারক নিকটস্থ

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বণ্টন করলেন। এরপর তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তাওয়াফে জিয়ারত (যাকে তাওয়াফে ইফাদাও বলে) শেষে তিন যমযম কুপের নিকট গমন করে পানি তুলে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। এরপর ঐদিনই মীনায় ফিরে আসেন ও পরের তিন রাত্রি অর্থাৎ ১৩ জিলহাজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন। উভয় দিন তিনি জামারাতে যেয়ে যথাক্রমে ছোট, মধ্যম ও বড়ো স্তম্ভে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর মক্কা শরীফ যাত্রা করেন, শেষ রাতে বিদায়ী তাওয়াফ করে লোকজনকে তৈরী হতে নির্দেশ দেন। এরপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই ছিলো অতি সংক্ষেপে বিদায় হজ্জের কার্যাবলীর বিবরণ।

পরম প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের প্রস্তুতি

বিদায় হজ্জের সময় যখন আরাফাতের ময়দানে সূরা মাইদার ৩ নং আয়াত নাযিল হলো তখনই বুঝা গিয়েছিল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতী দায়িত্ব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তিনি মানুষকে হিদায়াতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। ভাষণের সময় তিনি সবাইকে এ ব্যাপারে প্রশ্নও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করা হবে, সেদিন তোমরা তার কী জবাব দেবে?" সাহাবায়ে কিরাম সমস্বরে জবাব দিয়েছিলেন, "আমরা বলবো, আপনি আল্লাহর পয়গাম যথাযথ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।" তিনি তখন আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি উঁচিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করেন: "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো।"

তিনি বিদায় হজ্জের বিভিন্ন খুতবায় এ কথাটিও বার বার উচ্চারণ করেছেন: "তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। সম্ভবত এ বছরের পর আমার আর হজ্জ করার সুযোগ হবে না"। এরপর সূরা নাসর অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে প্রদান করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসল এবং তুমি দেখলে লোকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। অতএব তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের প্রশংসাগীতিসহ তাসবীহ পাঠ করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অবশ্যই তাওবা কবুলকারী" [সূরা নাসর : ১-৩]।

শেষ রোগ

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠ থেকে এমন কিছু বাক্য উচ্চারিত হতে লাগলো যে, এতে প্রকাশ্য ইঙ্গিত মিললো, তিনি এই মায়াবী পৃথিবী ছেড়ে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করবেন। এই শেষ সফরে যেতে তিনি যেনো দিন দিন ব্যকুল হয়ে উঠছিলেন। পরম প্রিয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষায় তিনি উন্মুখ। তিনি উহুদের শহীদদের কবর জিয়ারত করলেন। এরপর একদিন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবাদেরকে বললেন, "আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। এরপর তোমাদের সঙ্গে আমার হাওযে কাওছারে দেখা হবে।" এসব কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তারা জানতেন, তাঁদের মহান সাথী পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বেশিদিন তাঁদের মধ্যে থাকবেন না।

সফর মাসের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি রাতের বেলা জান্নাতুল বাকীতে যেয়ে কবর জিয়ারত করেন। ফিরে এসেই অসুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থানের জন্য তিনি সকল স্ত্রীদের নিকট থেকে অনুমতি নিলেন।

জীবনের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়িদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এই বাহিনী যাত্রা করে জুরুফ নামক স্থানে পৌঁছলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়ার তীব্রতা বাড়তে লাগলো। এমতাবস্থায় অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হলো। অবশ্য আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফত লাভ করেই এই অভিযান সম্পন্ন করেছিলেন।

সর্বশেষ ইমামতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ বেড়ে গেল। ইইন্তিকালের চারদিন পূর্বে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ ইমামতি করেন যুহরের নামাযে। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার ৮ রবিউল আওয়াল ১১ হিজরি। নামায শেষে তিনি জীবনের শেষ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি হামদ ও ছানা পাঠ শেষে প্রথমেই উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে মাগফিরাত কামনা করলেন। এরপর নিজের কবরকে উপাসনার বস্তু বানাতে নিষেধ দিলেন; কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে তা পরিশোধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন; মুহাজিরদেরকে বললেন, তোমরা আনসারদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে; এরপর বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের সবকিছু প্রদান করতে ইচ্ছা করলেন, সে আখিরাতকেই পছন্দ করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষোক্ত কথাটির মর্মার্থ হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠলো। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! সবর করো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু নসিহত করে ফিরে গেলেন।

অসুস্থতার সময় একদা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীর নিকট তাশরিফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁকে কানে কানে কি যেনো বললেন, এতে তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার কানে কানে কিছু বলার

পর তিনি খুশী হলেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, প্রথমবার আমার পিতা আমাকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন এতে আমি কেঁদে ফেলি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বললেন, আমার পরে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে মিলিত হবে, এতে আমার মনে আনন্দ অনুভব করলাম।

আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমাম নিযুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েত মুতাবিক হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার বর্ণনামতে ইশার নামাযের সময় লোকজন মসজিদে অপেক্ষারত ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার চেষ্টা করছিলেন নামাযে যোগ দিতে কিন্তু তিনি পারলেন না। শেষে বললেন, আবু বকরকে বলো নামাযে ইমামতি করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ১৭ বা ২১ ওয়াক্ত মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়তে পারেন নি।

ওফাতের দিন এসে হাজির হলো

১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার। তেষট্টি বছর পূর্বে এই একই তারিখে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ পয়গম্বর, জগতসমূহের জন্য রাহমাত পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মায়াবী ধরার কোলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছিলেন। আজ তিনি সেই মহান দায়িত্ব পালন শেষে মা'বুদের ডাকে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিভোর করে তুললো। তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবাদের সঙ্গে আজ ক'দিন যাবৎ মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে পারছিলেন না রোগের প্রাবল্যতা হেতু। সুবহে সাদিকের সময় হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরার পর্দা তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁরই ইঙ্গিতে। তিনি শেষবারের মতো তাঁর সাহাবাদেরকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চান। নবীজীর মুবারক দীপ্তিমান চেহারা ভোরের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে যেনো শতগুণ বেশী নূরানী

রূপ ধারণ করলো। তিনি সাহাবাদেরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতরা নামায আদায় করে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন, তিনি বুঝি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এক্ষুণি নামাযের ইমামতির জন্য মসজিদে তাশরীফ আনবেন। সবাই তাঁর আগমনের জন্য সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারায় আবু বকরকে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় তখন ফুটে ওঠেছে অপূর্ব স্নিগ্ধ হাসির রেখা। তিনি হুজরায় ফিরে গেলেন।

ইন্তিকালের পূর্বে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কোলে তাঁর পবিত্র মাথা মুবারক ছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ঐ দীনারগুলো কি করেছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো টাকাকড়ি ছিলো না, তিনি সবকিছু ইতোমধ্যে গুছিয়ে ফেলেছিলেন। তবে সাতটি দীনার তার নিকট অবশিষ্ট ছিলো। তিনি আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে নির্দেশ দিলেন এই টাকাগুলো সদকা করেদিতে।

সর্বশেষ আ'মল মিসওয়াক ব্যবহার

মিসওয়াক করা ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন দেখে অনেকেই যারতার কাজে চলে গেলেন। কিন্তু আসলে এ ছিলো বিদায় মুহূর্তের সংকেত মাত্র। অচিরেই তাঁর অন্তিম সময় এসে হাজির হয়ে গেল। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। এমন সময় আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আসলেন। তাঁর হস্তে একটি কাঁচা মিসওয়াক ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তিনি এটা চাচ্ছেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটা আপনাকে দেবো? তিনি হ্যাঁ-সূচক ইশারা করলেন। আমি এটা হাতে নিয়ে চিবিয়ে নরম করলাম, এরপর তাঁকে দিলাম। তিনি খুব উত্তমভাবে মিসওয়াক করলেন। ইতোপূর্বে কখনো আমি তাঁকে এতো ভালোভাবে মিসওয়াক করতে দেখি নি। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা

পরবর্তীতে অত্যন্ত গর্ব করে বলতেন, আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালার সঙ্গে আমার লালা একত্র হয়েছে, তিনি আমার বুকে মাথা মুবারক রেখে, আমারই হুজরায় ইন্তিকাল করেছেন।

শেষ নসিহত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নসিহত ছিলো: নামায ও তোমাদের দাসদাসীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বলেছিলেন, নামায এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

ইন্তিকাল

বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসলো। তিনি এই মায়াবী ধরাধাম থেকে চলে যেতে একরকম ব্যকুল হয়ে ওঠলেন। আল্লাহর সান্নিধ্য সন্নিকটে ভেবে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। অপরদিকে মৃত্যুর পেরেশানী তো ছিলোই। পাশে রাখা পানির পাত্রে হাত মুবারক ডুবিয়ে সিক্ত করে চেহারা মুবারকে বার বার দিচ্ছিলেন আর পাঠ করছিলেন:

لَا إِلَهَ إِلا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ

"আল্লাহ ব্যতীত কোনও মা'বুদ নাই। মৃত্যুতে রয়েছে পেরেশানী ও যন্ত্রণা"। (তাবারানী)

কোন কোন সময় বলছিলেন:

"হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কষ্টের সময় সাহায্য করুন"।

হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একবার বললেন, "হায় আল্লাহ! আমার পিতার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আজকের এই দিন পর তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট হবে না"।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক প্রস্থানের সময় একেবারে নিকটবর্তী হয়ে আসলো। তিনি বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلٰى

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং আমাকে সম্মানিত বন্ধুর সাথে মিলিত করুন" এবং

اَللّٰهُمَّ اَلرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

"হে আল্লাহ! সম্মানিত বন্ধুর নিকট আমি যেতে চাই"।

তাঁর পবিত্র রূহ মুবারক আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীঊন। তিনি ১১ হিজরির ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার দিন, দুপুরে গোটা মদীনা শরীফ তথা পুরো মহাবিশ্বকে কাঁদিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর আগমনের দিনটি ছিলো পৃথিবীর জন্য মহানন্দের আর যাওয়ার দিনটি হলো মহাশোকের। আমরা তাঁর পবিত্র প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তিনি চলে গেলেও মানুষের জন্য রেখে গেছেন হিদাআতের দু'টি মহাসত্যের উৎস: আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীম ও তাঁর পবিত্র জীবনের কর্ম, বাণী ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মের সমর্থনসম্মৃদ্ধ পবিত্র হাদীস শরীফ।

হে মহান আরশের অধিপতি! তোমার পেয়ারে হাবীবের শাফায়াত লাভে এই অধম বান্দাকে ধন্য করো। এই লেখাটুকুতে অবশ্যই অনেক ভুল-ত্রুটি করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পেয়ারে হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো রোজ কিয়ামতে আমাকে মায়ার দৃষ্টিতে দেখেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ওয়াসিলায়। আপনি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজন এবং পাঠকদের ক্ষমা করুন এবং এ লেখা থেকে উপকৃত করুন। আমীন।

আমি যদি মুখগহ্বর হাজার বার মিশক ও গোলাপজলে ধৌত করি, তোমার পবিত্র নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার যোগ্যতা লাভে ঐ মুখটি ব্যর্থ হবে।

দু’ জাহানের সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারিক জিনিসপত্র

রাহমাতুল্লিল আলামীন, সয়্যিদিল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, উভয় জগতের সরদার, পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নশ্বর এ ধরার বুকে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। জীবনচলার জন্য একান্ত জরুরী রসদপত্র ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তাঁর গৃহে থাকতো না। সকল যুগের সকল ওলিদের পথপ্রদর্শক, শরীয়ত ও মা’রিফাতের মধ্যমণি, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ ‘ইনসানে কামিল’ মহামানব- যদি চাইতেন, তাহলে বাদশাহদের বাদশাহর মতো জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চান নি। অবিনশ্বর মহাজগতের অফুরন্ত নিয়ামত এবং খাস করে রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও দীদারের সামনে দুনিয়াবী যাবতীয় ভোগ-বিলাস মহাসাগরের মাঝে মাত্র একফোটা পানির চেয়েও তুচ্ছ। হযরতের ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও গৃহের আসবাব নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তালিকাভুক্ত করেছি। পাঠক এ থেকেই আন্দাজ করে নিতে পারবেন দুনিয়ার প্রতি তাঁর চরম অনাকর্ষণের মাত্রা।

তাঁর পানপাত্র

তিনি মোট তিনটি পানপাত্র ব্যবহার করতেন: ১. রাইয়্যান। ২. মুদাব্বাব: ধাতুর তৈরী এই পাত্রে ছিলো রৌপ্যের নির্মিত একটি চেইন ও হাতল। এটা তিনি সফরকালে ব্যবহার করতেন। ৩. কাচের তৈরী কাপ।

পানি পানের জন্য ছিলো একটি ক্বাদ- এটা ছিলো কাঠের তৈরী। অযুর বদনা হিসাবেও এটা ব্যবহার করতেন। খেজুর বৃক্ষের তৈরী একটি পাত্র ছিলো যা তিনি রাতে প্রস্রাবের জন্য ব্যবহার করতেন।

চামড়ার তৈরী পানির পাত্র ছিলো মোট ৫টি: ১. ক্বিরবা: অযু ও পানের জন্য ব্যবহার করতেন। ২. আদওয়া: চামড়ার ছোট্ট পাত্র। ৩. মিযাদা: চামড়ার তৈরী

পানির পাত্র। ৪. শান্না: পুরাতন চামড়ার পানির পাত্র। গরমের সময় এ পাত্রে পানি রাখলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা ঠাণ্ডা থাকতো। ৫. সিক্বা: চামড়ার পানির পাত্র।

ছুরি

তিনি তিনখানা ছুরি ব্যবহার করতেন: ১. সিক্বিন, ২. মুদিয়া ও ৩. শাফরা: এটা ছিলো অনেকটা চওড়া ছুরি।

মুবারক যষ্টি

তাঁর মোট তিনটি যষ্টি (গল্লা) ছিলো: ১. মিহজান: এর অপর নাম ছিলো 'দাক্বন' (বা দাফন)। এটা ছিলো ১ গজ লম্বা (৩ ফুট)। চলতে ও আরোহী অবস্থায় এটা তাঁর হাত মুবারকে থাকতো। ২. ক্বাদিব: এই গল্লার নাম ছিলো, 'মামশুক'। কাঠের তৈরী এই যষ্টি পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীন ব্যবহার করেছেন বরকতের জন্য। ৩. মিকশারা: এই গল্লার নাম ছিলো 'আরজুন'।

বিছানাপত্র

১. ফিরাশ (বিছানা): এ বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরী। এর ভেতর খেজুর বৃক্ষের ছাল ছিলো। ২. উইসাদা (বালিশ): চামড়ার তৈরী এই বালিশের ভেতরও খেজুর গাছের ছাল ছিলো। ৩. মিরফাদা মিন আদাম: এটাও একটি চামড়ার তৈরী বালিশ।

কাঠের খাট

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা কাঠের তৈরী খাট ছিলো। তিনি প্রায়ই এতে বিশ্রাম নিতেন। এরূপ কাঠের তৈরী খাটে করে মাইয়্যিতকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্য কুরাইশদের মধ্যে ছিলো। এই কৃষ্টিটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এই খাট দিয়ে হুজরা শরীফে সমাহিত উভয় খলিফা- হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে শায়িত অনেক সাহাবায়ে কিরামের লাশও এই খাটে করে বহন করা হয়েছে।

পানীয়

তিনি পানি ছাড়াও বকরির দুধ খুব বেশী পছন্দ করতেন। মাঝে মধ্যে উটের দুগ্ধও পান করেছেন। দুধের তৈরী অন্যান্য জিনিষও তিনি আহার করতেন। যেমন: জুবনা (পনির), আক্বিত (এটাও একজাতীয় পনির), সাম্ন (ঘি) এবং জুবদা (তাজা ঘি)। দুধে পানি মিশিয়েও পান করেছেন। অপর আরেক ধরনের পানীয় যা খেজুরের রস থেকে তৈরী হয়, তিনি পান করতে ভালোবাসতেন। এটার নাম হলো 'নাবিদ্ব তামর'। আরেক ধরনের পানীয় ছিলো যার নাম 'নাবিদ্ব জাবিব'। এটা কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে তৈরী হতো। এছাড়া 'নাবিদ্ব শা'ইর' নামক আরেক ধরনের পানীয় ছিলো- যা তিনি পান করতে পছন্দ করতেন। এটা তৈরী হয় পানির মধ্যে যব ভিজিয়ে।

মধু

মধু মানুষের জন্য উপকারী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু খেতে ভালোবাসতেন। তিনি খাঁটি মধু খেতেন এবং পানি কিংবা দুধ মিশ্রিত মধুও পান করেছেন।

খেজুর

তিনি খেজুর খেতে ভালোবাসতেন। খেজুর পাকা হওয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন: বুসর (কাঁচা), রুতাব (তাজা), তামর (শুকনো) এবং তামর আতিক্ব (পুরাতন খেজুর)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের খেজুর খেয়েছেন। তবে রুতাব (তাজা) খেজুর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে খেতে ভালোবাসতেন, যেমন: ১. রুতাবের সাথে শশা, ২. রুতাবের সাথে তাজা ঘি, ৩. রুতাবের সাথে পনির ও ৪. রুতাবের সাথে তরমুজ।

নূরোজ্জ্বল মুবারক চেহারা

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখনই পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতেন তখনই নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

امين بالمصطفٰى بالخير يدعو
كضوء البدر زايله الظلام

তিনি 'বিশ্বস্ত' ঐশীসূত্রে নির্বাচিত জন, তিনি আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করেন/ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো- যা দৃশ্য হয় অমাবস্যা রাতের পর।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায়ই কবি জুহায়ির ইবনে আবি সালমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

لو كنت من شيء سوى البشر
كنت المضيء ليلة البدر

আপনি যদি মানব না হয়ে অন্য কিছু হতেন, তাহলে আকাশের চাঁদের মতো হতেন, আপনার নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো সমস্ত জগৎ।

হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা অত্যন্ত আবেগভরে বলেন:

لنا شمس وللأفاق شمس
شمسي تطلع بعد العشاء

আমার নিজস্ব জগতের একটি সূর্য আছে
আমার সে সূর্য উদয় হয় ইশার পরে।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক ছিলো লালচে-উজ্জ্বল-সাদা। তাঁর মুবারক চোখ দু'টোর রং ছিলো গাঢ় কালো। কালো চুল মুবারক অধিকাংশ সময় কানের লতি মুবারক পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। বুক মুবারকে একটি পাতলা লোমের রেখা ছিলো।

তিনি খুব লম্বা কিংবা বেঁটেও ছিলেন না। যখন তিনি হাঁটতেন, মনে হতো কোন টিলা থেকে নীচের দিকে নামছেন। সৈন্যদের মতো উভয় পদ মুবারক দ্রুত ওঠাতেন এবং ধীরে ধীরে মাটিতে নামাতেন। আমার শায়খ কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি এভাবে হাঁটতেন আর বলতেন, এরূপ হাঁটা হলো সুন্নাত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ঘর্মে ছিলো মিশক-আম্বরের সুঘ্রাণ। যখন তা নির্গত হতো, মনে হতো মোতি ঝরে পড়ছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাঢ় কালো দীর্ঘ মুবারক দাড়ি ছিলো। বুক মুবারক পর্যন্ত দাড়িতে আবৃত হয়ে যেতো।

মু'জিযাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবী-রাসূলদের কর্তৃক প্রকাশিত মু'জিযা সত্য। অপরদিকে আউলিয়াদের মাধ্যমেও মাঝে-মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। একে বলে 'কারামত'। এটাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর আক্বীদানুযায়ী সত্য। উভয়টি কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন, মু'জিযা তারই প্রমাণ হিসাবে তাঁদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: ১. খন্দক খননের সময় পাথর চুরমার করে দেওয়া। ২. কাবা ঘরে সংরক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি মক্কা বিজয়ের দিন লাঠির ইশারায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া। ৩. পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-তরু-লতা ও পাথরখণ্ড থেকে নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান। ৪. হিজরতের দিন ভোরে একমুষ্ঠি বালু নিক্ষেপ করে কাফিরদের চোখ অন্ধ করে দেওয়া ও তাদের অজান্তে গৃহ থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া। ৫. গারে সূরে অবস্থানকালে মাকড়শার জাল বোনা ও কবুতরের ডিম পাড়া। ৬. বৃক্ষরাজি চলন্ত হওয়া। ৭. কাষ্ঠখণ্ড উত্তম তলোয়ারে রূপান্তর। ৮. জীব-জন্তুর অভিযোগ ও তাদের পক্ষ থেকে সম্মানের সিজদা দেওয়া। ৯. পবিত্র হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে

পানির ফোয়ারা নির্গত হওয়া। ১০. ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক বিষমিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করা। ১১. বৃষ্টির জন্য দু'আ ও বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

অধিকাংশ গবেষকের মতে তাঁর মু'জিযার সংখ্য হাজারেরও অধিক। নিম্নে আমরা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাঠকদের অন্তরের খোরাক হিসাবে লিপিবদ্ধ করলাম। আল-মিরাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃহৎ একটি মু'জিযা। ইতোমধ্যে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে পুনরুল্লেখ করছি না।

১. সর্ববৃহৎ মু'জিযা কুরআনুল করীম

এটা এমন এক ঐশি কিতাব যার তুলনা জগতসৃষ্টির পর থেকে কখনো হয় নি- কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর হতে চললো। অবতীর্ণ হতে শুরু হয় এই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান কিতাব মক্কা মুকাররমার জাবালে নূরের চূড়ার সেই 'হিরা' গুহায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন মানুষের জন্য হিদায়াতের চিরসত্য বাণী স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম। এরপর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়তী জিন্দেগীতে নাযিল হয় বিভিন্ন সময় পুরো কুরআনে করীম। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য লিখিত কিতাব হিসাবে প্রকাশ করেন। তবে কুরআন শরীফ সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমারই।" (হিজর : ৯)

কুরআন শরীফ যে মানুষের পক্ষে রচনা অসম্ভব তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করে বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস, তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (বাক্বারাহ : ২৩)

এই চ্যালেঞ্জ আরব-অনারব তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি। কিয়ামত পর্যন্ত এটা বহাল থাকবে। সে যুগের আরবের খ্যাতিমান বাগ্মি, বাকপটু, কবি-সাহিত্যিকরা পারেন নি এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে। সুতরাং এ যুগে কিংবা পরবর্তী যে কোনো যুগেও যে কেউ তা পারবে না তা নিশ্চিত। আরব ভাষা-পণ্ডিতগণ যেখানে ব্যর্থ সেখানে অনারবদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এরপরও এই চ্যালেঞ্জ সবার প্রতি জারী আছে।

কুরআন শরীফের মু'জিযাত ভাব যা তত্ত্ব জগতের সাথে সম্পর্কিত। অলৌকিক এই ভাবের দু'টি দিক আছে: ১. ভাষালঙ্কার ও ২. ভবিষ্যদ্বাণী। ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য এতোই উন্নতমানের যে, এরূপ কোনো কিতাব পৃথিবীতে কখনো রচিত হয় নি। বার বার পাঠ করলে এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যান্য কিতাব একবার পাঠ করে নিলে আর দ্বিতীয়বার পাঠ করার ইচ্ছেই হয় না। এছাড়া কুরআন শরীফ সহজ করে দেওয়া হয়েছে হিফজ করার জন্য। একজন হাফিজ হতে বড়জোর তিন বছর সময় লাগে। তবে কেউ কেউ মাত্র এক মাসের মধ্যেও কুরআন শরীফ হিফজ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। সুবহানাল্লাহ! এ সবই কুরআন শরীফের মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। অনেকে বলেছেন, পবিত্র কিতাবুল্লায় অন্তত ৭ হাজার মু'জিযা আছে। তবে এই ভাষালঙ্কার, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুরূপ বাক্য-রচনার চ্যালেঞ্জ এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ হলো অধিকাংশের মতে কুরআন শরীফের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মু'জিযা।

দ্বিতীয়ত, কুরআন শরীফে যেমন অতীতের অনেক ঘটনাবলী, জনপদ ধ্বংসের ইতিহাস ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যার

অনেকগুলো ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। এ সবগুলোই একেকটি মু'জিযা। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি।

(ক) নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ: হুদাইবিয়ার সন্ধির পরই সূরা 'ফাতাহ' এর প্রথম আয়াতেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

(খ) পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী: ইরশাদ হয়েছে,

وَأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

"এছাড়া অন্য আরেকটি বিজয় রয়েছে, যা তোমাদের আয়ত্তে আসে নি। আল্লাহ একে (নিজ ক্ষমতাবলে) পরিবেষ্টন করে আছেন।"

জমহুর মুফাসসিরীনে কিরাম বলেছেন, উক্ত আয়াতে করীমে আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও সিরিয়া (রোমানদের বিরুদ্ধে) বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে।

(গ) কিছু মুসলমান মুরতাদ হওয়ার পূর্বাভাস: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ * ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ * وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত

হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।” (মাইদাহ : ৫৮)

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়-গ্রহণের পর আরবের কোনো কোনো গোত্রের বেশ কিছু লোক ধর্মত্যাগ করে। এরা মুরতাদ হয়ে যায়। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে। বিরাট একদল লোক মিথ্যা নবী-দাবীদার মুসাইলামা বিল কাজ্জাবের অনুসারী হলো। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ‘ইয়ামামার যুদ্ধে (৬৩৩ খ্রি.)’ জঙ্গে উহুদের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা মহাবীর হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) ঐ একই বর্ম দ্বারা মুসাইলামাকে হত্যা করেন।

(ঘ) পারস্য ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী: পবিত্র কুরআনের সূরা রূমে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ * لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ * وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

“আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায়। তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্তর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মু’মিনগণ আনন্দিত হবে।” (রূম: ১-৪)

এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধের ফলাফল রোমানদের পক্ষে যায়। উক্ত দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ পাক এই ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণার ৯ বছরের মধ্যেই পারস্য সৈন্যরা রোমান সৈন্যদের হাতে পরাজয়বরণ করে। উল্লেখ্য যেদিন রোমানদের বিজয় হয় ঠিক সেদিন মুসলমানরা বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে রোমানদের বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে দেন। এতে মুসলমানরা দু’টি বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। ইতোপূর্বে

পারস্য মুশরিকরা রোমানদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে। তারা বলাবলি করছিলো, 'একদল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে মুশরিকরা বিজয়ী হয়েছে!'। এ খবরে মুসলমানরা মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়েন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, পারস্যের এই বিজয় সাময়িক। কিছুদিন পর তারা রোমানদের হাতে পরাজিত হবে এবং সর্বোপরি মুসলমানরা অবশেষে উভয় দলকে পরাজিত করবেন। আর তা-ই হয়েছিল।

২. মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী

(ক) সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি দ্বীন সুরাইয়া (সিরিয়াস) নক্ষত্রের গায়ে ঝুলন্ত থাকে, তথাপি পারস্যের কিছু লোক এই দ্বীনকে পেয়ে যাবে।"

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে একদল এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলভী প্রণীত, মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), অনুবাদ: মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা ১৯৯৫ ঈ।]

(খ) মুসতাদারায়ে হাকিমে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিকট ভবিষ্যতে এমন হবে যে, লোকজন জ্ঞানের সন্ধানে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করবে। কিন্তু মদীনার আলিম অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী আলিম তারা পাবে না।"

হযরত সুফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মদীনার আলিম দ্বারা ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে ইশারা করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(গ) ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কুরাইশ বংশে একজন বড় আলিমের জন্ম হবে। তিনি পৃথিবীকে জ্ঞানের ভাণ্ডার দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন।” রিওয়ায়েতটি বাইহাকী শরীফে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে ইমাম শাফিঈ অপেক্ষা বড় কোনো কুরাইশ বংশীয় আলিম জন্মগ্রহণ করেন নি।

৩. মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বিরাট অগ্নিকুণ্ড

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ৬০০ বছর পর পূর্ণ হয়েছিল। এই বাণীটি সহীহাইন শরীফাইনে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের পূর্বে হিজায অঞ্চলে এমন তীব্র অগ্নি নির্গত হবে যে, এর আলোকে সিরিয়া থেকে বসরা নগরীর উটগুলোর গর্দান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে।”

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। ৬৪৫ হিজরি সনের ৩ জুমাদাল উখরা রোজ শুক্রবার ইশার পর মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে হঠাৎ মাটির গর্ভ থেকে এক প্রকাণ্ড অগ্নি নির্গত হতে থাকে। বিরাট এলাকা জুড়ে অগ্নিশিখা দেখাচ্ছিল। অনেকে বলেছেন, দূর থেকে মনে হতো, “এক বিরাট জ্বলন্ত শহর”। অগ্নির দৈর্ঘ্য ছিলো ১২ মাইল এবং প্রস্থ ৪ মাইল। অগ্নির শিখা ৯-১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ছিলো।

ঘটনার সময় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা কাসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত ছিলেন। তিনি এই অগ্নি সম্পর্কে আলাদা একখানা কিতাব রচনা করেন। তিনি বলেছেন, এই অগ্নি মোট ৫৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো।

৪. হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুকালীন অবস্থা

তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আ'রিফ জলিলুল কদর সাহাবী। তিনি জাগতিক সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। আমির-উমারাদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনকে ঘৃণা করতেন। শেষ জীবন লোকালয়হীন 'যুবদাহ' নামক এক স্থানে কাটান। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো। স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কাঁদতে লাগলেন। স্বামীর নিকট যেয়ে মন্তব্য করলেন, "হায়! আমরা এমন এক স্থানে অবস্থান করছি যেখানে ঝোপঝাড় ছাড়া কিছুই নাই! সাহায্যকারী একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না!" হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "হে আমার স্ত্রী! তুমি কেঁদো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে যে এমন এক জায়গায় মারা যাবে, যেখানে লোকজন থাকবে না। তার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল হঠাৎ পৌঁছে যাবে।" উম্মে যর! শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কেই বলেছিলেন। যাও বাইরে গিয়ে সেই আগন্তুক দলের অপেক্ষা করো।"

উম্মে যর রাদ্বিআল্লাহু আনহা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সত্যিই দেখা গেল একদল মুসাফির তাঁর বাড়ির দিকে আসছেন। তিনি তাঁদেরকে হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে সব অবগত করলেন। তাঁরা ছুটে গেলেন ভেতরবাড়ি। তখনও তিনি জীবিত। বললেন, ওহে আগন্তুক ভাইগণ! আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো সরকারী চাকুরী করেন না কিংবা আমির-উমারা নন তিনিই আমার কাফন পরাবেন, জানাযায় ইমামতি করবেন ও দাফন দেবেন। একথা শোনে একজন যুবক এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি আপনার কাফনের জন্য নিজের ইযারবন্দ এবং দু'টি কাপড় দান করবো। এগুলো আমার মায়ের হাতের কাটা সূতায় তৈরী।' হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা কবুল করলেন। এরপর

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অসিয়ত মতো তাঁকে গোসল, কাফন-দাফন করা হলো। (বাইহাকী শরীফ)

৫. পারস্য সম্রাট পারভেজের মৃত্যুসংবাদ প্রদান

ইমাম বাইহাকী এই ঘটনাটি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই। হিজরি ৬ষ্ঠ সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগের বিভিন্নসম্রাট ও শাসকবর্গের নিকট পত্রযোগে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাট পারভেজের নিকটও একখানা পত্র প্রেরিত হয় দূত মারফত। অহঙ্কারী বে-আদব পারস্য সম্রাট পত্রখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। বললো, ‘মুহাম্মদ’ নাম কেন আমার নামের পূর্বে লিখা হলো? রাগান্বিত হয়ে পারস্য সম্রাজ্যাধীন ইয়ামনের শাসনকর্তা ‘বাযান’কে নির্দেশ দিল, তুমি দু’জন চৌকস ও বিচক্ষণ লোক মদীনায় প্রেরণ করো। মুহাম্মদকে বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে এসো!

নির্দেশ পেয়ে বাযান দু’জন দক্ষ ও বিচক্ষণ লোক মদীনা শরীফ প্রেরণ করে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। বে-আদবীপূর্ণ কিছু কথা উচ্চারণ করে বললো, আপনি পারস্য সম্রাটের নিকট চলুন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তচিত্তে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, “তোমাদের সম্রাট পারভেজ তো গতরাতে স্বীয় পুত্র কর্তৃক নিহত হয়েছেন! আল্লাহ তা’আলা ওহির মাধ্যমে এ সংবাদ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা চলে যাও!” তারা বাযানের নিকট ফিরে যেয়ে সব কথা খুলে বললো। বাযান পারভেজের মৃত্যু সংবাদ তখনও জানতেন না। তিনি মন্তব্য করলেন, এই সংবাদ যদি সঠিক হয়- তাহলে তিনি সত্যিই আল্লাহর নবী। খুব শীঘ্র পারভেজের হন্তা শিরভিয়া একখানা চিঠির মাধ্যমে তাকে জানালো, “পারভেজ অত্যাচারী বিধায় আমি তাকে রাতে হত্যা করে ফেলেছি। আরব দেশে যে লোকটি নবুওয়াতের দাবী করছেন, আপনি তার সাথে কোনো সংঘাতে যাবেন না।”

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই সংবাদের সত্যতা যখন বাযানের নিকট প্রমাণিত হয়ে গেল তখন তিনি দু’জন পুত্রসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান।

৬. ফিরিশতাদের কর্তৃক নিরাপত্তা দান

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুদ্ধে ফিরিশতাদের কর্তৃক সাহায্য করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত আছে। এ সবই তাঁর মু'জিযা হিসাবে স্বীকৃত। তাঁকে ফিরিশতাদের দ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। এ সম্পর্কেও একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এরূপ একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

একবার পাপিষ্ঠ মুশরিক আবু জাহ্ল বললো, 'আমি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদকে মাটির উপর (নামায অবস্থায়) নাক ঘষতে দেখি তাহলে (নাউযুবিল্লাহ্) আমার পা দ্বারা তাঁর গর্দান পিষ্ট করে ফেলব!" ঘটনাক্রমে একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করাকালে পাপিষ্ঠ আবু জাহ্ল উপস্থিত হয়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে অগ্রসর হলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর উভয় হাতে সে অদৃশ্য কিছু প্রতিহত করতে করতে পেছনের দিকে সরতে লাগলো। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললো, 'আমি ও মুহাম্মদের মাঝখানে ভীতিপ্রদ জ্বলন্ত অগ্নির এক বিরাট গর্ত দেখতে পেলাম। কতিপয় ডানাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আবু জাহ্ল যদি আমার নিকটে আগমন করতো তাহলে ফিরিশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে যেতেন!"

৭. খাবারে অতিমাত্রায় বরকত

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তী জিন্দেগীতে 'খাবারে বরকতের' ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এরূপ মু'জিযার সবগুলো এখানে বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মাত্র বিশুদ্ধ বর্ণনা তুলে ধরছি।

(ক) পেয়ালার খাবারে বরকত: তিরমিযী ও দারিমী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কোনো একদিন

আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটি পেয়ালায় রাখা খাদ্য ভক্ষণ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর পর ১০ জন করে লোকসংখ্যা বাড়ছিলো। সকলেই ঐ একই পেয়ালা থেকে খাচ্ছিলেন। প্রথম ১০ জনের খাওয়া শেষ হওয়ার পর আরো ১০ জন এসে বসছিলেন। এভাবে পালাক্রমে আহার গ্রহণ চলছিলো। মানুষ হযরত জুন্দুব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, পেয়ালার মধ্যে খাদ্য কিভাবে আসছিলো? তিনি আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওখান থেকে আসছিলো।

(খ) দু'জনের খাবার একশত ত্রিশ জনে খেলেন: বাইহাকী ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সহীহ সদনে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশজন আনসার নিয়ে উপস্থিত হলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সবাই ঐ দু'জনের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার দ্বারা পেট পুরে খেলেন। আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার, খাবার তখনও সম্পূর্ণ শেষ হলো না- কিছুটা রয়ে গেল। এরপর আরো কিছু লোক এসে খাবার খেতে লাগলেন। মোট ১৩০ জন লোক দু'জনের জন্য পাক করা খাবার খেলেন। অনেকে মুসলমান হলেন ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন।"

(গ) আসহাবে সুফফার সকলকে নিয়ে আহার: মুসলিম ইবনে আবু শাইবা ও তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি রিওয়ায়েত তাঁদের স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে আসহাবে সুফফার সকল লোককে ডেকে আনতে আদেশ দিলেন। সবাইকে নিয়ে আসার পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মুখে একটি খাদ্যভর্তি পেয়ালা রাখলেন। সকলে এ থেকে তৃপ্তিসহ আহার করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পেয়ালার খাদ্য যেই-সেই রয়ে গেল। শুধু এটুকু লক্ষ্য করলাম, পেয়ালার খাদ্যে আঙ্গুলের অনেক দাগ আছে।" উল্লেখ্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম উল্লেখ করেছেন, আসহাবে সুফফায় একান্ত গরীব অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন

শতাধিক সাহাবায়ে কিরাম বাস করতেন। কারো কারো মতে তাঁদের সংখ্যা ৪ শতাধিক ছিলো।

(ঘ) আধা সের আটার রুটি খেলেন চল্লিশ ব্যক্তি: ইমাম আহমদ ও ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনা স্ব-স্ব হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তালিব গোত্রের চল্লিশ জনকে দাওয়াত করলেন। এদের কেউ কেউ খুব বেশী পেটুক ছিলেন। একাই একটা আস্ত বকরি খেয়ে নিতেন। এছাড়া একজনে আট সের পর্যন্ত দুগ্ধ পান করে ফেলতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পেটুকদের জন্য মাত্র আধা সের আটার রুটি তৈরী করালেন। অতিথিরা এটুকু রুটি খেয়ে শেষ করতে পারলেন না- বেশ কিছু রয়ে গেল! এরপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালায় বড়জোর ৪ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, দুধ আনলেন। এবারও তারা সকলে তৃপ্তিসহ দুধ পান করলেন- কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। মনে হচ্ছিল, কেউই দুধ পান করেন নি!" সুবহানাল্লাহ!

৮. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এই মু'জিযার বর্ণনা সর্বাধিক সহীহ হাদীসগ্রন্থ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। মূল বর্ণনাকারীদের মধ্যে আছেন হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামন রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। ঘটনাটির বর্ণনা নিম্নরূপ।

হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জমায় একদা আবু জাহ্ল, ওলিদ ইবনে মুগিরা, আস ইবনে ওয়ায়িল প্রমুখ মুশরিক একত্রিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে চ্যালেঞ্জ করলো, 'আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আকাশের চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান!' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি এরূপ করে দেখাতে পারি, তবে কি তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে?" তারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে যাবো'।

হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি চন্দ্রটির দিকে অঙ্গুলি মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন। আল্লাহর কী কুদরত! সত্যিই চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল! উপস্থিত সকলেই তা দেখলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজের চোখে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে দেখেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের নাম ধরে ধরে বললেন, "হে অমুক, হে তমুক! সাক্ষী থাকো, সাক্ষী থাকো ..."।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য সকলের চোখে পড়লো। উভয় খণ্ড এতো দূর পর্যন্ত চলে গেলো যে মাঝখানে হিরা পর্বত দেখাচ্ছিল। স্বচক্ষে এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা অবলোকন করার পরও পাপিষ্ঠ কাফিররা বলে ওঠলো, 'এ-তো প্রকাশ্য যাদু!' আবু জাহ্ল বললো, 'আমরা এ ব্যাপারে আরো খোঁজ-খবর নেবো। যদি এটা যাদু হয়ে থাকে, তাহলে শুধু আমাদের উপরই হতে পারে। অনুপস্থিত যারা এবং অন্যান্য শহরে বসবাসকারীদের উপর তো যাদুর ক্রিয়া বিস্তৃত হতে পারে না। তাই বাইর থেকে আগত লোকজনদের নিকট থেকে ব্যাপারটি জেনে নেওয়া উচিৎ।' আবু জাহলের এই চ্যালেঞ্জও বাতিল হলো। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে বলতে লাগলেন, তারাও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখেছেন।

এই অত্যাশ্চর্য মু'জিযা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেছেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা ক্বামার ১-২)

তারিখে ফিরিশতা, সাওয়ানিহুল হারামাইন ইত্যাদি ইতিহাসগ্রন্থে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ অবলোকন করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তারিখে ফিরিশতায় আছে, মালাবারের এক রাজা মুসলমানদের নিকট থেকে এই ঘটনা শ্রবণ করে যুগের পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থ খোঁজে দেখেছি, আরবের এক নবীর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবে। আপনি যে ঘটনার কথা বলছেন, সেটা সে-ই ঘটনা।' একথা শোনে রাজা মুসলমান হয়ে যান।

সাওয়ানিহুল হারামাইন কিতাবে আছে, মালোহ রাজ্যের চম্বল নদীর তীরে 'দিহার' নামক একটি শহর আছে। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ক্ষণে সেখানকার রাজা তাঁর প্রাসাদের ছাদে বসা ছিলেন। তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আকাশের চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এরপর আবার একত্রিত হলো। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি সম্পর্কে দেশের পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা বললেন, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আরব দেশে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ পাবে।' এটা জানার পর রাজা একজন দূত মক্কা মুয়াজ্জমায় হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে নিজে মুসলমানও হয়ে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাজার নাম রেখেছিলেন, আবদুল্লাহ। রাজা আবদুল্লাহর কবর এখন দিহার শহরের বাইরে অবস্থিত। (মো'জেযায়ে রাসূলে আকরাম (বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১২০-১২২)

৯. পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া

ইমাম বুখারী রিওয়ায়েত করেন, একদা এক পাহাড়ের উপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হঠাৎ পাহাড়ে কম্পন শুরু হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পা মুবারক দ্বারা সজোরে পাহাড়ের উপর আঘাত হেনে বললেন, "হে পাহাড়! কম্পন করো না, তুমি কি জানো না তোমার উপর অবস্থান করছেন একজন নবী, একজন সত্যবাদী ও দু'জন শহীদ?" আল্লাহর কুদরতে পাহাড়ের কম্পন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল।

এখানে দু'টি মু'জিযা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথমত পাহাড়ের কম্পন ও স্থির হওয়া এবং দ্বিতীয়ত হযরত উমর ও হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার শাহাদাতবরণের ভবিষ্যদ্বাণী।

১০. খর্জুর শাখার ক্রন্দন

এই মু'জিযাটির বর্ণনা সহীহ বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ আছে। ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মসজিদে নববীর মধ্যে তখনও কোনো মিহরাব নির্মিত হয় নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খর্জুর বৃক্ষের একটি শাখার মধ্যে হেলান দিয়ে জুমু'আর খুতবা প্রদান করতেন। এরপর তিনি একটি মিহরাব তৈরী করলেন। প্রথমদিন নবনির্মিত মিহরাবে আরোহণ করে খুতবা প্রদানের সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামসহ সকলে শুনতে পেলেন ঐ খর্জুর শাখাটি শিশুদের মতো করুণ সুরে ক্রন্দন করছে! পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাখাটির কাছে যেয়ে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে একে সান্ত্বনা দান করলেন। শাখার ক্রন্দন তখন থেমে গেল।

সুফিদের আদর্শপুরুষ

এই গ্রন্থে আমরা তাসাওউফ-শাস্ত্রপন্থী তথা সুফি-দরবেশ-অলিদের জীবনালোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও কর্মের উপর উপরে বর্ণিত আলোচনায় স্বভাবতই তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা জরুরী ছিলো। তিনি ছিলেন সমগ্র মানব ও জিন জাতির জন্য পথপ্রদর্শন এবং সর্দার। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার উপর তিনি আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত নন। তবে আমাদের গ্রন্থের মূল বিষয় তথা তাসাওউফ শাস্ত্রেরও উৎপত্তিস্থল তাঁরই পবিত্র জীবন থেকে উৎসারিত। এই শাস্ত্র যা কিছু শিক্ষা দেয়, তা সবই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আ'মল থেকে উদ্ভুত।

সুফিরা যেসব গুণাবলী অর্জনের জন্য জীবনভর সাধনা করে থাকেন তার সবই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর অন্যতম দিক ছিলো। তিনিই প্রথম পুরুষ যার মধ্যে একই সাথে ইখলাস, তাওবাহ, মুহাব্বাত, শাওক

(আগ্রহ), খাওফ (খোদাভীতি), রাজা (আল্লাহর রাহমাতের আশা), যুহদ (দুনিয়ার জাঁকজমক থেকে উদাসীন), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা), কিনাআত (অল্পেতুষ্টি), হিলম্ (সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্যতা), সবর (ধৈর্য), শুকুর (কৃতজ্ঞতা), সিদ্দক (দৃঢ়তা), রেজা (সন্তুষ্টি), ফানা (আল্লাহতে বিলীন), ফানাউল ফানা (আল্লাহতে বিলীনের মধ্যে বিলীন) ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল। এক কথায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 'ইনসানে কামীল' - পুর্ণাঙ্গ আদর্শ পুরুষ। সুতরাং একমাত্র তাঁর অনুসরণের মধ্যেই মানুষের ইহ-পরকালের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পবিত্র নৈকট্যে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত উসমান ইবনে আফফান, হযরত যায়িদ বিন হারিসা, হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আবু যর গিফারী, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আমর ইবনে আস, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন প্রমুখ মহাত্মনদের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহিলা সাহাবীরা তো ছিলেনই। বিশেষ করে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রাত্মা স্ত্রীরা যে কতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না নারী ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ভাগ্যবান এসব পুরুষ ও নারীরা সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদৃষ্টি, দু'আ, আধ্যাত্মিক উষ্ণতা, তাওয়াজ্জুহ ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা-বান্দী ও ওলি-ওলিয়্যাতে রূপান্তর হয়েছিলেন। আর এদের নৈকট্যে ও সুদৃষ্টিতে যারা উপকৃত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন তাবিঈগণ।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর চিশতিয়া সুফি তরীকার মূলে ছিলেন 'মদীনাতুল ইলমের সিংহদ্বার' হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি।

পরিচ্ছেদ ২

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

(২৩ হিজরিপূর্ব - ৪০ হিজরি, সমাধি: নাজাফ, ইরাক।)

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলিম উম্মার চতুর্থ খলীফা ছিলেন। অনেকের মতে মাত্র ৯ কিংবা ১০ বছর বয়সে তাঁর ইসলামগ্রহণ ছিলো পুরুষদের মধ্যে প্রথম। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আপনজন ছিলেন। শরীয়ত, তরীকত, হাক্বিকাত ও মা'রিফাতে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের চিশতিয়া তরীকার শাজারায় ফায়েজে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারিধারা তাঁরই মাধ্যমে পরবর্তী সুফিদের মধ্যে বিকাশ ঘটেছিল।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হিজরিপূর্ব ২৩ সাল মুতাবিক ৫৯৯ কিংবা ৬০০ ঈসায়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ২৯ কিংবা ৩০ বছর ছিলো। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিতার নাম ছিলো আবু তালিব। কুরাইশ (হাশিমী) বংশের প্রসিদ্ধ এই পুরুষ ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা। সুতরাং এ হিসাবে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন হযরতের চাচাতো ভাই। তাঁর মাতার নাম ছিলো ফাতিমা বিনতে আসআদ। তিনিও হাশিমী বংশের মহিলা ছিলেন।

ইসলামগ্রহণ

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সময় হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বয়স ৯ কিংবা ১০ হবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি

ইসলামধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি এক রাত্রে লক্ষ্য করলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা অজু করে নামায আদায় শেষে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন আছেন। এ দৃশ্য দেখে বালক আলীর মনে আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো। এমন সুন্দর, আত্মিক প্রশান্তপূর্ণ ক্ষণ তাঁর জীবনে ইতোমধ্যে কখনো তিনি উপলব্ধি করেন নি। এভাবে ইবাদাতের গুঢ় রসহ্য সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর কচি মন আন্দোলিত হয়ে উঠলো।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবকিছু জিজ্ঞেস করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সবকিছু বুঝিয়ে বলার পর বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান বালক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু আর কালবিলম্ব না করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলাম ধর্ম কবুল করে নিলেন। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা যে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম মুসলমান ছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আলী এবং হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, এই তিন জনই প্রথম মুসলমান হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি উত্তম সমাধান হলো, বয়স্ক পুরুষদের মধ্যেপ্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, দাসদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু (পরবর্তীতে তাঁকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত করে দেন) এবং বালকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান ছিলেন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

তুমি আমার ভাই, তুমি আমার উত্তরাধিকারী

হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বয়স মাত্র ১৫ বছর। নুবুওয়াত লাভের প্রাথমিক দিকে একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের একটি টিলায় দাঁড়িয়ে ৪০ ব্যক্তির সামনে কথা বললেন। এই দলে কুরাইশদের হাশিমী শাখার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আমীর হামযা, আব্বাস, আবু তালিব এবং

কিশোর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সম্মুখে দুজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ হাজির করেছি। বলো, তোমাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে এবং কে আমাকে সাহায্য করবে?"

কেউ কথা বলছিলো না। এরূপ নীরবতা দেখে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সহ্য হলো না, বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখানে সবার ছোট এবং এখনও দুর্বল। এরপরও আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আমি আপনার সাহায্যে অটল ও আস্থাশীল থাকবো"। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত খুশী হলেন। তবে তিনি চাচ্ছিলেন অন্যরা কি জবাব দেন তা জানতে। তাই আবার একই প্রশ্ন করলেন। এবারও সবাই নীরব। তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকলো। কিন্তু আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু পুনরায় দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারায় বসিয়ে দিলেন। সবার মধ্যে নীরবতা লক্ষ্য করে আবারো তিনি একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! একটা লোকও কিছু বললো না। আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু সহ্য করতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাহায্য করবো, আপনার প্রতি আস্থাশীল থাকবো"।

কিশোর আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এরূপ বক্তব্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হয়ে বললেন, "হে আলী! সত্যিই তুমি আমার ভাই, তুমি আমার উত্তরাধিকারী"।

হিজরতের পর মদীনার আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। মুহাজিরদের সকলেই নিজেদের আনসার ভাই পেয়ে গেলেন কিন্তু বাকী রইলেন একমাত্র আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কিছুটা ম্লান বদনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবাই তাদের ভাই পেয়ে গেলো- কিন্তু আমি তো পেলাম না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আদর করে তাঁকে

জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমার সাথে ইহ-পরকালে ভাইয়ের সম্পর্ক তো আমার আগে থেকেই রয়েছে। আজ হতে তুমি জেনে রাখো, আমি তোমার ভাই"। এ সংবাদে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অন্তরাত্মায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। অনন্তর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উত্তোলন করে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আলী আজ হতে আমার একান্ত আপন, আর আমিও তার একান্ত আপন। আমি তাঁকে ভালোবাসি।"

ইলমের সাগর

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু যে ইলমে দ্বীনের সাগর ছিলেন তার স্বীকৃতি এসেছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি বলেছেন:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

"আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী এর দরজা"। (তাবারানী, মুসতাদারাকে হাকিম, মা'রিফাতুস-সাহাবা- আবি নুয়াঈম)

হযরত আলীর বোধশক্তি, হাক্বিকাতের ব্যাখ্যা ইত্যাদি ছিলো অদ্বিতীয়। তিনি সুলেখকও ছিলেন। এছাড়া কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর আত্মত্যাগ ও কুরবানী ছিলো রীতিমতো বিস্ময়কর। হিজরতের প্রাক্কালে যে রাতে মক্কার কাফিরগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, সে রাতে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবীজীর বিছানায় শুয়ে থাকার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। কাফিররা তাঁকে যে হত্যা করতে পারে তা তিনি জানতেন, তথাপি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের নিরাপত্তার সম্মুখে নিজের জীবন তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেছিলেন। তাঁর এই কাজটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে ফিরিশতাদের নিকট গর্ব করেছিলেন।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি শের-ই-খোদা হিসাবে সুপরিচিত। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদর, উহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, খায়বার ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের সর্বাপেক্ষা

দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁরই হাতে বিজিত হয়েছিল। আমরা এই ঘটনাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

সুফিদের সর্দার হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

অধিকাংশ সুফি তরীকা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে হুজুরে পাক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলমে মা'রিফাতের সুধা আহরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, ধর্মের মূল হলো আল্লাহর পরিচিতি তথা মা'রিফাত লাভ করা। তিনি বলেন, "মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বাম হলো তাঁর (আল্লাহর) অস্তিত্বের প্রমাণ; অস্তিত্বের প্রমাণের উচ্চতর মাক্বাম হলো তাওহিদ; তাওহিদের উচ্চতর মাক্বাম হলো সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আধিপত্যের স্বীকৃতি। তিনি (আল্লাহ) সকল গুণাবলীর ঊর্ধ্বে। কোনো বিশেষ গুণ তাঁর সঠিক স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক নয়। তিনি কোনকিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত নন। কিন্তু সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অসীম, সীমাহীন, সময়ের ঊর্ধ্বে, স্থানের ঊর্ধ্বে, কল্পনার বাইরে। সময় তাঁর উপর ক্রিয়া করে না। যখন কোনকিছু ছিলো না তখন তিনি ছিলেন, তিনি অনন্তকাল অস্তিত্বশীল থাকবেন। জন্ম-মৃত্যুর আইন-কানুন তাঁর অস্তিত্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান অথচ কোনকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি কোন কিছুর কারণ নন, অথচ সবকিছুর কারণ তিনি। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টি করেন ধ্বংসও করেন। সবকিছু তাঁর নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। তিনি কোনকিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু নির্দেশ দেন (كُنْ- হও!) এবং তা হয়ে যায় (فَيَكُونُ)।"

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বাপেক্ষা নিষ্কলুষ জিনিস কি যা অর্জন সম্ভব? তিনি জবাব দিলেন, "এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক আলোকিত হৃদয়"।

মা'রিফাত কী? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "আল্লাহকে আল্লাহর মাধ্যমে জানা, যা আল্লাহর মাধ্যমে নয় তা আল্লাহর নূরে জানা।"

যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, "অবশ্যই! তাঁকে না জানলে আমি কিভাবে তাঁর উপাসনা করবো?"

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নামায

কথিত আছে তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কলা পাতার মতো তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হতো। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "একটি আমানত পূর্ণ করার সময় এসেছে। যে আমানতকে আকাশ-পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে নি- কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করেছে।" হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, "হযরত আলীর মতো এই পৃথিবীতে কেউ এমন উচ্চমানের নামায আদায় করতে পারে নি।"

নামাযের সময় তাঁর অবস্থা এমন হতো যে, তিনি প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতেন। একদা হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অজ্ঞান অবস্থায় নামাযের মুসাল্লায় পড়ে আছেন দেখে ভাবলেন, তিনি বুঝি এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তখন জানালেন যে, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রায়ই এভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক। হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তা শ্রবণ করে কাঁদতে শুরু করলেন এবং কিছু পানি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দিলেন। এতে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলো। তিনি আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর চোখে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ক্রন্দন করছো কেন? এই অবস্থায় আমাকে দেখে তোমার চোখে অশ্রু এসেছে। কিন্তু ভেবে দেখো, যেদিন ফিরিশতারা টেনেহেঁচড়ে আল্লাহর সম্মুখে নিয়ে যাবে এবং আমাকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন আমার কি অবস্থা হবে? তাঁরা আমাকে লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে নেবে আল্লাহর সম্মুখে এবং আমার বন্ধুদের যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে,

কিছুই করার শক্তি রাখবে না। তারা কোনো সাহায্যে আসবে না- একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহই সেদিন আমার কাজে আসতে পারে।”

ফানাফিল্লাহ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ফানাফিল্লাহর সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেছেন, “আল্লাহর অনন্ত মহাসাগরে মানুষ একটি ঢেউ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরাত্মা অজ্ঞতা ও জৈবিক ক্ষুধা দ্বারা অন্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে আলাদা সত্তা হিসাবে অনুভব করতে থাকবে। কিন্তু সে ও প্রভুর মধ্যকার হিযাব বা পর্দা যখন উঠে যাবে তখন সে সত্যিকার হাক্বিকাত সম্পর্কে অবহিত হবে। তখন সেই ঢেউ সাগরের সাথে মিশে যাবে”।

তিনি সর্বদাই বলতেন, মানুষকে প্রথমে নিজের পরিচয় অর্জন করতে হবে। আর নিজেকে না চিনে প্রভুকে জানার কোন উপায় নাই। সুতরাং এই জানার প্রথম স্তর হলো শরীয়তের অনুসরণ। শরীয়তের ভেতরই তাসাওউফ বিদ্যমান।

জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর উপর গুণিজনের মন্তব্য

হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার স্বামী ছিলেন। তবে তিনি কিভাবে নবী-দুলালীর স্বামী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন সে ঘটনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

কথিত আছে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর সামনে ঘোষণা দিলেন, “যে কেউ সবার আগে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করে আসতে পারবে, তারই নিকট আমার মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে দেবো।” সবাই দ্রুত কুরআন তিলাওয়াতে লেগে গেলেন। কিন্তু দেখা গেলো হযরত আলী কিছুক্ষণ পরই হযরতের নিকট এসে হাজির হয়ে গেছেন! আশ-পাশে তখনও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন সাহাবারা আশ্চর্যবোধ করলেন, সবাই হযরত আলীর

দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি, তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। আর তিলাওয়াতের মধ্যে সওয়াবই মূখ্য উদ্দেশ্য- সুতরাং আমি তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে চলে এসেছি!” একথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমিই আমার মেয়ের স্বামী হওয়ার যোগ্য।

তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব যে পাওয়া যায়, তা সহীহ ইবনে হিব্বানে শুদ্ধ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

দাওয়াতী কাজেও তাঁর জুটি ছিলো না। দশম হিজরি সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ইয়ামনে প্রেরণ করেন। এই অভিযানের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ইয়ামনবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা। হযরত খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হলেন। কেউই মুসলমান হলো না। শেষ পর্যন্ত রমযান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে এই মিশনে প্রেরণ করলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাঁর পবিত্র হাত মুবারক আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বুকের উপর রেখে দু'আ করলেন। তিনি ইয়ামনে পৌঁছে দাওয়াতী কাজ শুরু করতেই ইয়ামনবাসী অবিশ্বাস্যভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন “আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু উম্মত হলেন আবু বকর; আল্লাহর দ্বীনের উপর একনিষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন উমর; সর্বাপেক্ষা বিনয়ী হলেন উসমান; এবং আলী হলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম জ্ঞানের অধিকারী”।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হযরত আবু আবদুল্লাহ জাদালীকে একদা বললেন, “[কুফায়] আল্লাহর রাসূলকে কি কেউ অপমান করছে?” তিনি বিস্ময়ে জবাব দিলেন, “আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি!” উম্মুল

মু'মিনীন আবার বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে কেউ আলীকে অপমান করে, আমাকেই অপমান করে'।"

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তি হচ্ছেন আলী (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এবং উবাই ইবনে কাব (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) হলেন কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে সর্বাধিক দক্ষ।" হযরত আলী সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে 'খারিজী' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এই দলটিই ছিলো ইসলামের প্রথম চরমপন্থী বিদআতী। এরা বিশ্বাস করতো, সকল পাপীই কাফির এবং যারা তাদের এই আক্বীদায় বিশ্বাস রাখে না, তারাও কাফির। তাদের এই ভ্রান্ত আক্বীদার উপর ভিত্তি করে তারা মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাদের দলে যোগ দেওয়ার একটি শর্ত ছিলো, প্রথমে নিজেকে অমুসলিম ঘোষণা করে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে।

এই খারিজীরা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আমর ইবনে আ'স রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একই সঙ্গে হত্যার এক গুরুতর ষড়যন্ত্র করে। তারা তিনজন ঘাতককে এই দায়িত্ব অর্পণ করে। এরা ছিলো: আমর ইবনে বকর তামিমী, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিরিয়ার মসজিদে যেয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করা; দ্বিতীয় জনের নাম ছিলো, বকর ইবনে আবদুল্লাহ তামিমী। সে দায়িত্ব নেয় মিসরে যেয়ে হযরত আমর ইবনেআসকে হত্যা করার এবং তৃতীয় ঘাতকের নাম ছিলো আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম। সে দায়িত্ব নেয় কুফার মসজিদে যেয়ে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে হত্যা করতে।

তিন জনের মধ্যে একমাত্র মুলজাম সফলকাম হয়েছিল। সে তার শপথ অনুযায়ী ১৭ রমযান বদর দিবসে রোজ শুক্রবার ফজরের নামাযে মসজিদে অবস্থান নেয়। সে সারা রাতই মসজিদে থেকে হত্যার ফন্দি আঁটছিলো অন্যান্য খারিজীদের সঙ্গে। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মসজিদের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন সেখানে ইবনে মুলজাম ও তার এক সহযোগী আত্মগোপন করে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। এদিকে হযরত আলীর (রাদ্বিআল্লাহু আনহুর) সারারাত ঘুম হয় নি। একবার সামান্য চোখ লাগতেই তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি এই স্বপ্নের বর্ণনা স্বীয় পুত্র হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাবা হাসান, আমি তোমার নানাজানকে দেখলাম, তাঁকে সবিনয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উম্মত দ্বারা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। তিনি জবাব দিলেন, দু'আ করো আল্লাহ তা'আলা যেনো তোমাকে শীঘ্রই তাদের কবল থেকে মুক্ত করেন। তিনি বলেন, মহানবীর পরামর্শ অনুযায়ী আমি ঠিক এই দু'আ করলাম।

হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু সে-ই চরম বেদনাময় ক্ষণটি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন, আমি আব্বাজানের হাত ধরে যেই মাত্র মসজিদের ভেতর পা দিয়েছি, তখনই দেখলাম দু'টি তরবারি একসাথে চমকে উঠেছে। শাবির নামক অপর ঘাতকের আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ইবনে মুলজাম সফল হলো। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মস্তক প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। তিনি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি। ঘাতককে তোমরা পাকড়াও করো! শাবির ও ইবনে মুলজাম উভয়ই ধরা পড়ে গেল। ইতোমধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর নির্দেশে ঘাতক ইবনে মুলজামকে সামনে হাজির করা হলে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তোর উপর আমার কোনো অনুগ্রহ নেই কি?

ইবনে মুলজাম স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিল। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাকে আর কিছু না বলে স্বীয় পুত্র হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, বাবা! ইবনে মুলজাম এখন বন্দী তাই তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আমি বেঁচে থাকলে তার দ- আমিই দেবো। এটুকু বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এরপর আবার তাঁর

সংজ্ঞা ফিরে এলো। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও অপর পুত্র মুহাম্মদ বিনহাফিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে উপদেশ দিলেন। উপস্থিত মুসলমানদেরকেও কিছু নসিহত করলেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁর দেহখানা শীতল হয়ে এলো। তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। সবার মুখে উচ্চারিত হলো অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে সেই বাক্য: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৬৩ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ৪ বছর ৯ মাস স্থায়ী ছিলো। ঘাতক ইবনে মুলজামকে শরয়ী আইন মুতাবিক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মূল্যবান উপদেশ বাণী

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মুসলমানদের জন্য মহামূল্যবান অনেক উপদেশ বাণী রেখে গেছেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত এসব বাণীর একটি তালিকা নীচে পেশ করা হলো।

১. তিনি বলেন, তোমরা জ্ঞানার্জন করো- তাহলে আল্লাহর মা'রিফাত ও তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পাবে। মনে রেখো, তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে যখন সত্যের দশ ভাগের নয় ভাগই মানুষ অস্বীকার করবে। একমাত্র আল্লাহমুখী, তাওবাকারী ছাড়া কেউই এই ফিৎনা থেকে রেহাই পাবে না।

২. হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সাবধান! দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার হয়ো না।

৩. সাবধান! যারা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ তারা মাটিকে বিছানা ও ধূলাকে বিছানার চাদর রূপে গ্রহণ করে। তারা পানিকে সুগন্ধিরূপে বরণ করে।

৪. আখিরাতমুখিরা কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। যে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে তার নিকট যাবতীয় সমস্যা অতি তুচ্ছ মনে হয়।

৫. জেনে রাখো, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন যারা জান্নাতীদের ও জাহান্নামীদের বসবাস করতে দেখেছেন। এসব মহাত্মনদের অন্তর-আত্মা পূত-পবিত্র। তাঁদের পার্থিব চাহিদা খুব সীমিত।

৬. একদিন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসাবাণী উচ্চারণের পর মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! মৃত্যুকে ভয় করো। তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে চাইলে, সেটি তোমাদেরকে খুঁজে বের করবে। সুতরাং পরকালীন মুক্তি চাও, পরকালীন মুক্তি কামনা করো। জলদি করো, জলদি করো। কবরের মাটি তোমাদেরকে পেছন থেকে তাড়া করছে।

৭. কবর হয়তো আগুনের গর্ত অথবা বেহেশতের বাগান হবে। জেনে রেখো প্রতিটি কবর দৈনিক তিন বার কথা বলে। সে বলে, আমি অন্ধকার, পোকা-মাকড় ও একাকীত্বের ঘর।

৮. সত্য যার কল্যাণ করতে পারে না, মিথ্যা তার অকল্যাণ করবেই। হিদায়াত যাকে সরল পথে আনতে পারে না, গোমরাহী তাকে বাঁকা পথে নিয়ে যাবেই।

৯. দুনিয়া হচ্ছে নগদ পণ্য। পুণ্যবান ও পাপাচারী সবাই তা থেকে খায়।

১০. কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ সৎ ব্যক্তিকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দীর্ঘ কামনা ও আশা মানুষকে আখিরাতের কথা থেকে গাফিল করে দেয়।

১১. ক্ষেত দু'প্রকার: দুনিয়ার ক্ষেত আর আখিরাতের ক্ষেত। দুনিয়ার ক্ষেত হলো ধন-সম্পদ ও তাকওয়া, আর আখিরাতের ক্ষেত হলো জমা থাকা সৎকর্মগুলো। কতেক লোককে মহান আল্লাহ উভয় ক্ষেতের মালিক বানিয়ে দেন।

১২. দুনিয়া হলো গলিত শব এবং একে যারা ভালোবাসে তারা হলো কুকুর। যে কেউ এই দুনিয়া থেকে কিছু পেতে ইচ্ছুক সে যেনো নিজেকে কুকুরদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেয়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

আউলিয়ায়ে চিশত

(যাঁদের পদধূলিতে ধন্য এ ধরার কোল)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

থেকে

হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আরিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পর্যন্ত

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাসাওউফের সিলসিলার সকল ওলির জীবনালোচনা সম্বলিত 'আউলিয়ায়ে চিশত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজ শেষ হয়েছে। এ খণ্ডে প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আরিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত মোট ২৩ জন চিশতি মাশাইখের জীবন, কর্ম ও সাধনার উপর বর্ণনা তুলে ধরেছি। আমি আশা করছি, ইলমে মা'রিফাতের জীবন-সঞ্জীবনী আহরণে তনু-মন-প্রাণ বিসর্জনকরী এসব মহাত্মন অলি-দরবেশদের চিত্তাকর্ষক জীবনবৃত্তান্ত থেকে, আমরা আল্লাহপ্রাপ্তির রাস্তায় চলার সুপেয় সুধার স্বাদ কিঞ্চিৎ অনুভব করতে সক্ষম হবো। সর্বোপরি নিজেদের জীবনচলার পথে খুঁজে পাবো সঠিক দ্বীনদারী ও মা'রিফাত অর্জন তথা খোদাপ্রাপ্তির রাস্তা।

গ্রন্থ রচনা বিরাট এক সাধনার নাম। অক্লান্ত পরিশ্রম, রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনেক রুচিশীল বিষয় বিসর্জন, লোকমুখে সাধারণ থেকে চরম তিরস্কারের সম্মুখীন ইত্যাদি বহুতরের গ্লানির শিকার হওয়া ছাড়া এরূপ গবেষণা আদৌ সম্ভব নয়। তবে এসবই ঐ 'সাধনা'র স্বরূপ। আর সাধনা যদি হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে তাহলে কোনো পরওয়া নেই। আমার এ সাধনা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায়। সবার নিকট আব্দার- দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেনো এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন।

সবশেষে সকলের নিকট আরজ, ত্রূটি-বিচ্যুতি ক্ষমার চোখে দেখবেন। যদি কোনো বিশেষ ভুল ধরা পড়ে তাহলে জানিয়ে বাধিত করবেন। আগামী সংস্করণে

শোধরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ ও বন্ধুজনদের জীবন, সাধনা, বাণী ও ঘটনাবলী যেনো আমাদের জন্য সঠিক রাস্তা-প্রাপ্তির ওয়াসিলা বানিয়ে দেন। মহাত্মন আউলিয়ায়ে কিরামের সম্মানে আমাদেরকে ক্ষমা করে তাঁর আপনজনদের মধ্যে শামীল করেন। আমীন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
২৬ জুলাই, ২০১২ ঈসায়ী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরিচ্ছেদ ১

হযরত শায়খ হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(জন্ম ২২ হিজরি - মৃত্যু ১১০ হিজরি, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো হাসান ইবনে আবুল হাসান ইয়াসির আবু সাঈদ বসরী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবিঈ, ফকীহ্, বসরার ইমাম, সুফিদের সর্দার এবং তাঁর যুগের আলীমদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতার নাম ছিলো ইয়াসির। তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়িদ ইবনে তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। হযরত হাসান বসরীর মাতার নাম ছিলো খায়রাহ। তিনিও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মুক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁর জন্মের পর মাতা খায়রাহ তাঁকে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে যান এবং দু'আ কামনা করেন। তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দিলেন এরপর দু'আ করলেন: “হে আল্লাহ! একে ইসলামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করো, মানুষের নিকট সে হয়ে উঠুক প্রিয়।” তিনি আরো বললেন, “এর নাম রাখো হাসান, কারণ তার চেহারা খুব সুন্দর”।

উম্মত জননী হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা নিজেই হযরত হাসান বসরীকে শিশু থাকাকালে লালন-পালনে সহায়তা করেছিলেন। মাতা খায়রাকে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকতে হতো, তখন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহুআনহা হাসান বসরীকে নিজের স্তন্যদান করে শান্তি রাখতেন। এভাবে শিশু হাসান বসরী নবী-পরিবারের একজন নারীর দুধপান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের কঠোর অনুসারী ছিলেন। এছাড়া প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও সাধনার ক্ষেত্রে তিনি সে যুগে খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে সবার নিকট সুপরিচিত হয়ে

ওঠেন। তিনি অবশ্য সুফিদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। সারা জীবন একটিমাত্র পশমী জুব্বা পরে কাটিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন: "আমি হাসান ও ইবনে সীরীন এই দু'ব্যক্তির কারণে বসরাবাসীদের প্রতি ঈর্ষা করি!" প্রখ্যাত স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা ও তাবিঈ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "আমি যতো ফকীহ ব্যক্তির সঙ্গে বসেছি, তাদের মধ্যে সবার সেরা হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পেয়েছি। আমার চোখ তাঁকে অপেক্ষা বড় ফকীহ আর দেখে নি।"

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "ইতিহাসবিদগণের মতে, হাসান বসরী ইলম ও আমলের সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি ছিলেন আলিম, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, ফকীহ, নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ, অধিক ইলম ও আমলের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, সুশ্রী ও সুদর্শন। একবার তিনি পবিত্র মক্কায় গমন করে মঞ্চে উপবেশন করেন। আলিমগণ তাঁর চারপার্শ্বে বসেন এবং জনতা এসে তাঁর নিকট ভিড় জমায়। তিনি তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - বঙ্গানুবাদ)

বাইআত

হযরত আবু যুরআহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র ১৪ বছর বয়সে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত হন। এরপর তিনি কুফা ও বসরাতে চলে যান।

সালফে সালিহীন মহাত্মনরা হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একজন 'আবদাল' ওলি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একটি হাদীসে আছে: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "পৃথিবীর জমিনে চল্লিশ ব্যক্তি সর্বদাই জীবিত থাকবেন যারা হবেন (ইব্রাহীম) খলীলুল্লাহর মতো। এদের মাধ্যমেই মানুষ বৃষ্টি (অর্থাৎ রাহমাত) এবং সাহায্য পাবে। কেউ মারা গেলে তার বদলে আরেক জনকে

আল্লাহ তা'আলা নিযুক্ত করে দেন।" হযরত আবু কাতাদা (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) বলেন, "আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, হযরত হাসান বসরী সেই আবদালদের একজন।" (তাবারানী)

তাবিঈনদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এই মহাত্মন ওলিআল্লাহ অন্তত ১৪০০ হাদীসের বর্ণনাকারী। তিনি বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী বিন আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণ মিলে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম সূয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে দলীল পেশ করে মন্তব্য করেছেন যে, হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সরাসরি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "একদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু একটি বিচারকার্যে হাসান বসরীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন"। (মুসান্নাফ, ৭ : ৪১২)

অলিআল্লাহদের প্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ 'হিলায়াতুল আওলিয়া' এর প্রণেতা আবু নু'আইম ইসফাহানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ হযরত ওয়াহিদ ইবনে যায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ: ১৭৭) সর্বপ্রথম আবাদান নামক শহরে সুফিদের 'খানক্বাহ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (হিলায়াতুল আওলিয়া, ৬ : ১৫৫) হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর মুরীদানের ব্যাপক সুনাম তখনকার বসরা ও আশপাশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ কারণেই পরবর্তীতে ইবনে তাইমিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আস-সুফিয়্যা ওয়াল ফুক্বারা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, "তাসাওউফের উৎসস্থল হলো বসরা"। তবে অধিক সত্য কথা হলো, বসরা ছিলো তাসাওউফশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক তথা আত্ম-সংযম, সাধনা, আত্ম-শুদ্ধি এবং অন্যান্য জরুরী মানবিক গুণাবলী অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের স্থান। এর অর্থ এটা নয় যে, অন্যত্র এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য মুসলমানরা তখন সম্পূর্ণ গাফিল ছিলেন। কারণ তাসাওউফের যাবতীয় মূলসূত্র পবিত্র কুরআন ও হাদীস ছাড়া আর কিছু নয়।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তিরা এ পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করেন না। তিনি বলেন, “আমাদের লবণ গায়েব হয়ে গেছে; আমাদের মধ্যে ভালো বলতে কী আর অবশিষ্ট আছে?” (নাসিম আর-রিয়াদ, ৩:৪৬০) উল্লেখ্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার সাহাবীদের তুলনা হলো খাদ্যের মধ্যে লবণের মতো। খাদ্য লবণ ছাড়া মোটেই ভালো নয়।” হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীস শরীফের অনুসরণেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, “আমরা হাসতে আছি, অথচ কে জানে, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের কিছু আমলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং বলছেন, “আমি তোমাদের পক্ষ থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না।” হে আদম সন্তান! তোমার প্রতি ধিক্কার! তুমি কী কখনো আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবে? কারণ যে কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে ঝগড়া করে। আল্লাহর শপথ! আমি ৭০ জন বদরী মহাত্মন সাহাবার সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তাঁদের অধিকাংশের পরনে ছিলো পশমী কাপড়ের জুব্বা। তুমি যদি তাঁদের দেখতে তাহলে বলতে, তাঁরা পাগল। কিন্তু তাঁরা যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটিকেও দেখতেন তাহলে বলতেন, “এই লোকগুলোর জন্য আখিরাতে কোনো হিস্সা থাকবে না!”। আর তোমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তিটিকে দেখলে তাঁরা বলতেন, “এই লোকগুলো কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না!”। আমি এমন মহাত্মনদের দেখেছি যাঁদের জন্য এই পৃথিবীর মূল্য তাঁদের চরণধূলি থেকেও কম ছিলো। আমি ঐসব ব্যক্তিকে দেখেছি যারা রাতে গৃহে প্রবেশ করে নিজের অল্প খাবার হাতে নিয়ে বলেছেন, আমি এই খাবারের সবটুকু পেটের ভেতর ঢুকাবো না। এ থেকে কিছুটা অবশ্যই আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে দান করবো। এরপর তিনি কিছুটা খাবার দান করে দিলেন, যদিও এর চাহিদা প্রাপ্ত ব্যক্তির তুলনায় নিজের অনেক বেশী ছিলো।” (হিলায়াতুল আওলিয়া, ২:১৩৪)

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন ইমাম আবু হামিদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘ইহ্ইয়া-উলূমিদ্দিন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মানুষের আত্মার মধ্যে দু'টি চিন্তা ঘোরাফেরা করে। এর একটি স্বয়ং আল্লাহ

তা'আলা থেকে আর অপরটি দুশমন থেকে উদ্ভুত। যে চিন্তাটি আল্লাহর কাছ থেকে আসে, যদি বান্দা তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম হয় তবে তিনি (আল্লাহ) এই বান্দার উপর স্বীয় রহমত নাজিল করেন। এই বান্দা দুশমন থেকে আগত চিন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই দু'টি শক্তিশালী চিন্তার প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'ঈমানদারের হৃদয় মহান দয়ালুর দু'টি অঙ্গুলির মধ্যখানে অবস্থান করে'। অঙ্গুলি অর্থ হৃদয়ের মধ্যস্থ উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা। মানুষ যদি রাগ ও চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে, শয়তানের প্রভাব তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং তার হৃদয় শয়তানের আস্তানা ও পাত্রে পরিণত হয়। শয়তানের খাদ্য হলো 'হাওয়া' বা জাগতিক আকর্ষণ। যদি মানুষ তার জাগতিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে এবং নফসকে তার দ্বারা প্রভাবিত হতে বিরত রাখতে সক্ষম হয় তাহলে, সে ফিরিশতাসূলভ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। তখন তার হৃদয় ফিরিশতাদের বিশ্রামাগারে পরিণত হবে। তাদের নূরে হৃদয়টা আলোকিত হয়ে ওঠবে।"

ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনা থেকে আমরা হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাহাত্ম্যের প্রমাণ পাই। তিনি বলেন, "গাফিলতা ও আশা হলো আদম সন্তানের উপর দু'টি বিরাট নিয়ামত; এগুলো না থাকলে মুসলমানরা রাস্তায় চলতে অপারগ হতো।"

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

"কখনই নয়, তাঁর উভয় হস্ত প্রশস্তভাবে বিস্তারিত, এবং তিনি ইচ্ছামতো প্রদান করেন..." (৫:৬৪)

-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াত আল্লাহর দয়া ও মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আল্লাহর 'ক্বদম' (পা) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো 'ওরা, যাদেরকে তিনি পাঠিয়েছেন'। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দোযখের অগ্নি বার বার প্রশ্ন করতে থাকবে, আরো

আছে কি? শেষ পর্যন্ত মহান প্রভু তাঁর কুদরতি ক্বদম এতে রাখবেন। তখন দোযখ বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট! এবং এর সকল অংশ একত্রিত করবে। বেহেশতে তখনো অনেক স্থান বাকী থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক একটি নতুন সৃষ্টি শুরু করবেন যা তিনি বেহেশতের বাকী অংশে রাখবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির সুপারিশে রাবি’আ ও মুদার গোত্রের সমপরিমাণ মানুষকে আল্লাহ পাক বেহেশত দান করবেন”। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী বলেন, “এই ভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত ওয়ায়িস কারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি”। (আহমদ)

একবার উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পত্র লিখলেন: দীনার-দিরহামের প্রতি আপনার ভালোবাসা কিরূপ? তিনি জবাব দিলেন: ‘আমি ওসব মোটেই ভালোবাসি না’। আব্দুল আজিজ পুনরায় লিখলেন: আপনি শাসনভার গ্রহণ করুন। আপনি ন্যায়বিচার করতে পারবেন।

ইয়াযীদ ইবনে হাওশাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি হাসান ও উমর ইবনে আব্দুল আজিজ অপেক্ষা চিন্তিত কাউকে দেখি নি। জাহান্নাম শুধু তারা দু’জনের জন্যেই যেনো সৃষ্টি করা হয়েছে!

হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কারামত

১. পবিত্র হজ্জযাত্রায় একদল জ্ঞানী-গুণী মানুষ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাস্তার উপর একটি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে যেয়ে দেখা গেল পানির স্তর কূপের তলায়। আশেপাশে কোন দড়ি কিংবা বালতিও চোখে পড়লো না। তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিষয়টি অবগত করলেন। তিনি বললেন, আমি যখন নামাযে দাঁড়াবো তখন তোমরা সেই কূপের নিকট যাবে।

তিনি কিছুক্ষণ পর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্দেশ মুতাবিক তারাও কূপের নিকট গেলেন। কী আশ্চর্য! সবাই লক্ষ্য করলেন, কূপটি এখন কানায় কানায় পানিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং সবাই ইচ্ছেমতো পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলেন। একজন কিছু পানি তুলে একটি পাত্রে জমা রাখলেন- পরে পান করবেন এই বাসনা নিয়ে। কিন্তু দেখা গেলো পানির স্তর আবার নেমে নীচে চলে গেছে- ঠিক আগের মতো। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো না, তাই এমনটি হয়েছে।

২. কাফিলা পবিত্র বাইতুল্লাহর পথে চল্ছে। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাস্তা থেকে কিছু খেজুর সংগ্রহ করে অন্যান্য সদস্যদেরকে খেতে দিলেন। তাঁরা তা খেয়ে অবাক দৃষ্টিতে বীচিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এগুলো দেখতে যে ঠিক স্বর্ণের মতো লাগে! ঠিক তা-ই ছিলো। মক্কা শরীফ পৌঁছে স্বর্ণকারের দোকানে যেয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখলেন, এগুলো সত্যিই খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে।

কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা

১. একদিন এক কুকুর দেখে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ইয়া আল্লাহ! পরকালে আমি কি এই কুকুরটির সঙ্গে হাশর করতে পারবো? তাঁর এই কথাটি একজন পথচারী শ্রবণ করে প্রশ্ন করলো, হুজুর! কুকুরটি আপনার চেয়ে উত্তম না অধম?

তিনি জবাব দিলেন, রোজ কিয়ামতে যদি মুক্তি পাই তাহলে নিজেকে কুকুরটির তুলনায় উত্তম বলতে পারি। আর যদি না পাই, তাহলে বুঝতে হবে সে আমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম।

২. একদা তিনি তাঁর এক নিন্দুকের বাড়িতে বেশ কিছু খেজুর তুহফাস্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, দেখুন জনাব! আমি শোনেছি আপনি আপনার আমলনামা

থেকে অনেক নেকী আমারটিতে স্থানান্তরিত করছেন। সুতরাং এই কাজের বিনিময় হিসাবে কিছু নিয়ে এসেছি পুরস্কার হিসাবে!

৩. একদিন তিনি এক নপুংসকের কাপড় ধরে টান দিলেন। লোকটি বললো, আমার গোপন রসহ্য এখনো বাইরে প্রকাশ পয় নি- আপনি কি তা প্রকাশ করতে চান?

৪. এক মাতাল মধ্যপানের নেশায় টলতে টলতে রাস্তা অতিক্রম করছিলো। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, আরে মিয়া! সাবধানে পা ফেলো- নইলে আছাড় খাবে! সে জবাব দিলো, আমি আছাড় খেলে কী-ই বা হবে! কারো কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনি সঠিকভাবে চলবেন- আপনার মতো এতো বড় সাধকের চলার পথে বেশকম হলে অসংখ্য মানুষের ক্ষতি হবে কারণ, তারা তো আপনাকে ইত্তিবা করে।

৫. মোমবাতি হাতে নিয়ে চলছে এক বালক। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আলো কোথা থেকে আনলে? সে এক ফুঁৎকারে বাতিটি নিভিয়ে দিয়ে বললো, আগে বলুন এখন এটা কোথায় গেল? এরপর বলবো, তা কোথায় থেকে এনেছি!

অমূল্য উপদেশ বাণী

হযরত হাসান বসরী মানুষের জন্য রেখে গেছেন অসংখ্য উপদেশ বাণী। আমরা বিভিন্ন কিতাব থেকে নিম্নে বর্ণিত বাণীগুলো অত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলাম। এগুলো পাঠ ও উপদেশ হিসাবে গ্রহণ করলে উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে হিদাআতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

১. কথা কম বলাই উত্তম। এক ব্যক্তি হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট এসে দীর্ঘক্ষণ কথা বললো। তিনি তাকে একটি ঘুষি মেরে বললেন: নিশ্চয় এর মধ্যে ফিতনা আছে।

২. ক্ষমার আশা ও রহমতের প্রত্যাশা একদল মানুষকে উদাসীন করে ফেলে। ফলে তারা কোনো নেক আমল ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তাদের কেউ বলতো: আমি মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করি এবং মহান আল্লাহর রহমতের আশা করি। অথচ সে মিথ্যা বলেছে! যদি সে মহান আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভালো ধারণা করতো, তাহলে অবশ্যই সে মহান আল্লাহর জন্য ভালো আমল করতো। আর যদি সে মহান আল্লাহর রাহমাতের আশা করতো, তাহলে অবশ্যই নেক আমলের মাধ্যমে সে তাঁর অন্বেষণ করতো। পাথেয় ও পানি ছাড়া বিজন মরু এলাকায় প্রবেশ করলে, ধ্বংস অনিবার্য।

৩. নিজের অন্তরের সঙ্গে মত বিনিময় করো। কারণ এগুলো দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমার নফসকে ঘৃণা করো কেননা, তাকে চরম শোচনীয়ভাবে পাকড়াও করা হবে।

৪. মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, আলিম যখন দুনিয়াকে ভালোবাসবে তখন তার পরিণতি কী হবে? তিনি জবাব দিলেন: আত্মার মৃত্যু। তার দুনিয়া অন্বেষণ হবে আখিরাতের বিনিময়ে। সুতরাং তার থেকে ইলমের বরকত উঠে যাবে এবং তার নিকট ইলমের বাহ্যিক রূপটাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

৫. রোগ হলো দয়ালু বাদশাহর পক্ষ থেকে একটি বেত্রাঘাত। রুগ্ন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পর হয়তো দ্রুতগামী ঘোড়ায় পরিণত হবে, না হয় পদস্খলিত দংশিত গর্দভে পরিণত হবে।

৬. মানবতা ছাড়া দ্বীন হয় না।

৭. ক্রন্দন মানুষকে রাহমাতের দিকে নিয়ে যায়। কাজেই যদি পারো, জীবনটা ক্রন্দনের মধ্যে কেটে দাও।

৮. মুসলমানের লক্ষণ হলো: দ্বীনে শক্তিশালী হওয়া, কোমলতা প্রদর্শনে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া, ইয়াক্বীনের সঙ্গে ঈমান থাকা, বিদ্যায় প্রজ্ঞাবান হওয়া, কোমল আচরণে কঠিন হওয়া, হকের পথে দান করা, স্বচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অভাবে ধৈর্যধারণ করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনুগ্রহ করা, আনুগত্যের সাথে হিতকামনা করা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাকওয়া অবলম্বন করা এবং বিপদে পবিত্রতা ও ধৈর্য ধারণ করা। মু'মিনের লক্ষণ হলো: তার উদ্দীপনা তাকে ধ্বংস করে না, তার জিহ্বা তাকে ছাড়িয়ে যায় না, তার চক্ষু তাকে অতিক্রম করে না, তার গোপনাঙ্গ তাকে পরাজিত করে না, তার প্রবৃত্তি তাকে আকৃষ্ট করে না, তার রসনা তাকে অপদস্থ করে না, তার লোভ তাকে হীন করে না এবং তার নিয়ত ছোট হয় না।

১০. বান্দা যদি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যথাযথ বিশ্বাস লালন করে, তাহলে অবশ্যই সে বিনীত, বিগলিত, দৃঢ়পদ, সরল-সোজা হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে।

১১. আমি বিশ্বাস দ্বারা জান্নাত অন্বেষণ করেছি, বিশ্বাস দ্বারা জাহান্নাম থেকে পলায়ন করেছি, বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণরূপে ফরযসমূহ আদায় করেছি এবং বিশ্বাস দ্বারা সত্যের উপর অবিচল থেকেছি।

১২. বিপদ আসলে বুঝা যায়, কে আল্লাহর দাস আর কে গাইরুল্লাহর দাস।

১৩. তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! পঁচন যেরূপ মানুষের দেহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গীবতও মু'মিনের দ্বীনের মধ্যে দ্রুত (ফিতনা) বিস্তার লাভ করে। তবে তিন শ্রেণির মানুষের গীবত হারাম নয়: প্রকাশ্য পাপকারী, অত্যাচারী শাসক ও বিদআতী।

১৪. কেউ যদি কোনো পাপ করার পর তওবা করে থাকে, আর অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে এই পাপের অপবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে এই অপবাদকারী ঐ পাপ স্বয়ং নিজে না করা পর্যন্ত মরবে না।

১৫. মানুষকে তার আমল দ্বারা যাচাই করো- মুখের কথা দ্বারা নয়।

১৬. যার পরিধেয় পাতলা, তার দ্বীনও পাতলা। যার দেহ (অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের দরুন) মোটা, দার দ্বীন হলো জীর্ণ। যার খাদ্য যতো সুস্বাদু তার উপার্জন ততো গন্ধময়।

১৭. মু'মিনের মূলধন হলো দ্বীন। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন আছে, ততক্ষণ তার পুঁজি আছে। চলার পথে দ্বীন কখনো মু'মিনের বিপক্ষে কাজ করে না।

১৮. "শপথ তিরস্কারকারী আত্মার"- এই আয়াতে করীমের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: তুমি এমন মু'মিনের সাক্ষাৎ পাবে না, যে তার আত্মাকে তিরস্কার করে না। সে বলে, আমি তো এ কথা বলতে চাই নি, এ খাবার খেতে চাইনি কিংবা এ মজলিসে বসার ইচ্ছে করি নি। কিন্তু অবিশ্বাসীরা পা পা অগ্রসর হয় কিন্তু স্বীয় আত্মাকে তিরস্কার করে না।

১৯. তাওবার দ্বারা আল্লাহর দরবারে মানুষের মর্যাদা বাড়তে থাকে।

২০. বন্ধু-বান্ধবের জন্য কে কতটুকু খরচ করলো আর নিজের মা-বাবার জন্য কতটুকু খরচ করলো তার হিসাব আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখেন।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন: হাসান ইবনে আবুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একশত দশ হিজরি সনের রজব মাসে ৮৮ বছর বয়সে ইইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে লোকে দেখলো তিনি মৃদু হাসছেন। এতে সবাই অবাক হলো কারণ তিনি জীবনে কোনদিন হাসেন নি। তিনি বার বার বলছিলেন, সে কোন্ পাপটি, কোন্ পাপটি?

মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে হাসি ও কোন্ পাপটি? এ প্রশ্নের রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে আমি শুনতে পেলাম কে যেনো প্রাণ সংহারকারী ফিরিশতাকে বলছে, একটু কষ্ট দিয়ে তার প্রাণ বের করো। তার একটি গুনাহ রয়েছে। এ কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম এ ভেবে যে, তাহলে আমার বাকী সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। একটি মাত্র বাকী আছে যা মৃত্যুর কষ্ট দ্বারা মুছে যাবে। এজন্যই আমি এভাবে হেসেছিলাম।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অসংখ্য মুরীদান এবং বেশ ক’জন খলীফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার শাজারায় হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ আবুল ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম আসে। সুতরাং এখন আমরা তাঁরই জীবনালোচনায় মনোনিবেশ করছি।

পরিচ্ছেদ ২

শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ আবুল ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু: ১৭০ থেকে ১৮৬ হিজরির মধ্যে, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ ছিলেন বিখ্যাত তাবিঈ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফাদের মধ্যে অন্যতম। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি রোজা রেখে কাটিয়েছিলেন। পুরো বছরই দিনের বেলা রোজা এবং রাতে ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। সে যুগে তাঁর মতো সাধক খুব কম ছিলেন। অল্প কথা, অল্প খাবার, অল্প ঘুম ও অল্প মেলামেশা- এই অল্প-চতুষ্টয়ের আমলের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। রোজা রেখেও তিনদিনে একবার সামান্য কিছু খাদ্য গ্রহণ করতেন। হযরত আবু নাসির আবদুল্লাহ বিন আলী শাররাজ তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর (৩৭৮ হিজরিতে রচিত) 'কিতাবুল-লুমা ফীত-তাসাওউফ' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ আবুল ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনা করেছেন।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁর মতো কেউ ছিলেন না। হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পরবর্তী সকল সুফীর জন্য অল্পেতুষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর নিজের সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতেন। টাকা-পয়সা হাতের দ্বারাই অন্যকে দান করতে হয়। সুতরাং এই টাকার কোন প্রভাব দান করার পরও যাতে নিজের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে না পারে, তাই তিনি হস্তদ্বয় পানি দ্বারা ধুঁয়ে ফেলতেন।

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শিক্ষাজীবনে ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এছাড়া ইলমে বাতিন ছাড়াও ইলমে যাহির তথা ফিকহ, হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি

বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করতে যেয়ে তিনি স্বীয় মুর্শিদ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। সর্বোপরি উস্তাদের মতো তিনিও তাবিঈ ছিলেন এবং নিজের দাদাপীর ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎলাভে ধন্য হন। কথিত আছে মুর্শিদের নিকট বাইআত গ্রহণের পূর্বে তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর কঠোর মুজাহাদায় কাটিয়েছিলেন।

তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণ

তাসাওউফের চর্চা একটি আ'মলী ব্যাপার। কেউ কোনদিন তাসাওউফের উপর শুধুমাত্র কিতাবী জ্ঞান ও গবেষণা দ্বারা তাসাওউফপন্থী বা সুফি-দরবেশ হতে পারবেন না। এই রাস্তায় অগ্রসর হওয়ার অর্থ হলো নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক একটি উত্তম আ'মলী জিন্দেগী গড়ে তুলা। হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে সুলুকের পথে পাড়ি জমালেন এ ব্যাপারে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা বর্ণিত আছে।

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিলো। তাঁর এক গোলাম সারাদিন খিদমত করে রাতের বেলা অব্যাহতি নিতে তাঁর নিকট আবদার করলো। তিনি এক দীনারের বদৌলতে তার এই আবদার মঞ্জুর করলেন। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি এসে হযরতের নিকট অভিযোগ করলো: হুজুর! আপনার গোলামটি রাতের বেলা কবরস্থানে যেয়ে কবর খুঁড়ে মুর্দার কাফন চুরি করে।

এই অভিযোগ শোনে তিনি বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে তিনি গোলামকে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করলেন না। তাঁর গোলাম খুব বিশ্বস্ত ছিলো। এরূপ কাজে সে জড়িত থাকবে, তা তিনি সহজে মানতে পারলেন না। তথাপি, সঠিক তথ্য জানাও তাঁর জন্য জরুরী ছিলো। সুতরাং তিনি তাঁর গোলামকে এক রাতে চুপি চুপি অনুসরণ করলেন। দেখা গেলো সত্যিই সে এক কবরস্থানে যেয়ে পৌঁছুছে।

দূর থেকে হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গোলামের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করতে থাকেন। কবর খুঁড়ে লাশের কাফন চুরি তো দূরের কথা বরং গোলাম কবরস্থানে বসে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হলেন। এভাবে তিনি সারা রাত কাটিয়ে দিলেন। ফযরের নামায শেষে গোলাম হাত উঠিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করলেন: "হে আল্লাহ! হে আমার আসল মহান প্রভু! আমার জাগতিক মালিকের বেতন প্রদান করো"। দু'আর এই বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার পরই দেখা গেলো কুদরতী উপায়ে একটি দীনার গোলামের হাতে এসে গেছে! এরপর গোলাম দাঁড়িয়ে ওঠে ধীরে ধীরে ফিরে চললেন।

এদিকে লুকিয়ে থাকা গোলামের মালিক হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সতর্কতার সাথে নিজেকে গোপন রাখলেন যাতে কোনো মতেই গোলাম তাঁকে দেখতে না পান। গোলাম চলে যাওয়ার পর তিনি অযু সেরে দু'রাকাআত 'সালাতুত তাওবাহ' নামায আদায় করলেন। তিনি তাঁর গোলামের বুজুর্গী দেখে নিজেকে সত্যিই ছোট ভাবলেন, তাকে বাড়ি পৌঁছে মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভোর হওয়ার পর কিন্তু আসল রসহ্য তাঁর নিকট উন্মোচন হলো। তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন! স্বীয় বাড়িটি কোনদিকে ছিলো তা তিনি কিছুতেই সনাক্ত করতে পারছিলেন না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার ছিলো যে, তাঁর বাড়ি কোথায় ছিলো, তা লোকের নিকট জিজ্ঞেস করার পর তারা জবাবে বলছিলো, "আপনি আপনার বাড়ি থেকে অন্তত দুই বছরের ভ্রমণপথ দূরে অবস্থান করছেন!"

অবাক বিস্ময়ে হযরত আব্দুল ওয়াহিদ এক জায়গায় বসে পড়লেন। এমনসময় দেখা গেলো একজন অশ্বারোহী তার দিকে আসছেন। নিকটে পৌঁছে তিনি আব্দুল ওয়াহিদকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে আব্দুল ওয়াহিদ! তুমি কেনো এখানে বসে আছো?" তিনি তখন ঘটনার অদ্যপান্ত এই প্রশ্নকারীর নিকট বর্ণনা করলেন।

অশ্বারোহী তাঁকে পরামর্শ দিলেন, "একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চললেও তোমার বাড়ি যেতে দুই বছর সময় লাগবে। সুতরাং তুমি বাড়ি যাওয়ার চিন্তা আপাতত বাদ

দাও। আগামী রাতে তোমার গোলাম আবার এখানে আসবেন। তুমি তার সাথে গমন করো- হয়তো এভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন”। সুতরাং অগত্যা আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সেখানে অপেক্ষায় থাকতে হলো।

রাতের বেলা সত্যিই তার গোলাম আবার কবরস্থানে এসে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি নিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ধরনের খাবার। আব্দুল ওয়াহিদের নিকট এসে বললেন, “হে আমার মালিক! এই খাবারটুকু গ্রহণ করুন।” ক্ষুধার জ্বালায় দুর্বলপ্রায় আব্দুল ওয়াহিদ খাবার হাতে নিয়ে গলদ্ধকরণ শুরু করলেন। এদিকে তার গোলাম আগের মতোই ইবাদতে মশগুল হলেন। ফযরের নামাজ শেষে গোলাম ঠিক আগের রাতের মতো দু’আ করার পর একটি দীনার কুদরতী উপায়ে তার হাতে এসে পৌঁছুল। এরপর মাত্র কিছুদূর দু’জনে একত্রে হেটে অগ্রসর হয়েই কুদরতী উপায়ে বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

বাড়ি পৌঁছার পর হযরত আব্দুল ওয়াহিদ গোলামকে মুক্ত করার অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে কথা বলবেন মাত্র- ঠিক এমন সময় গোলাম বললেন, “আপনি আমাকে মুক্ত করে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন। ঠিক না?” হ্যাঁ-সূচক জবাব দিয়ে তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। গোলাম খুশী হয়ে বললেন, “আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মুক্তির বদৌলতে এই ক’টি প্রস্তরখণ্ড আপনাকে উপহার দিচ্ছি।” একথা বলে গোলাম সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তাকে আর কোনদিন দেখা গেলো না।

সকাল বেলা হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গোলামের দেওয়া ওসব প্রস্তরখণ্ডের প্রতি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। ওগুলো পাথর ছিলো না- বরং মূল্যবান মণি-মুক্তা! তিনি বুঝতে পারলেন, তার সেই গোলাম একজন উচ্চ পর্যায়ের দরবেশ ছিলেন। নিজের মনে ভাবান্তর অনুভব করলেন। জাগতিক সবকিছু পরিত্যাগ করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমাতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। গোলামের দেওয়া মণিমুক্তায় পরিণত পাথরগুলোসহ নিজের সবকিছু গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে ইলমে মা’রিফাতের সন্ধানে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

একটি দুর্লভ স্বপ্ন

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বর্ণনা করেন, একদা তিনি নামাযে দাঁড়ানোবস্থায় পায়ের মধ্যে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছিলেন। তবে তিনি কিছুতেই দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করলেন না- খুব বেশী কষ্ট সহ্য করেও নামায আদায় করে যাচ্ছিলেন। এক রাতে তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠে উভয় পায়ে ভীষণ ব্যথা থাকাসত্ত্বেও বিরাট কষ্ট সহ্য করে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি তখন এক স্বপ্ন দেখলেন। হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে বলেন, “আমি দেখলাম বেশ ক'জন মেয়ে আমাকে পরিবেষ্টন করে বসে আছে। এদের মধ্যে একটি মেয়ে আমার নিকটে বসে অপর সকল মেয়েকে নির্দেশ দিলো, তাকে ওঠাও! কিন্তু সজাগ করো না।

নেত্রী-মেয়ের নির্দেশ মুতাবিক সবাই মিলে আমাকে উঠিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দর সাজানো বিছানায় রেখে দিল। আমি জীবনে কখনো এরূপ সুন্দর ও আরামদায়ক বিছানা দেখি নি। আমি মেয়েদের নেত্রীর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবকিছু অবলোকন করছিলাম। সে ওদেরকে নির্দেশ দিলো, এবার তার বিছানার চতুর্দিকে ফুলগুলো সাজিয়ে রাখো। তারা তা-ই করলো। এরপর সে-ই মেয়েটি আমার নিকট এসে ব্যথাভরা পায়ের ওপর হাত রেখে বললো, আপনি নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আরোগ্য দান করেছেন।

এবার আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার পায়ে কোন ব্যথা ছিলো না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। এদিন থেকে আর কোনদিনই আমার পায়ের ব্যথা অনুভব করি নি। সর্বদাই আমার হৃদয়ে সেই মেয়েটির মিষ্টি সুরের শেষ কথাটি জাগ্রত হয়- “আপনি নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আরোগ্য দান করেছেন”।

স্বপ্নযোগে হুরের সাথে সাক্ষাৎ

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরেকটি অপূর্ব স্বপ্নের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “এক রাতে আমি ঘুমের ঘোরে যাবতীয় ওজিফা ও নফল

ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। গভীর নিদ্রাবস্থায় এক অপূর্ব সুন্দরী হুরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটলো। আমি এমন সৌন্দর্য কোনদিন কল্পনায়ও দেখি নি। তার অঙ্গের বস্ত্রাদি আল্লাহর তাওবাহ-তাসবীহ পাঠ করছিলো। সে আমাকে বললো, "হে ইবনে যায়িদ! আমাকে পাওয়ার জন্য সাধনা করো! আমি তোমার সন্ধানে আছি।"

এরপর সে একটি পংক্তি আবৃত্তি করলো: "যে কেউ আমাকে ক্রয় করবে এবং হৃদয়ের প্রশান্তি ও আনন্দের মধ্যে থাকবে, তার ব্যবসা অবশ্যই সফল হবে"।

আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি! তোমার মূল্য কী হয়?"

সে জবাবে বললো, "আল্লাহপ্রেম ও সে সাথে তাঁর আনুগত্য হলো আমার মূল্য। আমায় পাওয়ার বদলা হলো ভয়-ভীতিসহ গভীর ধ্যানমগ্নতা।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "হে সুন্দরী! তোমার মালিক কে হয়?"

সে বললো, "আমার মালিক তিনি যিনি আমাকে পাওয়ার জন্য যে ব্যক্তি মূল্যদানে আগ্রহী তার আশাকে অপূর্ণ রাখেন না। আমার মালিক আল্লাহ তা'আলা।"

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, "এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনদিন রাতের বেলা নিদ্রামগ্ন হবো না।" সুতরাং দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি ইশার অযু দ্বারা ফযরের নামায আদায় করলেন।

এক 'তরকে দুনিয়া' দরবেশের সঙ্গে কথোপকথন

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা এক তরকে দুনিয়া তথা সংসারবিরাগী দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি তাঁকে রাহিব (সংসারত্যাগী) বলে সম্বোধন করে ডাক দিলেন, "ওহে রাহিব! ওহে রাহিব!" দরবেশ কোনো জবাব দিলেন না। তিনি আবারও তাঁকে 'রাহিব' বলে ডাক দিলেন। কিন্তু এবারও জবাব নেই। তৃতীয়বার ডাকার পর কক্ষের ভেতর থেকে দরবেশ বের হয়ে বলতে লাগলেন:

"আমি কোনো 'রাহিব' নই। রাহিব ঐ ব্যক্তি যে আসমান-যমিনের আল্লাহকে ভয় করে; সে তাঁর মাহাত্ম্যকে সম্মান দান করে; আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যাবতীয় দুঃখ-বেদনাকে সে নীরবে বিনা অভিযোগে ধৈর্যসহ গ্রহণ করে নেয়;

আল্লাহর যে কোনো ফায়সালায় সে সন্তুষ্ট; নিজের ক্ষমার জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করে; অফুরন্ত নিয়ামতরাশির জন্য সে তাঁর স্তুতিতে পঞ্চমুখ; মহান আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতিতে সে সর্বদাই বিনয়াবনত; সে দিনের বেলা উপবাসে কাটায় আর রাতে দণ্ডায়মান থাকে নামাযে; জাহান্নামের স্মরণ ও ভয় তাকে জাগ্রত রাখে। এমন ব্যক্তিই 'রাহিব' খিতাবে ভূষিত হওয়ার যোগ্য। অপরদিকে আমি! আমি একটি বন্য কুকুর! অন্যান্য জন্তুকে শিকার করে বেড়াই। সুতরাং মানুষকে স্বীয় রসনা দ্বারা আহত করা থেকে নিজেকে বাঁচাতে যেয়ে এখানে বন্দী হয়েছি।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাহিব! আল্লাহ তা'আলা থেকে মানুষ দূরে সরে পড়ার কারণ কী?"

তিনি জবাব দিলেন, "হে আমার ভাই! আল্লাহ থেকে দূরে সরার পড়ার কারণ হলো, দুনিয়ার মুহাব্বাত। হুব্বে দুনিয়া হলো সকল পাপের মূল। সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে এই প্রেমকে নিজের হৃদয় থেকে মুছে ফেলেছে। এরপর নিজের গুণাহসমূহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সত্যিকার তাওবাহ করেছে এবং একমাত্র মহান প্রভুর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হয়েছে।"

এক হাবশি ওলির সঙ্গে সাক্ষাৎ

একদা হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর বন্ধু আইউব শাকতিয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাম দেশের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পথে এক হাবশি ওলিআল্লাহর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "রাস্তায় একজন হাবশিকে দেখতে পেলাম যার মাথায় এক বোঝা লাকড়ি ছিলো। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে হাবশি! তোমার প্রভু কে?"

সে অবাক হয়ে জবাব দিল, "আপনারা আমার মতো ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন করছেন?"

এরপর সে তার মাথা থেকে লাকড়ির বোঝা নামিয়ে মাটির উপর রেখে দিল। আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে বললো, "হে আল্লাহ! এই বোঝাকে আপনি স্বর্ণে পরিণত করে দিন!"

আমরা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম, তার এই আবদার সাথে সাথেই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছে- সত্যিই লাকড়ির বোঝা স্বর্ণে পরিণত হয়েছে। তিনি আবার আমাদেরকে বললেন, "এবার লক্ষ্য করুন!" এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে পুনরায় মাথা উত্তোলন করে বললেন, "হে আল্লাহ! এই লাকড়ির বোঝাকে লাকড়িতেই পরিণত করুন!"

আমরা দেখলাম, তার এই দু'আও আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছে। সব স্বর্ণ আবার লাকড়িতে পরিণত হয়েছে। এরপর হাবশি এই ওলিআল্লাহ বললেন, "আপনারা আরিফীনদের জিজ্ঞেস করুন, তাঁদের অত্যাশ্চর্য ব্যাপারগুলো কখনো বন্ধ হয় না।"

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথী হযরত আইউব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হাবশি এই ব্যক্তির অবস্থা দেখে আমরা অবাক হলাম। আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করছিলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কাছে খাবার কিছু আছে কি?" তিনি হাত দ্বারা একটি চিহ্ন অঙ্কন করলেন। এতে মধুভর্তি একটি থালা আত্মপ্রকাশ করলো। এই মধুর সুগন্ধি ছিলো মিশকের চেয়েও মনোমুগ্ধকর, তার স্বচ্ছতা ছিলো বরফ থেকেও পরিষ্কার। তিনি আমাদেরকে এটা খেতে দিলেন। বললেন, এই মধু মধুমক্ষিকা থেকে আসে নি। আমরা তা তৃপ্তিসহ ভক্ষণ করলাম- এমন সুমিষ্ট মধু জীবনে কখনো খাই নি। স্বভাবতই আমরা উভয়ে এসব ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, "যে কেউ এরূপ কারামত অবলোকন করে অবাক হয় সে আরিফ নয়। এভাবে অবাক হওয়ার অর্থ সে আল্লাহ থেকে দূরে অবস্থান করছে। যে কেউ কারামত দেখে (সে কারণে) উপাসনায় লেগে যায় সে অবশ্য আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ।"

একটি ঘটনা

একদা হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন মুরীদ এসে বললো, হযরত! আমি প্রতি রাত বেহেশতে ভ্রমণ করে থাকি। সেখানকার অপূর্ব সুন্দর বাগান, হুর, গেলেমানদের দেখতে পাই। আহার করি স্বাদে-গন্ধে ভরপুর মজাদার খাবার। তিনি মুরীদের বক্তব্য শুনে কিছুটা সন্দেহ করলেন। আসল ব্যাপার উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে তিনি একদা ঐ মুরীদের সঙ্গে বেহেশত ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এর পরদিন দেখা গেলো তারা উভয়ে একটি গোবরের স্তুপে পড়ে আছেন। হযরত ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুরীদকে বুঝিয়ে দিলেন যে, শয়তান তাকে ধোঁকা দিচ্ছিল! (কিতাবুল লুমা)

তাঁর কারামত

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে অসংখ্য কারামত প্রকাশ হয়েছিল বলে বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য কারামত কোনো শর্ত নয়। এরপরও মানুষের হিদায়াতের লক্ষ্যে অধিকাংশ ওলির জীবনে আল্লাহর হুকুমে অনেক কারামত প্রকাশ হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল ওয়াহিদের জীবনের কয়েকটি কারামত আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

নদীর পানি শুকানো

একদিন হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক খেয়াঘাটে অবস্থান করছিলেন। যাদের কাছে টাকা ছিলো শুধুমাত্র তাদেরকেই মাঝি নৌকোয় তুলে নিচ্ছিলো। নদীর ঘাটে অনেক ফকীর নদী পার হওয়ার জন্য বসে আছে। তারা মাঝিকে টাকা দিতে না পেরে নিরাশ ও পেরেশান- এমন সময় হযরত ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবার সামনে ঘোষণা করলেন: “হে লোকসকল! আব্দুল ওয়াহিদের এই সংবাদ তোমরা নদীর নিকট পৌঁছাও- ‘হে নদী! তুমি শুকিয়ে যাও!’”

সকল ফকীর মিলে ঠিক তা-ই করলো, বললো: হে নদী! হযরত আব্দুল ওয়াহিদ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, শুকিয়ে যাও! আল্লাহর কী কুদরত! কিছুক্ষণের মধ্যে নদীর পানি কমে গেল। সকলে তখন পায়ে হেটে নদী পার হতে সক্ষম হলেন।

আকাশ থেকে দীনারের পতন

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে প্রায়ই অনেক ফকীর, মিসকিন ও নিঃস্ব লোকজন বসে থাকতো। একদিন এরূপ অনেক লোক তাঁর কাছে জমায়েত হলো। তারা আশা করেছিল তিনি তাদেরকে কিছু খাবার পরিবেশন করবেন। কিন্তু হযরতের নিকট খাবার বলতে কিছুই ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে তাঁর নিকট আবদার করলো: হুজুর! আমাদের অবস্থা নাজুক। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা কাতর হয়ে পড়েছি। অনুগ্রহ করে একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল, আকাশ থেকে দীনার (মুদ্রা) পড়া শুরু হয়েছে! এই মুদ্রার বিনিময়ে খাবার নিয়ে আসা হলো। সবাই তৃপ্তিসহ আহার করলেন। কিন্তু হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আহার করলেন না।

এক মূর্তিপূজকের ইসলামগ্রহণ

একবার হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নৌকাযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে শুরু হলো তুফান। ছোট্ট নৌকোটি দোলতে দোলতে বাতাসের বেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এক দূরবর্তী দ্বীপে যেয়ে ভিড়লো। তিনি দ্বীপে উঠে সেখানে অবস্থানরত এক মূর্তিপূজকের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাকে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন: "আপনি কার উপাসনা করেন?" সে একটি মূর্তি দেখিয়ে বললো, "এটি আমার উপাস্য"। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, আসল প্রভুর উপাসনা করো। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও।

মূর্তিপূজক তখন প্রশ্ন করলো, "এরূপ একজন প্রভু আছেন বলে কেউ জানবে কি করে?"

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ থেকে তা জানা যায়।"

মূর্তিপূজক: "রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোথায়?"

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ: "তিনি খবর পৌঁছুনোর পর মিশন শেষে এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছেন।"

মূর্তিপূজক: "এই সত্যের কোনো চিহ্ন তিনি কি আপনার নিকট রেখে গেছেন?"

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ: "অবশ্যই, তিনি আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফ রেখে গেছেন।"

মূর্তিপূজক: "তাহলে এই কিতাব থেকে আমাকে কিছু পাঠ করে শুনান"।

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে কিছু তিলাওয়াত করলেন। এটা শ্রবণ করে মূর্তিপূজকের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে বলে উঠলো, "অবশ্যই, এই কথাগুলো এমন এক মহাপ্রভুর যাকে কিছুতেই অমান্য করা যায় না।" সে তখনই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। হযরত আব্দুল ওয়াহিদের সঙ্গে সে দ্বীপ ছেড়ে চলে আসলো এবং দীর্ঘদিন তাঁর সুহবতে কেটে দিল। একদা এই নও-মুসলিমকে শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ কিছু টাকা মুরীদদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে প্রদান করতে চাইলেন। তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, "আমি যখন একটি মূর্তিকে পূজা করতাম তখনও আমার আল্লাহ আমাকে ভুলেন নি- রিজিক দিয়েছেন। এখন তো আমি তাঁরই ইবাদত করি- সুতরাং কিভাবে তিনি আমাকে ভুলে যাবেন ও রিজিক প্রদান থেকে বঞ্চিত করবেন?"

এক রাতে সকল লোক নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লো। নও-মুসলিম সেই মূর্তিপূজক সবাইকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহ তা'আলাও কি রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়েন?" সবাই একবাক্যে জবাব দিল, "অবশ্যই না, তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীবী, যার না আছে নিদ্রা কিংবা তন্দ্রা"। তিনি তখন বললেন, "তাহলে আপনারা তাঁর কোন্ ধরনের গোলাম যে, মালিক থাকবে সজাগ আর বান্দা থাকবে ঘুমের ঘোরে!"

কথিত আছে এই ব্যক্তি পরবর্তীতে সারা রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে দেখলেন, জান্নাতের উচ্চাসনে এই অতীত-জীবনে-মূর্তিপূজক নও-মুসলিমকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

শেষ জীবনে আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। সুতরাং অযু করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। একদিন তাঁকে অযু করানোর মতো কেউ ছিলো না। এদিকে নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার ফরয নামায আদায়ের জন্য অযু করবো- আমাকে সাহায্য করো।" দু'আ শেষ হতেই তাঁর হাত-পা সচেতন হয়ে উঠলো। তিনি বিনা কষ্টে অযু সেরে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে পুনরায় তার শরীরের অসুস্থতা ফিরে এলো।

জান্নাতের সাথী

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জান্নাতে কার সঙ্গে থাকবেন এ ব্যাপারে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি একাধারে তিন রাত আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ! জান্নাতে আপনি আমার সঙ্গী কা'কে রাখবেন? আমার প্রশ্নের জবাব আসলো তৃতীয় রাতে। জানতে পারলাম, মাইমানা সাওদা নামক এক কৃষ্ণকায় হাবশিয়া মহিলা হবেন আমার জান্নাতের সাথী। আমি আরো জানতে সক্ষম হলাম যে, এই মহিলা কুফার একটি গোত্রের সঙ্গে বসবাস করেন। সুতরাং আমি ভাবলাম, যেহেতু তিনি জীবিত আছেন তাই তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা যাক। তাই আমি কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

কুফায় পৌঁছে মাইমানাকে খুঁজতে লাগলাম। অনেক লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, তিনি ছিলেন এক বকরি রাখাল মহিলা। একটি অরণ্যে তিনি বকরি চরানোর কাজে নিয়োজিত আছেন। আমি সেই জঙ্গলের নিকট যেয়ে তাঁকে খুঁজে বের করলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন, তার পরনে ছিলো বোরখা। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আশেপাশে অসংখ্য বকরি এবং সেসাথে অনেক নেকড়ে বাঘ ঘুরাফেরা করছিলো। নেকড়ে বাঘগুলো বকরিদের উপর কোনো হামলা চালাচ্ছিলো না।

আমি মাইমানার নিকটে পৌঁছার পর তিনি তার নামায একটু সংক্ষিপ্ত করে নিলেন। নামায শেষে তিনি বললেন, "আব্দুল ওয়াহিদ! এখন নয়- আজ চলে যান। সাক্ষাতের দিন হলো কাল কিয়ামত।"

আমি বললাম, "আল্লাহ আপনার উপর রহমত নাজিল করুন। আপনি কি করে জানলেন, আমি আব্দুল ওয়াহিদ?"

মাইমানা: "আপনি কি জানেন না, অসীম সেই রূহানী জগতে একদা সকল রূহকে সৈন্যবাহিনীর মতো একত্রে দাঁড় করানো হয়েছিল?"

আমি বললাম, "জী হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা তখন প্রশ্ন করেছিলেন,

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

"আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?" (৭:১৭২)

সকলে জবাব দিয়েছিলো,

قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

"অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি" (৭:১৭২)

মাইমানা: "সে সময় যার পাশে যে ছিলো, তাদের একে অন্যকে এ জগতে ও পরজগতে সনাক্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন। সুতরাং আপনাকে আমি কেনো চিনতে পারবো না?"

আমি বললাম, "আমাকে কিছু উপদেশ দিন।"

মাইমানা: "আপনার মতো সুখ্যাত এক বক্তার পক্ষে আমার নিকট নসিহত চাওয়া সত্যিই অদ্ভুত! তবে আমি সালিহীনদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, মহান আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির সঙ্গে ইশকের যোগাযোগ রক্ষা করেন না, যে জাগতিক বস্তুর পেছনে ছুটে আছে। অথচ যা কিছু তাকে দেওয়ার তা অবশ্যই তিনি দিয়েছেন। নৈকট্যের পরিবর্তে তাকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর ইশকের সুধা পানের পরিবর্তে তার জীবনে সম্পৃক্ত হয় ভীষণ দুঃখ-যাতনা ও ভয়-ভীতি।"

এরপর মাইমানা নীচের ক'টি পংক্তি আবৃত্তি করলেন:

হে বক্তা! আপনি অন্যকে উপদেশ ও সান্ত্বনা দান করেন,
অপরকে আপনি পথভ্রষ্টতা থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন,
অথচ, নিজে সেই পথভ্রষ্টতার মধ্যে আবদ্ধ আছেন!
যেদিন আপনি অনুশোচনা করবেন, কথা ও আ'মলে মিল রাখবেন,
সেদিন আপনার নসিহত শ্রোতার অন্তরাত্মায় যেয়ে প্রভাব ফেলবে।

আমি এবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই বকরি ও নেকড়ে বাঘ কিভাবে একই স্থানে অবস্থান করছে?"

তিনি বললেন, "আপনি আপনার কাজে যেয়ে নিজেকে নিমজ্জিত করুন! আমি আমার প্রভুর সঙ্গে শন্তিচুক্তি করেছি। আর তিনি শন্তিচুক্তি করেছেন বকরি ও নেকড়ে বাঘের মধ্যে!"

ইন্তিকাল

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবে ইন্তিকাল করেছিলেন এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। তবে তাঁর মৃত্যু হিজরি ১৭০ থেকে ১৮৬ সনের মধ্যে কোনো এক তারিখে হয়েছিল বলে সবাই মত পোষণ করেছেন। বসরা শহরে তাঁর সমাধি অবস্থিত। তাঁর খলীফাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক'জন ছিলেন হযরত খাজা ফুজাইল বিন আয়াজ, হযরত খাজা আবুল ফজল বিন রাযীন এবং হযরত খাজা আবু ইয়াকুব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। চিশতিয়া তরীকার সিলসিলা অনুযায়ী খাজা ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হচ্ছেন পরবর্তী শায়খ। সুতরাং আমরা পরবর্তীতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর বর্ণনা তুলে ধরছি।

পরিচ্ছেদ ৩

হযরত শায়খ খাজা ফুযাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(মৃত্যু: ১৮৭ হিজরি, সমাধি: জান্নাতুল মা'আল্লা, মক্কা মুকাররমা।)

তিনি আবু আলী ও আবুল ফজল নামেও পরিচিত ছিলেন। উজবেকিস্তানের সামারকন্দ কিংবা বুখারায় তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্ণ নাম হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ বিন মাসউদ বিন বিশর। নকশবন্দিয়া তরীকার সিলসিলা অনুযায়ী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে নাম আসে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর। এই সিলসিলায়ও হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিলাফত বিদ্যমান। তিনি হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাড়াও খিলাফত লাভ করেন হযরত আবু ইয়াজ বিনমানসুর বিন মা'মার সুলামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি খিলাফত লাভ করেন হযরত মুহাম্মদ বিন হাবীব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এবং তিনি খিলাফত লাভ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে।

প্রাথমিক জীবনে হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি একদল ডাকাতের সর্দার হিসাবে কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো যা অন্য কোনো ডাকাত বা ডাকাত সর্দারদের মধ্যে ছিলো না। দস্যুদের সর্দার হয়েও তিনি নিয়মিত নামায আদায় করতেন। শুধু তাই নয়, নফল ইবাদত এবং রোযা রাখা তার নিত্যদিনের অভ্যেস ছিলো। এরূপ 'ইবাদতগুজার' দস্যু ফুজাইল বিন আয়াজ পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার এক মহান মকবুল বান্দাতে পরিণত হয়েছিলেন। আর তাঁর তকদির খোলার কারণ ছিলো পবিত্র কুরআন শরীফের একটি আয়াত।

ভাগ্য পরিবর্তন

নিয়মিত নামায, রোযা ও নফল ইবাদতকারী কোনো ব্যক্তি আবার দস্যুদের নেতা থাকবে তা তো কিছুতেই মানায় না। কিন্তু ফুজাইল বিন আয়াজ তা-ই ছিলেন। আল্লাহ্ পাক একদা তাঁর প্রতি করুণার দৃষ্টি দিলেন। স্বীয় পবিত্র কালাম শ্রবণ করিয়ে ফুজাইল বিন আয়াজকে নিজের বন্ধুজনদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। সুবহানাল্লাহ্!

রাত তখন গভীর। ফুজাইল তার তাঁবুতে বসে আছেন। শুনতে পেলেন একদল কাফিলার পদধ্বনি। এরপর খুব অপূর্ব সুরে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনলেন। কাফেলার এক যাত্রী পাঠ করছিলেন:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

"যারা মু'মিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসে নি?"। [সূরা হাদীদ : ১৬]

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতাংশ ও তাঁর গভীর মর্মার্থ হঠাৎ ফুজাইল বিন আয়াজের অন্তরে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করলো যে, তিনি ভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হলো যেনো, আয়াতটি শুধুমাত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। কে যেনো তাকে কঠোর ভাষায় বলতে লাগলো: রে দুর্ভাগা! এভাবে আর কতদিন লুটপাটে নিজেকে জড়িত রাখবে? আল্লাহর পবিত্র দরবারে যেয়ে কী জবাব দেবে? এবার তাওবা করে নিজেকে সংশোধনের পথে নিয়ে যা! তোর পাপের সীমা অতিক্রম করেছে!

নিজের মনের মধ্যে কুরআন পাকের আয়াত এমন শক্ত প্রতিক্রিয়া করলো যে, ফুজাইল লজ্জায়-অনুশোচনায় ভীষণ কাতর হয়ে গেলেন। তিরস্কার ও গ্লানির আতিশয্যে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কোনদিন দস্যুবৃত্তিতে নিজেকে জড়াবেন না। এই অঙ্গীকার কতটুকু ফলপ্রসু হয়েছিল তার প্রমাণ মিললো কিছুক্ষণ পরই।

একদল বণিক ফুজাইলের তাঁবুর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁবুতে বসে তাদের কথা-বার্তা ও মন্তব্য শ্রবণ করছিলেন। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলছিলো,

এদিকে আসা মোটেই ঠিক হয় নি। এখানেই দস্যুসর্দার ইবনে আয়াজের বিচরণস্থল। সে কোন্ দিকে যে হামলা চালায়, কে জানে! আমরা আল্লাহর দরবারে জান-মালের নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় কামনা করছি।

একথা শ্রবণ করে ফুজাইল বাইরে চলে আসলেন। বণিকদেরকে চিৎকার দিয়ে বলে দিলেন, হে বণিকদল! তোমাদের আর চিন্তার কারণ নেই। ডাকাত সর্দার ফুজাইল তাওবাহ করেছে। সে এখন তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে পড়বে। একথা বলে আকুল-আবেগে কাঁদতে কাঁদতে তিনি ছুটে চললেন। মুখে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ! সময় এসে গেছে! আমি আল্লাহর জিকিরের দিকে ছুটে চলছি!"

আল্লাহ তা'আলা আ'লীমুল গাইব। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নয়। হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ যে একদিন তাঁর একান্ত প্রিয় বান্দায় রূপান্তরিত হবেন, তা তো আর তাঁর অজানা ছিলো না। সুতরাং ফুজাইলের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য মূল থেকেই উত্তম পর্যায়ের ছিলো, যার ফলে তিনি তার ডাকাতির তথ্যাদি সংরক্ষণ করে রাখতেন এবং এটা পরবর্তীতে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলো। বান্দার হক্ব আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করেন না। বান্দার হক্ব বান্দার নিকট থেকেই ক্ষমা করিয়ে নিতে হয়। ফুজাইল তার রেকর্ড থেকে সকলকে তাদের মালামাল ফেরৎ দিলেন ও ক্ষমা চাইলেন। সবাই মাল ফেরৎ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিল- কিন্তু এক ইয়াহুদী ছাড়া, সে একটি শর্ত দিয়ে বসলো।

সে বললো, আপনি যে ব্যাগটি আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তা স্বর্ণে পরিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু ফুজাইল তাকে বার বার কসম করে বললেন, "তোমার ব্যাগে স্বর্ণ ছিলো না!" ইয়াহুদী কিছুতেই মানলো না- সে বললো, ব্যাগভর্তি স্বর্ণ ফেরৎ দেওয়া ছাড়া আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।

বাস্তবে ইয়াহুদির ইচ্ছে ছিলো ফুজাইল বিন আয়াজকে পরীক্ষা করা। আল্লাহর দরবারে তাওবাহ তিনি করেছেন সত্য, কিন্তু তা কতটুকু আন্তরিক সে ব্যাপারে ইয়াহুদির সন্দেহ ছিলো। সে ফুজাইলকে বললো, "আচ্ছা ঠিক আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার স্বর্ণভর্তি ব্যাগ ফেরৎ না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে মাফ না

করে দেওয়ার কসম করেছি। তাই আপনার সুবিধার জন্য একটি কাজ করা যায়। আমার ঘরে ঢুকে একটি ব্যাগ দেখতে পাবেন যা স্বর্ণে পরিপূর্ণ আছে। আমি সেটা আপনাকে হাদিয়া দিলাম। এবার তা এনে আমাকে প্রদান করুন- এতে আমারকসম পরিপূর্ণ হবে এবং আমি আপনাকে ক্ষমা করতে সক্ষম হবো।"

ইয়াহুদির কথা মতো হযরত ফুজাইল ঐ ব্যাগটি নিয়ে এসে তার হাতে সোপর্দ করলেন। সে যখন ব্যাগটি খুললো তখন দেখা গেলো সত্যিই এতে শুধু স্বর্ণ বিদ্যমান। এবার ইয়াহুদী ফুজাইলকে আসল রহস্য খুলে বললো, "আপনি যে আল্লাহর দরবারে একান্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে খালিস দিলে তাওবাহ করেছেন এ ব্যাপারে আমি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম। আমি তাওরাতে পাঠ করেছি, যে ব্যক্তি তার তাওবায় আন্তরিক তার হাতে বালুকণা পর্যন্ত স্বর্ণে রূপান্তর হতে পারে। আসলে ঐ ব্যাগে প্রস্তর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমাকে আপনি ইসলামে দীক্ষিত করুন!"

সুবহানাল্লাহ! ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়াহুদির কথাশ্রবণ করে অঝোর দ্বারায় কাঁদতে লাগলেন। দীর্ঘদিন ডাকাতির মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত থেকেও আন্তরিক তাওবার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা আল্লাহর দরবারে এ পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, পাথর স্বর্ণে রূপান্তর করে দিলেন মহান দয়ালু, মেহেরবান, ওয়াদুদ আল্লাহ তা'আলা। ফুজাইল ইয়াহুদিকে বললেন, বলুন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।"

ইলমে মা'রিফাতের সন্ধানে

হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। কিভাবে কোথায় গিয়ে অন্তরে ক্রমশঃ বেড়েওঠা ইশকের পিপাসা নিবারণ করবেন, সেটা

ভাবতে ভাবতে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। একরূপ বেহুঁশ অবস্থায় তিনি ছুটে চললেন কুফা নগরীর দিকে। সেখানে সাক্ষাৎ ঘটলো ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে। তিনি তাঁর সুহবতে কিছুদিন কাটিয়ে ইলমে শরীয়তের উপর প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করলেন। এরপর তিনি চলে গেলেন বসরা নগরীতে। তিনি জানতেন, সেখানে অবস্থান করছিলেন হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণের মনোবাসনা ছিলো হযরত ফুজাইলের, কিন্তু বসরা পৌঁছে জানতে পারলেন, মাত্র ক'দিন পূর্বে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। সুতরাং হযরত বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বাইআত গ্রহণ করলেন। পীরের নির্দেশ অনুযায়ী এবার শুরু হলো আল্লাহর মা'রিফাত লাভের আশায় নফসের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক কঠোর সংগ্রাম। মহান আল্লাহর একান্ত করুণায় অচিরেই তিনি সফল হলেন। ইলমে মা'রিফাতের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করলেন।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক

সুলুকের অবস্থায় তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য পানি বহনকারী হিসাবে কাজ করতেন। দূরবর্তী কূপ থেকে পানি উত্তোলন করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেন আর এর বিনিময়ে লোকে তাঁকে সামান্য টাকা প্রদান করতো।

হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব অল্পই হাসতেন। তখনকার যুগের আরেক প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহ হযরত খাজা আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছি। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে শুধুমাত্র একদিন তাঁকে হাসতে দেখেছি।"

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "আমি শুনেছি হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "যে কেউ নেতৃত্বের পেছনে লেগে থাকবে সে অবশ্যই

অপমানিত হবে।” আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু উপদেশ পেতে আশা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, “নিজেকে অতি নগণ্য মনে করুন। মহান ব্যক্তি হিসাবে জীবিত থাকার আশা পরিত্যাগ করুন।”

মূল্যবান নসিহত

১. তিনি বলেন, যে কেউ প্রেম ছাড়া আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল করে, সে অবশ্যই আত্মম্ভরিতা হেতু ধ্বংস হবে। যে কেউ প্রেম ছাড়া খাওফ (ভীতি) অর্জন করে, সে নিজেকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরে পড়তে দেখবে, কারণ খোদাভীতির ভীষণতা ও নৈরাশ্য তাকে এই অবস্থায় উপনিত করবে। প্রকৃত খোদাভীতি হলো ভয় ও আশার মধ্যবর্তী অবস্থা। এই অবস্থার প্রতিফল হলো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ।

২. সর্বোত্তম নির্জনবাস হলো ঐ স্থানে থাকা যেখানে আমাকে কেউ দেখতে পায় না এবং আমিও কাউকে দেখতে পাই না।

৩. ঈমান তখনই কামিল হবে যখন কেউ যাবতীয় শরয়ী আইন-কানুন মেনে চলবে, হালাল গ্রহণ ও হারাম থেকে বিরহ থাকবে, তাক্বদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং সর্বদা এই খাওফ অন্তরে পোষণ করবে যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা দূরে ঠেলে দিতে পারেন।

৪. রাতের আগমন খুশির কারণ বৈকি। তখন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া যায়। দিনের আগমন চিন্তার ব্যাপার। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা হেতু ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে।

৫. আ'মলী বয়ান দ্বারা কোন লাভ হয় না যদি না সে আ'মল বক্তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

৬. আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ যে আমাকে সালাম দেয় না ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় থাকলেও দেখতে আসে না।

৭. আল্লাহর ভয় যার অন্তরে আছে তার রসনা নীরব থাকে।

৮. সুখে-শান্তিতে বসবাস করার অর্থ আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া। পক্ষান্তরে যার প্রতি আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ আছে সে-ই সর্বাপেক্ষা বেশী বিপদে-আপদে পতিত হয়।

৯. জান্নাতে কাউকে ক্রন্দন করতে দেখলে যেরূপ আশ্চর্য হতে হবে, তারচেয়ে বেশী আশ্চর্যবোধ হয় ঐ লোককে দেখে, যে এই পৃথিবীতে হাসতে থাকে।

১০. মালের যেমন যাকাত আছে তেমনি জ্ঞানেরও যাকাত আছে। আর তাহলো চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা। এ কারণেই আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর চিন্তামগ্নতা ও ধ্যানের মধ্যে থাকতেন।

১১. তিন ব্যক্তিকে পাওয়া আজকাল মুশকিল: একজন আলিম যিনি তাঁর জ্ঞান মুতাবিক আ'মল করেন; একজন পরিপূর্ণ ইখলাসওয়ালা সৎকর্মী এবং এক ভাই যার মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই।

১২. সংসারে প্রবেশ করা কঠিন কিছু নয়- বরং তা থেকে বেরিয়ে আসাই হলো সর্বাপেক্ষা কঠিন।

১৩. এই পৃথিবী একটি পাগলাগারদ ছাড়া আর কিছু নয়! এর অধিবাসীরা পাগল। বন্দীরা যেমন বন্দীশালায় শৃঙ্খলাবদ্ধ, তেমনি সকলেই দুনিয়ার মায়া-মোহে আবদ্ধ।

১৪. দু'টি কাজ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে: অতিরিক্ত নিদ্রা ও অধিক আহার।

১৫. একদা মানুষ তাকে আরাফাতে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি জবাব দিলেন, ফুজাইল যদি তাদের সঙ্গে না থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন!

১৬. পার্থিব জীবনের মূল্যবান পোশাক আর সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। এরূপ আকর্ষণ ও আ'মলই জান্নাতী লেবাস ও সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

১৭. ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হয়, যে অপর কোনো মুসলমান ভাইকে বাহ্যিকভাবে 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করে কিন্তু আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। এরূপ ব্যক্তি অন্ধ কিংবা বধির হয়ে যেতে পারে।

১৮. একদা একব্যক্তি এসে তাঁর নিকট বসলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেনো এসেছো? সে জবাব দিল, আপনার হৃদয় থেকে রূহানী-প্রেম সংগ্রহের আশায় এসেছি। তিনি বললেন, "এটা তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার, প্রেম নয়। হয় তুমি এখান থেকে বিদায় হয় না হয় আমি হবো"।

১৯. একবার উকুফে আরাফাতের সময় সূর্যাস্তের ক্ষণে তিনি নিজের দাড়িতে হাত রেখে বললেন, 'হে ফুযাইল! তোমাকে যদি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেই দেন, তথাপি তুমি আমার জন্য লজ্জার কারণ হবে!"

২০. পৃথিবীতে প্রবেশ অতি সহজ কিন্তু এ থেকে বের হওয়া বড়ো কঠিন।

২১. যে ব্যক্তি আশা করে যে মানুষ তার কথা সর্বদাই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে, সে সত্যিকার জাহিদ (তরকে দুনিয়া) নয়।

২২. নিন্দুক বন্ধু থেকেও উত্তম। কারণ সে তার উত্তম আ'মলের বিনিময় তোমাকে প্রদান করলো।

২৩. একদা হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে আসলেন। হযরত ফুযাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "কোনো এক সময় আপনারা উলামা শহরের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা ছিলেন, কিন্তু এখন আপনারা হয়ে গেছেন অন্ধকারের কারণ। আপনারা ছিলেন মানুষের জন্য আকাশের মধ্যে পথপ্রদর্শনের তারকাস্বরূপ, কিন্তু এখন আপনারা মানুষের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আল্লাহর ব্যাপারে আপনারা লজ্জাবোধ করেন না। আপনারা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করেন অথচ তা হালাল নাকি হারাম তা খোঁজ করে দেখেন না। তারপরও আপনারা মিহরাবে দাঁড়িয়ে হাদীস বর্ণনা করেন!"

এ কথাগুলো হযরত সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাথানত অবস্থায় শ্রবণ করছিলেন আর মনে মনে জপছিলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ!

ইন্তিকাল

হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র মক্কা মুকাররমায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর জান্নাতুল মু'আল্লায় অবস্থিত। কথিত আছে কোনো এক ক্বারী সাহেব তার নিকটে বসে সূরা ক্বারিয়া তিলাওয়াত করাকালে যখন তিনি সবেমাত্র 'আল-ক্বা-রিয়া' শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তখনই হযরত ফুজাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব জোরে 'আল্লা-হু আকবার' উচ্চারণ করে ইন্তিকাল করেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হিজরি ১৮৭ সনে তিনি এই মায়াবী ধরার কোল ছেড়ে মা'বুদের সান্নিধ্যে চয়ে যান।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাঁচজন প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন। এরা হলেন: হযরত শায়খ ইব্রাহীম বিন আদহাম বলখী, হযরত শায়খ মুহাম্মদ সিরাজী, হযরত শায়খ খাজা বিশরে হাফী, হযরত শায়খ আবু রাজা আত্তার এবং হযরত শায়খ খাজা আব্দুল্লাহ সাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এই পাঁচজন মহাত্মানদের মধ্যে চিশতিয়া তরীকানুযায়ী যিনি আমাদের শাজারার অন্তর্ভুক্ত আছেন তিনি হলেন হযরত শায়খ ইব্রাহীম বিন আদহাম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন আমরা তাঁরই জীবনালোচনায় মনোনিবেশ করছি। ওমা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ৪

হযরত শায়খ সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ১৬৬ হিজরি, সমাধি: শামদেশ [সিরিয়া]।)

ইতিহাসখ্যাত এই মহান সুফি সাধকের পঞ্চম পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা মহাত্মন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ তাঁকে হুসাইনী সাইয়্যিদ হিসাবেও দাবী করেছেন। আজ থেকে প্রায় ১২ শত বছর পূর্বে বলখ রাজ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার অপর নাম ছিলো আবু ইসহাক। শায়খুল হাদীস হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাড়াও অপর আরো চারজন মাশাইখে আজমের নিকট থেকে তিনি খেলাফত লাভ করেছিলেন। এরা হলেন: হযরত খাজা ইমরান ইবনে মূসা, হযরত ইমাম বাকির, হযরত শায়খ মানসুর সালমী এবং হযরত খাজা ওয়ায়িস কারনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। (মাশাইখে চিশত দ্র:)

বাদশাহ থেকে দরবেশ

প্রাথমিক জীবনে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলখ রাজ্যের বাদশাহ ছিলেন। বাদশাহ হিসাবে স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত বিলাসপূর্ণ জীবন-যাপন করছিলেন। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টি তার উপর পতিত হয় এবং বাদশাহ থেকে মহাসত্যের সন্ধানে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে ইতিহাসখ্যাত সুফি-দরবেশে পরিণত হন। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে বাদশাহ থেকে দরবেশী জীবনে উপনিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়োন্মচনমূলক ঘটনা।

প্রতিদিনের মতো বলখের বাদশাহ ইব্রাহীম বিন আদহাম স্বীয় উজির-নাজির সভাসদবর্গসহ সিংহাসনে বসে বিচারকার্যে রত ছিলেন। এক পর্যায়ে বিরাট প্রবেশদ্বার পেরিয়ে দৃশ্যত সম্মানসূচক, প্রভাবশীল ও আত্মগৌরবসম্পন্ন একব্যক্তি রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। সভাসদবর্গের কেউই আগন্তুককে চিনতে পারলেন না- স্বয়ং বাদশাহও তাকে ইতোপূর্বে কখনো দেখেন নি। সবাই আগন্তুকের দিকে বাকহারা অবস্থায় তাকিয়ে রইলেন- কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করারও সাহস পাচ্ছিলেন না। আগন্তুক সটান চলে আসলেন সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহের অতি নিকটে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করলেন: "আপনি কে?"
আগন্তুক গম্ভীর, প্রভাবশীল কণ্ঠে জবাব দিলেন: "আমি একজন মুসাফির। থাকার মতো একটি মুসাফিরখানার খোঁজ করছি"।
বাদশাহ: এটা কোনো মুসাফিরখানা নয়! এটা আমার রাজপ্রাসাদ!
মুসাফির: আপনার পূর্বে এখানে কে থাকতো?
বাদশাহ: আমার পূর্বের বাদশাহ।
মুসাফির: আর এই বাদশাহের পূর্বে এখানে কে থাকতো?
বাদশাহ: তার পিতা। কিন্তু কোনদিনই এটা মুসাফিরখানা ছিলো না।
মুসাফির: তা-ই নাকি? সবই তো চলে গেছে! আর মুসাফিরখানায় লোক আসে, থাকে এবং চলে যায়- ঠিক নয় কি?

এরপর আগন্তুক কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাদশাহর মনে উক্ত কথোপকথন ভীষণ রেখাপাত করলো। সেদিন থেকেই তিনি আল্লাহকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে লাগলেন।

অপর আরেক রাতের কথা। বাদশাহ ইব্রাহীম বলখী তার বিলাসপূর্ণ নরম তুলতুলে বিছানার ওপর গভীর নিদ্রামগ্ন। কিন্তু প্রাসাদের ছাদে পদধ্বনির আওয়াজ তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। কার এমন সাহস! প্রাসাদের ছাদে উঠে হাঁটছে? প্রশ্ন করলেন, "কে? ছাদের উপর কে হাঁটছে?" এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রতিত্তোর আসলো, "আমি আমার উটের সন্ধান করছি!"

বাদশাহ: আরে আহাম্মক! তোমার মতো বোকা কাউকে দেখি নি! উটের সন্ধান করছো প্রাসাদের ছাদে?

আগন্তুক: যে ব্যক্তি তুলতুলে আরামপ্রদ বিছানায় শুয়ে আল্লাহর সন্ধানে নিমগ্ন আছে, সে তো- আরো বড়ো বোকা!"

কথাগুলো বাদশাহ ইব্রাহীম বিন আদহামের অন্তরে তীরের মতো বিদ্ধ হলো। হঠাৎ ঐশীপ্রেমের শর বিদ্ধ হয়ে যেনো তার অন্তরাত্মাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে দিল। তিনি আর থেমে থাকতে পারলেন না। সে রাতই বলখের বাদশাহী ছেড়ে ফকীরের বেশে বেরিয়ে পড়লেন। দ্রুত ছুটে চললেন জঙ্গলের দিকে। একটি পাহাড়ের গুহায় যেয়ে আশ্রয় নিলেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে গভীর জঙ্গলে ঢুকে লাকড়ি সংগ্রহ করতেন। এগুলো বিক্রি করে যা কিছু আয় হতো তার অর্ধেক তিনি গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। বাকী অর্ধেক দ্বারা যা কিছু যৎসামান্য খাদ্য কিনে এনে পরবর্তী ৭ দিবস পর্যন্ত এগুলো ভক্ষণ করে জীবন রক্ষা করতেন। গুহার ভেতর ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াজত-মুজাহাদার মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে রাখতেন। এভাবে দীর্ঘদিন কঠোর সাধনা শেষে একদা ঐশী ইশারায় তিনি পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমার দিকে পাড়ি জমালেন।

মুর্শিদের সান্নিধ্যে

সে যুগের প্রসিদ্ধ অলিআল্লাহ হযরত ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন মক্কা শরীফ অবস্থান করছিলেন। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তরীকতের বাইআত গ্রহণ করলেন। মুর্শিদের সান্নিধ্যে থাকা প্রত্যেক মুরীদের জন্য অপরিহার্য, সুতরাং ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শিদ ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাতে থেকে তরীকতের উচ্চতর মাক্বামে উপনীত হলেন। সুলুকের সকল পর্যায় অতিক্রম করে তিনি রূহানিয়্যাতের এক বিশেষ স্থানে আরোহণ করলেন। পরবর্তীতে প্রখ্যাত শাইখুল মাশাইখ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আধ্যাত্মিক জগতের চাবি আউলিয়াদেরকে প্রদান

করা হয়- আর এই চাবি হচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।”

পুনরায় বলখের বাদশাহী গ্রহণের আবদার

বলখের শাসকবর্গ ও নেতারা একদা ছুটে আসলেন হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। তারা বললেন, হযরত! অনুগ্রহ করে বলখে ফিরে চলুন। বাদশাহ হিসাবে আপনার অভাবে রাজ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। আপনি বাদশাহী ছেড়ে আজ এই ছেড়া বস্ত্র পরে যাযাবর অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চলুন! দয়া করে ফের দেশের বাদশাহী গ্রহণ করুন। এসময় ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দজলা নদীর তীরে বসে ছিড়ে যাওয়া স্বীয় জুব্বা সেলাই করছিলেন। তিনি মাথা উত্তোলন করে শাসকবর্গ ও সভাসদদের দিকে তাকালেন। হাতের সূচটি নদীর মধ্যে ছুড়ে মারলেন। তারপর বললেন, “হে দুনিয়ার শাসকবর্গ! আমার এই সূচটি নদী থেকে তুলে আনো দেখি!”

শাসকবর্গ ও নেতারা একে অন্যের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নদীর দিকে তাকিয়ে নির্দেশের সুরে বললেন: “হে নদীর মাছ! আমার সূচটি নিয়ে আসো!” কী আশ্চর্য ব্যাপার, ক্ষণকাল পরই দেখা গেল অসংখ্য মাছ একেকটি স্বর্ণনির্মিত সূই মুখে নিয়ে পানিতে ভেসে ওঠেছে! ইব্রাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবার নির্দেশ দিলেন: “শুধুমাত্র আমার সূচটি নিয়ে আসো!”

একটু পরই দেখা গেল ছোট্ট একটি মাছ হযরতের সূচটি মুখে নিয়ে ভেসে ওঠেছে। তিনি এটি সংগ্রহ করে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা উপস্থিত শাসকবর্গকে বললেন: “আমার রাজত্বের ব্যাপ্তি পুরো পৃথিবীব্যাপী। এবার বলুন, আপনাদের নগণ্য একটি রাজ্যের অধিকারী হওয়ার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?”

জাবালে আবু কুবাইসের কম্পন

একদা মক্কা মুয়াজ্জমায় পবিত্র বাইতুল্লাহর নিকটে একজন সাথীকে নিয়ে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বসা ছিলেন। তিনি তার সাথীকে নসীহত করতে যেয়ে বললেন: "আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দা আছেন যাদের নির্দেশে পাহাড়-পর্বত চলন্ত হয়ে যায়।" কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল বাইতুল্লাহ শরীফের অদূরে প্রাচীন 'আবু কুবাইস' পাহাড়ে সম্পন শুরু হয়ে গেছে! তিনি সাথে সাথে বললেন: "ওহে আবু কুবাইস পাহাড়! থামো! আমি তো শুধু নসীহত করছিলাম- কোনো নির্দেশ প্রদান করি নি।" বলাই বাহুল্য, আবু কুবাইসের কম্পন সাথে সাথে থেমে গেলো।

সত্যিকার তাওয়াক্কুল

একদা তিনি এক কারামতওয়ালা দরবেশ অলিআল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন: "শায়খ! বলুন তো, আপনি জীবিকা নির্বাহ কিভাবে করেন?"

দরবেশ: "যা কিছুই আসে আমি তা-ই ভক্ষণ করি। আর যদি কিছুই থাকে না তাহলে সবর করি।"

ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "শহরের কুকুরগুলোও তো এরূপ করে। আসল তাওয়াক্কুল হলো যা কিছুই আপনার নিকট আসে তা কুরবান করতঃ ধৈর্য ধারণ করা।"

একদিন হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো: "আপনি কার ইবাদত করেন?"

প্রশ্ন শ্রবণ করামাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন লোকটি অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো: হযরত! আপনার এই অবস্থা হলো কেন?

তিনি প্রথমে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

- "যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়।" (নামল : ৮৭)

এরপর বললেন: দেখো, যদি বলি আমি আল্লাহর গোলাম, তাহলে আমি মিথ্যা বলবো কারণ আমি অবশ্যই তাঁর গোলামী করার হক সম্পূর্ণরূপে আদায় করছি না। সুতরাং গোলাম হওয়ার দাবী করা অসম্ভব। অন্যদিকে, যদি বলি আমি তাঁর গোলাম নয়- তাহলেও আমি মিথ্যা বলবো কারণ, এতে কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার ভীষণ ভয় আছে। এমতাবস্থায় ভয় ও নীরবতা অবলম্বন ছাড়া আমার আর কোনো উপায় আছে কি ভাই?

পুলিশ কর্তৃক প্রহার

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেও সব সময় নিজের আয় থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন। নিশাপুরের জঙ্গলে দীর্ঘ ৯ বছর যাবৎ তিনি কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। এ সময় লাকড়ি কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তবে সময় সময় একটি বাগানেও সাধারণ মজুর হিসাবে কাজ করেছেন। একদা এক বাগানে তিনি কর্মরত ছিলেন। এক পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে নির্দেশ দিল: "আমাকে একটি ফল দাও!"

তিনি জবাব দিলেন: "ফলের মালিক আমি নই। তাই ফল দিতে অপারগ।"

পুলিশ এই জবাব শুনে রাগান্বিত হয়ে উঠলো। হাতের ছড়ি দিয়ে ইব্রাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাথায় আঘাত হানলো। তিনি মাথা নীচু করে বললেন: "যে মাথা আল্লাহ জাল্লে শানুহুর নির্দেশ মানে নি তার জন্য এ শাস্তি যথাযথ!"

এরূপ কথা শ্রবণ করে পুলিশ লজ্জা পেয়ে গেল। সে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তিনি আবার বললেন: "যে মাথার জন্য লোকে ক্ষমা প্রার্থনা করতো তা বলখে ফেলে এসেছি।"

মানাজিলে সুলুকের পাঁচটি দরজা

একদা হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন। নিকটস্থ এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে নসীহত করলেন: সালিহীনের স্তরে উপনীত হতে পাঁচটি দরজা খুলতে হবে এবং পাঁচটি দরজা বন্ধ করতে হবে। এই পাঁচটির স্বরূপ হলো: এক. নিয়ামতের দরজা বন্ধ করে কষ্টভোগের দরজা খুলে দেওয়া, ২. মর্যাদার দরজা বন্ধ করে দুর্নামের দরজা খুলতে হবে, ৩. আরাম-আয়িশের দরজা বন্ধ করে কাঠিন্যতার দরজা খুলে দেওয়া, ৪. নিদ্রামগ্নতার দরজা বন্ধ করে জাগ্রতার দরজা উন্মুক্ত করা এবং ৫. সম্পদের দরজা বন্ধ করে ফকিরীর দরজা খুলে দেওয়া।

কিছু লোক তার কাছে এসে বললো: একটি হিংস্র সিংহ এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে। ভয়ে লোকজন চলাফেরা করতে পারছে না। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে সিংহকে নির্দেশ দিলেন: "হে আবুল হারিস! যদি তুমি আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসে থাকো তাহলে সে মুতাবিক কাজ করো- অন্যথায় এখান থেকে ভাগো!"

সিংহ আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সেখান থেকে চলে গেল।

মসজিদ থেকে বহিষ্কৃত

এক কনকনে শীতের রাতে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইশার নামায শেষে মসজিদের ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কোনমতে রাতটি কাটিয়ে দেওয়াই ছিলো তার অভিপ্রায়। কিন্তু মসজিদের ইমাম সাহেব বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, এখান থেকে বের হয়ে যাও! মসজিদের ভেতর

থাকার সুযোগ নাই। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম কাকুতি-মিনতি করে বললেন, হযরত! দয়া করুন। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার পরনে একটি মাত্র ছেড়া জামা। ফযর বাদেই আমি চলে যাবো। কিন্তু ইমাম সাহেব অটল। বললেন, আপনাদের মতো মুসাফিররা এখানে এসে মসজিদে থাকে আর যাওয়ার সময় মূল্যবান বস্তু চুরি করে নিয়ে যায়! হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এসে অনুরোধ করলেও মসজিদে থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তিনি বললেন, জনাব! আমিই ইব্রাহীম বিন আদহাম! ইমাম এবার আরো রাগান্বিত হলেন। বললেন, তুমি তো দেখছি মিথ্যা বলতেও বেশ পটু! তিনি তাঁকে ধরে টেনে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দিলেন। ইমামের ধাক্কায় তিনি মসজিদের কয়েকটি সিঁড়ির উপর উপড়ে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পতিত হলেন।

বাধ্য হয়ে ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদের হাম্মামখানায় (বাথরুমে) আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানে এক ব্যক্তি বাতিসহ বসা ছিল। সে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলো। তিনি তাকে সম্বোধন করে সালাম জানালেন, লোকটি কোনো উত্তর দিলো না। সে তার কর্মে ব্যস্ত থেকে চতুর্দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাকাচ্ছিলো। কাজ শেষে সে সালামের জবাব দিলো। দেরী করে জবাবের কারণ জিজ্ঞেস করলেন হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সে বললো, “আমি অপরের কাজে রত ছিলাম। ভাবলাম তার হক্ব নষ্ট হবে। কারণ জবাব দিতে তো কিছু সময় কেটে যাবে।”

এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি এদিক সেদিক তাকিয়ে কি দেখছিলেন?”

লোকটি জবাব দিলো: “আমার ভয় হচ্ছিলো, মালিকুল মাউত হয়তো উপস্থিত হয়ে যাবেন।”

এরপর সে আরো বললো: “দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ আমি এই দু’আ করে আসছি: হে আল্লাহ! ইব্রাহীম বিন আদহামের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আমার মৃত্যু দিয়ো না। কিন্তু আজো এই দু’আ কবুল হয় নি। যদি মৃত্যু এসে যায় ...।

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন: "আল্লাহ্ পাক আপনার নিকট আমাকে মাথা-চক্কর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন!"

একথা শ্রবণ করে লোকটি ভীষণ আনন্দিত হলো। বললো: "আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করেছেন।"

সে আবেগ-আপ্লুত হয়ে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জড়িয়ে ধরলো এবং বলতে লাগলো: "ইয়া আল্লাহ! এখন আমার অন্তরে আর কোনো ইচ্ছা অবশিষ্ট নেই, একমাত্র একটি ছাড়া: মা'বুদ গো! এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাই।"

আল্লাহ্ পাক তার শেষোক্ত এই আকাঙ্ক্ষা সাথে সাথে পূর্ণ করে দিলেন। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরাবস্থায়ই সে ইন্তিকাল করলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ক্ষৌরকার ও ভিক্ষুক থেকে শিক্ষা

মহাসাধক ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অতি নগণ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, এক ক্ষৌরকার একদা তাঁর ক্ষৌরকর্ম করছিলো। এক শিষ্য ক্ষৌরকারের মজুরী সম্পর্কে বললেন: যদি আপনার কাছে কিছু থাকে তাহলে তাকে দিয়ে দেবেন। ক্ষৌরকর্ম শেষ হওয়ার পর নিজের কাছে থাকা এক-থলে মুদ্রা তিনি তাকে প্রদান করলেন। এমন সময় কোত্থেকে এক ভিক্ষুক এসে হাজির হলো। সে ক্ষৌরকারের নিকট ভিক্ষা চাইলে সেই থলেসহ মুদ্রাগুলো ক্ষৌরকার তাকে দান করে দিলো। এতদশ্রবণে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম চমকে উঠলেন। বললেন, কী করছো মিয়া! এই থলের মধ্যে যে শুধু স্বর্ণমুদ্রা আছে! ক্ষৌরকার কিন্তু একথা শোনেও শান্ত। জবাবে বললো, তাতে কী হয়েছে! এতে যে স্বর্ণমুদ্রা ছিলো তা আমার অজানা নয়। আর যাকে তা দান করেছি সে-ও তা জানে! মনে হচ্ছে আপনার অন্তর চক্ষু এখনো উন্মোচন হয় নি। যে ব্যক্তি

শুধুমাত্র বাহ্যিক ধন-সম্পদ পেয়ে ধনী হয়েছে মনে করে, সে তো প্রকৃত ধনী নয়। অন্তরের ধনে যে ধনবান সে-ই আসল বিত্তশালী।

যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী তৃপ্ত

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো: হুজুর! বাদশাহী পরিত্যাগ করে দরবেশীর পথে কখনো কি কোনদিন আনন্দবোধ করেছেন? জবাবে বললেন, বহুবার আনন্দ বোধ করেছি। তবে একটি ঘটনায় সর্বাপেক্ষা বেশী তৃপ্তি মিলেছে।

একবার আমি নৌকাযোগে কোথাও যাচ্ছিলাম। এলোমেলো কেশ ও ছেড়া কাদামাখা বস্ত্র দেখে নৌকার অন্যান্য আরোহীরা আমার দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। সন্দেহ নেই, তারা আমাকে পাগল ভাবছিলো। তারা আমাকে নিয়ে বেশ তামাশা করছিলো। কেউ কেউ চুল ধরে টান দিলো, কেউবা কিল-ঘুষিও মারলো। বার বার গলাধাক্কা দিয়ে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলার প্রয়াস পেল। কিন্তু আমার মনে আনন্দে ভরপুর! মনে মনে বলছিলাম, হে নফস! জীবনের অধিকাংশ সময় বাদশাহী হালতে বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়েছ- আজ তোমার কেমন শাস্তি হলো!

ইতোমধ্যে নদীতে ভীষণ ঢেউ উঠলো। নৌকা ডুবুডুবু অবস্থা। মাঝি বললো, নৌকার মধ্যে বেশী লোক উঠে গেছে! ভর কিছুটা কমাতে পারলে হয়তো রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু নদীর মাঝখানে কী আর করা যায়। এক দু'জনের নজর আমার দিকে পড়লো। একজন বললো, এই পাগলকে নৌকা থেকে ছুড়ে দেওয়া যায়! সে মরবে না! একটি লোক এসে খুব জোরে আমার কান ধরে টান দিল। বললো: ব্যাটা! এক্ষুণি নদীতে ঝাঁপ দে! আমার মনে হলো কানটা ছিড়ে যাবে। ঠিক এ সময় আমার আত্মায় তৃপ্তি অনুভূত হলো। কারণ অতীত জীবনের বিলাসিতার জন্য এরূপ অপমানজনক শাস্তিই ছিলো আমার প্রাপ্য! তবে সৌভাগ্যবশত নদীতে ঝাঁপ দিতে হলো না। হঠাৎ ঝড় থেমে গেল।

দু'আ কবুল না হওয়ার কারণ

লোকে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলো: হযরত! আজকাল আমাদের দু'আ কবুল হচ্ছে বলে মনে হয় না- এর কারণ কী হতে পারে?

তিনি জবাব দিলেন: আপনারা আল্লাহকে জানেন, কিন্তু তাঁর উপাসনা করেন না। আপনারা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করেন কিন্তু অনুসরণ অনুকরণ করেন না। আপনারা তাঁর নিয়ামত ভোগ করছেন কিন্তু শুকরিয়া আদায় করছেন না। আপনারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ও জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহ থেকে বিরত আছেন। শয়তান আপনাদের পরম শত্রুজেনেও তাকে ঘৃণা করছেন না। মৃত্যু অনিবার্য- কথাটি জানা থাকা সত্ত্বেও আপনাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। মা-বাবাদের কবরস্থ করার পরও আপনারা শিক্ষাগ্রহণ করছেন না। নিজের মধ্যে ত্রুটি আছে বলে ওয়াকিফহাল থাকা সত্ত্বেও অপরের মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় বলুন তো, আপনাদের দু'আ প্রভুর দরবারে কিভাবে কবুল হবে?

তিনি বলতেন, এ পৃথিবীর মানুষ দুনিয়ার বুকে শান্তি ও আরামের সন্ধানে ব্রত আছে। অথচ এগুলো তারা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হচ্ছে। যে রাজত্বের খবর আমরা রাখি তারা যদি তা জানতো, তাহলে অবশ্যই এটা অর্জন করতে যেয়ে একে অন্যের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হতো।

কোনো একদিন একব্যক্তি তার দরবারে হাজির হয়ে ১০ হাজার দীনার তাকে হাদিয়া প্রদান করতে ইচ্ছাপোষণ করলো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, "আপনার ইচ্ছা এটাই কি যে, এই টাকা গ্রহণ করে ফকীরদের তালিকা থেকে আমার নাম মুছে ফেলি? না, আমি তা কখনো গ্রহণ করবো না।"

একদা ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লক্ষ্য করলেন রাস্তার পাশে একজন মাতাল অবস্থায় পড়ে আছে। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছিলো। তিনি অত্যন্ত আদর

করে মুখের ফেনা মুছে দিলেন, এরপর মন্তব্য করলেন: "এই জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর জিকিরের শব্দ বের হওয়া উচিত ছিলো। আহ! কী জঘন্য অভিশাপ এর উপর পতিত হয়েছে!"

একটু পর লোকটির জ্ঞান ফিরে আসলো। তখন ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রস্থান করেছেন। মানুষ তাকে সব কথা খুলে বললো। লোকটির মনে ভীষণ ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে তখনই তওবা করলো এবং জীবনে আর কোনদিন মদ্যপান করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

ঘটনার পর এক রাতে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে দেখলেন একটি আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে: "ওহে! আমার জন্য তুমি তার জিহ্বাকে পবিত্র করেছো। আর আমি তোমার জন্য তার অন্তরকে পবিত্র করে দিয়েছি।"

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সময় সময় ওয়াজ-নসিহত করতেন। একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো: হযরত! কখন আপনি উপদেশমূলক ওয়াজ ফরমাবেন? তিনি জবাব দিলেন: "আমি চারটি কাজে ব্যস্ত আছি। এগুলো শেষ হওয়ার পর তুমি আসতে পারো। এই কাজগুলো হলো:

১. আলমে আরওয়ায় যখন মহান প্রভু যাবতীয় রূহের নিকট থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি রূহসমূহকে দু'টি দলে বিভক্ত করেন: একটি জান্নাতী আর অপরটি জাহান্নামী। আমি সর্বদাই এই চিন্তায় আছি- এই দু'দলের কোনটিতে আমার স্থান তাতো আমি জানি না।

২. যখন মায়ের উদরে সন্তানের আবির্ভাব হয় তখন একজন ফিরিশতা আল্লাহ তা'আলার নিকট জানার ইচ্ছা করে: হে প্রভু! একে আমি ভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান হিসাবে রেকর্ড করবো? আমার নিত্যদিনের চিন্তা হলো: আমাকে ভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান বলে রেকর্ড করা হয়েছে।

৩. যখন মালিকুল মাউত মানুষের রূহ কবজ করে নিয়ে যান তখন প্রশ্ন করেন: 'এই রূহকে আমি মুসলিম না কাফিরদের দলে অন্তর্ভুক্ত করবো?' আমি জানি না,

নিজের রূহের ব্যাপারে ফিরিশতা কোন্ জবাব পাবেন। এটাও আমার সার্বক্ষণিক ভয়।

৪. কিয়ামত দিবসে নির্দেশ দেওয়া হবে: হে অবাধ্যরা! তোমরা আজ পুণ্যবানদের থেকে আলাদা হয়ে যাও! আমি তো জানি না সেদিন কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত হবো? সুতরাং এ ব্যাপারেও আমি সর্বদা চিšতাশীল।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

ঠিক কোন হিজরি সনে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। তবে তিনি **১৬১** কিংবা **১৬২** হিজরিতে ইন্তিকাল করেছিলেন বলে অধিকাংশ জীবনী লেখক উল্লেখ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শতাধিক বছরের হায়াত লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে একটি গায়েবী আওয়াজ অনেকে শোনতে পান: “এখন জগতের ইমাম মৃত্যুবরণ করেছেন!”। সিরিয়া কিংবা মদীনা মুনুওয়ারায় তার সমাধি অবস্থিত।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহামের অনেক খলীফা ছিলেন। তবে দু’জন শাইখুল মাশাইখ হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এরা হলেন, হযরত খাজা শাক্বীক বলখী ও খাজা হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। চিশতিয়া তরীকানুযায়ী আমাদের শাজারায় আসে হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনা করবো।

পরিচ্ছেদ ৫

হযরত শায়খ হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ২০৬ হিজরি, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

এই মহাত্মন বুজুর্গ সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় নি। শাইখুল হাদীস হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মাশাইখে চিশত' নামক গ্রন্থে হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। আমরা তা থেকেই অত্যল্প বর্ণনা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র ৭ বছর বয়সে পবিত্র কুরআনের হাফিজ হয়েছিলেন। ১৬ বছর বয়সের সময় শরীয়তের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন সম্পন্ন করেন। তার উপাধি ছিলো সাদীদুদ্দীন। কথিত আছে, হযরত খিজির আলাইহিস্সালামের ইশারায় তিনি স্বীয় মুর্শিদ হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হয়ে ইলমে মা'রিফাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাত্র ৬ মাস মুর্শিদের সান্নিধ্যে থেকে কঠোর সাধনা শেষে সুলুক ও মা'রিফাতের বিভিন্ন মাক্বাম অতিক্রম করতে সক্ষম হন। খিলাফত লাভের পর থেকে তিনি তরীকতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব রচনায় মনোযোগ দেন। তবে তাঁর রচিত অনেক কিতাবই আজ আর অবশিষ্ট নেই- এগুলো কালের স্রোতে ভেসে গেছে।

সাধনার ক্ষেত্রে হযরত মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তুলনা নেই। তিনি ছ'দিন পর পর খাবার খেতেন। তিনি বলতেন, জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী লোকদের খাদ্য হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি সর্বদা ক্রন্দন করতেন। কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলো: হযরত! আপনি এতো বেশী কাঁদেন কেনো? আপনি কি আল্লাহ তা'আলার ফজল ও রহমতের উপর ভরসা করেন না? তিনি জবাব দিলেন: "পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 'একদল যাবে জান্নাতে আর

অপরদল যাবে জাহান্নামে’। ভাই! আমি তো জানি না, কোন্ দলে আমাকে শরীক হতে হবে?”

প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করলো: এটাই যদি আপনার নিজের অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে অপরদেরকে আপনি মুরীদ করছেন কেনো?

প্রশ্ন শুনে হযরত হুজাইফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর যখন তার জ্ঞান ফিরে আসলো তখন এক গায়েবী আওয়াজ শুনা গেল। উপস্থিত সকলেই এই আওয়াজ শোনতে পেলেন: “হুজাইফাকে জান্নাত লাভের সুসংবাদ প্রদান করো!”

কথিত আছে এই গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করে ৩০০ কাফির হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: ১. যদি কেউ কসম করে বলে, হে হুজাইফা! তোমার আ’মল এ কথাটি প্রমাণ করে না যে, তুমি কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখো। আমি তাকে বলবো: তুমি সত্যি কথা বলেছ! এই কসমের জন্য তোমাকে কোনো কাফফারা দিতে হবে না। ২. সর্বোত্তম গুণ হলো ঘরে পড়ে থাকা। যদি ফরয নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া জরুরী হতো না, তাহলে আমি কখনো ঘর থেকে বের হতাম না।

হযরত মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরত হুজাইফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু হয়েছিল ১৪ কিংবা ২৪ শাওয়াল ২০৬ হিজরি। ইমাম শা’রানীর মতে হিজরি সনটি ছিলো ২০৭।

তাঁর খলীফাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম উল্লেখিত হয়েছে। তবে চিশতিয়া তরীকার আমাদের শাজারাহ মুবারকে যার নাম দেখতে পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন হুজাইফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অপর প্রখ্যাত খলীফা হযরত হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং পরবর্তীতে আমরা তাঁরই জীবন ও সুলুকের হালতের ওপর বর্ণনা তুলে ধরবো।

পরিচ্ছেদ ৬

হযরত শায়খ খাজা আমীনুদ্দীন আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: শাওয়াল ২৭৫ হিজরি, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

বসরা শহরের প্রখ্যাত এই অলিআল্লাহ হিজরি ১৬৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমীনুদ্দীন নামেও পরিচিত ছিলেন। তবে অধিকাংশ জীবনী লেখক তার নাম শুধু হুবাইরাহ ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন। আবু হুবাইরা নামটিও কোনো কোনো কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই অলির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় নি। তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সের ভেতরই ইলমে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে পবিত্র কুরআন হিফজ করে নেন।

হযরত আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অল্প বয়স থেকেই রিয়াজত-মুজাহাদার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মুজাহাদার বিকল্প নেই- হযরত হুবাইরা বাকী জীবনই কঠোর সাধনা ও নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাটিয়েছেন। তিনি সর্বদা ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। প্রতিদিন পবিত্র কুরআন দু'বার পাঠ করার অভ্যাস ছিলো তার।

হযরত হুবাইরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেও যখন মাক্বামে মাকছুদে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অনুভব করলেন, তখন একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লেন। ভাবলেন তাঁর ভাগ্যে বুঝি মা'রিফাত হাসিল সম্ভবপর হবে না। এরপর একদা একটি গায়েবী আওয়াজ তার কর্ণগোচর হলো: "হে আবু হুবাইরা! ফকিরীর রাস্তায় চলার জন্য তুমি খাজা হুজাইফা মারআশীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করো!" গায়েবী এই নির্দেশ তাকে নিশ্চিত

নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে যেনো কিঞ্চিৎ আশার ক্ষীণ আলোর জোগান দিল। তিনি ছুটে চললেন খাজা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে।

হযরত হুবাইরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শিদ হযরত হুজাইফা মরআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে অল্পদিন মাত্র অতিবাহিত করার পরই সুলুকের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলেন। মাত্র বছর খানেক অতিবাহিত হওয়ার পরই তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হলেন। জীবনের শুরু থেকেই কঠোর সাধনা তাঁকে মা'রিফাত হাসিলের রাস্তা অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল, তাই মাক্বামে মাকছুদে উপনীত হতে বেশীদিন লাগে নি।

হযরত আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একা থাকতে ভালোবাসতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় একটি নির্জন কক্ষে কাটিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহর ভয়ে তিনি খুব বেশী ক্রন্দন করতেন। সময় সময় কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এমনকি লোকে মনে করতো তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। খাদ্যগ্রহণেও তিনি বেশ সতর্ক ছিলেন। সুস্বাদু খাবার খেতেন না। শুকনো রুটি বা অনুরূপ স্বাদহীন খাদ্য ভক্ষণ করে কোনমতে জীবন রক্ষা করতেন।

হযরত হুবাইরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একক একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি কোনো ব্যাপারে কিছু জানার জন্য সর্বদাই ক্ষণকালের জন্য হলেও তাওয়াজ্জুহ তথা রূহানী মুরাক্বাবায় নিজেকে স্থির রাখতেন। এভাবে তার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের সঞ্চার হতো। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে তিনি জ্ঞানলাভ করতেন। তিনি বলেছেন, খিলাফত লাভের সময় হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহ মুবারকসহ অতীতের অনেক মহাত্মন পীর-আউলিয়ার রূহ তাঁর মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁরা সবাই তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকেন।

ইন্তিকাল

এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একমত যে হযরত আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৮৭ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ এই মায়াবী

ধরার কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তবে কেউ কেউ ইন্তিকালের সন ২৭৯ হিজরিও বলেছেন। তিনি ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। ইরাকের বসরা শহরে এই মহান অলির সমাধি অবস্থিত।

হযরত হুবাইরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে তরীকতের একটি শাখা আছে যার নাম হলো 'হুবাইরিয়া'। তবে পরবর্তীতে হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরে এই একই তরীকাভুক্ত আমাদের শাজারার নামকরণ হয় 'চিশতিয়া'। হযরত আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কয়েকজন খলীফা ছিলেন। আমাদের চিশতিয়া তরীকার সিলসিলানুযায়ী তাঁর খলীফা হিসাবে যার নাম আসে তিনি হলেন খাজা মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এবার তারই জীবন ও হালতের উপর আলোচনা হবে।

পরিচ্ছেদ ৭

হযরত শায়খ খাজা মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: মুহাররম ২৯৯ হিজরি, সমাধি: দীনাওয়ার, ইরাক।)

হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্তমান ইরাকের হামদান ও বাগদাদ শহরের মধ্যবর্তী দীনাওয়ার নামক একটি শহরের অধিবাসী ছিলেন। সে অঞ্চলের পরম প্রিয় এই মহান তাপসের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসা সবাই করতেন। তিনি কঠোর সাধনা ও চরম তাওয়াক্কুল অবলম্বন করে জীবন কাটিয়েছেন। লোকে তাঁকে 'করীমুদ্দীন মু'নঈম' উপাধিতে ভূষিত করে- যার অর্থ হলো খুব বেশী দয়াপরবশ। তিনি প্রাথমিক জীবনে ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। গরীব-মিসকীনদের প্রতি তাঁর দয়ার সীমা ছিলো না- তাদেরকে তিনি মুক্তহস্তে অর্থ-সম্পদ দান করতেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি ধন-সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করে 'ফকিরী' গ্রহণ করে নেন। এরপর তিনি মক্কা মুকাররমায় চলে যান।

হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, হযরত মুমশাদ উলুবী দিনাওয়ারী এবং একই নামে 'উলুবী' ছাড়া মুমশাদ দীনাওয়ারী একই ব্যক্তি ছিলেন কি না এ ব্যাপারে জীবনীকারদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে উভয়ের মৃত্যু তারিখসহ বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রায় একই হওয়ায় ধারণা করা হয় এই উভয়ে একই ব্যক্তিই হবেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, যেহেতু কোনো কোনো চিশতি সিলসিলায় মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী নাম দেখতে পাওয়া যায় আর কোনো কোনো সুহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলায় 'উলুবী' শব্দ ছাড়া শুধু মুমশাদ দীনাওয়ারী লিখিত আছে তাই বলা যায়, এ দু'জন একই শহরের জীবিত ভিন্ন দু'ব্যক্তি ছিলেন। তবে প্রথমোক্ত মতামত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে জমহুর গবেষক উল্লেখ করেছেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সঠিক অবগত।

নির্জনতা ও সাধনা

হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্জনতা খুব বেশী পছন্দ করতেন। এছাড়া কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদায় সে যুগে তাঁর মতো খুব অল্প জনই জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর সাধনালয়ের দরোজা অধিকাংশ সময় বন্ধ করে রাখতেন। এই বিশেষ কক্ষে সাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ ছিলো। তবে মুসাফির কারো আগমন হলে তিনি কক্ষে ঢুকতে অনুমতি দিতেন। পবিত্র কুরআনের হাফিজ থাকায় তিনি খুব বেশী তিলাওয়াত করতেন। এছাড়া উলূমে জাহির ও উলূমে বাতিনে তিনি ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি খুব বেশী বেশী রোযা রাখতেন। কথিত আছে শিশু থাকাবস্থায় হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো কোনো সময় মায়ের স্তন থেকে দুগ্ধপানে বিরত থাকতেন। কেউ এর কারণ জানতে পারে নি। পরবর্তীতে যুগের অলিআল্লাহ ও মাশাইখগণ তাকে 'মাদারজাদ' (জন্মগত)অলি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

বাইআত গ্রহণ ও খিলাফত লাভ

একদা হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত খিজির আলাইহিস্সালামের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন তাঁর সুহবতে থাকেন। এরপর একদিন হযরত খিজির আলাইহিস্সালাম বললেন, মুমশাদ! তুমি একজন শায়খের হাতে বাইআত গ্রহণ করো। এই নির্দেশ পেয়ে তিনি তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ মুর্শিদে কামিল হযরত খাজা আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। মাত্র ক'দিনের মধ্যে তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হন। ইজাযত প্রদানের সময় তাঁর মুর্শিদ তাকে তাওয়াজ্জুহ দান ও বিশেষ দু'আ করেন। সাথে সাথে হযরত মুমশাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসলো বটে কিন্তু তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এভাবে চল্লিশ বার তিনি জ্ঞান হারান ও ফিরে পান। এরপর তাঁর মুর্শিদ স্বীয় মুখের লালা বের করে মুমশাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। এতে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্থিতি ফিরে পেলেন। শায়খ আবু হুবাইরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, "হে মুমশাদ! তোমার অবস্থা এমন কেনো হলো?" তিনি জবাব দিলেন, "হযরত! দীর্ঘ

ত্রিশ বছর মুজাহাদায় কাটিয়ে আমি যেটুকু অর্জন করেছি, মাত্র ক্ষণকালের এই তাওয়াজ্জুহ এর মাধ্যমে তার থেকে ঢের বেশী মা'রিফাত হাসিল হয়েছে। সুতরাং জ্ঞান হারানো ছাড়া আর কী-ই বা আমার অবস্থা হতে পারে? আসলে মৃত্যু যে আসে নি, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।"

সুহবত

স্বীয় মুর্শিদ খাজা আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাড়াও তিনি ইবনে জালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ আরো কয়েকজন বিশিষ্ট অলির সান্নিধ্য ও সুহবত লাভ করেন। হযরত হুবাইরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে সর্বপ্রথম তরীকতের খিলাফত প্রদান করেন। এরপর অন্যান্য তরীকার সমকালীন মাশাইখও তাঁকে খিলাফত প্রদান করেছিলেন। সুতরাং তাঁর মধ্যে তরীকতের বিভিন্ন সিলসিলার সমন্বয় সাধিত হয় যার ফলে তার পরবর্তী চিশতি মাশাইখদের হালত অনেকটা ভিন্ন ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

১. হযরত মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা ও উপদেশ অত্যন্ত প্রভাবশীল (আসর) ও কার্যকরী ছিলো। অর্থাৎ তিনি ছিলেন 'সাহেবে তা'সির'। মানুষের হৃদয়ে তার কথার প্রতিক্রিয়া শক্তভাবে অনুভূত হতো। একদা তিনি দেখতে পেলেন বেশ কিছু লোক একটি মূর্তির পূজা করছে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর উপাসনা করতে তোমাদের লজ্জাবোধ হয় না?" হযরতের এই বাক্যটি উপস্থিত সকল মুশরিকের হৃদয়ে এতোই ভাবান্তর সৃষ্টি করে দিল যে, সবাই তাঁর নিকট এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিল।

২. একবার এক লোক এসে বললো, হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি জবাবে বললেন, "আমার দু'আর প্রয়োজন নেই! তুমি নিজেই আল্লাহর দরবারে চলে যাও!" সে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ তা'আলার দরবার কোথায়? তিনি বললেন,

"যেখানে তুমি নেই সেখানে!" এরূপ কথা শুনে লোকটি নির্জনতা অবলম্বন করলো এবং অচিরেই তার ভাগ্যের দরোজা উন্মোচন হলো।

কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। পুরো দেশ হঠাৎ বন্যার পানিতে সয়লাব হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল ঐ প্রশ্নকারী লোকটি একখানা মুসাল্লায় বসে পানির উপর দিয়ে চলে আসছেন হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে। হযরত তাঁকে বললেন, তুমি তো বেশ উঁচু স্তরে উপনীত হয়েছো দেখছি। সে বললো, মুর্শিদে আ'লা! সবকিছুই আপনার বদৌলতে হাসিল হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হওয়ার নীতি আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৩. হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক মুরীদ কিছু হালুয়া তৈরী করে তাঁকে আপ্যায়নের অনুমতি চাইলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, ভক্তি ও আনুগত্যের সঙ্গে হালুয়ার সম্পর্ক কী? মুরীদ আর কিছু না বলে উঠে গেলেন। কিন্তু স্বীয় মুর্শিদের মন্তব্যটুকু বার বার তার কানে বাজতে লাগলো: 'ভক্তি ও আনুগত্যের সঙ্গে হালুয়ার সম্পর্ক কী ..... '। তিনি কিছুতেই এই কথাটি ভুলতে তো পারছিলেনই না- উপরন্তু কথাটির প্রতিধ্বনি থেকে তিনি মুক্ত হতেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ছুটে গেলেন একটি জঙ্গলে। কান চেপে ধরলেন। কোনো ফল হলো না- হযরত মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তিটি তিনি পরিষ্কার শোনতে লাগলেন- বার বার। অবশেষ মুরীদ এই কথাটি শুনতে শুনতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই মৃত্যুসংবাদ যখন হযরত মুমশাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কর্ণগোচর হলো তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং আল্লাহর পবিত্র দরবারে অনুতপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া আল্লাহ! হে আমার প্রভু! আমার কথায় আঘাত পেয়ে লোকটির এ অবস্থা হলো। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করুন।

অমূল্য উপদেশবাণী

১. তিনি বলেন, কেউ যদি বিশিষ্ট কোনো বুজুর্গের সুহবতে থাকাকালে মনে করে, সে অনেক কিছু জানে কিংবা সে-ও কম বুজুর্গ নয়- তাহলে সে ঐ বুজুর্গের কাছ থেকে কিছুই ফায়দা হাসিল করতে পারবে না।

২. দেবদেবীর মধ্যে বিভিন্ন ধরন আছে যথা: (ক) নফস (একে দেবতাতূল্য জ্ঞান করে এর পূজা করা - অর্থাৎ নিজের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দেওয়া। কিন্তু সব ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা), (খ) দুনিয়ার ঐশ্বর্য (এগুলোকে রিজিক ও বাঁচার কারণ মনে করা) এবং (গ) স্ত্রী-পুত্রাদি (এদের ছাড়া বাঁচা যাবে না ইত্যাদি মনে করা)। অনুরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, রূপ-গুণ, শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, চতুরতা এমনকি ইবাদাত-বন্দেগী মুক্তিদাতা হিসাবে ভাবাও ইসলাম ধর্মের শিক্ষার পরিপন্থী। করণ এগুলোর কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই। এসব তো আল্লাহর সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহকে সব ক্ষমতার উৎস মনে করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে যাবতীয় উপাসনা করা চাই।

৩. আউলিয়াদের সুহবতে অবস্থান করলে আউলিয়াতূল্য গুণাবলী অন্তরেপয়দা হয়। আর খারাপ লোকের সুহবতে অন্তরে বক্রতা ও খারাপ প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

৪. প্রত্যেক মুরীদের কর্তব্য হলো তার পীরের পরিচর্যা ও দ্বীনি ভাইদের প্রতি সদাচরণ করা। অন্তরের যাবতীয় কু-কামনা পরিত্যাগ করাও সালিকের জন্য অবশ্যকরণীয়।

৫. তাসাওউফের অর্থ হলো অনুপকারী বস্তু পরিত্যাগ করা। আর যেসব বস্তুর দিকে হৃদয়ে আকর্ষণ জন্মে তা পরিত্যাগ করার নাম তাওয়াক্কুল।

৬. আমি কোনো তাপসের দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে নিজস্ব বিদ্যা, জ্ঞান, হালত ও যোগ্যতা একপাশে গুটিয়ে রাখতাম। এরপর তাদের উপদেশবাণী মনদিয়ে শ্রবণ করতাম। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর মা'রিফাতের সন্ধান দিয়েছেন।

৭. অতি সামান্যতম অহমিকা নিয়েও যদি কেউ কোনো সাধকের সুহবতে যায়, তাহলে তার কোনো লাভ হবে না। কারণ অহমিকা সর্বাপেক্ষা বড়ো পর্দা। এর দরুন অন্বেষী ব্যক্তি অলিদের উপদেশ ও হৃদয়ের নূর গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

৮. তিন উপায়ে মা'রিফাত হাসিল হতে পারে: (১) মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে আলোচনা ও মুরাকাবা, (২) দুনিয়ার নীতি ও নিয়মকানুন নিয়ে গভীর গবেষণা করা এবং (৩) আল্লাহর সৃষ্ট জগত সম্পর্কে জানা যে, কিভাবে তা আত্মপ্রকাশ করলো।

৯. কেউ যদি সর্বযুগের তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের যাবতীয় জ্ঞানবান সাধক-আ'রিফদের গুণাবলীর অধিকারী হয়েও মনে করেন যে, তিনি এক বিরাট অলি হয়ে গেছেন, তবুও তিনি কোনদিনই মকবুল আ'রিফের মর্যাদা লাভ করবেন না। কারণ মা'রিফাতের প্রকৃত মর্ম হলো, নিষ্কলুষ হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ তথা জিকিরের মধ্যে ডুবে থাকার সাথে সাথে ফকিরী অবলম্বন করা ও যা কিছু তাকদীরে আছে তা বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়া।

১০. যার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়া, সমসাময়িক পৃথিবীর অবস্থা যা-ই হোক, তার জন্য কিছুই আসে যায় না। অর্থাৎ আ'মল-ঈমান, যিকির-মুরাকাবা তথা সুলুকের কোনো পরিবর্তন নেই- বিশ্বজগতে যতোই রদবদল ঘটুক না কেনো।

১১. আমি একদা এক শায়খের সুহবত লাভ করি যার মধ্য থেকে হাক্বিকাতের নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। আমি তাঁকে নসিহত প্রদানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন: "তোমার সাহসকে শক্ত করে ধরো এবং একে সংরক্ষণ করো। ব্যক্তির উত্তম আ'মলের পূর্বশর্ত হলো সৎসাহস। সাহসী ব্যক্তির জন্য সকল ভালো আ'মল সহজ হয়ে যায়।"

১২. অন্তরকে পবিত্র রাখা, আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে নিত্য সতর্কতা অবলম্বন, তাঁর মর্জি-মাফিক আ'মল করা, মানুষের সঙ্গে মুহাব্বাতের সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদিই হলো তাসাওউফ। দীনের ভাব প্রকাশ করা, আত্মগোপন হয়ে অপরিচিত থাকা এবং অনাবশ্যক কার্যাদি থেকে বিরত থাকার নামই হলো ফকিরী।

১৩. নবী-রাসূলগণের কলব আল্লাহর মুশাহাদায় (বা প্রত্যক্ষ দর্শনে) নিমজ্জিত আছে। আর সিদ্দীকগণের আত্মা দর্শনলাভের চেষ্টায় চিররত।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

হযরত মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে পরে লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার অবস্থা কি বলুন? তিনি জবাব দিলেন, "তোমরা আমাকে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করো না।" তারা বললো, হযরত! কালিমা তায়্যিবাহ বলুন। তিনি বলতে লাগলেন, "আমার যা কিছু আছে সবই প্রভু আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছি। আপনাকে ভালোবাসার পুরস্কার কী এ-ই? দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ আমার সম্মুখে জান্নাত হাজির করা হয়েছে। আমি তো কখনো এর দিকে ফিরেও তাকাই নি! আমি ত্রিশ বছর পূর্বেই আমার মন হারিয়ে ফেলেছি। এটা ফিরে পাওয়ার আর আশা করি না ...। এটুকু বলেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

প্রথমেই বলেছি, হযরত মুমশাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সন-তারিখের উপর গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মাশায়েখে চিশত' গ্রন্থে বলেন, ইমাম শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাবাক্বাত নামক কিতাবে লিখেছেন, খাজা মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরি ২৯৭ সনে ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু খাজীনাহ নামক অপর একটি কিতাবে তাঁর মৃত্যুর সন দেওয়া হয়েছে ২৯৮ হিজরি। তবে 'আনওয়ার' গ্রন্থের লেখক বলেন, হযরত মুমশাদ ১৪ মুহাররম ২৯৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। এ সময় বাগদাদে আব্বাসী খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ ক্ষমতাসীন ছিলেন। এই মতই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধি দীনাওয়ারে অবস্থিত।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বেশ ক'জন প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন। এদের মধ্যে খাজা আবু মুহাম্মাদ, খাজা আবু আহমাদ বাগদাদী, খাজা আবু ইসহাক শামী এবং খাজা ইশতি'দাদ আহমদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আমাদের চিশতিয়া শাজারায় খাজা আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম আসে। তাই এখন আমরা তাঁরই জীবন ও হালতের উপর বর্ণনা করবো। আমরা আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করি।

পরিচ্ছেদ ৮

হযরত শায়খ আবু ইসহাক শরফউদ্দীন শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৩২৯ হিজরি, সমাধি শাম [সিরিয়া]।)

ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিনে এই মহাত্মন বুজুর্গের সমতুল্য সে যুগে খুব অল্পজনই ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান অধিকাংশের মতে সিরিয়া ছিলো তবে কেউ কেউ আফগানিস্তানের চিশত শহরেও বলেছেন। বাস্তবে হযরত আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শিদ হযরত মুমশাদ উলুবী দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে চিশতে এসে ইলমে তাসাওউফচর্চা করেছিলেন। 'চিশতিয়া' তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তাঁর নাম অধিকাংশ ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন সিরিয়া বা শাম দেশে কেটেছে। পরে তিনি দীর্ঘদিন চিশতে অবস্থানের পর শেষ বয়সে আবার সিরিয়ায় গমন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর কোথাও যান নি। মহাত্মন এই জাহিদ প্রায়ই উপবাস থাকতেন। তিনি বলতেন, উপবাসের মধ্যে যে স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করা যায় তা আর কোনো উপায়েই সম্ভব হয় না। আরো বলতেন, ফকীরদের মি'রাজ উপবাসের মধ্যে নিহিত।

বাইআত গ্রহণ, খিলাফত লাভ ও চিশতে গমন

হযরত আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন বাইআত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি একাধারে চল্লিশ দিন ইস্তিখারা করেন। এরপর তিনি একটি গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করলেন: "তুমি যদি মাক্বামে মাকছুদে পৌঁছার ইচ্ছা পোষণ করো তাহলে মুমশাদ দীনাওয়ারীর নিকট চলে যাও!"। সুতরাং শামদেশে অবস্থানরত হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। একদিন হযরত মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু ইসহাককে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথাকার

লোক?” তিনি জবাব দিলেন, আমাকে লোকে আবু ইসহাক শামী বলে ডাকে। তাঁর মুর্শিদ এবার বললেন, “এখন থেকে তুমি ‘আবু ইসহাক শামী চিশ্‌্‌তী’ নামে পরিচিত হবে”। একথা বলে আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খিলাফত প্রদান করে আরো বললেন, “তুমি আফগানিস্তানের চিশত শহরে গিয়ে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তাসাওউফের খিদমাত করো। তোমার পরে এই তরীকার নাম কিয়ামত পর্যন্ত ‘চিশ্‌্‌তিয়া তরীকা’ হিসাবে স্থায়ী হবে।”

সুতরাং মুর্শিদের নির্দেশে হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিশতে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। ইলমে শরীয়ত ও তাসাওউফের খিদমাতে তিনি দীর্ঘদিন এখানে থেকে প্রখ্যাত ‘চিশ্‌্‌তিয়া তরীকা’ সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তাঁরই ওয়াসিলায় চিশত শহরে আল্লাহ তা’আলা চারজন প্রসিদ্ধ শাইখুল মাশাইখের জন্ম দিয়েছিলেন। এমনকি পরবর্তীতে তাঁর নামের সঙ্গে স্বীয় মুর্শিদের ইঙ্গিতানুযায়ী চিশ্‌্‌তী শব্দটিও যোগ হয়ে যায়।

কারামত

হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘সাহেবে কারামত’ অলি ছিলেন। কেউ কোনদিন তাঁর সুহবতে আসার পর আর কখনও পাপকার্যে জড়িত হতে পারতো না। এটা ছিলো তাঁর এক প্রসিদ্ধ কারামত। এছাড়া তাঁর মজলিসে রোগীরা গমন করে আরোগ্য লাভ করতেন। ভ্রমণের সময় শতাধিক লোক তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। কোনো কোনো সময় চোখ বন্ধ করে সবাইকে নিয়ে শত শত মাইলের রাস্তা ক্ষণকালের মধ্যে অতিক্রান্ত করতেন।

একদা অনাবৃষ্টির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় দেশের বাদশাহ হযরত আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে এসে আরজ করলেন, “হযরত! দেশবাসীর কল্যাণের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু’আ করুন”। তিনি হাত উত্তোলন করে দু’আ করলেন। সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। পরদিন বাদশাহ বেশ কিছু উপহারসামগ্রীসহ তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু ইসহাক কাঁদতে লাগলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, “বার বার

আমার এখানে দেশের বাদশাহের আগমন থেকে মনে হচ্ছে আমি কোনো বড় পাপ করেছি। কারণ ধনাঢ্যদের সঙ্গলাভের অর্থ গরীবদের সাথে সঙ্গলাভে হ্রাস হওয়া। আমি ভয় করছি, কি জানি- হয়তো আমার মৃত্যু গরীবদের বদলে ধনীদের সাথে হয়ে যায় কি না”।

ইন্তিকাল

হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঈসায়ী ৯৪০ সালে (৩২৯ হিজরি) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহরে ইন্তিকাল করেন। এখানকার ‘জাবাল কাসিউন’-এ তাঁর মাজার অবস্থিত। পরবর্তীতে এই একই কবরস্থানে প্রখ্যাত তাপস মহাত্মন হযরত ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমাধিস্থ হয়েছেন। তবে কারো কারো মতে হযরত আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবর শামের নিকটে ‘আক্কা’ নামক স্থানে অবস্থিত।

হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুলাফার মধ্যে হযরত খাজা আহমদ আবদাল চিশতি, খাজা আবু মুহাম্মদ ও খাজা তাজউদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তবে আমাদের চিশতিয়া শাজারায় প্রথমোক্ত শায়খের নাম আসে। তাই তাঁরই জীবন ও সাধনার ওপর পরবর্তীতে আলোচনায় যাচ্ছি। আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করি।

পরিচ্ছেদ ৯

হযরত শায়খ আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৩৫৫ হিজরি, সমাধি: চিশত [হিরাত, আফগানিস্তান])

আফগানিস্তানের চিশত শরীফে এই মহাত্মন বুজুর্গের জন্ম হয়েছিল। তাঁর উপাধি ছিলো কুদওয়াতুদ্দীন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। অনেকে বলেছেন, শাহ আহমদ আবদাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্যতায় চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যেতো। বংশের দিক থেকেও তিনি সৌভাগ্যশীল ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো সুলতান ফারসানাফাহ- তিনি 'হুসাইনী সাইয়্যিদ' বংশের লোক ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদুরে নাতি হযরত হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু। হযরত আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র রামাদ্বান মাসের ৬ তারিখ ২৬০ হিজরি সনে চিশতে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মকালীন ঘটনা

স্বীয় মুর্শিদ মুমশাদ দীনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন চিশত শহরে অবস্থান করছিলেন। শহরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্গত সুলতান ফারসানাফাহ এর সঙ্গে তিনিপ্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন। বলাই বাহুল্য আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মহান এক বুজুর্গের সাথে তা'আল্লুক থাকায় তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন। সুলতানের এক বোন ছিলেন। হযরত শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাকে বললেন, আপনার এক ভ্রাতুষ্পুত্র (অর্থাৎ সুলতান ফারসানাফাহর ঔরসে) জন্মগ্রহণ করবে। আপনি আপনার ভাইয়ের প্রতি বিশেষ খিয়াল রাখবেন। তার মুখে যেনো সন্দেহজনক অত্যল্প খাবারও প্রবেশ না করে। বোন এই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে

পালন করলেন। সুলতান যাতে কোনো সন্দেহজনক খাবারও খেতে না পারেন সেদিকে কড়া নজর রাখলেন। এরপর হযরত আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সুলতানের ঘর আলোকিত করে জন্ম নিলেন আবু আহমদ আবদাল। জন্মের সময় বাগদাদে আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ ক্ষমতাসীন ছিলেন। আবু আহমদের বয়স যখন ৭ বছর পূর্ণ হলো, তখন থেকেই তিনি হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে যাতায়াত করতে লাগলেন।

পিতার মদের বোতল ভাঙ্গার ঘটনা

তরীকতের উচ্চ পর্যায়ের মাশাইখদের জীবনেতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, প্রায়ই এদের মাধ্যমে ছোট থাকতেই কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে যা তাঁদের পরবর্তী জীবনের মাহাত্মের ইঙ্গিত বহন করে। হযরত আবু আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ক্ষেত্রেও এরূপ কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যার একটির বর্ণনা এখন আমরা তুলে ধরছি।

হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, হযরত আব্দাল চিশতির পিতার একটি মদের স্টোর বা গুদাম ঘর ছিলো। এতে রক্ষিত ছিলো কিছু পুরাতন মূল্যবান বোতল-ভর্তি মদ। আবু আহমাদ তখন ছোট্ট বালক মাত্র। তিনি একদিন ঐ মদের গুদাম ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর সব মূল্যবান মদের বোতল ভেঙ্গে চুরমার করতে লাগলেন। মহা-মূল্যবান তার সকল মদ এভাবে নিজের ছেলের হাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুনে বাদশাহ ছুটে গেলেন গুদাম ঘরের দরজায়। কিন্তু ভেতর থেকে তালাবদ্ধ থাকায় তিনি কক্ষে ঢুকতে পারলেন না। তিনি ঘরের ছাদে আরোহণ করে ছেলেকে থামাতে চিৎকার দিতে লাগলেন। কিন্তু আবু আহমদ যেনো কিছুই শুনতে পারছিলেন না। তিনি পিতার চিল্লাচিল্লি ও ধমক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার কাজে রত থাকলেন। এরপর একটি পাথর তুলে পিতা ছেলের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! পাথরটি ছেলের উপর যেয়ে শূন্যের উপর ঝুলতে লাগলো। সুলতান এই দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। তিনি নিজের এই ছোট্ট ছেলের সামনে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করলেন। এরপর আর কোনদিন তিনি মদ্যপান করেন নি।

বাইআত গ্রহণ

ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের উপর আবু আহমদ হযরত শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে বাহ্যিক সদন লাভ করেন। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১৬ বছর। কিন্তু কিতাবী জ্ঞান কোনো সময়ই যথেষ্ট হয় না- ইলমের সঙ্গে আ'মলের প্রয়োজন আছে। আর পীর-মুরীদী তথা তাসাওউফ মূলত প্রণালীবদ্ধ একটি রাস্তার নাম, যাকে সুলুক বলে। বিশেষ নিয়ম-কানুন অবলম্বন ছাড়া এ রাস্তায় অগ্রসর হওয়া যায় না। এসব নিয়ম-কানুনের প্রথমটিই হলো কামিল মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরীদ হওয়া। হযরত আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৬ বছর বয়সেই মুর্শিদ হিসাবে হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রহণ করে নিলেন। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী তিনি ১৩ বছর বয়সে (অর্থাৎ বালিগ হওয়ার পরই) বাইআত গ্রহণ করেছিলেন।

আট বছরের কঠোর সাধনা

বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত আবু আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো একদিন শাহজাদা হিসাবে জঙ্গলে শিকারে গমন করেন। পাহাড়ী গভীর অরণ্যে শিকার-কালে তিনি হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলেন। সফরসঙ্গীরা অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর কোন পাত্তাই পেলো না। আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান পেলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত যেদিকে ইচ্ছে হাঁটতে লাগলেন। এরপর হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো অদূরেই হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চল্লিশ জন অলিকে নিয়ে এক জায়গায় বসে আছেন। এই ঐশী-সূলভ দৃশ্য তার মনে গভীর রেখাপাত করলো। তিনি ছুটে গিয়ে হযরত শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পায়ে জড়িয়ে ধরলেন।

এদিকে আবু আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পিতা রাজ্যের বাদশাহ সুলতান ফারসানাফাহ যখন জানতে পারলেন তার সন্তান গভীর জঙ্গলে একটি পাহাড়ের উপর হযরত শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে অবস্থান করছেন, তখন তিনি সাথে সাথে সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করলেন স্বীয় পুত্রকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু

আবু আহমদ কারো কথায় কান দিলেন না। তিনি স্বীয় মুর্শিদের সঙ্গ ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি পাহাড়ের উপরে কঠোর সাধনায় লিপ্ত হলেন। দীর্ঘ আট বছর স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে তিনি জিকির-মুরাকাবা-ধ্যান-সাধনায় কেটে দিলেন। এরপর হযরত আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই প্রিয় মুরীদকে খিলাফত প্রদান করলেন। কথিত আছে হযরত আবু আহমদ আবদাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একাধারে ত্রিশ বছর বিছানায় শয়ন করেন নি। তিনি সারারাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। তিনি খুব বেশী বেশী কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। দৈনিক অন্তত তিনটি খতম পূর্ণ করা তাঁর নিত্যদিনের অভ্যেস ছিলো। তাঁর যুগের সকল পীর-মাশাইখ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, তিনি যুগের কুতুব ও আবদাল ছিলেন। বস্তুত তাঁর নামের সঙ্গে 'আবদাল' শব্দটি যোগ হওয়ার কারণ তা-ই ছিলো।

কারামত

হযরত আবু আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বেশ কিছু কারামত তাঁর জীবনী লেখকরা বর্ণনা করেছেন। ইতোমধ্যে ছোটবেলার একটি কারামত সম্পর্কে আমরা বর্ণনা তুলে ধরেছি। অপর একটি কারামত সম্পর্কে এখন আলোচনা করবো।

একদা তিনি একটি অ-মুসলিম সম্প্রদায়বহুল জনপদ অতিক্রম করছিলেন। এখানকার মানুষ মুসলমানদের উপর খুব বেশী ক্ষেপা ছিলো। এমনকি কারো সন্ধান পেলে তারা তাকে ধরে মারপিট করার পর অগ্নিকুণ্ডে ফেলে পুড়িয়ে দিতো। অত্র এলাকার চতুর্পাশ্বস্থ বহুদূর পর্যন্ত কোনো মুসলমানের বসতি ছিলো না। হযরত আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পেয়ে তারা রীতিমতো তাঁকে প্রহার করতে লাগলো। এরপর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কিন্তু তাঁকে ধরে সেখানে ফেলে দিতে সাহস পাচ্ছিলো না। ইতোমধ্যে কুণ্ডের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু আহমদ আবদাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আমাকে আপনারা জোর করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আমি স্বেচ্ছায় অগ্নিতে পতিত হবো!" একথা শুনে সবাই অবাক হলো। এরপর তিনি

সত্যিই একখানা মুসাল্লা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে নিজে লাফ মেরে পড়ে গেলেন। দেখা গেলে সাথে সাথে আগুন নিভে গেছে! কাফিররা এই অত্যাশ্চর্য কারামত অবলোকন করে সবাই কালিমা তায়্যিবাহ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করে মহাসত্যের ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল। কথিত আছে কয়েক শত লোক সেদিন হযরত আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ হিসাবে তিনি কখনো কারো নিকট থেকে 'হাদিয়া' গ্রহণ করতেন না। এছাড়া সুস্বাদু খাবার কিংবা শানদার বস্ত্র পরিধান থেকে তিনি দূরে থাকতেন।

ইন্তিকাল

হিজরি ৩৫৫ সনের জুমাদিউল আখির মাসের ৩ তারিখ হযরত শাহ আবু আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মায়াবী ধরার কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। চিশত শহরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। হযরতের খুলাফাদের মধ্যে খাজা আবু মুহাম্মাদ ও খাজা খোদা বান্দাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। চিশতিয়া তরীকার আমাদের শাখানুযায়ী যে শায়খের নাম আসে তিনি হলেন প্রথমোক্ত শায়খ খাজা আবু মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা এখন তাঁরই জীবন ও হালতের উপর আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ১০

হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: রবিউল আউয়াল ৪১১ হিজরি, সমাধি: চিশত)

চিশতিয়া তরীকায় সাধারণত পিতা থেকে পুত্র খলীফা নিযুক্ত হন না। কিন্তু যোগ্যতা থাকলে এতে কোনো দোষ নেই। শাহ আবু মুহাম্মদ বিন আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা হযরত আহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা ছিলেন। অবশ্য এরূপ খলীফা নির্ধারণ যদি সর্বদা হতে থাকে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবার নয়। তাসাওউফে পরিবারতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। একমাত্র যোগ্যতা তথা রূহানিয়্যাতের উপর নির্ভর করে, কে কার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপাধি ছিলো ওয়ালীউদ্দীনএবং নাসিরুদ্দীন। তিনি মাদারজাদ ওলি ছিলেন। মায়ের উদরে থাকাবস্থায় জিকরুল্লাহর শব্দ শুনা যেতো। হুসাইনী সাইয়্যিদ এই মহাত্মন ৩৩১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অবশ্যই চিশতিয়া তরীকার প্রখ্যাত শাইখুল মাশাইখ হযরত আবুআহমদ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন। জন্মমুহূর্তে হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭ বার কালিমা তায়্যিবাহ পাঠ করেছিলেন। মায়ের কোলে থেকে দুগ্ধপান অবস্থায়ও তিনি জিকির করতেন। শিশুকালে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় উপরের দিকে তাকিয়ে জিকির করতে থাকতেন। শিশু আবু মুহাম্মদের মধ্যে এরূপ 'কারামত' প্রকাশ পাচ্ছে দেখে সবাই অবাক হয়ে যেতেন। তিনি যে পরিণত বয়সে খুব উঁচু দরজার একজন ওলি হবেন সে ব্যাপারে কেউই সন্দেহ পোষণ করেন নি। আসলে মাদারজাদ (জন্মগত) ওলির আবির্ভাব খুব অল্পই হয়ে থাকে। শিশুকালে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন কারামত অবলোকন করে অনেক

অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন বলেও প্রমাণ মিলে। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে এসব বর্ণনা এসেছে।

বাইআত গ্রহণ ও নির্জনবাস

হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগত ওলি হয়েও পিতার নির্দেশে মাত্র ৭ বছর বয়সেই বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হলো যে, ওলিরাও মুর্শিদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এর কারণ হলো, যে কোনো মুহূর্তে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া সেই জন্মগত ওলির পক্ষেও সম্ভব। নিষ্পাপ একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ)- আর কেউ নন। কামিল মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে নিলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও তার দ্বারা পথভ্রষ্টতা থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ থাকা যায়।

এই অল্প বয়সে পিতার হাতে বাইআত গ্রহণের পর হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো ৫ বছর তথা ১২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নির্জনবাস করেন। তিনি প্রত্যহ রোযা রাখতেন এবং ইবাদাত-বন্দেগী-মুজাহাদায় জড়িত থাকতেন। এতো অল্প বয়সে খুব কম ব্যক্তিই তাসাওউফের রাস্তায় এতদূর ভ্রমণ করতে পেরেছিলেন। ইতিহাসে এর প্রমাণ খুবই বিরল। তিনি শীঘ্রই পিতার নিকট থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হোন।

একটি কারামত

আগেই বলেছি, হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা ওলিআল্লাহ ছিলেন। তাঁর জিকিরের হালত ছিলো অসাধারণ। একদা এক নদীর তীরে বসে তিনি নিজের ছেড়া চাদরখানা সেলাই করছিলেন। তাঁর কলব থেকে জিকিরের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছিলো। এমন সময় দেশের বাদশাহ সেখানে এসে হাজির হলেন। হযরতের ফকিরী অবস্থা দেখে তার দয়া হলো- বললেন, হযরত এই থলেটি গ্রহণ করুন। থলেটি দীনারে পরিপূর্ণ ছিলো। হযরত আবু মুহাম্মদ বাদশাহের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জবাব দিলেন, “বাদশাহর নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ আমাদের রীতি

বিরুদ্ধ কাজ। সুতরাং আপনার টাকা আমি গ্রহণ করতে অপারগ। মাফ করুন।" কিন্তু বাদশাহ নাছুড়বান্দাহ- হযরতকে তা গ্রহণের জন্য বার বার আবদার করছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর দৃষ্টি নদীর পানির দিকে নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল অসংখ্য মাছ ভেসে উঠেছে এবং প্রতিটির মুখে একেকটি স্বর্ণমুদ্রা শোভা পাচ্ছে! মৎসগুলো হযরতের দিকে সাঁতার কেটে চলে আসছিলো। বাদশাহ এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। হযরত আবু মুহাম্মদ বললেন, "হে আমার বাদশাহ নামদার! বলুন তো, যে ব্যক্তির নিকট এই বিরাট ধনভাণ্ডারের চাবি বিদ্যমান, তার কাছে আপনার এই থলেভর্তি দীনারের মূল্য কী-ই বা হতে পারে?"

বাদশাহ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে রইলেন। এরপর দু'আ চেয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

আবিদা বোনকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন

হযরত আবু মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক আবিদা বোন ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী ও জিকির-মুরাকাবায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি বলতেন, বিবাহের প্রয়োজন কী? একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ ছাড়া আমার জীবনের আর কোন অভিপ্রায় নেই। অবশেষে একদা ভাই আবু মুহাম্মদ এসে বললেন, বোন আমার! আমার ইচ্ছে হচ্ছে তুমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও।

- কিন্তু কেন ভাই? হযরত রাবিয়া বসরী রামহাতুল্লাহি আলাইহা অবিবাহিত থেকেই তো আল্লাহর এক মহান বান্দী হয়েছিলেন।

- জানি। তবে আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তোমার পেটে এক সুসন্তান জন্ম নেবে। তিনি হবেন যুগের কুতুল আক্বতাব। সুতরাং বিবাহ করে নাও।

কিন্তু এরপরও তাঁর বোন রাজী হলেন না। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, “আমি সর্বদাই আল্লাহর জিকিরের মধ্যে আছি, আমি বিবাহ করবো না!”। এরপর এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন তার পিতা হযরত আবদাল চিশতি এসে বলছেন, “মা গো আমার! তুমি বিয়ে করে নাও- তোমার উদরে জন্ম নেবেন কুতুল আকতাব।”

একই সময় পরবর্তীতে যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল সেই মুহাম্মদ সাম'আন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। যা হোক, অবশেষে তাঁর সঙ্গে হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বোনের বিবাহ সম্পন্ন হলো। আর চিশতিয়া তরীকার পরবর্তী শাইখুল মাশাইখ খাজা আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই দাম্পত্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু মুহাম্মদের খুলাফাবৃন্দের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান খলীফা।

জিহাদে অংশগ্রহণ

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ মুসলমানদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। এটি ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু মুহাম্মদ বিন আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবদ্দশায় গজনির সুলতান মাহমুদ ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে অনেকবার অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বিশেষ করে সমনাথ মন্দিরে তাঁর ১৭ বার আক্রমণ ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শেষের বার বেশ ক'জন মুরীদসহ সুলতান মাহমুদের সঙ্গে মুজাহিদ হিসাবে সমনাথ মন্দির আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

চিরবিদায়

আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিম ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন, মহাত্মন সালফে সালিহীন, অলি-আবদাল-গাউস-কুতুবথেকে সাধারণ মানুষ কেউই মৃত্যুর কঠিন বাস্তবতা থেকে মাহরুম নন। একদিন হায়াত শেষ হবেই- কবরে চলে যেতে হবে একাকী। চিশতিয়া তরীকার প্রখ্যাত ওলি

শাইখুল মাশাইখ হযরত আবু মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতিও একদিন এই মহাসত্যকে বরণ করে নিলেন- তথা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অবশ্য আল্লাহর ওলিদের মৃত্যু দুনিয়ার মানুষের জন্য বিরাট অভাব ও ক্ষয়ের কারণ হলেও তাঁর নিজের জন্য তা সত্যিই এক মহানন্দের ক্ষণ। কারণ, একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই তিনি তাঁর মাহবুবের নিকট তনু-মন-প্রাণ-আত্মাসহ গিয়ে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মহান বান্দার দারাজাতকে বুলন্দ করুন। আমীন।

হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৪১১ হিজরির ৪ঠা রবিউল আউয়াল মাসে এ ধরার কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। কেউ কেউ অবশ্য একই হিজরির রজব মাসের শুরুতে তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে হযরতের বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি চিশত শরীফেই সমাহিত হয়েছেন।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত আবু মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তিনজন প্রসিদ্ধ খলীফার নাম বিভিন্ন জীবনী লেখক উল্লেখ করেছেন। এরা হলেন হযরত আবু ইউসুফ, হযরত মুহাম্মদ কাকু এবং খাজা উস্তাদ মারওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। আমাদের শাজারায় যার নাম আসে তিনি হলেন কুতুবুল আক্বদাস হযরত খাজা আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

পরিচ্ছেদ ১১

হযরত শায়খ আবু ইউসুফ নাসির উদ্দীন বিন সা’মান হুসাইনী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ১ জুমাদিউল উলা, ৪৫৯ হিজরি, সমাধি: চিশত)

আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, হযরত মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাগিনেয় ছিলেন শাহ আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। পৃথিবীতে তাঁর আগমনের সুসংবাদ তাঁর আম্মাজান অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ বিন আবি আহমদ চিশতির বোনও জানতে পেরেছিলেন। তিনি তার পিতা অর্থাৎ আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বলছেন, তারই উদরে জন্ম নেবেন এক যুগশ্রেষ্ঠ কুতুল আক্বতাব। এই খান্দানটি ছিলো হুসাইনী সাইয়্যিদ বংশের। হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ১৩তম ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন মা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার আদুরে সন্তান হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তাঁর জন্ম হয়েছিল চিশতে। নাসির উদ্দীন ছিলো তাঁর উপাধি। তিনি স্বীয় মামা যুগের শ্রেষ্ঠ শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম হযরত খাজা আবু মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলীফা ছিলেন।

পবিত্র কুরআন শরীফের হাফিজ না হওয়ার কারণে তিনি খুব বেশী ক্রন্দন করতেন। এ সময় তাঁর মুর্শিদ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছিলেন। হাফিজহওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তিনি একদিন কাঁদতে কাঁদতে একদম বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এই অবস্থায় তিনি তাঁর মুর্শিদ হযরত আবি আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ‘আলমে ওয়াক্বিয়াহ’ বা রূহানী জগতে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। মুর্শিদ তাকে বললেন, হে আমার ভাগিনেয়! তুমি সূরা ফাতিহা ১০০ শত বার তিলাওয়াত করো। এই নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সূরা ফাতিহা ১০০ বার পাঠ করে নিলেন। আল্লাহর কী কুদরত! তিনি কিছুদিনের মধ্যেই পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করে নিলেন। এরপর তিনি বার বার পবিত্র কুরআন শরীফের খতম খুব বেশী বেশী করতে লাগলেন।

আরো একটি কারামত

একদা হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছু সঙ্গী-সাথীসহ অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার মধ্যে কোথাও যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সবাই খুব তৃষ্ণাতুর হয়ে পড়লেন। সাথে যা পানি ছিলো তা ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আশেপাশে কোথাও পানির সন্ধান মিললো না। হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় যষ্ঠি দ্বারা মাটির উপর আঘাত করলেন। সুবহানাল্লাহ! দেখা গেল মাটি ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে! সবাই তৃপ্তিসহ পানি পান করলেন।

বিবাহের ঘটনা

একবার ভ্রমণে বের হয়েছেন হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কাং নামক একটি জনপদে এসে জানতে পারলেন এখানে এক দরবেশ বাস করেন। সুতরাং তিনি কৌতুহলবশত সেই দরবেশের বাড়িতে মেহমান হিসাবে গমন করলেন। দরবেশের এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিলেন। তিনি রাতে স্বপ্নে দেখলেন পূর্ণিমার চাঁদ তার কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভোরে জেগে উঠেই মেয়ে তার পিতার নিকট ছুটে গেলেন। তিনি স্বপ্নের কথা তাঁর নিকট বর্ণনা করে এর তাবির জানতে চাইলেন। দরবেশ নিজে কিছু না বলে তাঁর মেহমান হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট স্বপ্নের তাবির জানার জন্য চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তিনি স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে এর ব্যাখ্যা করে দিলেন। এতে এটাই ইঙ্গিত ছিলো যে, হযরত আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট দরবেশের মেয়ের বিবাহ হবে। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে দরবেশ তাঁর মেয়েকে হযরত ইউসুফের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। আর এই মেয়ের উদরেই পরবর্তীতে জন্ম নেন যুগের প্রধান চিশতি মাশাইখ হযরত খাজা মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

কঠোর সাধনা

হযরত আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবাদত-মুজাহাদার ক্ষেত্রে কঠোর সাধনা করতেন। তবে ইবাদতে কিছুটাও যদি গাফিলতি হয়ে যেতো তিনি এর প্রতিকার হিসাবে নিজের উপর নিজেই বড় ধরনের শাস্তি আরোপ করতেন। কথিত আছে এরূপ এক শাস্তির অংশ হিসাবে তিনি দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ পানি পান করা থেকে বিরত থেকে ছিলেন। নফস কেনো ইবাদতে শিথিলতা দেখালো, তারই শাস্তি ছিলো এ-ই! তিনি একাধারে ১২ বছর নির্জনবাসে কাটিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি কোনমতে প্রবেশ করে ঘুমোতে পারে- এরূপ ছোট্ট একটি কক্ষ ছিলো তাঁর এই দীর্ঘদিনের নির্জনবাসের আবাসস্থল।

একটি অত্যাশ্চর্য কারামত

একদিন হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক জনপদের উপর দিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে কোথাও ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি মসজিদের নিকট এসে দেখলেন অনেক লোকজন সেখানে জমায়েত আছে। তারা কী একটা সমস্যা নিয়ে বলাবলি করছিলো। হযরত ইউসুফ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, নির্মাণাধীন এই মসজিদের ছাদের জন্য একটি বীম তৈরী করে নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ এটি যথেষ্ট লম্বা নয়। কেউই সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলো না। আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোড়া থেকে নেমে মসজিদের ছাদেরউপর উঠে গেলেন। এরপর ঐ বীমের একপ্রান্তে ধরলেন- এতে দেখা গেল বীমের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিটার পর্যন্ত বেড়ে গেছে! এই আশ্চর্য কারামত প্রত্যক্ষ করে সবাই একেবারে হতবাক হয়ে পড়লো। এরপর হযরত আবু ইউসুফ ছাদ থেকে নেমে নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে গন্তব্য স্থানের দিকে চলে গেলেন।

ইন্তিকাল

হযরত খাজা আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে অধিকাংশ লেখক মতামত পেশ করেছেন যে, তা ছিলো ৪৫৯ হিজরির রজব মাসের ৩ তারিখ। তবে কেউ কেউ বলেছেন সনটি ঠিক থাকলেও মাস এবং দিন ভিন্ন

ছিলো। এসব মতামতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক'টি হলো: জুমাদিউল আখিরের শুরু, প্রথম জুমাদিউল আউয়াল এবং রবিউল আখিরের ৪ তারিখ ইত্যাদি। তবে তাঁর সমাধি যে চিশত শহরেই অবস্থিত এ ব্যাপারে সবাই একমত। তিনি ৮৪ বছরের হায়াত পেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি হযরত আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন তাঁরই সন্তান হযরত খাজা মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তবে তিনি অপর একজন বড় মাফের খলীফা রেখে যান। তাঁর নাম হলো হযরত খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

পরিচ্ছেদ ১২

হযরত শায়খ খাজা কুতুব উদ্দীন মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৫২৭/৫৭৭ হিজরি, সমাধি: চিশত।)

আফগানিস্তানের চিশত শহরকে আল্লাহ পাক চিশতিয়া তরীকার মূল কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এটা ঐ অঞ্চল, শহর, এর আলো-বাতাস, জমিন ও মানুষের জন্য সৌভাগ্যের কারণ বটে। এক, দু'জন নয়, তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাত হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাড়াও এই শহরে একই সাইয়্যিদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন চিশতিয়া তরীকার চারজন শাইখুল মাশাইখ। তাসাওউফের খাদিম এসব বুজুর্গের কঠোর সাধনা ও চেষ্টা-দাওয়াতের ফলেই পরবর্তীতে চিশতিয়া তরীকা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এবং খাস করে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদের পরে একাধিক জগৎখ্যাত চিশতি মাশাইখের জন্ম হয়েছিল যাদের রূহানী প্রভাব আজো সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত আছে। ইলমে তাসাওউফের ইতিহাসে এসব বুজুর্গের অবদান কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয়, অনুসরণীয় এবং প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করেছেন। এই চার মহাত্মন চিশতি মাশাইখের মধ্যে চতুর্থ এবং শেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কুনিয়াত বা উপাধি ছিলো 'কুতুল আক্বতাব' ও 'কুতুব উদ্দীন'। তাঁর অপর দু'টি উপাধি ছিলো: 'শামা' সুফিয়ান' বা 'সুফিদের মোমবাতি' এবং 'চেরাগে চিশতিয়া' বা 'চিশতি তরীকার বাতি'। হুসাইনী সাইয়্যিদ বংশের গৌরব এই মহান বুজুর্গ হিজরি ৪৩০ সালে চিশতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা ছিলেন।

অপূর্ব মেধা

হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মেধা ছিলো অসাধারণ। মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করে নেন। ১৬ বছরের কিশোর হয়েই তিনি জাহিরী তথা ইলমে শরীয়তের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। আর এর কিছুদিন পরই কিশোর মাওদূদ চিশতি তাসাওউফের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কিতাব রচনা করতে সক্ষম হন। এই কিতাবদ্বয়ের নাম ছিলো, "মিনহাজুল আরিফীন" এবং "খুলাসাতুস শারীয়াত"।

যোগ্য পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী

হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স যখন ২৯ বছর তখন তাঁর পিতা প্রখ্যাত চিশতি শায়খ হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকাল হয়। তিনি তরীকতের মুর্শিদ হিসাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার বাহ্যিক ও রূহানী দ্বীনি মিশন সফলভাবে অব্যাহত রাখেন। অসংখ্য লোক তাঁর মুরীদ ও সুহবত লাভে ধন্য হয়। তাঁর মুরীদ ও খুলাফাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিলেন। সঠিক ক'জন খলীফা ছিলেন তা জানা যায় নি। তবে জীবনী লেখকরা হাজারেরও উপরে বলেছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত খাজা মাওদূদ চিশতি সে যুগের প্রধান পীরে কামিল শাইখুল মাশাইখ ছিলেন। তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করতে মুসলিম বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য লোক এসে চিশত শরীফে জমায়েত হতেন। বলাই বাহুল্য মহাত্মন এই সাধকের সান্নিধ্য লাভ করে অনেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে নিজের জীবনকে ধন্য করেছেন।

বিশেষ কারামত

হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি বিশেষ কারামত ছিলো। তিনি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারতেন। হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাঁর রচিত 'মাশাইখে চিশত' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি ছিলেন 'তাই'উল আরদ্ব' অর্থাৎ ক্ষণকালে পৃথিবীর জমিনের উপর চলতে

পারতেন। একদা তিনি তাওয়াফের উদ্দেশ্যে সুদূর মক্কা মুকাররমায় ক্ষণকালের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন।

ফকিরী ও বদান্যতা

তাসাওউফের মাশাইখদের অধিকাংশের জীবন থেকে জানা যায়, তাঁরা 'ফকিরী' জীবন-যাপনকে বেশী ভালোবাসতেন। দুনিয়ার চাকচিক্য, বিলাসিতাপূর্ণ জীবনের প্রতি তাঁরা ভ্রূক্ষেপই করতেন না। এটা দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ-মুক্ত থাকার কারণেই হতো। হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুযোগ থাকাসত্ত্বেও কখনো বিলাসিতাকে পছন্দ করতেন না। দামী কাপড়-চোপড় পরে শানদার জীবন-যাপন ছিলো তাঁর নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তিনি ফকীরদের মতো অতি স্বল্পমূল্যের মোটা সুতার জামা-কাপড় পরিধান করতেন। তাঁর তাওয়াজ্জুহ তথা বদান্যতার মাত্রা ছিলো অসাধারণ। তিনি সব সময় আগেই সালাম জানাতেন। সময় সময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সাহেবে কাশফ

হযরত মাওদূদ চিশতির হালের অবস্থা ছিলো উচ্চ পর্যায়ের। তিনি ছিলেন সাহেবে কাশফ (হৃদয়নেত্র উন্মুক্ত)। তাঁর কাশফের মাক্বামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো 'কাশফে কুলুব' তথা হৃদয়ের উন্মোচন এবং 'কাশফে কুবুর' তথা কবরের অবস্থার উন্মোচন। একদা এক শাহজাদা তাঁর দরবারে এসে হাজির হলেন। বললেন, হযরত! অনুগ্রহ করে কিছু তাবাররুক প্রদান করে আমাকে ধন্য করুন। কিন্তু খাজা সাহেব জবাব দিলেন, তা দেওয়া সম্ভব নয়। শাহজাদা হযরতের কিছু ঘনিষ্ঠজনদের মাধ্যমে সুপারিশ করিয়ে তাবাররুক নেওয়ার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তিনি তাকে একটি টুপি উপহার দিলেন। তবে প্রদানের সময় বললেন, "এই টুপিটিকে তুমি সযত্নে মাথায় পরে এর সদ-ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবে- অন্যথায় সমস্যা হবে!"।

ফেরার পথে শাহজাদা এই টুপি নিয়ে তামাশায় লিপ্ত হলেন। এটাকে মাথায় না পরে তিনি তার জাগতিক কার্যাদিতে মগ্ন হলেন। হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি এই সংবাদ পেয়ে বললেন, "কি হলো, টুপি কি তার কার্য থেকে বিরত রয়েছে?" মাত্র ক'দিন পর দেখা গেলো, ঐ শাহজাদাকে কর্তৃপক্ষ বড় একটি অপরাধের দরুন গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। এরপর শাস্তি হিসাবে তার চোখদ্বয় উপড়ে ফেলা হলো।

ওফাত

শাইখুল মাশাইখ, যুগের শ্রেষ্ঠ রূহানী চিকিৎসক শায়খ খাজা মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৯৭ বছর বয়সে ৪২৭ হিজরির রজব মাসের শুরুতে এই ধরার কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। ইন্তিকালের পর দু'টি অত্যাশ্চর্য কারামত প্রকাশ পায়। হযরতের দু'টি জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ছিলো গায়েবী জানাযা। এতে মানুষ ছাড়া জিন ও ফিরিশতারা অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় জানাযায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এরপর কিছুক্ষণের জন্য পবিত্র মরদেহ আকাশে উড্ডয়ন করে। এই দৃশ্য দেখে অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনি চিশত শরীফে সমাহিত হয়েছেন।

খুলাফাবৃন্দ

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, হযরত খাজা মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ক'জন খলীফা ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। নিম্নে হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'মাশাইখে চিশত' গ্রন্থ থেকে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফার নাম লিপিবদ্ধ করলাম।

খাজা আবু আহমদ, খাজা শরীফ জিন্দানী, শাহ সানজান, শায়খ আবু নাসির শাকীবান, শায়খ হাসান তিবতী, শায়খ আহমদ বাদিরুন, খাজা শবজ পৌষ, শায়খ উসমান আউয়াল ও শায়খ খাজা আবুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এসব মহাত্মন বুজুর্গদের মধ্যে আমাদের চিশতি শাখায় যার নাম আসে তিনি হলেন হযরত খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ মহাত্মন খাজা শরীফ জিন্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনায় আত্মনিয়োগ করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ১৩

হযরত শায়খ হাজী শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: রজব ৬১২ হিজরি, সমাধি: কুনূহ, জান্দানা কিংবা শাম।)

জান্দানা নামক একটি শহরে এই মহাত্মন শাইখুল মাশাইখের জন্ম হয় হিজরি ৪৯২ সনে। তাঁর উপাধি ছিলো 'নূরুদ্দীন' [দ্বীনের আলো]। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত চিশতি মাশাইখ হযরত শায়খ খাজা মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা। অত্যন্ত কঠোর সাধক এই কামিল বুজুর্গ মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসতেন। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি গভীর জঙ্গলে কালাতিপাত করেছেন আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যান-মুরাক্বাবা-মুজাহাদার মধ্যে। জঙ্গলে খাদ্য হিসাবে বৃক্ষের পত্র ও ঘাস ইত্যাদি আহার করে জীবন রক্ষা করতেন। তিনি মূলত মানুষের কাছ থেকে ভেগে দূরে থাকা, ফকিরী ও উপবাস পালন বেশী পছন্দ করতেন। ইশকে ইলাহীর প্রাবল্য তাঁকে এরূপ কঠোর জীবন-যাপনে সম্পৃক্ত রেখেছিলো। রোযা রাখার ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘ তিনদিন পরপর ইফতার করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর আহারের খাদ্য ছিলো লবণমুক্ত শাক-সবজি।

অপরের প্রতি দরদের নমুনা

আল্লাহর বন্ধুরা তাঁর সৃষ্ট বান্দাদেরকে খুব বেশী মুহাব্বত করে থাকেন। এটা তাসাওউফ শাস্ত্রের একটি নিযামও বটে। আর এর মূল কারণ হলো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদেরকে মুহাব্বত করেন। সুতরাং বন্ধু যাকে মায়া করেন তার সার্বিক ভালায়ির চিন্তা ও সাহায্য-সহযোগিতা সেই বন্ধুকে রাজি-খুশি রাখার একটি উত্তম উপায়। হযরত শরীফ জান্দানী সম্পর্কিত একটি ঘটনায় এই 'অসহায়কে মুহাব্বতের' উত্তম নমুনা বা আদর্শ ফুটে ওঠেছে যা সর্বযুগের তাসাওউফপন্থী এবং সাধারণ মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে আছে।

একদা এক অসহায় গরীব লোক হযরতের দরবারে এসে হাজির হয়ে আকুল আবেদন করলো: "হে মহাত্মন! আমি ৭টি কন্যাসন্তানের পিতা। কিন্তু এদেরকে বিয়ে দেওয়ার আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই। অনুগ্রহ করে আমাকে একটু উপদেশ দিন, কী করতে পারি? এই মেয়েগুলোকে বিয়ে দিতে না পারলে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমি পিতা হিসাবে এই ব্যর্থতার গ্লানি কিভাবে বহন করতে পারি? এছাড়া আল্লাহর দরবারে কিভাবে জবাবদিহি করবো? দয়া করে একটা উপায় বলে দিন।" ফকীরের এরূপ হৃদয়স্পর্শী আবদার শুনে হযরত শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুক্ষণ ভাবলেন। এরপর বললেন, "আগামীকালের মধ্যে কোনো একটা ব্যবস্থা হতে পারে, ইনশাআল্লাহ!"। একথা বলে তিনি তাকে বিদায় দিলেন।

ফেরার পথে এক কাফিরের সঙ্গে ফকীরের সাক্ষাৎ ঘটলো। তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হওয়ার পর ফকীর নিজের সমস্যার কথা এক পর্যায়ে তাকেও জানালো। সে একথাও বললো, আমি এ ব্যাপারে কোনো একটা সমাধানের জন্য প্রখ্যাত তাপস হযরত শরীফ জান্দানীর নিকটও আবেদন জানিয়েছি। কাফির হেসে বললো, এই লোকটি তো তোমার চেয়েও গরীব! তার দ্বারা কোনো সাহায্যের সম্ভাবনা নেই। তবে কৌতুকবশত কাফির প্রস্তাব দিল, "আমি একটি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি! ঐ সাধককে গিয়ে বলো, তিনি যদি আমার জন্য একাধারে ৭ বছর কাজ করেন তাহলে আমি তাকে ৭ হাজার দীনার বিনিময় প্রদান করবো! এরপর এই টাকা তোমাকে তিনি দিয়ে দেবেন আর এতেই তোমার ৭ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে!"

ফকীর ঐ কাফিরের কথাটি অনেক ভেবেচিন্তে হযরত শরীফ জান্দানীর নিকট যেয়ে ব্যক্ত করলো। সে জানতো কাফিরের এরূপ অদ্ভুত ও অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাবে কোনো কাজ হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য! হযরত তা গ্রহণ করে নিলেন। তিনি ফকীরের সঙ্গে তখনই ঐ কাফিরের বাড়িতে চলে আসলেন। তিনি কাফিরকে বললেন, আপনি ৭ হাজার দীনার এক্ষুণি ফকীর ব্যাটাকে দিয়ে দিন- আমি ৭ বছর আপনার কাজ করতে রাজী আছি। সুতরাং ফকীর ৭ হাজার দীনার নিয়ে গেল এবং তার মেয়েদেরকে বিয়ের ব্যবস্থা করলো। এদিকে মহাত্মন শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাফিরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। হযরতের এই ঘটনার কথা

ক্রমে দেশের বাদশাহের কানে পৌঁছুল। বাদশাহ সাথে সাথে ৭ হাজার দীনার হাদিয়া হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন যাতে তা কাফিরকে প্রদান করে তিনি কাজ থেকে মুক্ত হতে পারেন। হযরত তা গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু সবটুকুই গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর বাদশাহকে বললেন, “কাফিরের সঙ্গে আমার চুক্তি চাকুরীর, সুতরাং টাকার বিনিময়ে তা থেকে অব্যাহতি সম্ভব নয়।” কাফির ব্যক্তিটি হযরতের এরূপ নীতিবান অবস্থান ও মাহাত্ম্য লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলো। সে সাথে সাথে বললো, হযরত! আমি আপনাকে এই চুক্তি থেকে অব্যাহতি প্রদান করলাম। হযরত শরীফ জিন্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাথে সাথে কাফিরের জন্য এই দু'আ করলেন: “আপনি যেভাবে আমাকে আপনার ‘জেলখানা’ থেকে মুক্ত করলেন, মহান রাব্বুল আলামীনও যেনো আপনাকে তাঁর জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।”

হযরত শরীফ জিন্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এরূপ আন্তরিক দু'আর প্রভাব কাফির ব্যক্তির মনকে আন্দোলিত করে তুললো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তার অন্তরে পবিত্র ঈমানের রৌশনী প্রজ্বলিত করে দিলেন- সে সাথে সাথেই হযরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে নিল। সুবহানাল্লাহ! ওলিদের খাস দু'আ কোনদিন বিফলে যায় না। পরবর্তীতে হযরতের শিষ্যত্বগ্রহণ ও সুহবতে থেকে এই ব্যক্তি এক বড় মাফের সাধকে পরিণত হয়েছিলেন।

একদা জঙ্গলে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি হযরত শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলো। লোকটি ছিলো হযরতের ভক্ত। সে কিছু স্বর্ণের তৈরী মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, বাবা! এসব বস্তু দিয়ে আমি কী করবো? এরপর জঙ্গলের দিকে ইশারা করে বললেন, ঐ দেখো! এই জঙ্গলে কী এসবের অভাব আছে?

ভক্ত সেদিকে তাকিয়ে দেখে একটি উঁচু স্থান থেকে অঝোর ধারায় স্বর্ণের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে নীচের দিকে। কথিত আছে হযরত শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাবার পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্য অন্য কেউ আহার করলে ‘মজযূব’ হয়ে যেতো। তিনি সর্বদাই ক্রন্দন করতেন। দেখা যেতো কোনো কোনো সময় তিনি খুব জোরে একটি চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন শুরু করতেন। এরপর কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ

হয়ে পড়তেন। কেউ একদিন জিজ্ঞেস করলো, হযরত! আপনি কেনো এতো বেশী কাঁদেন? তিনি জবাব দিলেন, "আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না বাবা, যখন আমার এই আয়াতটি স্মরণে পড়ে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

-"আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করি নি"। [সূরা যা-রিয়াত : ৫৬]"

চিরবিদায়

মহাত্মন হযরত শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। তিনি ১২০ বছর বয়সে ৬১২ হিজরি সনের ৩য় কিংবা ১০ম রজব মাসে এই মায়াবী ধরার কোল থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে স্বীয় মাহবুবের সান্নিধ্যে চলে যান। আল্লাহ তা'আলা যুগের শ্রেষ্ঠ এই সাধক ওলিআল্লাহকে নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করুন। অনেকের মতে কুনূহ নামক স্থানে তিনি সমাহিত হয়েছেন। তবে অন্যরা বলেন, তাঁর সমাধি জান্দানায়ই অবস্থিত। এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন, শাম তথা দামেস্কে কবরস্থ হয়েছেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।

হযরত শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন ইমামুত্তুরুক হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন সনজরী আজমিরী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ মহাত্মন হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা এখন তাঁরই জীবন ও হালতের উপর মহান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে আলোচনা করার আশা রাখি। ওমা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ১৪

হযরত শায়খ খাজা আবুল মনসুর উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৫৯৭/৬৩৩ হিজরি, সমাধি: জান্নাতুল মা'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা)

হিজরি ৫২৬ সনে নিশাপুরের হারুন নামক স্থানে হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিলো আবুন নূর ও আবুল মনসুর। শরীয়ত ও তরীকতের উপর তাঁর মতো গভীর জ্ঞানবান ব্যক্তি সে যুগে খুব কম লোক ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করেন। আর হিফজ সম্পন্নের পর থেকেই তিনি সর্বদা দৈনিক এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। সে যুগে তাঁর মতো মুজাহিদও কম ছিলেন। নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দীর্ঘ সত্তুর বছর তিনি অতিবাহিত করেন। এই যুদ্ধের অংশ হিসাবে 'কম আহারের' একটি নীতি অবলম্বন করতেন। এছাড়া সপ্তাহে একবার মাত্র কিছু পানীয় গ্রহণ করতেন। (জওহরে ফরিদী)

তরীকতের ইমাম হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ হযরত উসমান হারুনীকে যখন তাঁর মুর্শিদ হযরত শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফতের খিরকা পরিয়েছিলেন তখন প্রথমে 'চার কল্লি' একটি টুপি প্রদান করেন। টুপি মাথায় পরিয়ে মুর্শিদ তার প্রিয় মুরীদকে বললেন: "এই টুপি চারটি বস্তুর প্রতি অনীহার প্রতীক স্বরূপ তোমাকে প্রদান করলাম। আর এ চার জিনিস হলো: ১. দুনিয়া পরিত্যাগ, ২. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আখিরাতের সবকিছু পরিত্যাগ, ৩. ঘুম পরিত্যাগ এবং ৪. নফসের ইচ্ছা পরিত্যাগ। এরপর তিনি বললেন, 'হে উসমান! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহর ইবাদতে রাতদিন মশগুল থাকবে, দরিদ্রতা ও উপবাসে (রোজা) জীবন-যাপন করবে এবং বস্তুজগৎ ও তাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিবর্গ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।' মুরীদ হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব উপদেশ শ্রবণ করার পর জবাব দিলেন,

‘মহাত্মন! আমি আপনার সমস্ত উপদেশ কবুল করলাম।’ এরপর দীর্ঘ তিন বছর মুর্শিদের খানকায় অবস্থান করে কঠোর ইবাদাত ও মুজাহাদায় নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখলেন। হযরত খাজা শরীফ জান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন তাঁর এসব কঠোর রিয়াজত অবলোকন করলেন তখন তাঁকে সাজ্জাদাহ্ নশীন তথা তরীকার শাসনক্ষমতা প্রদান করলেন এবং চিশতিয়া তরীকার খিলাফত প্রদানে ধন্য করলেন।

নামাযের অবস্থা

আনিসূল আরওয়াহ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামাযের অবস্থা এতোই উচ্চপর্যায়ের ছিলো যে, তিনি সময় সময় গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করতেন। তিনি ছিলেন ‘মুজিবুদ্দাওয়াত’ অর্থাৎ তাঁর দু’আ আল্লাহ তা’আলার দরবারে কবুল হয়ে যেতো। নামায পড়ার সময় একদা তিনি গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করলেন, ‘হে উসমান! আমি তোমার নামায কবুল করলাম। তোমার যাকিছু চাওয়ার আছে চাইতে পারো।’ তিনি নামায শেষ করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবদার করলেন, ‘হে বারে ইলাহী! আমি তোমার কাছে তোমার মা’রিফাত কামনা করছি।’ পুনরায় গায়েবী আওয়াজ হলো, ‘হে উসমান! আমি তোমার দু’আ কবুল করে নিলাম, আমার মা’রিফাত দানে তোমাকে ধন্য করলাম; আর কিছু চাওয়ার থাকলে বলো?’ হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। বললেন, ‘ইয়া ইলাহী! আপনার পিয়ারে নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দিন।’ আওয়াজ এলো, ‘আমি তোমার ওয়াসিলায় ত্রিশ হাজার উম্মাতে মুহাম্মদীকে ক্ষমা করে দিলাম!’। নামাযরত অবস্থায় প্রায়ই এরূপ গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করে তিনি কথোপকথন করতেন এবং বারে ইলাহীর পবিত্র দরবারে উম্মাতের মুক্তির জন্য আকুল আবেদন জানাতেন। (আনিসূল আরওয়াহ)

মুসাফির বেশে

হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনের অধিকাংশ সময় মুসাফির অবস্থায় কেটেছে। তিনি তখনকার মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যেতে ভালোবাসতেন। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে তাঁর

সাক্ষাৎ হতো। এদের মধ্যে সবাই মুসলমান ছিলেন না। একদিন তিনি কোনো এক জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ছিলো অগ্নিপূজক। শহরের একটি জায়গায় অনেক লোক জমায়েত হলো। সেখানে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত ছিলো। হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অদূরেই তাঁবু টাঙ্গিয়ে অবস্থান করছিলেন। খাবার তৈরীর লক্ষ্যে উনুনে আগুন দিতে হবে। কিন্তু কোথাও ম্যাচ খুঁজে পেলেন না। খাদিমকে ডেকে হযরত ঐ অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। খাদিম সেখানে পৌঁছে উপস্থিত এক ব্যক্তিকে বললো, 'আমি হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন খাদিম। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন নিয়ে যাবো। দয়া করে তা নিতে অনুমতি দিন।' লোকটি অবাক হয়ে খাদিমের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'তুমি কী বলছো? তুমি জানো না, এই আগুনকে আমরা উপাসনা করি! এই অগ্নি পবিত্র! এ থেকে আগুন দেওয়া নিষিদ্ধ'। খাদিম ফিরে এসে সব কথা হযরতের নিকট বর্ণনা করলো।

এরপর হযরত উসমান হারুনী নিজেই সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট যেয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি অগ্নিকুণ্ডের কাছে উপস্থিত শত শত লোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, "দেখুন ভাইসব! একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই উপাসনার যোগ্য। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এই অগ্নি মোটেই উপাসনার যোগ্য নয়- কারণ, এটারও সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আপনারা এই অগ্নিকে মা'বুদ বানিয়ে মারাত্মক পাপ করছেন, যার ফলে এই আগুন দ্বারাই মহান প্রতিপালক জাহান্নামে আপনাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে কঠোর শাস্তি দেবেন। কিন্তু এই আগুনের উপাসনা থেকে যদি বিরত থাকেন, তাহলে রোজ কিয়ামতে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুনে পুড়ানো থেকে রেহাই দিতে পারেন।"

হযরতের বক্তব্য শ্রবণ করার পর উপস্থিত অগ্নিপূজকদের নেতা এগিয়ে এসে বললো: 'হে সুফি সাহেব! আপনি তো বললেন আগুনকে উপাসনা করেন না। আর এর ফলে জাহান্নামের আগুন আপনাকে স্পর্শ করবে না। তাহলে, দয়া করে এর প্রমাণ এক্ষুণি প্রদান করুন: এই আগুনের মধ্যে পতিত হয়ে দেখিয়ে দিন তো

আপনার কথা সত্য কি না! যদি আপনি পুড়ে মরে না যান, তবেই বুঝবো আপনি সত্যবাদী!"

হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ক্ষণকাল চোখ বন্ধ করেআল্লাহ্র দিকে নিজেকে রুজু করে নিলেন। তারপর দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন। ঐ নেতার ছোট্ট একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে অগ্নিকুণ্ডে লাফ মেরে পড়ে গেলেন! উপস্থিত সবাই ভাবলো, হায়! দরবেশ ব্যাটা নিজে তো মরলো, সাথে সাথে আমাদের নেতার বাচ্চাটিও খোয়া গেল! কিন্তু দীর্ঘ দু' ঘণ্টা পর দেখা গেলো হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাচ্চাসহ অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে আসছেন হাসিমুখে। তাঁর এবং বাচ্চার শরীরের একটি লোমও পুড়ে নি! সুবহানাল্লাহ! উপস্থিত শত শত অগ্নিপূজক তাজ্জব হয়ে গেলো! তাদের মনে ভীষণ ভাবান্তরের সৃষ্টি হলো। তারা ভাবলো, হায়! সারা জীবন অগ্নির পূজা করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি নষ্ট করে ফেলেছি! এখন উপায়? সবাই লুটে পড়লো হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পায়। বললো, হুজুর! আমাদেরকে কালিমা শাহাদাত পাঠ করান! আমরা একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবো। সুবহানাল্লাহ! এদিনই শত শত মুশরিক হযরতের হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো এবং পরে এই ঘটনা জানাজানির পর আরো হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য করলো। হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই কারামতটি ছিলো 'ইব্রাহিমী মু'জিযা' স্বরূপ। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়েও আল্লাহর হুকুমে বেঁচে গিয়েছিলেন। আগুন তাঁর একটি লোমও স্পর্শ করে নি- তার জন্য তা, শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

-"আমি বললাম: হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" [সূরা আম্বিয়া : ৬৯]

এদিকে অগ্নিকুণ্ডে যে ছেলেটি হযরতের সঙ্গী ছিলো তার নেতৃস্থানীয় পিতা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর 'অবদুল্লাহ' ও ছেলে 'ইব্রাহীম' নামে পরিচিত হলেন।

উভয়ে হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে থেকে পরবর্তীতে নেককার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন।

কারামত

উপরে বর্ণিত প্রসিদ্ধ কারামতটি ছাড়াও হযরত উসমান হারুনীর আরো এক দু'টো কারামতের বর্ণনা বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর ক'টির বর্ণনাকারী হচ্ছেন গরীবে নিওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলেন: একদা আমি হযরতের খাদিম হিসাবে সফরসঙ্গী হলাম। আমরা একটি নদীর পারে এসে দেখলাম পারাপারের কোনো খেয়া নৌকো নেই। কিন্তু অপর পারে আমাদেরকে যেতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও যখনখেয়া নৌকো এলো না তখন হযরত আমাকে নির্দেশ দিলেন, চোখ দু'টো বন্ধ করো। আমার নির্দেশ ছাড়া আবার খুলবে না।' আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। চোখ খোলে দেখি আমরা নদীর অপর পারে এসে পৌঁছে গেছি!

একব্যক্তি হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজিরহয়ে আবদার করলো, হযরত! আজ বেশ কিছুদিন হয় আমার ছেলেটি হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার কোন সন্ধান মিলে নি। দয়া করে দু'আ করুন- যাতে আমার হারানো মানিককে পেয়ে যাই। হযরত লোকটির কথা শ্রবণ করে কিছুক্ষণের জন্য মুরাক্বাবা করলেন। এরপর বললেন, "আপনার ছেলে তো বাড়িতে এসে গেছে!"

হযরতের উক্তি শ্রবণ করে তাড়াতাড়ি সে তার বাড়িতে চলে আসলো। ছেলের আগমন সত্যিই হয়েছে দেখে সে একেবারে অবাক! কাল বিলম্ব না করে সে ছেলেকে নিয়ে হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হলো। অত্যন্ত বিনয়ভাবে হযরতকে ধন্যবাদ জানালো। ছেলেকে হযরত জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছিল বাবা? উত্তরে সে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করলো।

সে বললো, “আমাকে একদল বণিক ধরে নিয়ে যায়। এরপর অনেক দূরের পথ ভ্রমণ শেষে অচেনা এক দ্বীপে নিয়ে আটক করে রাখে। সেখানে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আজ ভোরে এক দরবেশ সেখানে হাজির হয়ে বললেন, ‘ব্যাটা! আমাকে জড়িয়ে ধর, আমার পায়ের উপর তোর পা রাখ, এবার চোখ দু'টো বন্ধ করে নে।’ আমি তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করলাম। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার বললেন, ‘এবার চোখ খোলে ফেল’। কী আশ্চর্য, এবার দেখি আমি আমার বাড়িতে এসে গেছি!’ ছেলের পিতা জিজ্ঞেস করলো, ‘ঐ দরবেশের চেহারা কেমন, তা তোর মনে আছে?’ ছেলে উত্তর দেওয়ার পূর্বে কিছুক্ষণ হযরত উসমান হারুনীর মুখপানে তাকালো, এরপর বললো, ‘তিনি ছিলেন এই হযরতের মতো!’।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খিলাফত প্রদান

বিশ্ববিখ্যাত ওলিয়ে কামিল, গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি সঞ্জরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বপ্রধান খলীফা ছিলেন। স্বীয় মুর্শিদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খাজা সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তবে খিলাফত লাভের ঘটনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। মাত্র এক দিন ও রাতের মধ্যেই হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই জগতখ্যাত প্রিয় মুরীদকে সুলুকের যাবতীয় মাক্বাম অতিক্রম করিয়ে মাকসুদে উপনীত হতে সহায়তা করেছিলেন। এরপর তাঁকে খিলাফতের ‘খিরক্বা’ প্রদান করেন। আল্লাহ তা’আলার নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তরকে বলে ‘উসূল ইলাল্লাহ’। এই স্তরই সকল তরীকতপন্থীর মাকসুদ বা হাসিলের আকাঙ্ক্ষা। হযরত খাজা সাহেবের জীবন ও কর্মের উপর পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর মাহবুব হওয়ার তিনটি নিদর্শন

মহান রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য হাসিলের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো ‘ইশকে ইলাহী’র ছোঁয়ার দ্বারা সত্যান্বেষীর হৃদয়ে নূরের আলেকচ্ছটার বিকাশ ও এর প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া। এই স্তর সাধারণত কোনো ওয়াসিলা ছাড়া হাসিল হয় না।

কামিল মুর্শিদের নেক তাওয়াজ্জুহ এবং সর্বোপরি প্রেমাস্পদ স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে মুহাব্বাতের সুদৃষ্টি বান্দার প্রতি পতিত করলেই তার ভাগ্যাকাশে ইশকে ইলাহীর সূর্য পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যতাসহ উদিত হতে পারে। এরূপ ভাগ্যবান আল্লাহপ্রেমিকের মধ্যে তিনটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। এ গুণগুলো হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অতি অল্পকথায় বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহর বন্ধু সেজন, যার মধ্যে বিরাজ করে সাগরের মতো উদারতা।
২. আল্লাহর অলি তিনি, যার অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান সূর্যের মতো প্রেম-স্নেহ-মমতা।
৩. তিনিই আল্লাহর মাহবুব, যার হৃদয়ের বদান্যতা যেনো পৃথিবীর যমিনের মতো।

এখানে সাগর, সূর্য ও জমিনের সঙ্গে ওসব উত্তম গুণাবলীর তুলনা বিরাট মাত্রা ও ধৈর্যের দিকে ইঙ্গিত করে। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার 'অসীম' দয়া-মুহাব্বাতের সঙ্গে তুল্য কেউ বা কোনো কিছু নেই। তবে উদারতা, প্রেম ও বদান্যতা বান্দার মধ্যে যতো বেশী বিকাশ ঘটবে সে ততো বেশী আল্লাহর নৈকট্য হাসিলে ধন্য হবে। শর্ত হলো, ঈমান ও আ'মল। ঈমান ও আ'মল শরীয়তের গণ্ডিসীমার মধ্যে রেখে খোদান্বেষায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাসাওউফের উসূল এটাই।

আগেই বলেছি হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলীফা শরীয়ত ও তাসাওউফের সূর্য-পুরুষ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শিদের বিভিন্ন হালতের বর্ণনা উত্তরসূরীদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আমরা এখন ঐসব কিতাব থেকে বিভিন্ন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি।

১. হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন মুরীদ মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি ছিলেন হযরত গরীবে নিওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিবেশী। নিয়মমতো এই 'পীর-ভাইয়ের' কাপন-দাফনের পর সবাই চলে গেলেন, কিন্তু খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবরের পাশেই কিছুক্ষণ বসে রইলেন। হযরত খাজা সাহেব নিজেই বলেন, আমি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অর্থাৎ গভীর মুরাকাবার মধ্যে) কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কাশফের মাধ্যমে কবরের অবস্থা

অবলোকন করতে লাগলাম। দেখলাম দু'জন ফিরিশতা (আযাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে) এসে আমার পীর-ভাইকে কব্জা করে ফেললো। কিন্তু শাস্তি প্রদানে উদ্যত হতেই দেখলাম, আমার পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (অর্থাৎ উসমান হারুনী) সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি ফিরিশতাদ্বয়কে সম্বোধন করে বললেন, "এ লোককে আপনারা শাস্তি প্রদান করতে পারবেন না- কারণ, সে আমার মুরীদ!" আশ্চর্য! এ কথা শ্রবণ করা মাত্র ফিরিশতাদ্বয় সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। কিন্তু একটু পরই আবার ফিরে এসে বললেন, 'হুজুর! আমরা আপনার সম্মানার্থে ক্ষণকালের জন্য এখান থেকে প্রস্থান করেছিলাম। এ লোকটি আপনার মুরীদ সত্য কিন্তু এ মুরীদ হওয়ার মর্যাদা রক্ষা করে নি- তরীকার অনুসরণকারী ছিলো না।" হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন, "তার কর্ম যাই হোক না কেন, সে নিজেকে আমার নিকট সমর্পণ করায় তার কর্ম আমার কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। অতএব তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করা আমার কর্তব্য। আমি তাই আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি তিনি যেনো তাকে ক্ষমা করে দিন।" কথা শেষ হতেই একটি গায়েবী আওয়াজ শুনলাম, 'হে ফিরিশতাদ্বয়! তোমরা চলে এসো! তাকে শস্তি দিও না। আমি আমার বন্ধুর সম্মানে তাকে মাফ করে দিলাম।" সুবহানাল্লাহ! [আনিসূল আরওয়াহ]

২. হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ঈমান একটি উলঙ্গ জিনিস। তার পোশাক হলো তাক্বওয়াহ (সংযমশীলতা), তার পা হচ্ছে দরিদ্রতা, তার ঘর হলো জ্ঞান এবং তার কথোপকথন হলো:

" أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

[আনিসুল আরওয়াহ]

৩. তিনি বলেন, ঈমানের মূল কখনো হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি পায় না- যে বলে তা কমবেশী হয় সে নিজের অস্তিত্বকে কষ্ট দেয়। কারণ সে মিথ্যা বর্ণনাকারী। কসম সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার! কারো স্বাধীনতা নেই ঈমানের বিষয়গুলো হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি করার।

৪. আহলে সুলুকগণ দুনিয়াকে (অর্থাৎ অতিরিক্ত দুনিয়াদারিত্বকে) দোযখের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করেন।

৫. হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে যেয়ে তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী একবার বসরার রাস্তায় একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে রুটি খাওয়াচ্ছে দেখে বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেছিলেন, হে ইয়াহুদী! তোমার এ কাজ নেকী হিসাবে কবুল হবে না কারণ তুমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত নও। সে জবাব দিল, নেকী হোক বা না, আল্লাহ তা'আলা তো সবকিছু দেখছেন। বেশ কিছুদিন পর মক্কা শরীফে পবিত্র হজ্জের সফরে যেয়ে হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে কাবা শরীফের সামনে সিজদাবনত অবস্থায় দেখতে পেলেন। লোকটি খুব গভীর আবেগে বার বার বলছিলো, "ইয়া রাব্বী! ইয়া রাব্বী!" [হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!]। বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর একটি গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করলেন: "লাব্বায়িকা আবদী!" [হে আমার ইবাদাতকারী! এই তো আমি উপস্থিত!"]। লোকটি যখন মাথা উত্তোলন করলো তখন হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ, এ লোকটিই ইয়াহুদী অবস্থায় বাগদাদের রাস্তায় ক্ষুধার্ত কুকুরকে রুটি খাওয়াচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার সেই কাজকে পছন্দ করে ঈমানের নূর দ্বারা তাকে আলোকিত করে দিয়েছেন।

৬. তিনি বলেন, সেই মুরীদই তার পীরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী যে তার পীরের নিকট হতে যা শুনে তা স্মরণ রাখে এবং মন-প্রাণ দিয়ে মেনে চলে।

হযরত উসমান হারুনীর জীবনাবসান

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি সনজরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আনিসূল আরওয়াহ গ্রন্থে তাঁর মুর্শিদের মৃত্যু তারিখ লিখেছেন ৫ই শাওয়াল ৬০৭ হিজরি। তবে হযরত যাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাশাইখে চিশত গ্রন্থে মাসের তারিখ একই হলেও হিজরি সন লিখেছেন ৬১৭। মৃত্যুকালে হযরত উসমান

হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করছিলেন। সুতরাং সেখানকার প্রসিদ্ধ মুবারকপূর্ণ কবরস্থান ‘জান্নাতুল মাআল্লা’তে তিনি সমাহিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর এই মায়ার বান্দার দারাজাত আরো বুলন্দ করুন- আমীন।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক খলীফা রেখে যান। এদের মধ্যে ভারতবর্ষে মোট চারজন প্রসিদ্ধ খুলাফা ছিলেন। এরা হলেন হযরত গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতি আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তুর্ক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত সাইয়্যিদ লাঙ্গোচি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং খাজা সৈয়দ শায়খ নিজামুদ্দীন ছোগরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমাদের চিশতিয়া তরীকার শাজারায় যার নাম এসেছে তিনি হচ্ছেন প্রথমোক্ত প্রখ্যাত শায়খ তথা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন তাঁরই জীবন ও হালতের উপর বর্ণনা হবে ইনশাআল্লাহ!

পরিচ্ছেদ ১৫

হযরত শায়খ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী সনজরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৬ রজব ৬৩২ হিজরি, সমাধি: আজমির শরীফ, ভারত।)

তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানে তাসাওউফের ইমাম। মূলত তাঁরই মাধ্যমে ভারতবর্ষ ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন দেশে উলুমে মা'রিফাতের সূচনা লাভ করে। আর খাস করে চিশতিয়া তরীকার উন্নয়ন, বিস্তার ও প্রসার লাভে খাজা সাহেবের মতো ইতোমধ্যে আর কেউ তেমন বেশী ভূমিকা পালন করেন নি। আর এ কারণেই অনেকে চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তবে আমরা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছি, চিশতিয়া তরীকাসহ সকল হক্কানী সুফি তরীকার জন্ম স্বয়ং রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই হয়েছিল- যদিও 'তরীকাত', 'চিশতিয়া', 'সুহরাওয়ার্দিয়া', 'কাদিরিয়া', 'মাওলাবিয়া' ইত্যাদি নাম তখনপ্রচলিত হয় নি। এসব নাম বিভিন্ন মাশাইখ বা তরীকতের ইমামের নামানুসারে পরবর্তীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ হিসাবে 'চিশতিয়া তরীকা' নামটি তখন থেকেই সর্বমহলে প্রচার লাভ করে যখন খাজা আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে বর্তমান সিরিয়া থেকে আফগানিস্তানের চিশতে এসে তাসাওউফ চর্চা শুরু করেন।

গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি৫৩৭ (কারো কারো মতে ৫৩৬ হিজরি, ১১৩৮ কিংবা ১১৪২ বা ১১৪১ ঈসায়ী) হিজরি সনে বর্তমান ইরানের সিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সানজার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো সৈয়দ গিয়াস উদ্দীন হাসান এবং মাতার নাম ছিলো সায়্যিদাহ বিবি উম্মালওয়ারা। তিনি বিবি মাহে-নূর নামেও পরিচিত ছিলেন। খাজা সাহেবের ১১তম ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন নবী-দুলালী হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার আদুরে সন্তান শহীদ ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু। সুতরাং হুসাইনী

সাইয়্যিদ বংশের এই মহাত্মন অলির বাল্যকাল স্বীয় জন্মস্থান সিস্তানেই কেটেছিল। মাত্র ৯ বছর বয়সেই তিনি কুরআন শরীফ হিফজ করেন। তবে ১৬ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হন। পিতার মৃত্যুর পর কিশোর খাজা মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কিছু সম্পদের মালিক হন। নিজের একটি ফলের বাগান ছিল। তিনি সেখানেই কাজ করতেন।

মজযূব দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ

অধিকাংশ জীবনী লেখক ইব্রাহীম কাহাঞ্জরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নামক এক আল্লাহর প্রেমে উদাস মজযূব দরবেশের সঙ্গে গরীবে নিওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাতের উল্লেখ করেছেন। এ সাক্ষাৎটি ছিলো তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় একদা হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের ফলের বাগানে কর্মরত ছিলেন। এমন সময় কোত্থেকে এক মজযূব দরবেশ (ইব্রাহীম কাহাঞ্জরী) সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি বৃক্ষের ছায়ায় বসে খাজা সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যুবক মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের গাছ থেকে বেশ কিছু তাজা আঙ্গুর ফলসহ আগন্তুকের নিকট আসলেন এবং ফলগুলো হাদিয়া হিসাবে মেহমানকে প্রদান করলেন। কোনো কথা না বলে মজযূব ফলগুলো ভক্ষণ করে আনন্দিত হলেন এবং নিজের থলে থেকে ফলজাতীয় কিংবা রুটি, অর্থাৎ খাবার কিছু একটা বের করে নিজে তা মুখের ভেতর নিয়ে চিবিয়ে আবার বের করলেন। এরপর তিনি এটি বাগানের মালিক খাজা সাহেবকে প্রদান করে বললেন, খাও। হযরত মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্দ্বিধায় তা ভক্ষণ করে নিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর অন্তরাত্মায় প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ইলমে মা'রিফাতের অপূর্ব নূর যেনো তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আড়ষ্ট করে ফেললো। প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের নূরের মধ্যে তিনি সাঁতার কাটতে লাগলেন। তিনি দেখতে পেলেন পুরো বাগানটি নূরে-নূরে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। এদিকে মজযূব হযরত ইব্রাহীম কাহাঞ্জরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগান থেকে বের হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

উল্লেখিত ঘটনাটির সঙ্গে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক একটি ক্রীতদাসী মেয়েকে চিবিয়ে কিছু খাবার খাওয়ানো এবং হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক শিশু হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খেজুর চিবিয়ে খাওয়ানোর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শেষোক্ত ঘটনাটি আমরা হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও হালতের উপর আলোচনাকালে বর্ণনা করেছি। প্রথম ঘটনাটি হযরত তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: একদা পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু খাবার গ্রহণ করছিলেন। এসময় একটি ক্রীতদাসী মেয়ে এসে তাঁর নিকট কিছু খাবার চাইলেন। তিনি বললেন, আমার সাথে আমার থালায় বসে যাও। কিন্তু মেয়েটি জবাব দিলেন, আমার ইচ্ছে আপনার পবিত্র মুখের ভেতর যে খাবার আছে তা থেকে খাবো। সুতরাং তিনি নিজের মুবারক মুখের ভেতর থেকে কিছু খাবার বের করে দিলেন। এটা খাওয়ার পরই মেয়েটির মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটলো। তিনি পরবর্তীতে মদীনা শরীফের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পরহেজগার মহিলা সাহাবিয়া হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উক্ত ঘটনার পরই খাজা মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি বাগানসহ যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এরপর মায়ের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মা'রিফাতের উচ্চতর জ্ঞানান্বেষায় স্বদেশ ত্যাগ করে তখনকার দিনের মুসলিম জ্ঞানপিপাসুদের প্রসিদ্ধ দু'টি কেন্দ্র সমরকন্দ ও বুখারার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন।

বুখারা ও সমরকন্দে সে যুগে ইলমে ফিকাহর দু'টি বড় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, এগুলোর নাম ছিলো 'নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'। হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে পৌঁছে হযরত হুসামুদ্দীন বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ইলমে শরীয়তের উপর উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া বুখারা ও সমরকন্দে অবস্থানরত সে যুগের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইসলামী শাস্ত্রবিদদের নিকট থেকেও তিনি জ্ঞানার্জন করেছিলেন। দীর্ঘ ৯ বছর তিনি সমরকন্দ-বুখারায় অবস্থান করে হিজরি ৫৬১ সালে ইলমে বাতিন তথা মা'রিফাতের

জ্ঞানান্বেষায় উদাসীন চিত্তে তখনকার মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ শুরু করলেন।

রূহানী চিকিৎসকের সন্ধানে

রূহানী চিকিৎসক তথা মুর্শিদে কামিল ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান মিলে না। হ্যাঁ খুব অল্প ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে- অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাঁর যে কোন বান্দাকে 'ইলমে লাদুনী' (সরসারি জ্ঞানদান) দ্বারা ভূষিত করতে পারেন। কিন্তু এরপরও দেখা গেছে, যারা 'মাদারজাদ ওলি' হওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পরও কোনো না কোনো কামিল মুর্শিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হলো, মুর্শিদ হচ্ছেন রূহানী পথনির্দেশক ও চিকিৎসক। যে কোনো মুহূর্তে সত্যান্বেষীর পা পিছলে যেতে পারে- ঠিক ঐ মুহূর্তে কামিল মুর্শিদের সাহায্য ও তাওয়াজ্জুহ থেকে বিরাট উপকার হাসিল হয়ে থাকে। এ সম্পর্কিত বহু ঘটনাবলী তরীকতশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়।

মুর্শিদে কামিলের 'ক্বালব' আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত ও ইশকের নূরে আলোকিত। সুতরাং তাঁর নিকটস্থ ব্যক্তিরা এ থেকে যে আলোকবর্তিকা আহরণ করে থাকেন তা তাদের জন্য হিদায়াতের সূত্র হয়ে থাকে। যে কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক সকল জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু এর দ্বারা কখনো 'হাক্বিকাত' তথা মানবজীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 'মহাসত্য' উদঘাটন হবার নয়। তাকে অবশ্যই কোনো হক্ব বাতিনী চিকিৎসক তথা তরীকতের মুর্শিদের শরণাপন্ন হতে হবে। তাই মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

ইলমে বাতিন হামচু মাছক্বা, ইলমে জাহির হামচু শির ॥
কি বুআদ শির মাছক্বা, কি বুআদ বি পীর, পীর ॥

অর্থাৎ, "অভ্যন্তরীণ জ্ঞান (ইলমে বাতিন) হলো ঘি এর মতো, আর বাহ্যিক জ্ঞান (ইলমে জাহির) হলো দুগ্ধ স্বরূপ। যেভাবে ঘি দুধ ছাড়া হয় না, সেরূপ ইলমে বাতিন (মা'রিফাত) হাসিল হয় না একজন পীর ছাড়া"।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে নিজের বাগানের একটি ফোয়ারার নিকট বসা ছিলেন। এসময় এলোকেশী, ময়লা বস্ত্রাবৃত এক মজযূব এসে সেখানে হাজির হলেন। তাঁর নাম ছিলো শামসুদ্দীন তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক হস্তলিখিত বিভিন্ন কিতাব থেকে পাঠদান শুনতে লাগলেন। এরপর এক সময় রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন, “হে মাওলানা! এসব কিতাবে কী লিখিত আছে?” মাওলানা উত্তরে বললেন, “হে দরবেশ! এসব কিতাবে যা লিখিত আছে তা তোমার দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। সুতরাং তুমি তোমার তাসবীহ গুণতেই থাকো!”

উপরোক্ত কিছুটা ভর্ৎসনাপূর্ণ মন্তব্য শ্রবণ করে রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অগোচরে হযরত শামসে তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কিছু কিতাব হাতে নিয়ে পার্শ্ববর্তী ফোয়ারার পানিতে নিক্ষেপ করে দিলেন! রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিছু ছাত্র ব্যাপারটি লক্ষ্য করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারা হযরত তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বেদম প্রহার শুরু করে দিলেন। এর ফলে রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল, কী জঘন্য কাণ্ড করেছেন শামসে তিবরিযী! তিনি তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এসে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, “হায়! হায়! এ তুমি কী করলে দরবেশ? এতো মূল্যবান কিতাবগুলো তুমি পানিতে ফেলে নষ্ট করে দিলে!” শামসে তিবরিযী বললেন, “তোমার ছাত্রদেরকে বলো, আমাকে প্রহার করা থেকে বিরত থাকতে। আমি তোমার কিতাবগুলো ফেরৎ দিচ্ছি!” রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ‘পাগলের’ কথা শুনে আরো মর্মাহত হলেন। পানিতে পতিত হস্তলিপি কি কখনো অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার আশা করা যায়? অবশ্য ছাত্রদেরকে থামিয়ে দিলেন- কী আর করবেন? অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সেখানে বসে পড়লেন। এদিকে শামসে তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিসমিল্লাহ বলে পানি থেকে সকল কিতাব উঠিয়ে আনলেন। অবাক দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে দেখলো, সবগুলো কিতাব সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে, যেনো পানি এগুলোকে স্পর্শই করে নি! এই আশ্চর্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শামসে তিবরিযীকে প্রশ্ন করলেন, “হে দরবেশ! আপনি কিভাবে এরূপ একটি অসাধ্য ব্যাপার সংঘটিত করলেন?” এবার শামসুদ্দীন

তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, "এই ব্যাপারটি বুঝার ক্ষমতা আপনার নেই- সুতরাং আপনি ছাত্রদেরকে পড়াতেই থাকেন!"

এই প্রখ্যাত ঘটনার ফলেই বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, সুফি, ইলমে তাসাওউফের কালজয়ী কবিতাগ্রন্থ 'মসনবী মা'নবী'র রচয়িতা হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্তরাত্মায় ইলমে মা'রিফাত অন্বেষার অগ্নি জ্বলে উঠেছিল। তিনি সেই মজযূব দরবেশ হযরত শামসুদ্দীন তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গলাভে ধন্য হন। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইলমে বাতিনের গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যান সেথায় প্রাপ্ত মণি-মুক্তার এক বিরাট ভাণ্ডার। তিনি লিখেছেন:

সাদ কিতাবোহ, সাদ ওয়ারাক্ব, দার মেরি কোন ॥
আওর জা-নো দিল রাহ, জানিবেহ, দিল দার কোন ॥
মৌলভী হারগিস না শুধ মাওলাই রুমী ॥
তা গুলামি শামসে তিবরিযী না শুধ ॥

অর্থাৎ, "তোমার সকল গ্রন্থ আগুনে নিক্ষেপ করো! এবং আত্মা আর হৃদয়সহ আউলিয়ার নিকট এসো, কারণ, তাঁদের ছাড়া কেউ কামালিয়াত হাসিল করতে পারবে না। মাওলানা (রুমী) কখনো মাওলানা রুমী হতে পারতো না, যদি না শামসে তিবরিযীর গোলাম না হতো।"

তবে এখানে কোনো ভুলবুঝাবুঝির অবকাশ নেই। ইলমে শরীয়তের ভেতরই ইলমে তরীকত বিদ্যমান। শরীয়তের জরুরী মাসআলা-মাসাইল এবং এর অনুসরণ প্রত্যেক মুর্শিদের জন্য ফরযে আইন। অনুরূপ কোনো সালিককেও শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। অন্যথায় পথভ্রষ্ট হওয়া নিশ্চিত হয়ে দাঁড়াবে। মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ শামসুদ্দীন তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীয়তের উপর পূর্ণ জ্ঞানবান ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে যে অতিরিক্ত হাক্বিকাতের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল তা ছিলো আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ ও স্বীয় মুর্শিদের ওয়াসিলায় অর্জিত। তাছাড়া মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মসনবী শরীফে

ইলমে শরীয়ত তথা কুরআন-হাদীসের অনেক উদ্ধৃতি বিদ্যমান। এ থেকে এটা স্পষ্ট, তিনি শামসে তিবরিযীর সান্নিধ্য হেতু হাক্বিকাতের সন্ধান পেয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু ইলমে শরীয়তের উপর জ্ঞান না থাকলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত 'মাওলানা রুমী' হতে পারতেন না। এককথায়, শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বিত নামই হলো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। যে আলিম তরীকতের রাস্তায় চলে হাক্বিকাতের জ্ঞানে ভূষিত হয়েছেন তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ। অপরপক্ষে যে আ'রিফ শরীয়তের মৌলিক জরুরী জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত তিনি অতি সহজেই পথভ্রষ্ট হতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আ-মিন।

খাজা উসমান হারুনীর সাথে সাক্ষাৎ

বেশ কিছুদিন ভ্রমণ শেষে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রাণপুরুষ, মুর্শিদে কামিল, রূহানী পিতা সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলিআল্লাহ খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ পেলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাঁর প্রতি এতোই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর মুর্শিদের সান্নিধ্য থেকে আর দূরে সরে যান নি। স্বীয় মুর্শিদের প্রতি এরূপ ভক্ত-অনুরক্ততাকেই বলে 'ফানা ফিশ-শাইখ' (শায়খের মধ্যে বিলীন)।

মুর্শিদের সঙ্গে সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ স্বয়ং খাজা সাহেবই বর্ণনা করেছেন। একজন হক্কানী উচ্চ পর্যায়ের পীরের সন্ধানে তিনি দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে একদা নিশাপুরের হারুন নামক স্থানে এসে পৌঁছুলেন। হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি মুরীদ হওয়ার আশা ব্যক্ত করলেন। উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে হুজরার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতে নির্দেশ দিলেন। ইবাদত, রিয়াজত, মুজাহাদা, মুরাক্বাবায় পুরো একদিন কাটানোর পর খাজা সাহেবকে তাঁর মুর্শিদ জিজ্ঞেস করলেন, "হে বৎস! তুমি ধ্যানের অবস্থায় কী দেখতে পাও?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি ৭ আসমান ও ৭ জমিন দেখতে পাচ্ছি"। মুর্শিদ বললেন, "তুমি এখনও প্রস্তুত হও নি! পুনরায় হুজরায় গিয়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হও!" আরো একদিন কেটে যাওয়ার পর উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খাজা সাহেবকে আবার ঐ একই প্রশ্ন করলেন। তিনি

এবার জবাব দিলেন, “আমি যমিনের পাতালদেশ থেকে উর্ধ্বলোকে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি”। একথা শ্রবণ করে হযরত উসমান হারুনী সেই আগের মতোই বলে উঠলেন, “তুমি এখনও প্রস্তুত হওনি! পুনরায় হুজরায় প্রবেশ করো!”।

তৃতীয় দিন কঠিন রিয়াজত-মুরাক্বাবা শেষে খাজা মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হুজরা থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর মুর্শিদ এসে সেই একই প্রশ্ন করলেন। তিনি এবার জবাবে বললেন, “হে মহাত্মন! যে পর্দার আড়ালে মহাসত্য তথা হাক্বিকাতের রহস্য লুকানো আমি সেই দ্যুতিময় পর্দা (হিজাবে আজমত) এবং এরচেয়ে গভীর পর্যন্ত অবলোকন করছি।”

খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত খুশী হলেন। সুতরাং তিনি তাঁর এই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মুরীদকে খিলাফত প্রদানে ভূষিত করলেন। অনেকের মতে খাজা উসমান হারুনীর সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর থেকে কঠিন রিয়াজত-মুজাহাদা শেষে হযরত মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফত লাভ করেছিলেন। কিন্তু খাজা সাহেব রচিত ‘আনিসুল আরওয়াহ’ নামক কিতাবে আছে, তিনি বলেন, “আমাদের অনুসারীদের মধ্যে মাত্র তিন দিন ও তিন রাত স্থায়ী রূহানী মুজাহাদা বিদ্যমান”। এ থেকে বুঝা যায় তিনদিন ও তিনরাত কঠিন মুজাহাদা শেষে তিনি খিলাফত লাভ করেছিলেন। তবে সবার জন্য এভাবে স্বল্প সময়ে হাক্বিকাতের উচ্চ মাক্বামে আরোহণ সম্ভব নয়। আল্লামা রুমি বলেন:

হার কাসি আজ রামজি ইশক আগা আ নিস্ত ॥
হার কাসি শাইয়ানে ই দারগায়ে নিস্ত ॥

অর্থাৎ “প্রেমের গোপন ভেদ সবার জন্য নয়, সুতরাং এই মহান দরগায় চুমো খাওয়ার সৌভাগ্য সকলের নিয়তিও নয়।”

খিলাফত লাভের পরও কিন্তু হযরত গরীবে নিওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শিদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে চাইলেন না। দীর্ঘ ২১ বছর তিনি হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাতে কাটিয়েছিলেন। এ সময়

ভ্রমণপ্রিয় মুর্শিদের সঙ্গে তিনি সে যুগের বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আমার মুর্শিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম হিসাবে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছি। এ সময় আমার মাথায় সকল রসদপত্র বহন করে নিতাম। তাঁদের ভ্রমণের গন্তব্যস্থলের মধ্যে ছিলো মক্কা মুয়াজ্জমা, মদীনা মুনুওয়ারাহ, ইরাক, শাম (সিরিয়া), সমরকন্দ, আফগানিস্তান ইত্যাদি। এই ভ্রমণে সে যুগের অনেক বিখ্যাত অলিআল্লাহ ও তরীকতের মাশাইখদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থানকালে একদিন হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের নিকট চলে গেলেন। সেখানে বসে তিনি তাঁর সাথী প্রিয় মুরীদ ও খলীফার জন্য আল্লাহর দরবারে বিশেষ দু'আ করলেন। দু'আ শেষ হতেই এক গায়েবী আওয়াজ শ্রুতিগোচর হলো: "মুঈনুদ্দীনকে আমাদের একজন মুহাব্বতের পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে!"

মদীনা মুনুওয়ারায় পৌঁছার পর খাজা উসমান হারুনী হযরত গরীবে নিওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, "যাও মুঈনুদ্দীন! হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরাগের সাথে সালাম পেশ করো।" মুর্শিদের নির্দেশ ও দু'আ নিয়ে তিনি পবিত্র রওজা মুবারকের সামনে গিয়ে অত্যন্ত ভক্তি, বিনয় ও অনুরক্ত হয়ে সালাম পেশ করলেন: "আসসালাতু আসসালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!" সাথে সাথে রওজা মুবারক থেকে আওয়াজ আসলো: "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া কুতবুল মাশাইখি বাহর ওয়া বার!"।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সালামের এরূপ জবাব এসেছে জানতে পেরে হযরত খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব আনন্দিত হয়ে তাঁর প্রিয় মুরীদকে বললেন, "হে মুঈনুদ্দীন! অবশ্যই তুমি এখন কামালিয়াত হাসিল করে নিয়েছো!"

পবিত্র হজ্জ পালন ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বাপ্নিক নির্দেশ

গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন তরীকতের উচ্চতম মাক্বামে আরোহণ করলেন তখন তাঁর মুর্শিদ হযরত উসমান

হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে প্রদান করলেন নিজের খিরক্বা। এরপর পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে উভয়ে মক্কা শরীফ যেয়ে উপস্থিত হলেন। হজ্জপানলের যাবতীয় আহকাম শেষ করে তাঁরা রওজা শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনুওয়ারায় যেয়ে আবার হাজির হলেন। সেখানে মুর্শিদ ও মুরীদ বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। একদা রাতে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় হযরত মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। কারো কারো মতে তিনি গভীর ধ্যান অবস্থায় থাকাকালে তা অবলোকন করেছিলেন। যাই হোক, তিনি যা দেখেছিলেন তার সারমর্ম হলো: পেয়ারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশের সুরে বললেন, "হে মুঈনুদ্দীন! তুমি আমাদের দ্বীনের ভরসা। তুমি হিন্দে চলে যাও এবং সেখানকার মানুষকে সিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথপ্রদর্শন করো।"

উপরোক্ত রূহানী নির্দেশ পাওয়ার পর স্বীয় মুর্শিদের অনুমতিক্রমে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি সঞ্জরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখান থেকেই হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে তিনি ইসফাহান, বুখারা, লাহোর এবং দিল্লীতে বিরতি নেন এবং অনেক শাইখ-মাশাইখের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে বাহ্যিক ও রূহানী ফায়দা লাভে ধন্য হন। লাহোরে তিনি হযরত দাতা গঞ্জেবখশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধিস্থলে দীর্ঘ ৪০ দিনের চিল্লা পালন করেছিলেন। এই চিল্লাপালন শেষে তিনি গঞ্জেবখশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শানে একটি কবিতা লিখেন, যাতে 'দাতা গঞ্জেবখশ' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ ছিলো। সেই থেকেই ফার্সি ভাষার প্রথম উচ্চ পর্যায়ের তাছাওউফ গ্রন্থ 'কাশফুল মাহযুব' এর রচয়িতা হযরত উসমান হাজভেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'দাতা গঞ্জেবখশ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

দিল্লী থেকে খাজা সাহেব রাজাস্তানের মরু অঞ্চলে এসে যাত্রাবিরতি করেন। পবিত্র মদীনা মুনুওয়ারা থেকে হিন্দুস্থান পর্যন্ত ভ্রমণে তিনি অনেক লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন। এছাড়া অনেকেই তাঁর মুরীদ হয়ে সফরসঙ্গী হন।

ভারতের আজমীরে খাজা সাহেব

অধিকাংশ জীবনী লেখকের মতে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন আজমীরে আসেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। হিজরি ৫৮৭ তথা ১১৯০ ঈসায়ী সনে তিনি আজমীরে এসে বসতি স্থাপন করেন। এসময় আজমীর অঞ্চলের বাদশাহ ছিলেন হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান। প্রখ্যাত এই রাজপুত বাদশাহের দরবারে একদল যাদুকর ছিলেন যাদের নেতার নাম ছিলো অজয় পাল। খাজা সাহেব এখানে এসে আনা সাগর নামক একটি ছোট্ট টিলার উপর বসবাস শুরু করেন। এই টিলাটি এখন 'চিল্লা খাজা সাহেব' নামে পরিচিত। একজন খ্যাতনামা মুসলিম দরবেশের আগমন ঘটেছে জেনে দৈনিক অনেক লোক আশপাশ ও দূর-দূরান্ত এলাকা থেকে খাজা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আজমীরে আসতে লাগলো। সকলেই তাঁর দরবারে এসে খুব আদর-যত্ন পেয়ে মুগ্ধ হলো। এমনকি অনেকেই এই মহান ওলির সংক্ষিপ্ত সান্নিধ্য হেতু ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলো। এদের মধ্যে কিছু লোক হযরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো তথা মুরীদ হয়ে গেল। একদা পৃথ্বীরাজের প্রধান জাদুকর অজয় পালও হযরতকে দেখতে এলেন এবং তাঁর অমায়িক ব্যবহার, ওলিআল্লাহ হওয়ার নিদর্শন ইত্যাদি অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে তিনিও মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর হযরতের শিষ্যত্ববরণ করে নিজের জীবন ধন্য করেন। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিয়াবানী নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। ভারতের মধ্যপ্রদেশের কুরুপা-বে 'আব্দুল্লাহ বিয়াবানী জঙ্গল' নামে একটি গভীর পাহাড়ী অরণ্য আছে। সেখানে তাঁর নামে একটি আস্তানাও বিদ্যমান।

আজমীরে হযরতের অবস্থানকালে ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে শিহাবুদ্দীন ঘোরী হিন্দুস্থানে হামলা চালিয়ে তারাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। পরে খাজা সাহেবের সঙ্গে শিহাবুদ্দীন ঘোরী সাক্ষাৎলাভ করেন। এই সাক্ষাৎলাভের ঘটনাকে তিনি জীবনের একটি অনন্যসাধারণ প্রশান্তময় ক্ষণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। খাজা সাহেব এরপর থেকে বিনা বাধায় দ্বীন প্রচারের মিশন অব্যাহত রাখেন। ভারতে চিশতিয়া তরীকা প্রতিষ্ঠায় তাঁর মতো ভূমিকা ইতোমধ্যে কেউ রাখেন নি। তিনি দেশেরপ্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বীয় মুরীদ ও খলীফাদের প্রেরণ করেন। এসব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ ইসলাম ও এর অভ্যন্তরস্থ মহামূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ রূহানিয়্যাত তথা তাসাওউফচর্চা

সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় গণনাতীত কাফির-মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের ইসলামগ্রহণ

হযরত গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাশফ-কারামতওয়ালা উচ্চপর্যায়ের শায়খ ছিলেন। তাঁর পবিত্র নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়েই অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। কথিত আছে একদা এক ভ্রমণকালে তাঁর মুখশ্রী পানে একনজর তাকানো শেষে প্রায় সত্তুর হাজার হিন্দু একসাথে মুসলমান হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ! হযরত খাজা সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ চল্লিশ বছর ভারতের আজমীরে বসবাস করেন। এই দীর্ঘদিন তিনি অবিরামভাবে দ্বীনের খিদমতে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা ও কারামতের ওয়াসিলায় ভারতবর্ষে অন্তত ৯০ লক্ষ মানুষ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন জীবনী লেখক উল্লেখ করেছেন।

খাজা সাহেবের মিশন

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের উপর বিস্তারিত বলার সুযোগ এখানে সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তরীকতের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অনুপম চরিত্র-মাধুর্য নিজের সর্বাপেক্ষা বড় দুশমনের মনকে পর্যন্ত জয় করে নিতে সক্ষম হতো। তাঁর অতি সুন্দর, আকর্ষণীয়, প্রেমময়, রূহানিয়্যাতপূর্ণ সাধারণ শিক্ষা দ্বারা মানুষ খুব সহজে সত্যপোলব্ধি করতে সক্ষম হতো। সর্বোপরি তাঁকে আল্লাহ পাক যে রূহানী শক্তি দান করেছিলেন তার মুকাবিলায় সে যুগের কোনো বাতিল শক্তিই ঠিকে থাকার যোগ্য ছিলো না। অনেক লোক তাঁর দরবারে কট্টর দুশমনের বেশে এসেও শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্যের চরম সীমানায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর খাস বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ সবই ছিলো খাজা সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চুম্বকসম আকর্ষণীয় চরিত্র-মাধুর্য এবং উচ্চ পর্যায়ের ওলি ও কাশফ-কারামতের ফসল।

গরীবে নিওয়াজ

হযরত খাজা সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'গরীবে নিওয়াজ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই শব্দদ্বয়ের অর্থ, 'যে গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল' অর্থাৎ গরীবের বন্ধু। তিনি প্রত্যেক মানুষকে খুব বেশী মুহাব্বত করতেন। তবে গরীবদের প্রতি তাঁর মায়া-মুহাব্বত-সহানুভূতি ছিলো খুব বেশী ও সম্পূর্ণ স্বার্থহীন, অকৃত্রিম। তাঁর এই আদর্শকে পরবর্তীতে চিশতি মাশাইখরা অত্যন্ত মহামূল্যবান রত্ন মনে করে আটকে রাখেন। এখনও উচ্চ পর্যায়ের চিশতি মাশাইখদের মধ্যে এই উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আমার (লেখকের) গুরুজন ও মুর্শিদ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যেও অনুরূপ চরিত্র-মাধুর্য বিদ্যমান ছিলো। তিনি হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহর বান্দা হিসাবে খুব বেশী মুহাব্বত করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সবার মুখে একই কথা ছিলো, "হযরত শায়খে কাতিয়া আমাকে খুব বেশী মায়া করতেন"। আর গরীবদের প্রতি তাঁর মায়া-মুহাব্বত ও সহানুভূতির তুলনা ছিলো না। তিনি ফকীর, রিক্সা ড্রাইভার, মিসকিন ও ইয়াতীমদের এতো বেশী ভালোবাসতেন যে, প্রায়ই এদেরকে নিয়ে একই থালায় বসে একত্রে খাবার খেতে আমরা তাঁকে দেখেছি। বলাই বাহুল্য এরূপ চরিত্র-মাধুর্য হযরত গরীবে নিওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচিত। আর তাঁরই অনুসরণে ভারতবর্ষে পরবর্তী সকল চিশতি শায়খের মধ্যে এর প্রভাব বিদ্যমান ছিলো এবং এখনও আছে।

মহামূল্যবান বাণী

তরীকতের অনেক গ্রন্থে হযরত গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মহামূল্যবান বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। এখানে এসব বাণীর মধ্যে মাত্র কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

১. তিনি বলেন, আল্লাহর আসল বন্ধুর মধ্যে যে ক'টি গুণ থাকা আবশ্যক তাহলো: (ক) তাঁর মধ্যে সূর্যের মতো আকর্ষণ থাকবে। সূর্য যেভাবে আকাশে উদিত হওয়ার ফলে পুরো পৃথিবী এ থেকে উপকার লাভ করে, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর

বন্ধুজনের নিকট যে কেউই আসবে সে তাঁর থেকে উপকার লাভে ধন্য হবে। (খ) আল্লাহর বন্ধুর মধ্যে সাগরসম দয়া থাকবে। আমরা সকলেই সাগরের পানি দ্বারা উপকৃত হই। ঠিক এভাবে আল্লাহর অলির দয়া দ্বারা সবাই লাভবান হবে। (গ). আল্লাহর অলির মধ্যে মাটির মতো দয়ার্দ্রতা ও আতিথেয়তার গুণাবলী থাকতে হবে। পৃথিবীর জমিন আমাদের পদতলে সর্বদাই বিছানো থাকে। আমরা এর উপরই জন্ম নিই বড় হই। তার কোলই আমাদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

২. তিনি বলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি উত্তম চরিত্রের সমাগম ঘটবে তিনিই হবেন সর্বোত্তম মানুষ: (ক) তিনি হবেন দরিদ্রতার মাঝে প্রাচুর্যসম, (খ) ক্ষুধার মধ্যে প্রশান্ত, (গ) দুঃখের সময় হাস্যোজ্জ্বল এবং (ঘ) সংঘাতের সময় বন্ধুত্বসূলভ।

৩. চিরশাস্তির দোযখ থেকে মুক্তির নিশ্চিত রাস্তা হলো: ১. ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ২. আহতের পাশে দাঁড়ানো এবং ৩. দুঃখে পতিতকে সাহায্য করা।

৪. তিনি লিখেছেন, নামায পালন ছাড়া, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল কারো পক্ষেও সম্ভব নয়। কারণ, সালিকের জন্য নামায হলো মিরাজ স্বরূপ।

৫. নামাযের যাবতীয় আইন-কানুন সঠিক মতো পালন না করা হলে, তা নামাযীর উপর ফিরে নিক্ষেপ করা হয়।

৬. সত্যিকার আল্লাহ-প্রেমিকের হৃদয় সর্বদাই প্রেমাগ্নিতে জ্বলন্তাবস্থায় থাকে। এই অগ্নির ক্ষমতা ও প্রাবল্য এতোই বেশী যে, সেখানে অন্য কোনো কিছু প্রবেশ করলেই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

৭. স্বজাতি মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ দ্বারা যে ক্ষতি হয় তা একটি গুনা হয়ে যাওয়া থেকেও মারাত্মক।

৮. সকল উপাসনার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে ইবাদাত তাহলো, নির্যাতিত-নিপীড়িত, গরীব-দুঃখীদের প্রতি করুণার দৃষ্টি ও সাহায্যের হাত বাড়ানো।

৯. আল্লাহপ্রেমের রাস্তায় যে কেউ পদার্পণ করে, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

১০. আল্লাহপ্রেমিকরা উভয় জগতের সবকিছু প্রেমাস্পদকে পাওয়ার আশায় বিসর্জন দিয়েও অনুভব করেন যে, কিছুই করা হলো না!

১১. তিনটি বিষয় দ্বারা ঈমানের স্তর নির্ণিত হয়: (১) ভীতি, (২) আশা এবং (৩) প্রেম।

হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকাল

পবিত্র কুরআনের বাণী:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে" (আম্বিয়া (২১) : ৩৫)।

যুগের শ্রেষ্ঠ রূহানী চিকিৎসক, তরীকতের মহান শাইখুল মাশাইখ, ভারতবর্ষে চিশতিয়া তরীকার সর্বাপেক্ষা বড় খিদমাতগার, অসংখ্য মানুষের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শক হযরত খাজা সাহেবও কালামে পাকের উক্ত বাণী মুতাবিক একদা নশ্বর এ ধরার কোল ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করেন। অধিকাংশ জীবনী লেখকের মতে তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ছিলো ৬২৭ হিজরির ৬ রজব (১২৩০ ঈসায়ী)। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। আজমীরের খানক্বার যে কক্ষে তিনি দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছিলেন সেই কক্ষেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত গরীবে নিওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনেক খলিফা ছিলেন। এর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ চার জনের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হলেন:

১. খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,
২. শায়খ নিজামুদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৩. শায়খ নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৪. শায়খ হামিদুদ্দীন নাগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

আমাদের শাজারায় প্রথমোক্ত মহাত্মন অলির নাম এসেছে তাই এখন আমরা তাঁরই জীবন ও হালতের উপর বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। ওমা তাওফিকী ইল্লা-বিল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ১৬

হযরত শায়খ খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরি, সমাধি: কুতুব মিনার, দিল্লী, ভারত।)

তিনি ছিলেন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা। হিজরি ৫৮২ সনে বর্তমান তাজিকিস্তানের অন্তর্গত আউশ নামক একটি প্রখ্যাত গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শাইখুল মাশাইখ হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মায়ের উদরে থেকেই হযরত কুতুবউদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৫ পারা কুরআন শরীফ হিফজ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর মাতা কুরআনের হাফিজা ছিলেন এবং কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গর্ভে ধারণের পর থেকে জন্ম পর্যন্ত সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর জন্ম হয় রাতের বেলা। অন্ধকার রাতে হঠাৎ দেখা গেল আসমান থেকে নূর এসে সমগ্র এলাকাকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। মানুষ ভাবলো, বুঝি ভোর হয়ে গেছে। ঠিক এ মুহূর্তেই জগতখ্যাত এই ওলির জন্ম হয়।

ইয়াতীম হওয়া ও প্রাথমিক শিক্ষা

হযরত কুতুবুদ্দীন যখন মাত্র দেড় বছর বয়সের শিশু তখন তার পিতা সাইয়্যিদ কামালুদ্দীন আহমদ বিন সাইয়্যিদ মূসা ইহধাম ত্যাগ করে চিরন্তন জীবনের পরপারে পাড়ি জমান। ৪ বছর ৪ মাস বয়সের শিশু কুতুবুদ্দীনকে তাঁর বিধবা মাতা ছেলের শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব অনুভব করে পড়শীর সহায়তায় একজন মুয়াল্লিমের কাছে প্রেরণ করেন। চলার পথে সাক্ষাৎ ঘটলো এক বুজুর্গের সাথে। তিনি ঐ পড়শীকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে বৎস! এই ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?” পড়শী জবাব দিলেন, উস্তাদের নিকট নিয়ে যাচ্ছি লেখাপড়ার জন্য। তিনি বললেন, “একে আমার নিকট সোপর্দ করো। আমিই তাকে সঠিক উস্তাদের নিকট নিয়ে যাবো।”

সুতরাং পড়শী শিশু কুতুবুদ্দীনকে বুজুর্গের হাওয়ালা করে চলে গেলেন। বুজুর্গ ছেলেকে নিয়ে সে যুগের এক মহান ওলির দরবারে উপনীত হলেন। এই ওলির নাম ছিলো, হযরত খাজা আবু হাফস আউশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বুজুর্গ ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "আহকামুল হাকিমীনের নির্দেশ হলো, আপনি এই শিশুকে বিশেষ খিয়াল করে শিক্ষাদান করবেন।" একথা বলে শিশু কুতুবুদ্দীনকে ওলির নিকট রেখে বুজুর্গ চলে গেলেন। এদিকে উস্তাদ আউশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সস্নেহে কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান! এইমাত্র হযরত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে আমার নিকট সোপর্দ করে চলে গেলেন!" কিন্তু আউশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও শিশু কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে ইলমে শরীয়তের জ্ঞানদান করার সুযোগ পেলেন না। প্রথম ছবক দানের সময় শ্লেটের মধ্যে কিছু লিখার পূর্বেই একটি গায়েবী আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন: "হে আবু হাফস! এই শিশুর উস্তাদ হচ্ছেন কাজী হামিদুদ্দীন নাগরী। তাকে তার কাছে নিয়ে যাও!" এই আওয়াজ শ্রবণ করা মাত্র আউশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শিশুকে নিয়ে গেলেন হযরত হামিদুদ্দীনের নিকট। এরপর তাঁরই কাছে কুতুবুদ্দীন পবিত্র কুরআন শরীফ অধ্যয়ন শেষ করেন। 'তা'লিমুদ্দীন' কিতাবে এ ব্যাপারটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটা লিখিত আছে যে, এক অদৃশ্য ব্যক্তির কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো, "হে হামিদুদ্দীন! তোমার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করো!" এরপর ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি কুতুবুদ্দীনের নিকট যেয়ে পৌঁছে গেলেন। হামিদুদ্দীনের হাতে শ্লেট ছিলো। বললেন, "হে কুতুবুদ্দীন! আমি কি লিখবো?"

"লিখুন! ..." বললেন চার বছরের শিশু কুতুবুদ্দীন। এরপর তিনি কুরআন শরীফের আয়াতমালা অনর্গল বলতে লাগলেন।

কাজী সাহেব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এগুলো কার কাছ থেকে শিখলে?"

কুতুবুদ্দীন জবাব দিলেন, "আমি আমার আম্মাজানের উদরে থাকাকালে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত কুরআন শরীফ শ্রবণ করতে করতে ১৫ পারা পর্যন্ত মুখস্ত করে নিয়েছিলাম!"

এরপর কাজী হামিদুল্লাহর নিকট মাত্র ৪ দিন থেকে কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফের শেষ ১৫ পারা মুখস্ত করে নেন। এছাড়া খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শরীয়তের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন।

ইলমে মা'রিফাতের সন্ধানে

আল্লাহর পরিচিতি তথা মা'রিফাত অর্জনই হলো মানবজীবনের মূল লক্ষ্য।আর মা'রিফাত অর্জনের নামই হলো সত্যিকার অর্থে 'জীবন্ত' থাকা। হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "হুজুর! আপনার বয়স কতো?" তিনি জবাব দিলেন, "চার বছর!" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "তা কেমন?" তিনি বললেন, "দীর্ঘ সত্তর বছর পার হয়ে গেছে, দুনিয়ার পর্দা আমাকে আল্লাহ থেকে আড়ালে রেখে দিয়েছিল। এই গত চার বছর যাবৎ পর্দা উন্মোচন হয়েছে মাত্র- মনে রেখো পর্দার আড়ালে থাকাবস্থায় কেউ জিন্দা থাকে না!" কিন্তু পর্দা উন্মোচন হওয়ার জন্য চাই ওয়াসিলা। ইলমে তাসাওউফের উসূল হচ্ছে, কামিল কোনো বুজুর্গ ওলির হাতে বাইআত গ্রহণ করে 'সুহবত' গ্রহণ করা। হযরত বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিঃসন্দেহে মাদারজাদ ওলি ছিলেন। ইতোমধ্যে ব্যাপারটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরপরও তিনি কামিল একজন ওলির দরবারে গমন করে 'বাইআত' গ্রহণের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠলেন। তাঁর যুগে অনেক প্রসিদ্ধ ওলিআল্লাহ জীবিত ছিলেন। এরমধ্যে একজন ছিলেন খুরাসান শহরের বাসিন্দা হযরত খাজা শায়খ মাহমুদ ইস্পাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত কুতুবুদ্দীন তাঁর সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং খুব উচ্চ ধারণা রাখতেন। সুতরাং খুরাসানে যেয়ে ইস্পাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হলেন।

আল্লাহর কুদরত, কৌশল ও উদ্দেশ্য কিরূপে কিভাবে সম্পন্ন হয় তার খবর কেউ জানে না। খুরাসানে তখন যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবস্থান করছিলেন। হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কেও সম্যক অবগত ছিলেন। খাজা সাহেবের সুনাম ইতোমধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ হযরত কুতুবুদ্দীন তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রচণ্ড এক টান নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করলেন এবং অনতিবিলম্বে

দরবারে যেয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি খাজা সাহেবকে মুর্শিদ হিসাবে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অন্তরের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। এদিকে খাজা সাহেবও এরূপ এক শাগরিদ পাওয়ার জন্য যেনো অপেক্ষারত ছিলেন। সেমতে 'মসজিদে আবুল লেইস'-এ তিনি খাজা সাহেবের হাতে হাত ধরে বাইআত হন। বাইআত গ্রহণের পর মুর্শিদের সুহবত পরিত্যাগ করে কোথাও চলে যেতে মন চাইলো না হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির।

মুসাফিরের বেশে মুর্শিদের সাথে

হযরত খাজা সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইস্পাহান থেকে স্বীয় মুরীদ কুতুবুদ্দীনকে নিয়ে দীর্ঘদিনের এক সফরে বের হন। অবশ্য খাজা সাহেব আগে থেকেই সফররত অবস্থায় ইস্পাহানে এসেছিলেন। সুতরাং কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সফররত অবস্থায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় এখন সঙ্গী হলেন। প্রথমেই উভয়ে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমার দিকে যাত্রা করেন। এই সফরে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। এসব ঘটনার বর্ণনা বখতিয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন:

"মক্কা মুয়াজ্জমায় যাত্রাপথে একদিন বাদ ফযর হাঁটতে শুরু করলাম। একটি ছোট্ট শহরে যেয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানকার এক খানক্বায় উচ্চপর্যায়ের বুজুর্গ একব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন ই'তিক্বাফ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর খানক্বাটি ছিলো একটি ছোট্ট গুহার ভেতর। আমরা দেখতে পেলাম চক্ষু খোলা অবস্থায় তিনি অনড়, গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ একমাস আমরা সেখানে অবস্থান করি, কিন্তু ইতোমধ্যে ঐ দরবেশ একবার মাত্র চেতনাশীল ছিলেন। আমরা ঐ সময় তাঁকে সালাম জানালাম, তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'হে মুসাফির ভাইগণ! আমি যে অবস্থায় দিনাতিপাত করছি এতে আপনাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তবে আমি আশা করি আপনারা এ কষ্টের প্রতিদান পাবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, যে ব্যক্তি দরবেশদের খিদমাত করে, সে সকলের প্রিয় হয়। আপনারা দয়াকরে বসুন।' এরপর তাঁর নিজের হালত বর্ণনা করতে যেয়ে বললেন, 'আমি শায়খ আসলাম তোয়ায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর। আমি ত্রিশ বছর যাবৎ দুনিয়ার সকল খিয়াল থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন আছি। আপনাদেরকে কিছু

উপদেশ দিচ্ছি। নফসের তাড়না থেকে সাবধান! সৃষ্ট জগতের কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকবেন। হাতে যা আসে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। সম্পদ জমা রাখা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি মনকে আকৃষ্ট করবেন না।' এটুকু বলে তিনি পুনরায় মুরাকাবার মধ্যে বসে গেলেন। আমরা খানক্বাহ থেকে বেরিয়ে পড়লাম।" (দিল্লি কি বাইশ খাজা, ড. জহুরুল হাসানশারিব)

খিলাফত লাভ

পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন করে কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীরের সঙ্গে বাগদাদে গমন করেন। আনোয়ার আলী দেহলভী প্রণীত তাজদারে আজমীর গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী ঈসায়ী ১১৮৯ সালে খাজা সাহেব বাগদাদে আসেন। ঠিক কোথায় হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী খিলাফত লাভ করেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে এক বর্ণনামতে বাগদাদে অবস্থানকালেই আবু সাঈদ সমরকন্দীর মসজিদে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সে যুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ মাশাইখ। এদের মধ্যে খাজা শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দি, শায়খ দাউদ কিরমানী, শায়খ বুরহানুদ্দীন মুহাম্মাদ চিশতি এবং শায়খ তাজউদ্দীন মুহাম্মাদ ইস্পাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুজুর্গের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খিলাফত লাভের সময় হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স হয়েছিলো মাত্র ১৭ বছর।

দিল্লীতে গমন

খিলাফত প্রদানের পর খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই প্রিয় শিষ্যকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে গমনের নির্দেশ দেন। সুতরাং বখতিয়ার সাহেব বাগদাদ থেকে দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন। অবশ্য ভ্রমণপথে তিনি সে যুগের প্রসিদ্ধ ক'টি শহরে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। তিনি সমরকন্দ ও গজনী অবস্থানকালে অনেক যুগশ্রেষ্ঠ অলিদের সুহবত লাভে ধন্য হন। এরপর তিনি আজমীর হয়ে

দিল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। কারো কারো মতে তিনি স্বীয় পীর সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ শেষে আজমীর হয়ে দিল্লীতে এসে উপনীত হন।

মাত্র ক'দিনের মধ্যেই হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। অসংখ্য লোক এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। অনেকে হযরতের জন্য উপহার সামগ্রী ও টাকা-পয়সা নিয়ে আসতো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। মানুষের ভীড়ের মধ্যেও তিনি সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাশাইখে চিশত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি মুস্তাগরাক্ব অবস্থায় থাকতেন। মুস্তাগরাক্ব ঐ ব্যক্তিকে বলে যিনি অনেক মানুষের মধ্যে অবস্থান করেও আল্লাহর মুরাক্বাবায় নিমগ্ন থাকেন- পারিপার্শ্বিকতার দিকে তাঁর খিয়ালই থাকে না'।

একদা তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন স্বীয় মুর্শিদের দরবারে কিছুদিন অতিবাহিত করবেন। হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন আজমীরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী ও মুরিদের সংখ্যা তখন অনেক। তারা কিছুতেই হযরতকে ছেড়ে থাকতে রাজী হলো না। এদিকে মুর্শিদের সান্নিধ্য লাভের আশায় তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেছেন। শেষ পর্যন্ত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আপনি দিল্লীতেই থেকে যান।

কারামত

হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কিত অনেক কারামতের বর্ণনা বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়। 'মাশাইখে চিশত' এর লেখক তাঁর একটি কারামতের উল্লেখ করেছেন। দিল্লীতে থাকাকালে হযরতের স্ত্রী প্রায়ই তাঁদের পড়শী এক মহিলার কাছ থেকে টাকা-পয়সা, খাবার ইত্যাদি ধার করে নিয়ে আসতেন। কারণ, হযরতের ঘরে অনেক দিনই খাবার বলতেও কিছু থাকতো না। পড়শী মহিলার স্বামীর নাম ছিলো শরফুদ্দীন। একদা হযরতের স্ত্রী শরফুদ্দীনের স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু টাকা কর্জ আনলেন। এরপর আরেক দিন ঐ মহিলা কথায় কথায়

হযরতের স্ত্রীকে বললেন, "আমি যদি আপনাদেরকে টাকা কর্জ না দিতাম তাহলে আপনারা ক্ষুদার জ্বালায় মরে যেতেন!"

এই মন্তব্যে তিনি অত্যন্ত কষ্টবোধ করলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই মহিলার কাছ থেকে আর কোন দিনই কিছু ধার করবো না। কিছুদিন পর ব্যাপারটি তিনি তাঁর স্বামী হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অবগত করেন। হযরত ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বললেন, "এই মহিলার কাছ থেকে কিছু কর্জ আনা তোমার জন্য ঠিক হয় নি।" এরপর কক্ষের একটি তাকের দিকে ইশারা করে বললেন, "তুমি এখান থেকে প্রত্যহ যে পরিমাণ রুটির দরকার নিয়ে যেয়ো। যাকে ইচ্ছা তাকে তা বিতরণ করে দেবে।" এরপর থেকে হযরতের স্ত্রী অনেকদিন যাবৎ উক্ত থাক থেকে তরতাজা রুটি নিয়ে যেতেন। এই রুটি কোত্থেকে যে আসতো, কেউ তা জানতো না। উল্লেখ্য, তুর্কী ভাষায় 'কাকী' শব্দের অর্থ হলো রুটি। হযরতের এ কারামত প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তিনি 'কাকী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অবশ্য কাকী উপাধির পেছনে আরেকটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলিফা আমির খসরু একদা স্বীয় পীর সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, হযরত! আপনার মুর্শিদ হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে 'কাকী' নামে পরিচিত হলেন? তিনি জবাব দিলেন, "একদিন হযরত কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কয়েকজন সহচরসহ এক হাউজের পাশে বসা ছিলেন। কোনো একজন আক্ষেপ করে বললেন, আহ! এই প্রচণ্ড শীতের মাঝে যদি কোথাও থেকে খাবারের জন্য কিছু গরম 'কাকী' (রুটি) পাওয়া যেতো! একথা শ্রবণ করে হযরত কুতুবুদ্দীন হাউজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কিছু তরতাজা গরম রুটি নিয়ে আসলেন। সবাই তা তৃপ্তিসহ ভক্ষণ করলেন। এই কারামত প্রকাশের পর থেকেই তিনি 'কাকী' নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'সামা' (ইশকের কবিতা) খুব পছন্দ করতেন। তবে সামা সঙ্গীত শ্রবণ সবার জন্য বৈধ নয়। চিশতিয়া তরীকায় সামা শ্রবণের একটা ইতিহাস আছে। অবশ্য আধুনিক যুগের চিশতি বুজুর্গানে দীন ফিতনা থেকে রক্ষার্থে 'সামা' শ্রবণ থেকে বিরত থাকেন। হযরত

বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আমলেও একদল সুফি-দরবেশ এবং বাহ্যিক আলিম-উলামা সামার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দিল্লীতে আগমন করে হযরত কুতুবুদ্দীন ও হযরত হামীদুদ্দীন নাগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা খুব আগ্রহভরে সামা শুনতেন। এ খবর সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরীর (১১৯১-৯২) নিকট পৌঁছার পর তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তাঁরা 'সামা' শ্রবণ করছেন, এ কথাটি যদি আবার আমার কানে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁদের লাশ আমি দরজায় টাঙ্গিয়ে দেবো! কিংবা কাজীদের আইনানুযায়ী তাদেরকে পুড়িয়ে মাটির মতো কালো করে ছাড়বো!"

হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন সুলতানের এই নির্দেশ শ্রবণ করলেন তখন বললেন, "তিনি নিজে যদি নিরাপদে থাকেন, তাহলে আমাদের লাশ জ্বালাতে সক্ষম হবেন।" এ মাসেই শিহাবুদ্দীন ঘোরী খুরাসান প্রদেশে এক যুদ্ধে থাকাকালে বিশ্বাসঘাতক এক ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হন। (সিয়ারুস সালিকীন)

ইবাদাত

আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা-মুশাহাদার মধ্যে জীবন কাটিয়ে থাকেন। তবে তাঁরা যে পরিমাণ 'নফল' ইবাদাত করতেন তা শ্রবণ করলে সত্যিই হতভম্ব হতে হয়। এটা ভুল ধারণা যে, 'হুজুরী' (সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি) হাসিল হয়ে গেলে বুজুর্গানে দীন বা মাশাইখরা জিকির-মুরাকাবা ও ইবাদতের মাত্রা কমিয়ে দেন। আসলে এর উল্টো কথাই সত্য। হুজুরীর ফলে বরং তাঁদের জিকির-মুরাকাবা ও ইবাদাতের স্তর অনেক উচ্চে আরোহণ করে। ফলে তাঁরা এসব আরো বেশী বেশী করতে থাকেন ও আল্লাহর মা'রিফাতের মধ্যে সদানিমজ্জিত হয়ে বেশী থেকে বেশী নৈকট্যের স্বাদ পেতে থাকেন। হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেক রাতে জিকির-ধ্যান ছাড়াও অন্তত ৩০০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। প্রথম বিবাহের পর একনাগাড়ে তিন রাত তিনি এই অজিফা পাঠে ব্যর্থ হলেন। আনিস আহমদ নামক তাঁর এক খাদিম ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক বিরাট বড় অপূর্ব সুন্দর অট্টালিকার সামনে অনেক মানুষের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউই ভেতরে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। তবে এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট বুজুর্গকে দেখাচ্ছিলো। তিনি প্রাসাদসদৃশ এই অট্টালিকার

ভেতরে যাওয়া-আসা করছিলেন। আনিস আহমদকে কেউ জানালো, এই বুজুর্গ হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি আরো জানলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাসাদের ভেতর অবস্থান করছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বাইরের লোকদের "খবর" নিয়ে ভেতরে যাচ্ছিলেন। আনিস আহমদ বলেন, এসব ব্যাপার জানার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জিয়ারত নসীবের জন্য আমার হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠলো। সুতরাং তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু প্রাসাদের ভেতর থেকে আওয়াজ ওঠলো:

"তুমি জিয়ারতের যোগ্যতা এখনও অর্জন করো নি। তবে কুতুবুদ্দীনের নিকট সালাম দিয়ে তাঁকে জানাবে, আজ দিন তিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাঁর পক্ষ থেকে হাদিয়া এখানে পৌঁছে নি।"

তিনি প্রতি রাতে ১০০ রাকাআত নফল নামায আদায় করতেন। সর্বদাই 'ইসতিগ¦রাত' (আল্লাহপ্রেমে বিভোর) থাকতেন। কেউ যদি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতো তখন প্রায়ই দেখা যেতো আগন্তুকের কোনো খবরই তিনি রাখতেন না। বেশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ টের পেয়ে বলতেন, আপনি কখন আসলেন? (মাশাইখে চিশত)

গ্রন্থাবলী

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমে তাসাওউফের উপর বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে তিনটি পুস্তকের সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া গেছে। এ তিনটি হলো: 'দলীলুল আরিফীন', 'যুবদাতুল হাকায়িক' এবং 'তাযকিরাতুল আসফিয়া'। 'তাজদারে আজমীর' নামক গ্রন্থে এসব কিতাবের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। দলীলুল আরিফীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়েছে। গ্রন্থের শিরোনামের অর্থ হলো, আল্লাহপ্রেমিকের আল্লাহপ্রাপ্তির প্রমাণ। যুবদাতুল হাকায়িকের কোন বঙ্গানুবাদ এখনো দেখি নি। এতে তাসাওউফের মর্মকথা তুলে

ধরা হয়েছে। তাযকিরাতুল আসফিয়া মূলত সুফীদের জীবনীগ্রন্থ। এ কিতাবটিরও কোনো বঙ্গানুবাদ আছে কিনা জানতে পারি নি।

ইহলোক থেকে বিদায়গ্রহণ

'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে', মহাসত্যের এ বাণীটি স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা দিয়েছেন। বাস্তবে এই নশ্বর ধরার কোলে আমাদের জীবনকাল অতি অল্পদিনের মাত্র। সৃষ্ট এ পৃথিবীর বয়সের তুলনায়ই ষাট, আশি কিংবা শত বছরের হায়াত মূলত কয়েক সেকেন্ডের বলা চলে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে আমাদের এই পৃথিবী তথা সৌরজগতের জন্ম হয়েছে আজ থেকে ৫০০ কোটি বছর পূর্বে। সুতরাং আমাদের হায়াতে জিন্দেগী এর মাত্র ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের এক অংশ। আর এই ক'টি সেকেন্ডের জিন্দেগীকে কাজে না লাগাতে পারলে সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আখিরাতের অনন্ত জীবনের বাসস্থান কোথায় হবে তা নির্ভর করছে ইহলোকের এই ক'টি দিনের আমলের উপর। আমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পার্থিব লোভ-লালসায় কাটিয়ে বরবাদ করে দিচ্ছি। অপরদিকে আল্লাহর ওলিরা একে শুধু উত্তম পন্থায় খরচ করেন না, তাঁরা জীবনের মূল লক্ষ্য তথা আল্লাহর পরিচিতি লাভে ধন্য হন এবং নশ্বর এ ধরার কোল ছেড়ে মা'বুদের সান্নিধ্যে ফিরে যেতে সদা-আগ্রহশীল, অধীর অপেক্ষমান। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও একদিন তাঁর মাশুকের ডাকে সাড়া দিলেন। চলে গেলেন এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ছেড়ে চিরসত্য অনন্তের জিন্দেগীতে। তবে তাঁর ইন্তিকাল হওয়ার সময় যে চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল তা এ প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখা একান্ত জরুরী মনে করছি।

তারিখে ফিরিশতা, আনিসুল আরওয়াহ, সিয়ারুল আওলিয়া, দিল্লী কি বাইশ খাজা, আতহারউদ্দীন মোল্লা প্রণীত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হযরত কুতুবুদ্দীন কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনাবসানের সঙ্গে 'সামা' মা'রিফতি কবিতা জড়িত ছিলো। বর্ণিত আছে, একদা শায়খ আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানকায় একদিন সামার আসর বসেছিল। এতে হযরত

খাজা বখতিয়ারসহ অনেক ওলিআল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আহমদ জামী নামক এক কবি ছিলেন। তিনি সামা পাঠের সময় এক পর্যায়ে সুর করে বললেন:

(ভাবার্থ) “ওহে! সামা কি বস্তু যে, এতে এতো মুহাব্বত ও বেদনার উৎপত্তি সৃষ্টি হয়? সামা তো প্রেমের রহস্য, আর প্রেম তো মাশুকের রহস্য ছাড়া আর কিছুই নয়।”

উক্ত কথাগুলো উপস্থিত বুজুর্গদের মধ্যে খুব উচ্চ পর্যায়ের আবেগের জন্ম দিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক আবেগপূর্ণ হয়ে পড়লেন খাজা কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এমনকি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর দু’জন বন্ধু তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলেন। চেতনা ফিরে আসার পরই কিন্তু সেই কবিতা পাঠক জামীকে বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। এরপর একাধারে চারদিন পর্যন্ত তিনি মা’রিফতি সামা শ্রবণ করতে থাকেন। বর্ণিত আছে তিনি অধিকাংশ সময় অজ্ঞান অবস্থায় থাকতেন। শুধুমাত্র নামায পড়ার সময় জ্ঞান ফিরে পেতেন। এ অবস্থায় তিনি মাঝে মধ্যে ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহ’ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতেন আর মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসতো। অনেকে মন্তব্য করেছেন, জামী যখন প্রথম পংক্তি উচ্চারণ করতেন তখন হযরতের রূহ বেরিয়ে পড়তো। আর দ্বিতীয় পংক্তি আবৃত্তির সময় তা আবার দেহের ভেতর ফিরে আসতো। মোটকথা তিনি ইশকে ইলাহীর চরম পর্যায়ের স্তরে উপনীত হন। তাঁর দেহ যেনো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। যুগের প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা এসে বললেন, “তিনিইশকের রোগে ভুগছেন! তাঁর অন্তর ও কলিজা জ্বলে গেছে। এখন আর চিকিৎসা নেই।” এরপর এই অবস্থায় থেকেই যুগের এই শ্রেষ্ঠ ওলি অসংখ্য ভক্ত-মুরীদান ও সাধারণ মানুষকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে মহান মা’বুদের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ছিলো, ২৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরি, ২৭ নভেম্বর ১২৩৫ ঈসায়ী। হযরতের প্রসিদ্ধ খলিফা দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জানাযা নামাযে ইমামতি করেন। পুরনো দিল্লির প্রসিদ্ধ কুতুব মিনারের অদূরে মেহেরওয়ালী মহল্লায় হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমাহিত আছেন।

খুলাফাবৃন্দ

হযরতের খুলাফাবৃন্দের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় নি। কোন কোন কিতাবে ২২ জন পর্যন্ত খলিফার নামের তালিকা দেখতে পাওয়া যায়। আমরা এখানেপ্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। ১. হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর, ২. শায়খ বদরুদ্দীন গজনবী, ৩. শায়খ বুরহান উদ্দীন বলখী, ৪. শায়খ মাহমুদ বিহারী, ৫. সুলতান নাসিরুদ্দীন গাজি, ৬. সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ, ৭. শাহ খিযির কলন্দর, ৮. শায়খ নাজমুদ্দীন কলন্দর, ৯. শায়খ জিয়াউদ্দীন রুমী এবং ১০. বাবা বাহরী বহর দরিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ।

অমূল্য বাণী

১. মৃত্যু একটি সেতুর মতো। উভয় পশে অবস্থানরত বন্ধুদ্বয়কে তা মিলনের স্বাদে নিমজ্জিত করে।

২. নফসের তাবেদারী করেও আল্লাহ তা’আলার দরবারের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা সত্যিই এক অদ্ভুত ইচ্ছে!

৩. তরীকতের পথে ধর্মভ্রষ্ট ঐ দুনিয়ালোভী, যে বাদশাহ, আমির-উমারা ও ধনীদের সাথে ওঠাবাসা করে।

৪. আল্লাহ তা’আলার গোপন রহস্য প্রকাশক ওলিরা অত্যন্ত ভাবাবেগ অবস্থায় থাকেন। এজন্য তাঁরা মোটেই দোষী নন।

৫. খোদাপ্রেমের দাবীদার যদি বিপদের সময় শিকায়াতের চিৎকার দেয়, তাহলে সে তার দাবীতে অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৬. মানুষের জন্য উচিৎ, যে গুনাহ থেকে তাওবাহ করা হয়েছে তা চিরদিনের জন্য ঘৃণা করা।

পরিচ্ছেদ ১৭

হযরত শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর উজুদাহনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৫ মুহাররম ৬৫৪/৬৬৬ হিজরি, সমাধি: পাকপাটান, পাকিস্তান।)

‘বাবা ফরিদ’ নামে সুপরিচিত এই প্রখ্যাত চিশতি শাইখুল মাশাইখের বাল্যনাম ছিলো ফরিদুদ্দীন মাসউদ। তিনি ৫৮৪, ৫৮৫ কিংবা ৫৮৯ হিজরিতে মুলতানের কতোওয়াল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ জামালুদ্দীন এবং দাদার নাম কাজী শুয়াইব। তিনি আমীরুল মু’মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। কাজী শুয়াইব চেঙ্গিস খানের অত্যাচার-নিপীড়নের সময় কাবুল থেকে লাহোরে হিজরত করেন। লাহোরের তখনকার কাজী মনসুর দিল্লীর সুলতানকে কাজী শুয়াইবের আগমনের কথা অবগত করেন। সুলতান তাঁকে কাজীর দায়িত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু শুয়াইব তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তিনি স্বপরিবারে মুলতানে চলে যান। মুলতানের শাসনকর্তাকে সুলতান নির্দেশ দিলেন, কাজী শুয়াইবের নামে বেশ কিছু জায়গার জমিদারী প্রদান করা হোক। সুতরাং কতোওয়াল এলাকায় তিনি জায়গীর লাভ করেন এবং পরিবারবর্গসহ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করলেন।

শিক্ষা

অতি অল্প বয়সেই ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়াতীম হন। নজীবুদ্দীন নামক তাঁর এক ছোট ভাই ছিলেন। ইয়াতীম এই দু’সন্তানের বিধবা মাতা বেগম সফুরা খাতুন ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সুশিক্ষিতা মহিলা। তিনি উভয় সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করে তুলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার নিজেই বহন করেন। এরপর তাদেরকে তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র মুলতানে পাঠিয়ে দেন।

হযরত ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি **১১** বছর বয়সে মুলতানে আসেন। তিন বছর অধ্যয়ন শেষে তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এরপর সেখান থেকে কানপুরে যেয়ে ৭ বছর লেখাপড়া করে আরো উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন।

বাইআত গ্রহণ

'বাবা ফরীদ গঞ্জেশকর (র)' নামক গ্রন্থে ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাইআত গ্রহণের ঘটনাটি বর্ণিত আছে। মুলতানের প্রধান জামে মসজিদ ছিলো 'কাজী মিনহাজ উদ্দীনের মসজিদ'। হযরত ফরিদুদ্দীন প্রায়ই এই মসজিদে যেয়ে ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। একদা মসজিদের ভেতর কিবলামুখী হয়ে বসে তিনি 'নাফি' নামক একখানা গ্রন্থ গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করছিলেন। এসময় সেখানে উপস্থিত হলেন খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! কি কিতাব পাঠ করছো? তিনি প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এরপর ক্ষণকাল পরে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। কুতুবুদ্দীন কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নূরানী চেহারা দেখে তাঁর শরীরে এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর অবস্থার সৃষ্টি হলো।

হযরত কুতুবুদ্দীন কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথমে দু' রাকাআত তাহিয়্যাতুল অযু নামায আদায় করলেন। এরপর ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি কিতাব পড়ছিলে? তিনি জবাব দিলেন, 'নাফি'। হযরত বললেন, নাফি শব্দের অর্থ উপকারী। বলো তো এই কিতাব পাঠ করে তুমি কতটুকু উপকার লাভ করেছ? জানো, নাফি দ্বারা তোমার নাফা হবে! একথা শুনে ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভাবোদ্দীপ্ত হয়ে পড়লেন। অন্তর তাঁর উদ্বেলিত হয়ে ওঠলো। তিনি বিনম্রভাবে আরজ করলেন, 'হযরত! আপনার খিদমাত ও নেক দৃষ্টির দ্বারাই আমার ফায়দা হতে পারে।' এটুকু বলেই তিনি খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তিনি স্বীয় পীরের সাহচর্যে কালাতিপাত করতে থাকেন।

হিজরি ৫৯০ সালে শায়খ ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ হয়েছিলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী নিজামুদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ফরিদুদ্দীন সাহেব যখন মুরীদ হন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর ছিলো। (সিয়ারুল আউলিয়া) মুরীদ হওয়ার সময় কাজী মিনহাজ উদ্দীনের মসজিদে উপস্থিত ছিলেন হযরত নিজামুদ্দীন নাগরী, মাওলানা আলাউদ্দীন কিরমানী, সাঈদ নূরুদ্দীন বিন মুবারক গজনভী, শায়খ নিজামুদ্দীন আবুল মুয়াইয়্যিদ, মাওলানা শামসুদ্দীন তুর্ক, খাজা মুয়াযি্যনা দুয রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এবং অন্যান্য তরীকতের মাশাইখবর্গ। (বাবা ফরীদ গঞ্জেশকর, শাব্বির চিশতি নিযামী, দিল্লী)

সফর ও কঠোর সাধনা

বাইআত গ্রহণের পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে মুর্শিদের নির্দেশে বাবা ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুলতানে থেকে যান। তবে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে মুর্শিদকে তিন মঞ্জিল পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন। মুলতানে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। তখনকার দিনে ইসলামী শিক্ষার দু'টি প্রধান কেন্দ্র ছিলো বলখ ও বুখারা। তিনি উভয় স্থান পরিভ্রমণ করেন। এরপর স্বীয় পীর সাহেবের সুহবত লাভের আশায় দিল্লীতে চলে আসেন। কিছুদিন এখানে অবস্থানের পর চলে যান কান্দাহারে। এরপর ইরাক, খুরাসান, মাউরা উন নাহার (মার্ভ), মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনুওয়ারায় সফর করেন। এ সফরে তিনি অনেক যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ ও বুজুর্গানে দীনের সাক্ষাৎ লাভ করে রূহানী ফায়িজ হাসিল করেন। অবশেষে পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। মুর্শিদের নির্দেশে তিনি পুরনো দিল্লীর একটি খানক্বায় অবস্থান করে কঠোর সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

এ সময় হযরত বাবা ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খানক্বায় থেকে যে কঠিন সাধনা করেছিলেন তার নজির বিরল। তিনি চিল্লায়ে মা'কুস পালন করেন। এই চিল্লার নিয়ম হলো দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত উল্টোচিল্লা পালন। ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সারাদিন মুরাকাবায় কাটাতেন। রাতের বেলা মসজিদের

মুয়াজ্জিনকে বলতেন, আমাকে বেঁধে কুয়ার নিকটস্থ আমগাছে লটকিয়ে রাখো। সুতরাং এভাবে উল্টো হয়ে নিজেকে লটকিয়ে রেখে সারারাত জিকির মুরাকাবায় কাটিয়ে দিতেন। এরূপ 'নফসের বিরুদ্ধে' কঠোর জিহাদ আজকের জামানায় কেউ করেছেন বা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ এক যুগ পর্যন্ত জঙ্গল ও পাহাড়ী অঞ্চলে কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা করেছেন। এ সময় বনের ঘাস ও লতা-পাতা ছিলো তাঁর খাদ্য। (মাসালিকুস সালিকীন)

একদিনের ঘটনা। জঙ্গলে থাকাকালে হযরত বাবা ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভীষণ পিপাসা অনুভূত হলো। মনে হচ্ছিলো, তার জীবন যায় যায়। একটি কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। পানির স্তর বেশ নীচে ছিলো। ভাবলেন, আহ! কেউ যদি একগাছি রশি ও একটি বালতি নিয়ে আসতো? কিন্তু কেউ এলো না। এরপর তিনি লক্ষ্য করলেন একদল হরিণ কুয়োর কাছে এসে দাঁড়ালো। পানির স্তর বেড়ে উঠলো। হরিণগুলো নির্বিঘেœ পনি পান করে চলে গেল। তিনি ছুটে গেলেন কুয়োর পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, পানির স্তর আবার নেমে পড়েছে! তিনি হতাশ হয়ে ওঠলেন। মনে মনে ভাবলেন, এ কেমন অবস্থা! হে প্রভু! একদল পশুকে আপনি পানি পান করিয়ে তৃষ্ণামুক্ত করলেন। অথচ, তোমার এই অধম বান্দাহকে উপেক্ষা করলেন? সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ ধ্বনিত হলো, "হে ফরিদ! বনের ঐ হরিণগুলো আমার উপর ভরসা করেছিল। আর তুমি ভরসা করছিলে রশি ও বালতির উপর। তাই তাদেরকে পান করালাম, তুমি হলে বঞ্চিত।" এতদশ্রবণে তাঁর চেতনায় সাড়া জাগলো। নিজের নফসকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয় নি। সুতরাং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর তাড়াতাড়ি পানি পান করবেন না। দীর্ঘ চল্লিশ দিন নিজেকে বেঁধে রাখলেন। এ সময় পানি তো দূরের কথা একটু খাদ্যও গ্রহণ করেন নি। চল্লিশ দিন শেষে এক টুকরো মাটির ঢেলা মুখে দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এই মাটির ঢেলা চিনিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কথিত আছে, এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে 'গঞ্জেশকর' বা 'শকরগঞ্জ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আরবী সুক্কার (চিনি) শব্দ থেকে এ শব্দটির উৎপত্তি। (দিল্লী কি বাইশ খাজা)

অন্য বর্ণনায় আছে, মুর্শিদের নির্দেশে একদা হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একাধারে তিনদিন উপবাসে কাটান। শেষ দিবসে এক ব্যক্তি এসে কিছু রুটি প্রদান করলো। প্রভুপ্রদত্ত রিজিক ভেবে তিনি তা গ্রহণ করে ভক্ষণ করলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরই অসুস্থ হলেন এবং বমি করে পেট খালি করে দিলেন। ঘটনাটি শায়খ কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট জানালেন। তিনি বললেন, "তিনদিন পর তুমি এক মাতালের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে ভক্ষণ করেছো। আল্লাহর দরবারে শুকুর! খাদ্য তোমার পেটে থাকে নি। এবার আরো তিন দিনের জন্য উপবাস করো এবং দেখো গায়েব থেকে কী আসে?"।

কিন্তু তিনদিন উপবাসে থাকার পরও কোনো খাদ্য কোথাও থেকে আসলো না। ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভুখা থাকার দরুন খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন। শেষে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় কিছু পাথর কুড়িয়ে মুখে দিলেন। আল্লাহর কী কুদরত! পাথরগুলো চিনিতে রূপান্তরিত হলো। ফরিদুদ্দীন ভাবলেন, হয়তো ভারসাম্য হারিয়ে তিনি পাথরের মধ্যে চিনির স্বাদ পাচ্ছেন। আরো কিছু পাথর মুখে দিলেন। কিন্তু না, সত্যিই পাথর হয়ে গেছে চিনি! এবারও তিনি মনে করলেন, আমি পাগল হয়েছি! তাই পাথরকে চিনি ভাবছি! পুনরায় পাথর মুখে দিলেন। এভাবে কয়েকবার পাথর মুখে দেন এবং বের করেন। প্রতিবারই চিনির স্বাদ পাওয়া যায়। ঘটনাটি স্বীয় মুর্শিদের নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "তুমি যদি পাথরগুলো খেয়ে নিতে তাহলে ভালো হতো- ওগুলোতো সত্যিই চিনিতে রূপান্তর হয়েছিল"। এদিন থেকে ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শকরগঞ্জ' নামে পরিচিত হন। (মাখাইখে চিশত)

অপর আরেক বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদা এক ব্যবসায়ীর কাছে কিছু চিনি তাকে দেওয়ার জন্য আবদার করলেন। ব্যবসায়ী বললো, 'আমার নিকট চিনি নেই, আছে শুধু লবণ।' তবে কথাটি মিথ্যা ছিলো। সে হযরতকে চিনি দিতে ইচ্ছে করছিলো না।

হযরত ফরিদুদ্দীন বললেন, "তাহলে তোমার নিকট লবণই আছে!"

ব্যবসায়ী পাত্রের ভেতর দৃষ্টিপাত করে দেখে সত্যিই সব চিনি লবণে পরিণত হয়ে গেছে! সে হযরতের পায়ে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে মাফ করলেন। সাথে সাথে লবণ আবার চিনি হয়ে গেল। এ ঘটনার কারণে পরবর্তীতে তিনি 'শকরগঞ্জ' নামে পরিচিত হন।

হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বুজুর্গী ও মর্যাদা সম্পর্কে তার দাদাপীর হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব উচ্চ ধারণা রাখতেন। তার প্রশংসা বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি বলেন, "কুতুবুদ্দীন এক উচ্চমানের রাজকীয় বাজপাখি আটক করেছে!"। আরেকদিন তিনি বললেন, "এতো এক মোমবাতি। সে দরবেশদের খানক্বাহ্ আলোকিত করবে। সে হবে যুগের গউস ও কুতুব।" মৃত্যুর সময় হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কাছে ডেকে আনলেন। বললেন, বাবা ফরিদ! তোমাকে আমি আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাটের দায়িত্ব প্রদান করলাম।

খিলাফত লাভ

তরীকতের রাস্তায় দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে মুর্শিদের পক্ষ থেকে এক বিশেষ ধরনের তাওয়াজ্জুহ মুরীদকে দেওয়া হয়। একে বলে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব। তবেযোগ্যতা অর্জন ছাড়া তা লাভ কখনো সম্ভব নয়। যদিও আজকাল মাশাইখরা 'ইসলাহী খিলাফত' প্রদানের রিওয়াজ শুরু করেছেন। এটা প্রদানের মাধ্যমে মুরীদকে তরীকতের রাস্তায় আরো বেশী সাধনায় লিপ্ত হতে উৎসাহ করা হয় মাত্র। এভাবে যারা খিলাফত লাভ করেন, তারা অন্যকে মুরীদ করার যোগ্যতা রাখেন না। যা হোক, বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন খিলাফত লাভের যোগ্যতা অর্জন করলেন তখন তাঁর দাদাপীর হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলেন।

একদা খাজা সাহেব স্বীয় মুরীদ কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘরে মেহমান হন। একই কক্ষে মেহমান-মেজবানের থাকার খাট ছিলো। নিয়মানুযায়ী ফরিদুদ্দীন মাসউদ তার মুর্শিদ কুতুবুদ্দীন কাকীর খিদমাতে হাজির হলেন। তার পা টিপে দিতে লাগলেন। কাকী সাহেব ইঙ্গিতে বললেন, আজ রাত আমাদের শ্রদ্ধেয়

মেহমানের পা টিপে দাও। সুতরাং তিনি তা-ই করলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, হযরত! আমার হৃদয় তো এখানে। আমি কিভাবে অন্যত্র যেতে পারি? কথাটি খাজা গরীবে নিওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কানে গেল। তিনি মন্তব্য করলেন, "হে কুতুবুদ্দীন! একে কিছু দান করো!" এ নির্দেশের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো তরীকতের খিলাফত প্রদানের কথা। (মাশাইখে চিশত)।

খিলাফত লাভের ঘটনা অন্য বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। একদা হযরত কুতুবুদ্দীন কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিল্লীতে স্থাপিত খানক্বায় গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আগমন করেন। মুর্শিদের নিকট কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের সকল মুরীদকে উপস্থিত করলেন। খাজা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সবাইকে নিয়ে এসেছো?" তিনি জবাব দিলেন, "জী হাযরাত! তবে একজন ছাড়া। ফরিদুদ্দীন। সে বর্তমানে চিল্লায় বসে আসে।" হযরত খাজা সাহেব একথা শ্রবণ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "চলো! তাকে দেখে আসি।"

উভয় বুজুর্গ চলে আসলেন দিল্লীর 'গজনি গেট' সন্নিকটস্থ একটি প্রাচীরের নিকট। এখানে ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার চিল্লাখানায় অবস্থান করছিলেন। তিনি কঠোর সাধনা হেতু এতোই দুর্বল হয়েছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জগতের এই উভয় সূর্যপুরুষকে দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানানোর ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। সুতরাং বসে বসেই তিনি উভয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

হযরত ফরিদুদ্দীনের এই অবস্থা লক্ষ্য করে খাজা মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সাথীকে বললেন, "হে কুতুব! আর কতদিন বেচারা যুবককে মুজাহাদার অগ্নিতে দগ্ধ করবে! এসো! আমরা উভয়ে মিলে এই ফকীরকে কিছু বখশিশ দিই।" এরপর খাজা সাহেব ফরিদুদ্দীনের ডান হাত ও কুতুবুদ্দীন সাহেব বাম হাত ধরে তাকে দাঁড় করালেন। খাজা সাহেব এবার আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের ফরিদকে আপনি কবুল করুন! তাকে পূর্ণ দরবেশীর মর্যাদা দিন!"

সাথে সাথে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ উঠলো, “আমি ফরিদকে কবুল করেছি। সে যুগের অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক নেতা হবে!”

খাজা সাহেব এবার কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে তাকিয়ে নির্দেশের সুরে বললেন, “ইসমে আযম খাজিগানে চিশতিদের মধ্যে পরম্পরায় প্রতিস্থাপন হয়ে আসছে। ফরিদকে তা শিক্ষা দাও।”

পীরের নির্দেশ মতো কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার প্রিয় মুরীদ ফরিদুদ্দীনকে ‘ইসমে আযম’ শিক্ষা দিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই ফরিদুদ্দীনের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটলো। অন্তরদৃষ্টির সম্মুখস্থ যাবতীয় পর্দা উঠে গেল। যাবতীয় জগতসমূহের অভ্যন্তরস্থ সবকিছু তাঁর অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখতে পেলেন। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় ‘খিল’অত’ ফরিদুদ্দীনকে উপহার করলেন।

খাজা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে ইলমে লাদুনীর বারিধারা বর্ষিত হতে লাগলো। বান্দাহ ও মা’বুদের মধ্যস্থ যাবতীয় পর্দা উন্মোচন হলো। আল্লাহর নৈকট্য তথা ইলমে মা’রিফাত হাসিল করলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কুতুবুদ্দীন কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফত প্রদানের নিদর্শন স্বরূপ নিজের পাগড়ি, যষ্টি, খিরকা, জুব্বা ইত্যাদি ‘তাবাররুক’ হিসাবে বাবা ফরিদকে প্রদান করেন। মুবারক এই খিলাফত প্রদানের অনুষ্ঠানে সে যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট ওলিআল্লাহ এবং দরবেশ উপস্থিত ছিলেন। (বাবা ফরিদ গঞ্জেশকর, দিল্লী)

কারামত

হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। বিভিন্ন কিতাবে তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত অনেক কারামতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। কারামত বুজুর্গীর, ওলিয়াত কিংবা শায়খের যোগ্যতা লাভেরপ্রমাণ নয়। অধিকাংশ বুজুর্গানে দীনের মতে ‘কারামত’ মূলত তরীকতের রাস্তার ‘কাটা’

মাত্র। এ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা হয়তো কিছু উপকৃত হতে পারেন, এই যা। যা হোক, হযরতের কারামত হিসাবে প্রসিদ্ধ পাঁচটি ঘটনা তুলে ধরছি।

১. ঘাতকের উদ্দেশ্য উপলব্ধি

লাহোরের প্রধান কাজি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বেশ হিংসার দৃষ্টিতে দেখতো। একদা তারা ফন্দি আঁটলো, তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং টাকার বিনিময়ে এক ঘাতককে হযরতের দরবারে প্রেরণ করলো। রাতের গভীরে হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গভীর ধ্যানমগ্ন আছেন। ঘাতক কক্ষে ঢুকে কর্কশ সুরে সালাম জানালো। মনে হলো তিনি তা শুনতে পান নি। সুতরাং জবাব দিলেন না। একটু পর তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। খাদিমকে বললেন, দেখো তো, আগন্তুক লোকটির গায়ে হলুদ বর্ণের জামা ও সে তুর্কী নিবাসী লোক কি না? খাদিম জবাব দিলেন, জি হ্যাঁ। তার কোমরে শিকল আছে, বস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছে একটি ছুরি, ঠিক কিনা? তুমি তাকে বলো, এই মুহূর্তে সে এখান থেকে বিদায় না হলে ভীষণ বিপদে পড়বে।

লোকটি আড়ালে থেকে সবই শোনতে পেলো। সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

২. পছন্দসই খাবার পরিবেশন

একদিন ৭ জন দরবেশ হযরতের খানক্বায় মেহমান হলেন। তারা সকলে মিলে হযরতের বুজুর্গী পরীক্ষা করার এক কৌশল আঁটলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দসই খাবার কামনা করে বললেন, দেখি, সত্যিই আমাদের পছন্দসই খাবার সামনে এসে যায় কি না। কিছুক্ষণ পর তাদের সম্মুখে খাবার পরিবেশন করা হলো। বিভিন্ন জাতের ও নিজেদের পছন্দসই খাদ্য সামনে এসেছে দেখে দরবেশরা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব উচ্চ পর্যায়ের ওলি। তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল।

৩. মুরীদ কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা লুকানোর ঘটনা

কোন এক সময় এক ধনী ব্যক্তি হযরতের এক মুরীদের মাধ্যমে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া হিসাবে পাঠালেন। মুরীদ জানতো, উক্ত ধনী লোকটি কখনো হযরতের দরবারে আসবে না। সুতরাং সে পথিমধ্যে সকলের অগোচরে ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা নিজের জন্য লুকিয়ে রাখলো। দরবারে পৌঁছে সে বাকী ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা হযরতের হাতে প্রদান করলো। তিনি মৃদু হেসে বললেন, “বৎস! তুমি তো বেশ সুন্দর অর্ধা-অর্ধিভাবে বণ্টন করলে!” কথাটি শুনতেই মুরিদের শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল। সে বাকী মুদ্রাগুলো বের করে হযরতের হাতে তুলে দিয়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, ঘটনার পর কেনো যেনো এই মুরীদের প্রতি তিনি দয়াপরবশ হয়ে ওঠেন এবং নিজের সান্নিধ্যে রেখে দেন। পরবর্তীতে এই মুরীদ একজন খ্যাতিমান ওলি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

৪. হযরত বু-আলী কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ

একদা হযরত বু-আলী কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত ফরিদুদ্দীন যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পার হতে হয়। কিন্তু সেখানে নৌকা ছিলো না। নদীর অপর পারে বু-আলী কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কুঁড়েঘর। ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একখানা ছোট্ট কাগজের নৌকা বানিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে এতে আরোহণ করলেন। আল্লাহর কুদরতে নৌকোখানা তাঁকে নিয়ে অপর পারের দিকে চলতে লাগলো। এদিকে কুঠুরির জানালা দিয়ে মাথা বের করে বু-আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবকিছু অবলোকন করছিলেন। তিনি দু’আ করলেন, “হে আল্লাহ! নৌকোখানার গতিরোধ করুন!” সাথে সাথেই কাগুজে নৌকোটি থেমে গেলো নদীর মাঝখানে। হযরত ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে এটা ঘুরতে লাগলো। তিনি বিষয়টি বুঝতে পারলেন। চোখে পড়লো বু-আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জানালার মধ্য দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। হযরত ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দু’আ করলেন, “হে আল্লাহ! বু-আলীর মাথায় দু’টি লম্বা শিং গঁজিয়ে দেন, যাতে তিনি এদিকে তাকাতে সক্ষম না হন!” এ দু’আও আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। সুতরাং বু-আলীর মাথায় শিং গঁজিয়ে ওঠায় জানালার বাইরে তাকাতে পারলেন না। ইতোমধ্যে ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নদী পার হয়ে আসলেন। বু-আলী কলন্দর

রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সালাম জানিয়ে কক্ষে ঢুকলেন। নিজের ভুল বুঝে বু-আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মেহমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি ক্ষমাকরলেন। সাথে সাথে বু-আলীর মাথা থেকে শিংদ্বয় অদৃশ্য হয়ে গেল। উভয় বুজুর্গ এবার মুসাফাহা করলেন।

৫. অপহৃতা স্ত্রী উদ্ধার

একদিন হযরতের খানক্বায় একব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করলো। বললো, "হযরত! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। একদল ডাকাত আমার ঘরে ঢুকে সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। আমি এতে সবর করেছি, কিন্তু তারা আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকেও অপহরণ করে নিয়ে গেছে! দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আমার স্ত্রী ছাড়া আমি বাঁচবো না।" শায়খ ফরিদুদ্দীন একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা তুমি আগামীকাল এসো। দেখি কিছু করা যায় কি না। পরদিন সে ফিরে আসার পর তিনি বললেন, এখানে একটু অপেক্ষা করো। বাইরে দেখা গেলো একদল পুলিশ এক ব্যক্তিকে চেইন দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে সুলতানের দরবারে। তিনি লোকটিকে চিনতেন। সে বার বার আবদার করছিলো, "আমাকে ছেড়ে দিন! আমি কোনো অপরাধ করি নি। আমাকে অন্তত একটি বার শায়খ ফরিদুদ্দীনের দরবারে নিয়ে চলুন।"

পুলিশরা তার আবদার রক্ষার্থে হযরতের খানক্বায় নিয়ে আসলো। এ লোকটিও হযরতের নিকট আবদার করলো, "হে মহাত্মন! আপনি তো আমাকে চিনেন। আমি কোনো অপরাধ করি নি। দয়া করে আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করুন।" তিনি জবাব দিলেন, "আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নেই। তুমি যদি নিরপরাধ হয়ে থাকো তাহলে ছাড়া পাবে। আমি দু'আ করছি।" নিজে লোকটির আমানতদার হয়ে পুলিশদেরকে বললেন, "এই লোকটিকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিন।" পুলিশ তা মেনে নিল। এরপর হযরত অপর লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "যাও, এই লোকটিকে সাথে নিয়ে অমুক বাজারে চলে যাও। সেখানে দেখবে এক দাসীকেবিক্রি করা হচ্ছে। তাকে ক্রয় করে নিয়ে এসো।" উভয়ে বাজারে গিয়ে ঐ দাসীকে কিনে আনলো। খানক্বায় আসার পর হযরত বললেন, ওহে! স্ত্রীহারা ব্যক্তি! এই দাসীটি তুমি নিয়ে যাও। সে দাসীর মুখের নিকাব সরিয়ে অবাক হয়ে গেল। এযে তাঁরই

অপহৃতা স্ত্রী! হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই অপূর্ব কারামতে সকলেই মুগ্ধ হলেন। বিপদে পতিত উভয় ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হলো।

মূল্যবান উপদেশবাণী

১. তিনি বলতেন, খোদাভীরুতা হলো ইলমে মা'রিফাতের মূল চাবিকাঠি। আল্লাহকে ভয় যে যতো বেশী করবে সে ততো বেশী নৈকট্য লাভে ধন্য হবে।

২. নিজেকে গোপন রাখার নামই হলো দরবেশী। যে দরবেশ নিজেকে জাহির করে বেড়ায় সে রিয়াকার। আর রিয়া হলো কামালিয়াত লাভের পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাঁধা।

৩. প্রভুর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা ছাড়া ইলমে মা'রিফাত হাসিল হয় না। যদি তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তথাপি তুমি একবিন্দুও বিচলিত হবে না। এভাবে ধৈর্যধারণই হলো আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার উপমা। মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো বান্দা যখন প্রভুর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তখন তিনি অবশ্যই তার উপর বালা-মুসিবত পতিত করেন। এ সবই পরীক্ষা। এতে উত্তীর্ণ হতে পারলে বান্দা নৈকট্যলাভে ধন্য হবে।

৪. ধনাঢ্য মানুষ বাস্তবে সুখী নয়। আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদকে সঠিক রাস্তায় খরচ করতে ব্যর্থ হলে তাদের ইহ-পরকাল উভয়টি অশান্তিতে ভরপুর হবে।

৫. সামান্যতম দুনিয়ালিপ্সা স্রষ্টা ও বান্দার মধ্যে পর্বতসম পর্দাস্বরূপ। অন্তরে দুনিয়ার মোহ যতো বেশী হবে, আল্লাহ তা'আলা থেকে ততো বেশী দূরে থাকবে। আর দুনিয়া অন্তর থেকে যতো দূরে থাকবে, আল্লাহ তা'আলাও অন্তরের ততো কাছে থাকবেন।

৬. মৃত্যুর স্মরণ গাফিলতা থেকে অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখে। মৃত্যুকে সঙ্গী বানাও। আল্লাহ তোমার যাবতীয় কার্য সহজ করে দেবেন ও তোমার প্রতি সদয় হবেন।

৭. প্রকৃত ফকির-দরবেশ সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। গোসল করার সময় ভাবেন, এটাই আমার জীবনের শেষ গোসল। নামাযের সময় মনে করেন, এই নামাযই জীবনের শেষ নামায। কাপড় পরার সময় মনে করেন, আমি কাফন পরিধান করছি। এভাবে প্রতিটি কাজ জীবনের শেষ কাজ হিসাবে মনে করে আখিরাতের প্রস্তুতি নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন।

শেষ নিঃশ্বাস

এই মায়াবী ধরার কোল ছোড়ে একদিন যে সবাইকে চলে যেতে হবে, সে মহাসত্য সবার জানা। নবী-রাসূল-সিদ্দিকীন-ওলি-দরবেশ কেউই এ চাকচিক্য প্রকাশক প্রতারক দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে থাকতে পারেন নি। হায়াতে জিন্দেগীর অবসান এক নির্দিষ্ট ক্ষণে ঘটবেই। হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহলোক ত্যাগ করে মাহবুবের সান্নিধ্যে চলে যান মুহাররমের ৫ তারিখ ৬৬৪, ৬৬৮ কিংবা ৬৬০ হিজরিতে। বিভিন্ন কিতাবে তাঁর মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণিত আছে।

যে রাতে তাঁর মৃত্যু হয় এর আগের দিন তিনি ৫ খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন। এরপর গভীর মুরাকাবায় সারাদিন কাটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যের সময় খাদিম ও মুরীদানকে বললেন, “আজ তোমরা আমাকে একাকী ও নিরিবিলি থাকতে দাও। আমি ডাক না দেওয়া পর্যন্ত কেউ কক্ষে ঢুকবে না।” এরপর মাগরিবের নামায আদায় করে শয়ন কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সারারাত চলে গেল। তাহাজ্জুদ, ফযরের ওয়াক্ত পার হলো। ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসলোই না। দরজার নিকট অবস্থানরত তাঁর ভক্তরা বিচলিত হয়ে ওঠলেন। দরজা জোর করে ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন হযরত সিজদাবনত আছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও তিনি মাথা উত্তোলন করলেন না। গায়ে হাত দিয়েই ভক্তরা বুঝতে পারলেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ, জগতখ্যাত এই মহান ওলিআল্লাহ অনেক পূর্বেই পৃথিবীর মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে মাশুকের দরবারে চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

মৃত্যুর পর এক গায়েবী আওয়াজ উঠলো, "দুস্ত বা দুস্ত পেওয়াস্ত" - বন্ধু বন্ধুর মিলনের মধ্যে একাকার হয়েছেন। এক বৃদ্ধা তাঁর কাফনের কাপড় স্বহস্তে বুনে রেখেছিলেন। মহিলা বলেন, আমি এই কাপড়খানা সর্বদা ওজু অবস্থায় বুনেছি। ইচ্ছে ছিলো এর দ্বারা আমার কাফন হবে। কিন্তু মহান এই ওলিকে তা প্রদান করে খুবই প্রশান্তি বোধ করছি। হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পাঞ্জাবের পাকপাটানে সমাহিত করা হয়েছে।

খুলাফাবৃন্দ

মাশাইখে চিশতের লেখক বলেন, হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফাদের সংখ্যা হাজার হাজার ছিলেন। এতো বেশী খলিফা এর পূর্বে কিংবা পরে কোনো তরীকতের শায়খ রেখে গেছেন বলে জানা যায় নি। 'জাওয়াহিরুল ফরিদ' গ্রন্থে ৫৮৪ জন খলিফার নাম লিপিবদ্ধ আছে। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক'জন হলেন খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া, খাজা জামালুদ্দীন হাসনুবী, খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালিয়ারী, হযরত ইনামুল হক সিয়ালকোটী, শায়খ মুনতাখাবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। আমাদের চিশতিয়া তরীকার শাজারায় যার নাম আসে তিনি হলেন, শায়খুল মাশাইখ হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং পরবর্তীতে তাঁরই জীবনালোচনা হবে।

পরিচ্ছেদ ১৮

হযরত শায়খ আলাউদ্দীন আলী আহমাদ সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৬৯০ হিজরি, সমাধি: পীরান, কালির, ইউপি, ভারত।)

তিনি ছিলেন হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাগিনা এবং বিশিষ্ট খলিফা। সাবির পাক নামে প্রসিদ্ধ এই মহান শায়খের জন্ম হয় বর্তমান আফগানিস্তানের হিরাত অঞ্চলে। অধিকাংশ জীবনী লেখক বলেছেন, তিনি হিজরি ৫৯২ সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন (ঈসায়ী ১১৯৫ খ্রীস্টাব্দে)। কাদিরিয়া সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ। সুতরাং তিনি হুসাইনী সায়্যিদ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ ইব্রাহীম আবদুর রাহমান, যিনি ছিলেন শাহ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহহাব এর পুত্র, যিনি ছিলেন হযরত গাওসুল আযম আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র। -(spiritualfoundation.net)

জন্মের কিছুদিন পূর্বে গর্ভে থাকাকালে তাঁর মাতা একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর জিয়ারত লাভ হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "ওহে! তোমার উদরের সন্তান জন্ম নিলে তার নাম রেখো 'আহমাদ'।" এই স্বপ্নের আরো কিছুদিন পর হযরতের মাতা আবার স্বপ্নে দেখলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, "ওহে! তোমার উদরের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নাম রেখো 'আলী'।" সুতরাং জন্মের পর তার মাতা নাম রাখলেন 'আলী আহমাদ'।

হযরত সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনের প্রথম যে বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিলো, "লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ" - অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুই উপস্থিত নয়'। মাত্র ৭ বছর বয়সেই তিনি রোযা রাখা শুরু করেন।

এসময় থেকে নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করতে থাকেন। আদুরে সন্তান এরূপ মুজাহাদা অল্প বয়স থেকে শুরু করেছে দেখে তার মাতা একদিন বললেন, “বাবা! এই অল্প বয়সে কঠোর মুজাহাদা করতে নেই”। তিনি জবাব দিলেন, “আমি কি করবো আম্মাজান! আমি যে আর কিছুই চাই না। নিজেকে আল্লাহর জন্য জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। এই সাধনার মধ্যেই আমি আনন্দ অনুভব করি।”

হযরত আলী আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ হযরত বাবা ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা বলেছিলেন, “আমার বুকের জ্ঞান আমি শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়াকে দান করেছি। আমার হৃদয়ের জ্ঞান আলাউদ্দীনের হৃদয়কে আলোকিত করেছে।” হযরত সাবির কালিয়ারী সারা জীবনই ‘অর্ধ-মযজুব’ অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

খানক্বায় এক যুগ

হযরত আলাউদ্দীন সাবির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মামার খানক্বায় দীর্ঘ ১২ বছর অবস্থান করেছিলেন। এসময় তিনি কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদায় দিন কাটাতেন। তিনি কোনো দিন অনুমতি ছাড়া মুখে একমুঠো অন্ন দেন নি। অধিকাংশ দিন তিনি রোযা অবস্থায় থাকতেন। একদা তাঁর মুর্শিদ বাবা ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কোন্ কারণে উপবাসে থাকলেও অনুমতি ছাড়া খাবার গ্রহণ করো না?”

তিনি জবাব দিলেন, “হযরত! আপনার অনুমতি ছাড়া এই গোলামের কি অধিকার আছে যে, খাবার খেয়ে নেবে?”

একথা শোনে ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আজ থেকে তুমি ‘সাবির’ (ধৈর্যশীল) নামে পরিচিত হবে।

গভীর মুরাকাবা

হযরত সাবির পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ধ্যান-মুরাকাবায় এতোই বেশী মগ্ন থাকতেন যে, কেউ তাঁর নিকটে আসলে টেরই পেতেন না। একদা স্বীয় মামা ও মুর্শিদ হযরত বাবা ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক খাদিম তাঁকে দেখতে

আসলেন। অনেকক্ষণ কাছে থাকার পরও তিনি কোনো সাড়া দিলেন না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, হযরত শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হযরত পীর-অ-মুর্শিদের খাদিম এসেছেন! তিনি সালাম জানাচ্ছেন!" এতে হযরতের ধ্যান ভেঙ্গে গেল। বললেন, "আমার শাইখ কেমন আছেন?" এরপর তিনি শামসুদ্দীনকে বললেন, "আপনি খাদিমের খানাপিনার ব্যবস্থা করুন"। এটুকু বলে তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হলেন।

খাদিম এবার চলে গেলেন হযরত সুলতানুল আওলিয়ার দরবারে। সেখানে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হলো। ভালো খাবার পরিবেশ করা হলো। এরপর অনেক মূল্যবান জিনিষ উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে বিদায় করা হলো। বাবা ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায় ফিরে আসলেন খাদিম। হযরত বাবা ফরিদ তাঁর উভয় খলিফা সম্পর্কে খাদিমকে প্রশ্ন করলেন।

খাদিম বললেন, "সুলতানুল আওলিয়া আমাকে অত্যন্ত সম্মান করেছেন।" বাবা ফরিদ বললেন, "আলাউদ্দীনের খবর কি বলুন?"

খাদিম জবাব দিলেন, "তিনি তো অনেকক্ষণ পরে কথাই বললেন!" বাবা ফরিদ জিজ্ঞেস করলেন, "আমার সম্পর্কে কিছু বলেছেন?"

খাদিম বললেন, "জি, শুধুমাত্র এটুকু, আমার শায়খ কেমন আছেন?"

হযরত বাবা ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অশ্রুসিক্ত অবস্থায় বললেন, "এই অবস্থায় তিনি আমার কথা স্মরণ রেখেছেন জেনে খুশী হলাম। কারণ, তাঁর বর্তমান অবস্থায় একমাত্র মাশুক ছাড়া অন্য কারোর কথা স্মরণ থাকা প্রায় অসম্ভব। আমার প্রতি তার মুহাব্বত থাকায় তিনি আমাকে স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।"

ইন্তিকাল

প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে আশিকে মাওলা হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯০ হিজরির ১৩ রবিউল আওয়াল মাসে পৃথিবী থেকে

বিদায় গ্রহণ করেন (১২৯১ ঈসায়ী)। সাহারানপুর জিলার রুরকি অঞ্চলে পীরান কলিয়ারে তার সমাধি অবস্থিত। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর হিন্দুরা কালিয়ার অঞ্চলে প্রভাবশীল হয়ে ওঠে। যুগশ্রেষ্ঠ এই ওলির কবরকে ঘিরে তারা মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়। একদিন দেখা গেল কবরের উপর একটি হিংস্র সিংহ এসে সবাইকে হামলা করে বসলো। বেশ ক'জনকে সে খতম করে দিল। অন্যরা কোনমতে পালিয়ে জান বাঁচালো। এরপর থেকে কবরপূজা থেমে যায়।

হযরত সাবির পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে 'জালালী' প্রভাব খুব বেশী সক্রিয় ছিলো। মৃত্যুর পরও তাঁর কবরের উপর একটি নূরোজ্জ্বল অগ্নিশিখা দেখা যেতো। স্বর্গীয় নূরের এই শিখার কারণে বহুদিন যাবৎ তাঁর কবরের নিকট কেউ যেতে সাহসও করে নি। হযরতের মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর চিশতিয়া তরীকার অপর এক প্রসিদ্ধ শায়খ হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাঁর কবর জিয়ারত করেন। সেই থেকে নূরের শিখা নিভে যায়।

উল্লেখ্য ভারতবর্ষে চিশতিয়া তরীকা হযরত ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরে তাঁর চারজন বিশিষ্ট খলিফার নামানুসারে চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই চার খলিফার নাম পরবর্তীতে চিশতিয়া তরীকার সিলসিলায় যুক্ত হয়। আমাদের শাজারা তাই 'চিশতিয়া সাবিরিয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানেহযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারেই 'সাবিরিয়া' শব্দের সংযুক্তি। অবশ্য পরে গঙ্গুহ শরীফের স্বনামধন্য শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে এই তরীকা 'চিশতিয়া সাবিরিয়া কুদ্দুসিয়া' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

পরিচ্ছেদ ১৯

হযরত শায়খ শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৭১৫ হিজরি, সমাধি: পানিপথ, ভারত।)

এই মহাত্মন শাইখ তুর্কীস্তানের অধিবাসী ছিলেন। সে অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ 'সাইয়্যিদ' বংশে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক জীবনে তিনি ইলমে জাহিরের উপর গভীর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইলমে জাহির তথা বাহ্যিক শরীয়তের জ্ঞান দ্বারা তাঁর আত্মা পরিতৃপ্ত হলো না। তাই সে যুগের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অন্তরে প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিলো, ইলমে বাতিন তথা শরীয়তের অভ্যন্তরস্থ হাক্বিকাতের জ্ঞান- তাসাওউফ শাস্ত্রের উপরও পারদর্শী হয়ে ওঠবেন। কিন্তু ইলমে তাসাওউফ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের আসল উপায়-পাথেয় হলো একজন কামিল পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ ও সান্নিধ্য লাভ।

বিভিন্ন দেশ ও শহরে ঘুরেফিরে অবশেষে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। লোকমুখে জানতে পারলেন, ভারতের কালিয়ার নামক স্থানে একজন বুজুর্গ আছেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন সুযোগ্য খলিফা। কালিয়ারে পৌঁছে হযরত তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মহান বুজুর্গের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য তিনি এভাবেই লাভ করেন।

হযরত শামসুদ্দীন পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে হযরত কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিতভাবে খিলাফত প্রদান করেন। চিশতিয়া তরীকানুযায়ী 'ইসমে আযম' শিক্ষাদান করে নিজের খিরকা তাবাররুক হিসাবে তাঁকে দান করে বললেন, "বৎস! পানিপথের ওলিয়াত তোমাকে দান করা

হলো। আমার মৃত্যুর পর তুমি পানিপথে গিয়ে বসতি স্থাপন করবে। এখানে (অর্থাৎ কালিয়ারে) তিন দিনের বেশী অবস্থান করবে না।”

নিজের শায়খের মৃত্যুর পরই শামসুদ্দীন তুর্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পানিপথে যেয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন হযরত কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলিফা। সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর দাদাপীর হযরত ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরও সান্নিধ্য অর্জন এবং খিলাফত লাভ করেন। সুতরাং তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ দু'জন শায়খ- মামা-ভাগিনেয় উভয়ের খলিফা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

কারামত

প্রায় আটশত বছর পূর্বে হযরত তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত ছিলেন। সে যুগের মহান মাশাইখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সাধনা ও ধ্যানের পথ-পাথেয়, পদ্ধতি ও মাত্রা ছিলো অতুলনীয়। আজকের যুগে এরূপ উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত, জিকির, মুরাক্বাবা, মুজাহাদাসম্পন্ন বুজুর্গদের সংখ্যা বিরল- এমনকি নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইলমে মা'রিফাতের রাস্তায় যখন সালিক খুব বেশী থেকে বেশী সাধনায় লিপ্ত হন তখন ‘পথের বস্তু’ হিসাবে ‘কাশফ’, ‘কারামত’ ও ‘ইলহাম’ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কোনো সময় পরীক্ষা, অন্য সময় ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি আর অন্যান্য সময় অপর এক বা একাধিক বান্দার উপকারার্থে ভূষিত করেন। সুতরাং এসব ব্যাপার কোনো সালিকের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার নামই ‘কামালিয়াতের’ নিদর্শন নয়। জগতে অনেক আল্লাহর উচ্চপর্যায়ের ওলি ছিলেন যাদের মাধ্যমে এসব প্রকাশ পায় নি। তবে হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলিফা হযরত শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবনের অসংখ্য কারামত থেকে ক'টি মাত্র এখানে বর্ণিত হলো।

(১)

তিনি একদা সিদ্ধান্ত নিলেন সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবেন। ভীষণ ঠাণ্ডার মৌসুমে পুকুরের পানি পর্যন্ত বরফে পরিণত হতো। হযরতের এক সাথী একদিন এক ছোট্ট পুকুরের পারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন তিনি অযু করছেন। পানি

হিমায়িত অবস্থায় ছিলো। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, অযুর পানিটুকু যে স্থান থেকে তিনি ওঠিয়ে নিয়ে কাজ সারছিলেন তা উত্তপ্ত। অর্থাৎ হযরতের অযুর জন্য এই কতটুকু জায়গার পানি শুধু তরল ছিলো না- গরমও হয়ে গিয়েছে! এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার উক্ত সৈন্য সুলতানকে অবগত করলেন। সুলতান হযরতের বুজুর্গি অনুধাবন করে তাঁর বিশেষ ভক্তে পরিণত হলেন।

(২)

দেশের সুলতান একটি দুর্গে কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করেও তা দখল করতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তিনি হযরত শামসুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "হযরত! অনুগ্রহ করে দু'আ করুন। আমি এই দূর্গটির উপর বার বার আক্রমণ চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছি।" প্রথমে তিনি কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু সুলতান বার বার আবদার করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বললেন, "ঠিক আছে! আপনি নিজে আক্রমণ চালাবেন, দেখবেন এমনিতেই দুর্গের দরজা খুলে গেছে।"

সুলতান হযরতের কথা মতো দুর্গে আক্রমণ করলেন। সত্যিই এর দরজা খুলে গেল। তিনি অতি সহজে তা দখল করে দিলেন। এই ঘটনার পর হযরতের প্রতি সুলতানের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু শামসুদ্দীন তুর্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন লক্ষ্য করলেন, কারামতের ঘটনাবলী প্রকাশ হওয়ার পর লোকে তাঁকে অতিভক্তি করতে শুরু করেছে, তিনি গোপনে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। এরূপ করার মূল কারণ ছিলো রিয়া ও যশ-খ্যাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। সত্যিকার ওলিদের হালত এরূপই হয়ে থাকে। দুনিয়ার মানুষ তাঁদেরকে বড়ো ওলি ভাবুক, তা তাঁরা কখনো পছন্দ করতেন না।

ইন্তিকাল

হযরত শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সন-তারিখের উপর ইখতিলাফ আছে। অধিকাংশের মতে তিনি হিজরি ৭১৫ সনের ১৯ শা'বান মাসে এই ধরার কোল ছেড়ে মাওলার সান্নিধ্যে চলে যান। কেউ কেউ ৭১৬ এবং

৭১৮ হিজরিও বলেছেন। কোনো কোনো বর্ণনামতে তিনি ১০ জুমাদিউল উলা, বা জুমাদিউল আখির মৃত্যুবরণ করেন। হযরতের সমাধি পানিপথেই অবস্থিত।

হযরত শামসুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুলাফার সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে চিশতিয়া সাবিরিয়া শাজারা মুবারক অনুযায়ী তাঁর বিশিষ্ট খলিফার নাম ছিলো শায়খ জালালুদ্দীন কবিরুল আওলিয়া পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনার দিকে মনোনিবেশ করছি।

পরিচ্ছেদ ২০

শায়খ জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: জিলকদ ৭৬৫ হিজরি, সমাধি: পানিপথ, ভারত।)

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন এই মহাত্মন শায়খের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ। তাঁর আসল নাম ছিলো মুহাম্মদ বিন মাহমুদ। তিনি খাজা মাহমুদ নামেও পরিচিত ছিলেন। হযরতের মুর্শিদ শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী তাঁকে ‘জালালুদ্দীন’ উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে তিনি ‘কবিরুল আউলিয়া’ তথা ‘আউলিয়াদের শীর্ষ’ হিসাবেও উপাধি লাভ করেন। হিজরি ৬৯৫ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া ছিলেন পানিপথের অধিবাসী। রিয়াজত-মুজাহাদায় অত্যন্ত কাঠিন্যতা পালন করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মতো ব্যক্তি খুবঅল্পই ছিলেন। ইস্তিগরাক্ব বা গভীর ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি কাটিয়েছেন। তাঁর খাদিমগণ অনেক সময় তাঁকে নামাযের সময় বলে দিতেন। ধ্যানমগ্নতার প্রভাবে তিনি সম্পূর্ণ আত্মহারা অবস্থায় থাকতেন। তবে নামায কিংবা অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব ইবাদত শেষে তিনি পুনরায় ইস্তিগরাক্ব অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতেন।

একটি ঘটনা

সিয়ারুল আক্বতাব গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। হযরত কবিরুল আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নদীর তীর ধরে হাঁটছেন। সেখানে দেখতে পেলেন গভীর ধ্যানরত এক হিন্দু ঋষি। তাঁর চোখ দু'টো বন্ধ, চারজানু অবস্থায় বসে তিনি যেনো ঊর্ধ্বজগতে বিচরণ করছেন। হযরতের আগমনে তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে

তাকিয়ে বললেন, “স্বাগতম! আপনি একটি উত্তম সময়ে এখানে এসেছেন। আমার নিকট একটি ‘পরশমণি’ আছে। আমি শপথ করেছি, চোখ মেলে যাকেই দেখবো তাকে এটা প্রদান করবো। সুতরাং আপনাকে যখন দেখলাম, এটি গ্রহণ করুন।”

গর্বভরে ঋষি তাঁর এই মহামূল্যবান পাথর খণ্ডটি হযরতের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু হযরত কবিরুল আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তা হাতে তুলে নদীতে ছুঁড়ে মারলেন! এতে ঋষির ভীষণ রাগ পেল। চিৎকার দিয়ে বললো, “এ তুমি কী করলে? এতো মহামূল্যবান বস্তুর প্রতি এরূপ অবহেলা! আমার পরশপাথর আমাকে ফেরৎ দাও!”

হযরত জালালুদ্দীন ঋষির দাবী প্রত্যাখ্যান করে বললেন, “দেখুন! পাথরটি তো আপনি আমাকে দান করেছেন। এটি নিয়ে আমি যাচ্ছেতাই করতে পারি, এতে আপনার কিছু বলার অধিকার আর থাকলো কৈ?”

ঋষি কিন্তু অনড়। তিনি বলতে লাগলেন, “আমার পাথর আমাকে ফেরৎ দিতে হবে!”

হযরত কবিরুল আউলিয়া তাঁকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, “আপনি যদি এটাকে এতো মূল্যবান মনে করেছিলেন, তাহলে তা কেনো আমাকে দিলেন? আর এখন আপনি তা ফেরৎ চাচ্ছেন, তাহলে নদীতে ডুব দেন! দেখুন, তুলে আনতে পারেনকি না? তবে মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আপনার পাথরখণ্ড ছাড়া অন্য কোনোটি আনতে পারবেন না।”

ঋষি ভাবলো, সত্যিই তা-ই। মূল্যবান এ পাথরটি উদ্ধার করার একমাত্রউপায় হলো নদীতে ডুব দেওয়া। সুতরাং তিনি নদীতে লাফ মেরে পড়ে গেলেন। ডুব দিয়ে নদীগর্ভে পৌঁছে অবাক হলেন। কারণ, তাঁর চোখে পড়লো অসংখ্য মহামূল্যবান পাথরখণ্ড। তিনি তাঁরটিও পেলেন। কিন্তু অতি বেশী মূল্যবান অন্যান্য এক দু'টো পাথর কুড়িয়ে আনতেও ভুললেন না।

হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঋষিকে বললেন, “ওহে! আপনি তো কথা রক্ষা করলেন না! নিজের শপথের বিপরীত কাজ করে বসলেন।”

ঋষি বুঝতে পারলেন, এই মুসলমান দরবেশ অনেক বড় সাধক। তাঁর অন্তরের পর্দা অপসারিত হয়ে গেল। পাথরগুলো ছুঁড়ে মারলের নদীতে। নিজেকে সোপর্দ করলেন হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। বললেন, হযরত! এক্ষুণি আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করে আপনার খাদিম হওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য করুন।

চিরবিদায়

সত্তুর বছর বয়সে হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ৭৬৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১৩ তারিখ তিনি ইন্তিকাল করেন। পানিপথেই তাঁর সমাধি অবস্থিত।

হযরত মুফতি নূরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘মাশায়েখে চিশত’ গ্রন্থে হযরতের ৫ জন ছেলেসন্তানের নাম উল্লেখ করেছেন। এরা সকলেই উচ্চ পর্যায়ের ওলি ছিলেন। এই ৫ জনের নাম হলো: ১. খাজা আবদুল কাদির, ২. খাজা ইব্রাহীম, ৩. খাজা শিবলী, ৪. খাজা করীমুদ্দীন এবং ৫. খাজা আবদুল আহাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

খুলাফাবৃন্দ

হযরত কবিরুল আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বমোট ত্রিশ জন খলিফা রেখে যান। প্রত্যেকেই উচ্চপর্যায়ের ওলি ছিলেন। বাদলী নামক শহরে চিরনিদ্রায় শায়িত তাঁরই খলিফা ছিলেন প্রখ্যাত শায়খ বারাআম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরতের অপর দু'জন খলিফার নাম ছিলো শায়খ শাহাবুদ্দিন ঝানঝানাওয়ী এবং পীর সামাদুদ্দীন হাইরানওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। তাঁর সর্বপ্রধান খলিফা ছিলেন সুখ্যাত শায়খ হযরত আবদুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমাদের সিলসিলায় তাঁরই নাম লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এখন তাঁর জীবন ও হালতের উপর আলোচনা হবে।

পরিচ্ছেদ ২১

হযরত শায়খ আহমদ আবদুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: জুমাদাল উখরা ৮৩৭ হিজরি, সমাধি: রাদূলী।)

শায়খ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বপুরুষ ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। রাদাওলা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গোল সম্রাট হালাকু খানের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বাঁচার লক্ষ্যে তাঁর দাদা শায়খ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলখ প্রদেশ থেকে সপরিবারে হিজরত করে এসেছিলেন। শায়খ দাউদ ছিলেন দিল্লির মহান ওলি হযরত নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আত্মীয়। দাউদ পরিবার বলখ থেকে হিন্দুস্তানে হিজরতকালে দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী।

জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র আহমদ। পরে তিনি 'আবদুল হক' অর্থাৎ হক আল্লাহ তা'আলার গোলাম- এই উপাধি লাভ করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই শায়খ আহমদ কঠোর মুজাহাদায় লিপ্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে ইবাদাত-বন্দেগী ও রিয়াজত-মুজাহাদার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন তা দেখে যুগের অনেক গুণিজন অবাক হয়েছেন। তবে শরীয়তের জরুরী জ্ঞানার্জন থেকেও তিনি গাফিল ছিলেন না। এই জ্ঞান ছাড়া সত্যিকার অর্থে কামালিয়াত হাসিল আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং বাহ্যিক জ্ঞানান্বেষায় প্রিয় জন্মস্থান ছেড়ে প্রথমে দিল্লিতে চলে যান।

ছাত্রাবস্থায় হযরত শায়খ আহমদ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটে। হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন।

দিল্লিতে আহমদ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক ভ্রাতা বসবাস করতেন। সেখানকার রাজকুমার তাঁর খুব ভক্ত ছিলেন। একদা আবদুল হক তাঁর ভাইকে প্রশ্ন করলেন, "আমি আরবী সরফ গ্রন্থে দেখতে পেলাম লিখা আছে: দ্বারাবা জাইদুন 'আমর- অর্থাৎ জায়েদ আমরকে মেরেছে। বলুন, জায়েদ আমরকে কেনো মরলো?"

ভাই মনে করলেন, বিষয়টি না বুঝে আবদুল হক এই 'বালকসুলভ' প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু আসলে তা ছিলো না! যা হোক জবাবে তিনি বললেন, "হে ভাই! আরবী ভাষা শেখার জন্য এই বাক্যটি উদাহরণ মাত্র! আসলে কেউ কাউকে মারে নি।" আবদুল হক জবাব দিলেন, "কেউ যখন কাউকে মারে নি- তাহলে কথাটি অলীক বা মিথ্যা! যে গ্রন্থে মিথ্যা কথা লিখা আছে আমি তা পাঠ করবো না! এটাতো বাল্য থেকেই মানুষকে মিথ্যা বলা শিক্ষা দিচ্ছে!" একথা বলে তিনি কিতাবখানা ছুঁড়ে মারলেন।

উক্ত ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায়, হযরত আবদুল হক কতো বড় মাফের সত্যবাদী ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই ঘটনার পর থেকেই তিনি 'আবদুল হক' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। যা হোক, ঘটনাটি তাঁর ভাই রাজকুমারের নিকট বর্ণনা করেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "তোমার ভাই আহমদ খুব উচ্চ পর্যায়ের দরবেশ। তিনি হচ্ছেন সাহেবে হাল। উলূমে জাহিরিয়্যা শিক্ষা তার জন্য আর জরুরী নয়!"

তরীকতের সালিক বেশে

উলূমে জাহিরিয়্যার জরুরী বিষয়াদি জানার পর হযরত শায়খ আবদুল হকের মন উলূমে বাতিনিয়্যার দিকে চরমভাবে আকর্ষিত হয়ে পড়লো। অন্তরে প্রচণ্ড টান অনুভব করলেন। নিজেকে প্রায়ই তিনি 'গোপন' রাখার অভ্যাস করতে লাগলেন। একাকী থাকার মধ্যে তিনি খুব আনন্দবোধ করছিলেন। সময় সময় গভীর জঙ্গলে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। ঘুরাফেরা করতেন আর নিজের তনু-মন-প্রাণকে মহান প্রভুর

প্রতি নিবিষ্ট রাখতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর গায়েবী ইশারায় তিনি পানিপথের দিকে যাত্রা করলেন।

সে যামানার কুতুব হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পানিপথে বসবাস করতেন। তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন ইলমে তাসাওউফের নূর চতুর্দিকে। তাঁর খানক্বায় অসংখ্য দরবেশের আশ্রয়স্থল ছিলো। রূহানী ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষীরা জমায়েত হতো। হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাশফের মাধ্যমে ভবিষ্যতের এই 'তারকা' খলিফার আগমনের সংবাদ জানতে পারলেন। খানক্বায় আসার পরই তিনি আহমদ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পরীক্ষায় ফেলে 'উচ্চতর মাক্বামের' যোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হলেন।

খানক্বার খাদিমদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন, "যাও! আজ মেহমানদের জন্য উত্তম খাবার তৈরী করো। সবাইকে আজ সুস্বাদু খানাপিনা পরিবেশন করানো হবে।" সুতরাং এদিন সকলের সম্মুখে নিয়ে আসা হলো নানান জাতের আকর্ষণীয় মজাদার খাবার। সেসাথে কয়েক ধরনের মিষ্টি ফল। হযরতের নির্দেশে কিছু হারাম খাদ্যও দস্তারখানে এনে রাখা হয়েছিল। খানক্বার বাইরে বেঁধে রাখা হলো, শ্বেতবর্ণের এক অপূর্ব সুন্দর অশ্ব। তার উপর শোভা পাচ্ছিলো স্বর্ণখচিত একখানা উজ্জ্বল আকর্ষণীয় চাদর। মোটকথা খানক্বাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পরিণত করা হলো এক রাজপ্রাসাদের মতো।

অবশেষে হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খানক্বায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত কবিরুল আউলিয়া পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ও গায়েবী ইশারা পেয়ে এসেছেন। কিন্তু খানক্বার এই 'রাজকীয়' অবস্থা অবলোকন করে সম্পূর্ণরূপে বাকহীন, অবাক-বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন। এসব কী দেখছেন তিনি? বাইরের অবস্থাতো যা-ই হোক ভেতরে পদার্পণ করে দস্তারখানার উপর খাবার-দাবার, পানীয় ও ফল-ফ্রুট দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। এরপর আরোও অবাক হয়ে গেলেন খাবারের মধ্যে কিছু বস্তু দেখে, যা ছিলো হারাম! তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুত কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন।

আগেই বলেছি, এ সবই ছিলো হযরত আবদুল হকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। বের হয়ে যাওয়ার পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কি করবেন বা না, বুঝতে পারছিলেন না। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসলো। নামায আদায় করে শহর ছেড়ে চলে গেলেন। বেশ রাত হলো। তিনি অনেক দূর চলে গেছেন। এক পথিককে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথায় এসেছি? জবাব আসলো, আপনি পানিপথ শহরে আছেন। তিনি অবাক হলেন! সেই সন্ধ্যে বেলা পানিপথ শহর ছেড়ে চলে এসেছেন, পথ হারিয়েছেন বলেও মনে হয় না। কী ব্যাপার? নিশ্চয় পথই ভুলেছেন তিনি। আবার শহর থেকে বের হলেন। কিন্তু রাতের বেলা পুনরায় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন তিনি পানিপথেই আছেন! এভাবে তিন দিন পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করলেন পানিপথ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে, কিন্তু পারলেন না। দিনে শহর থেকে বের হয়ে যান, আর রাতে পথ ভুলে আবার ফিরে আসেন। তিনি বুঝতে পারলেন, একটা কিছু ঘটছে! কে যেনো তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পানিপথ ছেড়ে চলে যেতে দিচ্ছে না। তবে তিনি ছিলেন নাছোড়বান্দা!

চতুর্থ দিবসে শহর থেকে বের হওয়ার পর সাক্ষাৎ ঘটলো সাদা লম্বা জুব্বা পরনে এক দরবেশের সাথে। জিজ্ঞেস করলেন, পানিপথ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পথ কোন্টি? দরবেশ জবাব দিলেন, "শায়খ জালালুদ্দীনের নিকটই ছিলো সঠিক রাস্তা, তুমি দূরে সরে এসে পড়েছ!"

এই জবাব শুনে তিনি আরো হতভম্ব হয়ে পড়লেন। দরবেশ ব্যাটা কী বলে! কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আরো দু' ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি তাদেরকে সঠিক রাস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! উভয়ে ঐ দরবেশের জবাব পুনর্ব্যক্ত করলেন। হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হৃদয়চক্ষু খোলে গেল। তিনি ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পারলেন। কাল বিলম্ব না করে ছুটে চললেন পানিপথের সেই খানক্বার দিকে।

বাইআত গ্রহণ ও খিলাফত লাভ

হযরত আবদুল হাক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পানিপথেরখানক্বায় ফিরে এসে সটান হযরত কবিরুল আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, হযরত আমাকে মুরীদ করে ধন্য করুন। কবিরুল আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "বাবা! তুমি পরীক্ষায় জয়লাভ করেছো। এসো! ইলমে মা'রিফাতের সুপেয় সুধা পান করো!"

মুরীদ হওয়ার পর আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুদিন মুর্শিদের নির্দেশে খানক্বায় অবস্থান করে খুব কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা করলেন। মাত্র ক'দিন পরই কবিরুল আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে তরীকতের খিলাফত প্রদান করলেন। নিজের খিরকা পরিয়ে দিলেন।

বিয়ের প্রস্তাবে নারাজ

কোনো কোনো ওলি অবিবাহিত থেকেই জীবন কাটিয়েছেন। দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁরা এই সুন্নাতটি পালন করেন নি। মহিলা ওলিয়্যাদের মধ্যে অবিবাহিতা ছিলেন হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। একথা সবার জানা। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ওলি, সিলেট শহরে সমাহিত হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও মুজাররদ তথা অবিবাহিত ছিলেন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যদিও তরীকতের পথে কোনো বাঁধা নেই, তথাপি কোনো কোনো ওলি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে সংসারী হতে চান নি। হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও প্রাথমিক জীবনে সংসারী হতে চান নি। তবে তাঁর ভ্রাতাগণ বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুতরাং উপযুক্ত কনের খোঁজ পাওয়ার পর প্রস্তাব দিলেন। আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিয়ে করতে রাজী হলেন না। কিন্তু ভাইগণও অটল। তিনি অবশেষে এক ফন্দি আঁটলেন। বিয়ের কিছুদিন পূর্বে চলে গেলেন তাঁর হবু-শ্বশুরের বাড়িতে।

হবু-শ্বশুরকে বললেন, "দেখুন হযরত! আমার নিকট আপনার মেয়েকে বিয়ে দিলে তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমি আসলে বিয়ের যোগ্য নই, আমি এক অক্ষম ব্যক্তি!"

কথাটির মর্ম অনুধাবন করে হবু-শশুর বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। তবে এটা যে বিয়ে থেকে নিষ্কৃতি লাভের কৌশল মাত্র তা তিনি বুঝতে পারেন নি। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তানাদির পিতা হন। মাশায়েখে চিশত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সন্তানদের কেউই বেঁচে থাকতো না। জন্মের পরই তারা 'হাক্ব! হাক্ব! হাক্ব!' তিনবার উচ্চারণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হতো। কয়েকটি শিশু এভাবে মারা যাওয়ার পর একদা ধৈর্যহারা হয়ে তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। হযরত বললেন, "ওহে! তুমি কেঁদো না। আল্লাহর মর্জিতে পরবর্তী সন্তান জীবিত থাকবে।"

পরবর্তী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 'হক্ব' শব্দ উচ্চারণ করা থেকে বিরত রইলো। আল্লাহ পাক তাকে দীর্ঘ হায়াতও দান করলেন।

একটি কারামত

কোনো এক দিন হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ বড়ো একটি পাতিলে খাবার তৈরী করে রাস্তার মধ্যে রেখে দিলেন। তিনি সবাইকে বললেন, "এই পাতিল থেকে লোকজন যতোই খাবার গ্রহণ করুক না কেনো, তা কমবে না ইনশাআল্লাহ!" সত্যিই তা-ই হলো। দীর্ঘ দিনব্যাপী পথিকরা উক্ত পাতিল থেকে খাবার খেলো কিন্তু তা কমলো না। আশ্চর্য এই কারামত অবলোকন করে লোকজন হযরতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। হঠাৎ তাঁর মনে এক ভাবের উদ্রেক হলো। মনে মনে বললেন, সর্বনাশ! এই কারামতের ফলে লোকজন তাঁকে অতিভক্তি করা শুরু করে দিয়েছে! এক্ষুণি তা না থামলে লোকজন ও তাঁর নিজের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং তিনি সবাইকে বললেন, "কেউ ভুল বুঝবেন না। একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন রিজিকদাতা। যা হচ্ছে তা আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। একমাত্র তিনিই তাঁর সৃষ্ট

সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমার কোনো হাত নেই।” একথা বলার পর পাতিলটি তিনি ভেঙ্গে ফেললেন।

হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। শাইখুল মাশাইখ হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘উনওয়ারুল উয়ূন’ কিতাবে বলেন, শায়খ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এগুলো উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি সবার পূর্বে মসজিদে যেতেন, মুসল্লিদের সুবিধার্থে নিজ হাতে ঝাড়ু দিতেন। তবে ‘মজযূব’ থাকার কারণে মসজিদের রাস্তা সময় সময় ভুলে যেতেন। তাঁর খাদিমরা ধরে ধরে নিয়ে যেতেন মসজিদের দিকে।

মৃত্যুর ডাক

কেউ এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয়। এ মহাসত্য সবার জানা। কিন্তু এরপরও মানুষ ভুলের মধ্যে আছে। আখিরাতের অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহে বেখবর। ওলি-আবদাল, গউস-কুতুব ও নৈকট্যশীল বান্দাদের অবস্থা কিন্তু ভিন্ন। তাঁরা এ দুনিয়ায় বাস করেন ‘কয়েদী’ হিসাবে। দুনিয়া ছেড়ে সেই অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমাতে সদা উদগ্রীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

“اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ”

-অর্থাৎ দুনিয়া মু’মিনের কয়েদখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত [মুসলিম : ৫২৫৬]।

মজযূব আল্লাহপ্রেমিক হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো। তিনি দুনিয়ার জেলখানা থেকে মুক্ত হলেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে ৮৩৭ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। হযরতের সমাধি বারাখবিনকি জিলার রাদূলীতে অবস্থিত।

হযরতের কয়েকজন পুত্রসন্তান 'কারামতওয়ালা' হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। আহমদ আ'রিফ নামক একজন পুত্র দীর্ঘজীবন লাভ করেন। তিনি পরবর্তীতে হযরতের খলিফা হিসাবে তরীকতের সিলসিলা বজায় রাখেন। এছাড়া আরো যাঁদেরকে তিনি খিলাফত প্রদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত মিয়া ফরিদ, শায়খ বখতিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের চিশতিয়া তরীকায় তাঁর পুত্র তথা শায়খ আহমদ আ'রিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম আসে। সুতরাং এখন তাঁর জীবন ও হালতের উপর আলোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ২২

হযরত শায়খ আহমদ আ'রিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: সফর ৮৮২ হিজরি, সমাধি: রাদূলী।)

তিনি ছিলেন শায়খ আবদুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র ও প্রধান খলিফা। সুতরাং রূহানী ও জিসমানী এই উভয় দিক থেকে তিনি হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র ছিলেন। চিশতিয়া তরীকায় ইতোপূর্বে অনুরূপ শায়খ থেকে মুরীদ ও খিলাফতপ্রাপ্তি ছিলো নতুন। অর্থাৎ পিতা থেকে তরীকাতের খিলাফত লাভ ছিলো এই নতুন। শুধু তাই নয় তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত এই সিলসিলা অব্যাহত থাকে। কারণ, হযরত আহমদ আ'রিফের পুত্র মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও পরবর্তীতে খিলাফত লাভ করেছিলেন।

রূহানী চিকিৎসক হিসাবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে হযরত আ'রিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চতুর্দিকে ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের আলো ছড়াতে থাকেন। দীনের এই উভয় বিষয়ের উপর তিনি যুগের শীর্ষস্থানীয় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে একটি এমন ছিলো, যে কোনো ব্যক্তি সান্নিধ্য লাভ করে বলতো, হযরত আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী মুহাব্বত করেন। প্রত্যেক মুরীদকে তিনি নিজের একান্ত আপনজন মনে করতেন। শুধু তাই নয়, কিভাবে এই শিষ্যের আধ্যাত্মিক উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন হয়, সে ব্যাপারে তিনি খুব বেশী চিন্তাযুক্ত থাকতেন। সুতরাং হযরতের আচরণ থেকে মনে হতো, তিনি মানুষের আখিরাতের মুক্তিকামনায় সদা-উদ্গ্রীব।

রিয়াজত-মুজাহাদা ও খিলাফত লাভ

হযরত আ'রিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পিতা যখন পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর ছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যে তিনি

কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদায় মগ্ন থাকার অভ্যেস গড়ে তুলেন। মৃত্যুর পূর্বে মুর্শিদ ও পিতা যোগ্যতা বিবেচনায় তাঁকে তরীকতের খিলাফত প্রদান করেন। এমন অল্প বয়সে খুব কম ব্যক্তিই খিলাফত লাভে ধন্য হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যু

হযরত আ'রিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় নি। তবে তিনি যে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি ছিলেন এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র ও খলিফা হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে চিশতিয়া তরীকার বিকাশ ঘটে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে আ'রিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৮৮২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তবে কেউ কেউ ৮৫৯ হিজরিও লিখেছেন। মাশাইখে চিশতের লেখক তাঁর মৃত্যু তারিখ ১৭ সফর বলে উল্লেখ করেছেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সঠিক অবগত।

পরিচ্ছেদ ২৩

হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আরিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: সফর ৮৯৮ হিজরি, সমাধি: রাদূলী।)

তিনি ছিলেন শাইখুল মাশাইখ, যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি হযরত আহমদ আ'রিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য পুত্র এবং তরীকতের খলীফা। আল্লাহর পবিত্র হুজুরীর মধ্যে যাঁদের কলব সর্বদা নিমজ্জিত থাকে তাঁদেরকে তাসাওউফের ভাষায় 'মুশাহাদা-ই-মুতলাক্ব' বলে। হযরত মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মাক্বামে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি এতো বেশী 'ইস্তিগ¦রাক' এর অবস্থায় নিমগ্ন হতেন যে, নিজ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কোনো খবরই রাখতেন না।

ধ্যানে নিমগ্নতার প্রাবল্য অবশ্য চিশতিয়া তরীকার একটি বৈশিষ্ট্যও বটে। আর এর মূল কারণ হলো চিশতিয়া তরীকায় 'প্রেমের' গুরুত্ব। ইশকে ইলাহীর প্রভাবএই তরীকার মাশাইখদের মধ্যে ইতিহাসব্যাপী পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। আমরা ইতোমধ্যে হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনায় 'সামা' প্রসঙ্গ নিয়ে কিঞ্চিৎ তথ্যাদি তুলে ধরেছি। সামা বা মা'রিফতি গজল মূলত 'ইশকে ইলাহীর' স্বরূপ বর্ণনার একটি পদ্ধতি মাত্র। শ্রবণকারী কথা ও সুরের লহরীর মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অনুভব করে থাকেন। এর ফলে অন্তরের গভীরে প্রেমাস্পদের জন্য যে তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রেমিককে শুষ্ক মরু-সায়রের মতো পিপাসা-হাহাকারে সদাবেদনাতুর রাখে, তাতে যেনো অনুভূত হয় কিছুটা সিক্ত প্রেমরসের সুপেয় সুধা। সুতরাং উচ্চ পর্যায়ের ওলিদের ক্ষেত্রে গভীর প্রেম-সায়র থেকে কুড়িয়ে আনা পংক্তিমালাসর্বস্ব 'সামা' (سمع অর্থাৎ শ্রবণ) গজল যেনো শুষ্ক মহাসায়রে একবিন্দু জল। প্রেমাস্পদ থেকে দূরে পড়ে থাকার বিরহমাঝে

যেনো একটুকু আশার আলো। যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হৃদয়ের গভীরে এরূপ উচ্চ পর্যায়ের 'ইলাহী প্রেম' বিরাজ করতো। এর ফলেই তিনি উচ্চতর 'মুশাহাদা-ই-মুতলাক্ব' স্তরের অধিকারী হয়েছিলেন।

বিদায়ক্ষণের ঘটনা

হযরতের এক সুযোগ্য পুত্রের নাম ছিলো বুধহ। তিনি শাইখুল আওলিয়া হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর সর্বাপেক্ষা স্বনামধন্য খলিফা ছিলেন তরীকায়ে চিশতির যুগ সংস্কারক শাইখুল মাশাইখ শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই উভয় বুজুর্গ হযরত মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সময় শাহাবাদ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। বিদায়ের সময় সন্নিকটে বুঝতে পেরে তাছাররুফ-ই-বাতিনী বা রূহানী ক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদেরকে সংবাদ জানালেন। তাঁরা ছুটে আসলেন হযরতের দরবারে। তখন তাঁর 'সাকরাতের' অবস্থা অতি নিকটে। তিনি বার বার ইস্তিগ¦রাকের ও 'সকর' এর অবস্থায় চলে যাচ্ছিলেন ও ফিরে আসছিলেন। হুঁশ কিছুটা ফিরে আসতেই তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন: "আল-হামদুলিল্লাহ! আমি বুঝতে পেরেছি!"

হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন: "হযরত! আপনি কি বুঝতে পারছেন?"

তিনি বললেন: "আমি তাওহীদ বুঝেছি!"

এরপর শায়খ মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফতের যাবতীয় দায়িত্ব হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বুঝিয়ে দিলেন। চিশতিয়া তরীকার মাশাইখদের সিলসিলা পরম্পরায় 'ছিনা থেকে ছিনায়' প্রতিস্থাপিত হয়ে আসা 'ইসমে আযম' হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছিনায় প্রবেশ করলো। তিনি সাথে সাথেই ইশকে ইলাহীর সর্বোচ্চ মাক্বামে উপনীত হলেন। এভাবে সকল সুফি তরীকায় ছিনা থেকে ছিনায় 'পিরাকী' প্রতিস্থাপন হয়ে আসছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলিদেরকে এভাবেই মুহাব্বতের সুরা পান করিয়ে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না- এবং তিনিই সবকিছু অবগত। তিনিই সবকিছু ভালো জানেন।

হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘ফানাফিশ-শাইখ’ এর মাক্বাম থেকে তখনও মুক্ত হতে পারছিলেন না। বললেন, “হে আমার প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন মুর্শিদ! আমি তো আপনার অনুপস্থিতি সইতে পারবো না! আপনি চলে গেলে এই রাদূলী শহরে থাকা আমার জন্য সম্ভব হবে না। অন্য কোথাও চলে যেতে অনুমতি দিন।” হযরত রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর করলেন। তবে বললেন, “প্রিয় বৎস! আমার পুত্র বুধহকে আপনার নিকট রেখে গেলাম। তাঁকে তরীকতের রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এরপর যোগ্যতা অর্জন হলে এখানে রাদূলীতে পাঠাবেন।” এরপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওলায়ে আ’লার পবিত্র সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। অনেকের মতে ৮৯৮ হিজরির ১৭ সফর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। রাদূলীতেই তিনি সমাহিত আছেন।

হযরতের একমাত্র খলিফা ছিলেন সে যুগের তরীকাতের মুজাদ্দিদ কুতুবুল আলম শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তবে কোনো কোনো কিতাবে স্বীয় পুত্র শাইখুল আউলিয়া বুধহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও তিনি খিলাফতপ্রদান করেছিলেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

আউলিয়ায়ে চিশত

(যাঁদের পদধূলিতে ধন্য এ ধরার কোল)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

তৃতীয় খণ্ড

হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

থেকে

কুতবুল ইরশাদ হযরত শায়খ মাওলানা

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পর্যন্ত

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় 'আউলিয়ায়ে চিশত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড রচনার কাজ শেষ হয়েছে। আমাদের চিশতি তরীকার শাজারাহ মুবারকের সকল পীর-আউলিয়ার জীবন ও সাধনার উপর রচিত এই গ্রন্থ পাঠে সকলে উপকৃত হবেন, এটাই আশা।

আত্মশুদ্ধির রাস্তার নাম হচ্ছে 'তাসাওউফ সাধনা'। আর তাসাওউফকে সঠিকভাবে অনুসরণের শরীয়তসম্মত রাস্তাকে বলে 'তরীকা'। পৃথিবীর জমিনে চারটি সুপ্রসিদ্ধ এরূপ তরীকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রত্যেকটি তরীকার 'সিসসিলা' বিদ্যমান। এসব সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। যে চারটে তরীকাপন্থী গণনাতীত পীর-মাশায়িখ-আউলিয়া-দরবেশ মানুষের আত্মশুদ্ধির কাজে অতীতে নিয়োজিত ছিলেন এবং এখনও আছেন ওগুলো হলো: ১. চিশতিয়া, ২. নকশবন্দিয়া, ৩. কাদিরিয়া ও ৪. সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকা।

এ গ্রন্থে শাজারায়ে চিশতিয়ার অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্য থেকে মাত্র একটি শাখার উপর গবেষণা সীমিত রেখেছি। এ শাখাটির নাম 'চিশতিয়া-সাবিরিয়া-ইমদাদিয়া-রশীদিয়া-হুসাইনিয়া'।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শাজারাহ মুবারকে প্রকাশিত বিভিন্ন সিলসিলা দ্বীনের মধ্যে কোনো বিভক্তি বা এ ধরনের কিছু বুঝাচ্ছে- তা কিন্তু কখনো নয়। বিভিন্ন সিলসিলা বা শাখার জন্ম হয়েছে অতি স্বাভাবিকভাবেই। কারণ প্রায় সকল পীর

সাহেবেরই একাধিক 'খলিফা' থাকেন। একই শাজারায় প্রত্যেক খলিফার নাম উল্লেখ সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যেক খলিফার আরো এক বা একাধিক খলিফা থাকায় অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে মূল শাজারাহ মুবারক থেকে।

এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো আমার শায়খ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যে শাজারাহ মুবারক আছে তার সকল মাশাইখের জীবন ও সাধনার উপর আলোচনা লিপিবদ্ধ করা। সুতরাং তৃতীয় এ খণ্ডে হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হযরত শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী পর্যন্ত চিশতিয়া তরীকার পীর-মাশাইখের জীবনবৃত্তান্ত এসেছে।

গ্রন্থ প্রণয়নে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁদের অনেকের নামও উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ভুল-ত্রুটির জন্য আমি প্রথমত মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কোনো সুহৃদ পাঠকের নিকট ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে আমাকে অবগত করে বাধিত করবেন। ইনশাআল্লাহ! আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
২৮ জুলাই ২০১২ ঈসায়ী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরিচ্ছেদ ১

হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ২৫ জুমাদাল উখরা ৯৪৪ হিজরি, সমাধি গাঙ্গুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত।)

ভারতের সাহারানপুর জিলাধীন ‘গাঙ্গুহ শরীফ’ এর মাটি চিশতিয়া তরীকার তিনজন যুগশ্রেষ্ঠ মাশাইখের পদধূলি পেয়ে ধন্য হয়েছে। এই শহরে শায়িত আছেন হাযারাত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী, শাহ আবু সাঈদ গাঙ্গুহী এবং শাহ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। হিজরি ৮৬০ থেকে ১৩২৩ এই ৫৬৩ বছরের মধ্যে উক্ত স্থান চিশতিয়া তরীকার তিনজন মহাত্মন বুজুর্গের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো। তাই আফগানিস্তানের ‘চিশত’ এর মতো ‘গাঙ্গুহ’ শহরও ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

‘নুযহাহ’ নামক কিতাবের লেখক বলেন, শাহ আবদুল কুদ্দুসের পিতার নাম ছিলো শাফী। তাঁর দাদার নাম নাসিরুল হানাফী রাদূলী গাঙ্গুহী। আবদুল কুদ্দুস সাহেব হিজরি ৮৬০ সনে গাঙ্গুহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা-বাবা নাম রাখেন ইসমাঈল। তবে পরবর্তীতে তিনি শাহ আবদুল কুদ্দুস নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উলূমে বাতিন ও জাহিরে তাঁর সমকক্ষ কোনো ওলি সে যুগে ছিলেন কি না সন্দেহ আছে। তিনি সুন্নাতের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। একটি সুন্নাতও যাতে ছুটে না যায় সেদিকে তাঁর মতো সতর্ক ব্যক্তি পাওয়া সেকালে খুব বিরল ছিলেন।

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তাঁরই নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। এছাড়া যুগের শ্রেষ্ঠ শায়খ আবদুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানী ফায়েজ লাভে তিনি ধন্য হন। স্বরচিত কিতাব 'আনওয়ারুল উয়ূন' (আরবী)-এ হযরত নিজেই উল্লেখ করেন: "মহাত্মন হযরত আহমদ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানী তাছাররুফের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হলো, মৃত্যুর ৫০ বছর পরও এই অধমকে তিনি তাঁর রূহানী ফায়েজ দ্বারা ইসলাহী তারবিয়াত প্রদানে ধন্য করেছেন।" এতে এটা স্পষ্ট হলো, ওলিদের মৃত্যুর পরও রূহানী ফায়েজ-বরকত-তারবিয়াত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না।

হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র লিখেছেন, "আমার পিতার ইচ্ছে ছিলো অন্যত্র মুরিদ হওয়া। কিন্তু আলমে কাশফের জগত থেকে আহমদ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তুমি অন্যত্র বাইআত গ্রহণ করবে না। আমার নাতি মুহাম্মদ বিন আ'রিফের নিকট মুরিদ হও। আমি নিজেই তোমাকে রূহানী তারবিয়াত প্রদান করবো।" (মাশাইখে চিশত)

এ হিসাবে হযরত আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রূহানী ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে চিশতিয়া সিলসিলায় অনুপ্রবেশ করেছিলেন। অপরদিকে তিনি সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার শায়খ কাসিম উধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকেও খিলাফত লাভ করেন।

জন্মগত ওলি

হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদারজাদ ওলি ছিলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর মাধ্যমে 'কারামাত' প্রকাশ হওয়ার প্রমাণ মিলে। প্রাথমিক জীবনে তিনি কৃষিকাজে জড়িত ছিলেন। বছরের প্রথম শস্য ঘরে তুলে ফকীরদের মধ্যে সর্বাগ্রে তা বিতরণ করে দিতেন। 'সামা' সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ভীষণ আকর্ষণ ছিলো। 'সামা' বা মা'রিফতি গজল শ্রবণ জায়িয-নাজায়িয ইত্যাদির উপর গ্রন্থের প্রথমে প্রামাণ্য দলিলভিত্তিক আলোচনা হয়েছে। এখানে এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে, হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে 'সামা'

ওলিরা শ্রবণ করতেন। সে যুগে এটি নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিলো না। সঠিক পদ্ধতিতে সামার আয়োজন হতো। কিন্তু আজকের যুগে অধিকাংশ ওলি সামা পরিবেশন আর জায়িয মনে করেন না। এর মূল কারণ হলো, সামার সাথে যেসব শর্ত সম্পৃক্ত আছে তা মোটেই অনুসরণ করা হয় না। ফলে এ থেকে ফায়দার বদলে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা বেশী। সুতরাং 'সামা' আজকের যুগে পরিত্যাজ্য বলে প্রায় সকল হক্কানী আলিম, উলামা ও তরীকতের শাইখরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিতাব প্রণেতা

হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুলেখক ছিলেন। সুলুকের উপর লিখিত 'আনওয়ারুল উয়ূন' (আরবী) নামক কিতাবখানা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই কিতাবটি সাত খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে লেখক স্বীয় রূহানী মুর্শিদ হযরত আবদুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কামালতের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। অন্যান্য খণ্ডে সুলুকের বিভিন্ন হালত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত দ্বিতীয় আরেকটি গ্রন্থের নাম, 'তা'লিকাত আ'লা শারহিস সাহাইফ' (আরবী)। ইলমে কালাম তথা দ্বীনের আক্বাঈদ ও তাওহীদের উপর এতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

'মাকতাবাত' বা পত্রাদি নামকরণে একটি গ্রন্থে তাঁর অনেক উক্তি ও বক্তব্য সংকলিত হয়েছে। এটা একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। ইলমে মা'রিফাতের উপর অতি উঁচুমানের মহামূল্যবান বাণীসহ এতে আছে তরীকতের সালিকদের জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা। কিতাবটি ফার্সি ভাষায় রচিত।

হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত তরীকতের সুখ্যাত কিতাব 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' (আরবী) এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আততাআ'ররুফ' (আরবী) নামক কিতাবটির রচয়িতাও হচ্ছেন হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

উপরোক্ত কিতাবাদি ছাড়াও হযরতের জীবন ও কর্মের উপর একাধিক গ্রন্থ পরবর্তী শায়খরা রচনা করে গেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, তায়িফে কুদ্দুস (আরবী)। কিতাবটি হযরতের রূহানী ও জিসমানী সন্তান শায়খ রুকুনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রণীত। এতে হযরতের জীবন ও হালতের অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য কিতাবের মধ্যে 'মিরাতুল আসরার' (আরবী), 'ইক্বতিবাসুল আনওয়ার' (আরবী) এবং 'আনওয়ারুল আ'রিফীন' (আরবী) এখানে উল্লেখযোগ্য। এসব কিতাবে শাহ আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও হালত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। (হযরত মুফতি নূরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রণীত 'মাশায়েখে চিশত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত কিতাবসমূহ অধিকাংশই ফার্সি কিংবা উর্দুতে রচিত। এর ক'টি বাংলায় অনূদিত হয়েছে তা জানা যায় নি। তবে এগুলো পাঠ করলে যে বিরাট ফায়দা পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। শাইখুল হাদীসহযরত জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত উর্দু কিতাব, মাশাইখে চিশতে এ ব্যাপারে যুগশ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামিল শাইখুত তরীকাত ইমামে রব্বানী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলেন:

"সুলুক সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হলেই আমি হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'মাকতুবাত' পাঠ করে সন্তুষ্টজনক জবাব পেয়ে যাই।"

বিবিধ ঘটনাবলী

১.

হযরতের এক বিশেষ মুরীদ ছিলেন। সুলুকের রাস্তায় শয়তান কর্তৃক সালিকের অন্তরে 'ওয়াসওয়াসা' বা বাতিল ধারণা জন্মলাভ করে খুব বেশী। এই মুরীদ ভাবলেন, আমি তো এখানে (গাঙ্গুহ শরীফে) থেকে সুলুকের যাকিছু ছিলো সবই অর্জন করে নিয়েছি! সুতরাং যুগের অপর বিশিষ্ট শায়খদের সান্নিধ্যে যেয়ে আরো

বেশী জ্ঞানার্জন করতে বাঁধা কিসের? এতে উপকার ছাড়া অপকারের কোনো সম্ভাবনা নেই। এরূপ ওয়াসওয়াসা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। নিজের শায়খকে ব্যাপারটা বলতেও সাহস হচ্ছিলো না। কিন্তু হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাশফ বা অন্য কোনো উপায়ে মুরীদের ইচ্ছে টের পেয়ে গেলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন: "ভাই! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'সীরু ফিল আরদ্ব', অর্থাৎ, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। সুতরাং তুমি যদি কিছুদিনের জন্য এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে যাও তাহলে হয়তো কিছুটা স্বস্তি বোধ করবে। একই সাথে কোনো শায়খের জিয়ারতও নসীব হয়ে যেতে পারে! এরূপ কোনো শায়খের সান্নিধ্য লাভে তুমি উপকৃত হতে পারো, জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারো আল্লাহর পবিত্র নামের জ্ঞান।"

একথা শ্রবণ করে মুরীদ ভাবলেন, বাঁচলাম! হযরত ঠিক সঠিক সময়ই এই মন্তব্য করেছেন। সুতরাং তিনি গাট্টি বেঁধে বের হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অনেক শায়খের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলো। সকলেই একই জিকির-শুগুলের সবক দিলেন। আর এই 'পাস-আনফাস' জিকিরের সবক হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে প্রাথমিক স্তরে দিয়েছিলেন। মুরীদ ভাবলেন, ব্যাপার কি? আমি যার কাছেই যাই, তিনি আমাকে আলিফ, বা, তা থেকে শুরু করার ব্যবস্থা করেন! ইতোমধ্যে আমি যা কিছু শিখেছিলাম তা সবই ব্যর্থ!

অবশেষে মুরীদের মধ্যে অনুতাপের গ্লানি প্রবল হয়ে ওঠলো। তিনি গাঙ্গুহে ফিরে আসলেন। স্বীয় মুর্শিদ হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পায়ে পড়লেন। করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হযরত বললেন, "ভাই! তুমি এখন আশারাখি সন্তুষ্ট হয়েছো। এবার নির্জনবাস করো। নির্ভেজাল ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর নামের প্রতি খিয়াল দাও।"

২.

'জাওয়াহিরে খামশা' নামক কিতাবের লেখক মুহাম্মদ গউস গোয়ালিয়ারী হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি জিন সাধন করতেন। একদা ইচ্ছা করলেন, হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে

নিজের নিকট জিন মারফত নিয়ে আসতে। সুতরাং তিনি একজন জিনকে হযরতের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসময় মসজিদে আল্লাহর জিকির করছিলেন। জিন তাঁর নিকটে যেয়ে কিছু বলার বা করার সাহস পাচ্ছিলেন না। হযরত হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কে ওখানে?'।

জিন সামনে এগিয়ে যেয়ে সালাম জানালেন। এরপর বললেন, হযরত! মুহাম্মাদ গউস আমাকে পাঠিয়েছেন। তার ইচ্ছে আমি আপনাকে নিয়ে যাই। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। শূন্যের উপর তুলে আমি নিয়ে যাবো।

একথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে নির্দেশের সুরে বললেন, 'হে জিন! তুমি এক্ষুণি গউসের নিকট যেয়ে তাকে আমার দরবারে নিয়ে আসো!'

জিন এই নির্দেশ পালন করতে গউসের নিকট গেলেন। তাকে ধরে শূন্যে উড়ো দিলেন। মুহাম্মদ গউস অবাক হয়ে নিজের সাধনকৃত জিনকে প্রশ্ন করলেন, 'ওহে! এ কী করছো? তুমি আমাকে নিয়ে কোথায় চললে? আমার নির্দেশ অমান্য করলে কেন?'

জিন জবাব দিলেন, 'অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আপনার অনুগত। কিন্তু হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ক্ষেত্রে আমরা আপনার নির্দেশ পালনে অপারগ।"

সুতরাং মুহাম্মদ গউসকে হযরতের সম্মুখে নিয়ে হাজির করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার লজ্জা হয় না?"

গউস সত্যিই লজ্জিত হলেন এবং হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি ইলমে তাসাওউফের উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করেন। তিনি সাহেবে নিসবতের স্তরে উন্নীত হন। মুহাম্মদ গউসের সমাধি গোয়ালিওরে অবস্থিত।

৩.

একদা হযরতের এক খাদিম তার পুত্রের ওয়ালিমা অনুষ্ঠানে শহরের অনেক গণ্যমান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করেন। একইসঙ্গে অনেক গরীবও দাওয়াতী ছিলেন। হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খাদিমকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তিনি ছদ্মবেশে রাতের বেলা গরীবদের সঙ্গে খাদিমের বাড়িতে আসলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, গরীব-ধনী সকলের সঙ্গেই খাদিম একইভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। গরীবদের সাথে বসে থাকা হযরতকে খাদিম চিনতেই পারলেন না। এর পরের দিন খাদিম খানক্বায় এসে স্বীয় মুর্শিদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

হযরত আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খাদিমের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। খাদিম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মহাত্মন! আমার ভুল হলে ক্ষমা করুন। অনুগ্রহ করে বলুন, কোন্ কারণে আপনি আমার উপর নারাজ?

তিনি জবাব দিলেন, "গতরাতে আমি তোমার বাড়িতে মেহমান ছিলাম। অথচ তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না!"

খাদিম অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে বললো, হযরত! নিশ্চয় আমার চোখে কোনো ধান্ধা লেগেছিল। অন্যথায় আপনাকে না চিনার কোনো কারণ থাকতে পারে না। চিনলে তো অবশ্যই আপনার খিদমাত করতাম।

তিনি বললেন, "ওহে! কোন্ কারণে আমার ঘ্রাণ তোমার নাসিকায় অনুভূত হলো না? যদি তুমি এই ঘ্রাণ অনুভব করার ক্ষমতা রাখতে তাহলে ছদ্মবেশে থাকাবস্থায়ও আমার উপস্থিতি টের পেতে। আর যেহেতু তুমি তা পাও নি, এতে বুঝা যায় আমার প্রতি তোমার মুহাব্বত নেই।"

হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরোক্ত উক্তি সবার বোধগম্য হওয়ার নয়। ইশকে ইলাহীর অগ্নিতে দগ্ধ হৃদয় অবশ্য এর মর্ম বুঝতে সক্ষম হবে। যার প্রতি মুহাব্বত থাকে তাঁর উপস্থিতি যতো লুকানোই হোক না কেন, বিরহের যন্ত্রণায় ছটফটে হৃদয়-নাসিকা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম। তরীকতের মাশাইখরা বলেন, এ রাস্তার প্রথম ধাপ হলো 'ফানা ফিশ-শায়খ' বা নিজের মুর্শিদের প্রতি মুহাব্বত। এই মুহাব্বত যতো বেশী শক্তিশালী হবে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়া মুরীদের জন্য ততো বেশী সহায়ক হবে। সুতরাং শায়খের প্রতি মুহাব্বতের মাত্রা অত্যধিক হলে তাঁর স্মরণও অন্তরের মধ্যে এক রূহানী-ঘ্রাণ সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় ফানা-ফিশ-শায়খ মুরীদের অতি নিকটে স্বয়ং শায়খ ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকলে কেনো সে তাঁর ঘ্রাণ পাবে না? অবশ্যই পাবে।

৪.

হযরত আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো এক সময় দিল্লীতে আসেন। এসময় দিল্লী শহরে বসবাস করতেন সাঈদ জালালুদ্দীন বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর শায়খ হাজী আবদুল ওয়াহহাব বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন সুলেখক। তাফসীর বিষয়ে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন। ভাবলেন, পাণ্ডুলিপিটি হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখাবেন। সুতরাং অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে তা তিনি হযরতের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত সম্পর্কিত কুরআন শরীফের একটি আয়াতের তাফসীরের প্রতি দৃষ্টি পড়লো। আয়াতে তাহারাত বা পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। হাজী ওয়াহহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছিলেন, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বংশধরদের 'খাতিমা বিলখাইর' তথা ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তাঁদের মৃত্যু অবশ্যই সর্বোত্তম ইন্তিকাল'। হযরত আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখলেন, "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে এই মতামত সাংঘর্ষিক"।

এরপর পাণ্ডুলিপিখানা তিনি লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠালেন। এদিকে এ বিষয়টির উপর যুগের উলামাদের মধ্যে বেশ কিছুদিন যাবৎ তর্কবিতর্ক শুরু হলো।

শেষ পর্যন্ত সকলেই হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে একমত হলেন। (মাশাইখে চিশত)

৫.

কোনো এক সময় স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব নামাযের সময়মতো উপস্থিত হলেন না। ইমামের ভাতিজা শায়খ আবদুল গণি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামতি করতে এগিয়ে গেলেন। নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় তিনি আরবী শব্দ 'আল্লাজীনা' উচ্চারণ শেষে ওয়াকফ (থেমে) করে 'আন'আমতা' পড়লেন। এতে গাঙ্গুহী সাহেব নামায পুনরায় পড়লেন এবং বললেন, "হে নওজোয়ান! তোমার কি জানা নেই এই শব্দদ্বয় উচ্চারণকালে ওয়াকফ করতে নেই? তুমি ওয়াকফ করে সকলের নামায বাতিল করে দিয়েছ!" উল্লেখ্য, আরবী গ্রামার মুতাবিক উক্ত শব্দদ্বয় একত্রে মিলিয়ে পাঠ করতে হবে। ওয়াকফ করা বৈধ নয়। (মাশাইখে চিশত)

চিরবিদায়

সবাইকে একদিন এই মায়াবী ধরার কোল ছেড়ে অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমাতে হবে। শেষ নিঃশ্বাসের এই চিরসত্য দিন-ক্ষণটি কার বেলা কোন্ মুহূর্তে আসবে কেউ জানে না। আমাদের আলোচিত মহাত্মন, যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ক্ষেত্রে এ দিনটি ছিলো হিজরি ৯৪৪ সনের ১১ জুমাদিউল উখরা। মৃত্যুর আগের রবিবার থেকে তিনি অসুস্থতা অনুভব করেন। কিন্তু পরবর্তী শুক্রবার দিন অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিনাকষ্টে মসজিদে যেয়ে জুমু'আ আদায় করেন। তবে নামায শেষে পুনরায় শরীর গরম হয়ে ওঠলো। তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে হযরত নিয়মিত ইবাদাত করতে থাকেন। মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তিনি ইশারা করলেন ওযু করবেন। ওযু সেরে দু'রাকাআত নামায ইশারায় রুকু, সিজদাসহ আদায় করলেন। অসুস্থতার নবম দিনটি ছিলো সোমবার। তিনি ইশারায় নামায আদায় করছিলেন। ঠিক এসময় তাঁর রূহ দেহপিঞ্জর থেকে বের হয়ে মা'বুদের সান্নিধ্যে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ৭ ছেলেসন্তানের পিতা। এরা সকলেই আলিম ছিলেন। হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ ৩৫ বছর রাদূলীতে বসবাস করেন। হিজরি ৮৯৮ সালে শাহাবাদে চলে আসেন। সুলতান সিকান্দার লোদীর মন্ত্রী উমর খান কাসি'র অনুরোধে তিনি শাহাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানেও দীর্ঘ ৩৫ বছর অবস্থান করেছিলেন। জহিরুদ্দীন বাবরের রাজত্বকালে তিনি গাঙ্গুহ শরীফ এসে বসবাস শুরু করেন। আর এখানেই ১৪ বছর পর পরপারে পাড়ি জমান। হযরত গাঙ্গুহতেই সমাহিত আছেন।

বর্তমানে গাঙ্গুহ শহর দু'অঞ্চলে বিভক্ত। শহরাঞ্চলকে বলে গাঙ্গুহ। বাইরের দিকের অঞ্চলের নাম সিরাই। হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন এখানে আসেন, তখন তা গভীর জঙ্গল ছিল। তিনি এই জঙ্গলেই বসবাস করতেন। হযরতের আগমনের ফলেই পরবর্তীতে এলাকায় জনবসতি গড়ে ওঠে। আর এই অঞ্চলেই চিশতিয়া তরীকার তিনজন মহাত্মন শায়িত আছেন। এরা হচ্ছেন, হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী, হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী ও হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সন নিয়ে ইখতিলাফ আছে। কেউ কেউ ৯৪৫ হিজরি বলেছেন। তবে অধিকাংশ মতে তা ছিলো ৯৪৪ হিজরি।

খুলাফা

হযরতের খলীফাদের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন শায়খ ব্রু, শায়খ উমর, শায়খ আবদুল গাফফার আযমপুরী, শায়খ রুকনুদ্দীন, শায়খ আবদুল কবীর বালা পীর এবং হযরত শাহ জালালুদ্দীন জলীল তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। আমাদের চিশতিয়া শাখায় যার নাম আসে তিনি হচ্ছে শেষোক্ত শায়খ। সুতরাং এখন আমরা তাঁর জীবন ও হালতের উপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ২

হযরত শায়খ জালালুদ্দীন উমরী মাহমুদ জলীল তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ১৪ জিলহাজ্জ ৯৮৯ হিজরি, সমাধি: তিউনিসিয়া।)

তিনি ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর। গাঙ্গুহ শরীফের প্রখ্যাত চিশতি শায়খ হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বপ্রধান খলীফা শাহ জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্মস্থান ছিলো বলখ্ প্রদেশ। তাঁর পিতা সে অঞ্চলের কাজি হযরত মাহমুদ সাহেব ছিলেন একজন বড় আলিম। অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর জন্মের সন ৮৯৪ হিজরি উল্লেখ করেছেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করেছিলেন। ১৭ বছর বয়সের সময় তাঁর জাহিরী শরীয়তের জ্ঞানার্জন সম্পন্ন হয়। মুফতি ও উস্তাদ হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এছাড়া ছোট থেকেই তিনি কিতাব রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

ইবাদত, বন্দেগী, নিয়মিত ওজিফা এবং শরীয়তের পাবন্দ ছিলো তাঁর জীবনভর আখলাকের বৈশিষ্ট্য। সুন্নাতের প্রতি এতো বেশী পাবন্দ সে যুগে অপর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ আছে। এ যেনো তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তিনি কখনো একটি সুন্নাতও তরক করতেন না। বাস্তবে চারটি প্রসিদ্ধ তরীকার মাশাইখ বুজুর্গদের সকলেই এরূপ ছিলেন। শরীয়তের পাবন্দ এবং সুন্নাতের কঠোর অনুসরণ ছিলো তাঁদের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক।

সুন্নাতের প্রতি হযরত শাহ জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আকর্ষণ ও আমল কী পরিমাণ ছিলো তা একটি ছোট্ট ঘটনা থেকে জানা যায়। একদা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাও লোপ পেল। খাদিমরা কিছু ঔষধ সেবন করাতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমাকে ধরে মাটিতে বসাও। তারা তা-ই

করলেন। এরপর ঔষধ সেবনের পাত্র হাতে তুলে বললেন, “রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বিছানায় শুয়ে থাকাবস্থায় কিংবা চেয়ারেবসে কিছু পান বা খেয়েছেন বলে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ মিলে নি।” এরপর তিনি কোনোমতে বসে বসেই ঔষধ সেবন করলেন।

কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা

হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদার মধ্যে দিনরাত কাটাতেন। ফলে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণকায়, দুর্বল হয়ে পড়েন। অধিকাংশ সময় ভীষণ দুর্বলতা হেতু বিছানায় শুয়ে থাকতেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তাঁর কর্ণে নামাযের আযান ধ্বনি হলেই কোত্থেকে শক্তি পেতেন এবং উঠে যেতেন। অযু সেরে শান্তিমতো নামায আদায় করে আবার শুয়ে পড়তেন।

মুরীদ হওয়ার ঘটনা

হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন জালালুদ্দীন সাহেবের মুর্শিদ। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে তিনি তাঁর নিকট চিঠি প্রেরণ করতেন। হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব চিঠির উত্তর দিতেন। এই চিঠিগুলো সংরক্ষিত আছে। এতে রূহানিয়্যাতের অত্যাশ্চর্য অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখার সংগ্রাহক পীরের নিকট কিভাবে জালালুদ্দীন সাহেব মুরীদ হয়েছিলেন তা-ও লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ঘটনাটি খুব চিত্তাকর্ষক।

প্রাথমিক জীবনে তিনি ছিলেন জাহিরী জ্ঞানসম্পন্ন একজন ইমাম এবং মাদ্রাসার শিক্ষক। অনেক ছাত্র তাঁর সান্নিধ্যে থেকে উপকার লাভ করেন। একদা হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ মাদ্রাসায় তাঁর কিছু মুরীদের নিমন্ত্রণে তাশরিফ আনেন। মাওলানা জালালুদ্দীন সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি সেখানে গিয়ে কৌতুহলবশত কয়েকজন মুরীদকে জিজ্ঞেস করলেন, “শুনেছি তোমাদের ‘নৃত্যপ্রেমী’ পীর সাহেব নাকি এসেছেন? তাঁর

নিকট আমার সালাম দেবে এবং বলবে, যখন সময় পাই তখন আমি তাঁকে দেখতে যাবো।”

হযরত গাঙ্গুহীকে নৃত্যপ্রেমী হিসাবে তিনি কিছুটা ভর্ৎসনার সুরে সম্বোধন করেছিলেন। মুরীদ তাঁর সালাম ও বাণী হযরত গাঙ্গুহীর নিকট পৌঁছে দিলেন। তিনি জবাবে বললেন, তাঁকে গিয়ে বলো, ঐ পীর সাহেব নিজেই নাচেন এবং অন্যান্যদেরকে নাচন শিক্ষা দেন! এর কিছুদিন পর হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক গায়েবী আওয়াজ শুনলেন: “মাওলানা জালালকে তোমার জন্য গ্রহণ করে নিয়েছি। তাকে তোমার নিকট নিয়ে আসো!”

এই অত্যাশ্চর্য গায়েবী নির্দেশ পেয়ে হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাওলানা জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাদ্রাসায় চলে গেলেন। দেখতে পেলেন একদল ছাত্র মাওলানাকে ঘিরে বক্তব্য শ্রবণ করছেন। হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাত্রদের সাথে বসে গেলেন। বক্তব্য শেষে হঠাৎ মাওলানা জালালুদ্দীন হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কোন্ বুজুর্গ?” তিনি জবাব দিলেন, “ঐ নৃত্যুপ্রেমী পীর!”। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মাওলানা জালালুদ্দীন বুঝতে পারলেন তাঁর স্মরণে সংরক্ষিত যাবতীয় জাহিরী ইলম বিলুপ্ত হয়ে গেছে! মাওলানা বুঝতে সক্ষম হলেন, হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি বে-আদবির কারণে এমনটি হয়েছে। তিনি সাথে সাথে হযরতের পায়ে পড়ে মাফ চাইতে লাগলেন। একটু পরই মুরীদ হয়ে ধন্য হলেন। হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহ জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তরীকতের সবক দিলেন। বললেন, এখন থেকে যাবতীয় জিকির-আজকার ও শুগুল আদায় করবে। একাকী থেকে ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াজত-মুজাহাদা করবে।

বেশ কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হলো। মাওলানার উপর থেকে তখনো হতাশা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তিনি যেনো সবকিছু হারিয়ে ফেলেছেন। মুর্শিদকে এসব ব্যাপার জানালেন। হযরত গাঙ্গুহী তাঁকে পথনির্দেশ করতে লাগলেন। শাহ

জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে 'ইস্তিগরাক্ব' এর অবস্থা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠলো। তিনি স্বীয় পীরের মুহাব্বতে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।

কারামত

হযরত জালালুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক মুরীদ একবার বললেন, "এমন এক যুগ ছিলো যখন রূহানী জগতের উচ্চ পর্যায়ের ওলিদের চোখের দৃষ্টিপাত সাহেবে-কামাল হওয়ার কারণ হয়ে যেতো।" হযরত একথা শুনে বলে উঠলেন, "আজকের যুগেও এরূপ মহাত্মন ওলিআল্লাহ জীবিত আছেন!"

উক্ত মুরীদের প্রতি তিনি ক্ষণকালের জন্য গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করলেন। মুরীদ সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। দীর্ঘ তিনদিন পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায় থাকলেন। এর কিছুদিন পর মুরীদ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করলেন: "সকলের পক্ষে এই ওজন বহন করা সম্ভব নয়। এই ব্যক্তিও তা বহন করার ক্ষমতা রাখতো না।"

তানেশ্বরের মেলা ও যোগীর মৃত্যু

তানেশ্বর শহরে বাৎসরিক এক মেলা বসতো। শত-সহস্র হিন্দু এতে জড়োত হতেন। হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাঁর খাদিমকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মেলায় এতো হিন্দু জমায়েত হওয়ার কারণ কি? খাদিম তাঁকে বললেন, হযরত! এটা হিন্দুদের কি একটা ধর্মোৎসব। তবে এতে এক প্রখ্যাত যোগী আসেন। তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বিরাট। তিনি শক্ত যমিনের উপর ডুব দিয়ে মাটির নীচে যেতে পারেন এবং অন্য কোথাও যেয়ে আবার উঠে আসেন। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখার জন্যই এতো লোক একত্রিত হয়। হযরত বললেন, আমিও এই তামাশা দেখবো! আমাকে নিয়ে চলো। খাদিম কিছুটা আশ্চর্যবোধ করলো।এরপরও নির্দেশ মানতে হবে। হযরত তানেশ্বরী মেলায় গমন করলেন।

যোগী যে স্থানে তার 'অলৌকিত ক্ষমতা' প্রদর্শন করেন হযরতকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। ক্ষমতা প্রদর্শনের সময় আসলো। যোগী প্রত্যেকবারের মতো এবারও মাটির উপর আঘাত করলেন। মাটি ফেটে গেল। তিনি লাফ মেরে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সাথে সাথে হযরত জালালুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ স্থানে পা রাখলেন। যোগী আর বেরিয়ে আসলেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

বাণী

স্বরচিত কিতাব 'ইরশাদুত-তালিবীন'-এ তিনি লিখেছেন, "পবিত্র মুহাব্বতে ডুবন্ত মানুষ কখনো কাশফ-কারামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। বরং তাদের সকল ধ্যান ও নেশা নিবদ্ধ থাকে ইবাদত, জুহদ ও তাক্বওয়ার মধ্যে।" হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ করো।"

হযরত জালালুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "মূর্খ সুফিদের যারা তরীকতের রাস্তা থেকে পিছলে পড়ে, তারা অনেক মানুষকে ভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে সুফি-মাশাইখের বক্তব্য হলো, 'এসব জাহিল সুফি উসূল-ইলাল্লাহ থেকে বঞ্চিত। কারণ তাঁরা তরীকতের উসূলকে পরিত্যাগ করেছে। সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো নিষ্কলুষ ও পবিত্র শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ।"

হযরত তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকাল

কুল্লু নাফসিন যা- ইকাতুল মাউথ - প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। মৃত্যু থেকে কেউ পালাতে পারবে না। নির্ধারিত সময় এসে পড়লে রূহ দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যাবেই যাবে। এই একটি মহাসত্যকে এমন কোনো প্রাণী নেই যে স্বীকার করে না। তবে মৃত্যু কারো জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন আর কারো জন্য চিরশান্তির বাসস্থানের দিকে গমন। আল্লাহর প্রিয়জন ও নাযাতপ্রাপ্তদের জন্য মৃত্যু যেনো পৃথিবীর কয়েদীখানা থেকে মুক্তিস্বরূপ এবং চিরসুখের জান্নাতের দিকে ভ্রমণের আনন্দঘন সূচনা। তাই কবি বলেছেন: এমন জীবন তুমি করো গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।

হযরত শাহ জালালুদ্দীন উমরী মাহমুদ জলিল তানেশ্বনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চিরবিদায়ের এই আনন্দঘন ডাক আসে ১৪, ২২ কিংবা ২৫ জিলহাজ্জ ৯৮০ না হয় ৯৮৯ হিজরি সনে। দিনটি ছিলো পবিত্র জুমু'আ বার। তিনি এ ধরার কোলে দীর্ঘ ৯৫ কিংবা ৯৬ বছর জীবিত থেকে অসংখ্য মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবমান করেছেন। অধিকাংশ জীবনী লেখক বলেছেন, তিনি ১৪ জিলহাজ্জ ৯৮৯ হিজরিতে তিউনিসিয়ায় ইন্তিকাল করেন। সে দেশেই তিনি সমাহিত হয়েছেন।

হযরতের খুলাফাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ মাক্বামের অধিকারী ছিলেন বলখ শহরের অধিবাসী হযরত শাহ নিযামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবনালোচনায় মনোনিবেশ করছি।

পরিচ্ছেদ ৩

হযরত শায়খ নিযামুদ্দীন উমরী তানেশ্বরী বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৮ রজব ১০২৪ হিজরি, সমাধি: বলখ)

তিনি ছিলেন শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ জালালুদ্দীন উমরী তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাগিনা, দামান্দ এবং সুযোগ্য খলিফা। এছাড়া তাঁর বাবা শাহ আব্দুশ শুকুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা ছিলেন। সুতরাং পিতা-পুত্র উভয়েই তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিলাফত লাভ করেন।

উলূমে আসরার বা রূহানিয়্যাতের জ্ঞানের উপর তিনি প্রচুর বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া হাক্বিকাতের উপরও তাঁর বাণীসমূহ ছিলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। হযরতের খাদিমগণ এসব বাণী লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনামতে তিনি শরীয়তের জাহিরী জ্ঞান নিজে নিজেই অর্জন করেন। প্রচলিত কোনো মাদ্রাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যান নি। অধিকাংশ সময় তিনি নফি-ইসবাতের জিকিরের মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন। এছাড়া জিক্রে জলির [স্বরবে জিকির] প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো অত্যধিক। সময় সময় তিনি চল্লিশ দিনের জন্য স্বীয় খানক্বার একটি কক্ষে ঢুকে ‘চিল্লা’ দিতেন। পুরো চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেন না। এভাবে সর্বদাই নিজেকে কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা এবং ইবাদতের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতেন।

হযরত শাহ নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদ্রাসায় না গিয়েও উলূমে জাহির ও বাতিনে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। ইলমে মা’রিফাতের উপর তাঁর জ্ঞানের গভীরতা তো ছিলোই, এছাড়া জাহিরী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর তিনি উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন

শাখার উপর তিনি উল্লেখযোগ্য জ্ঞানার্জন করেছিলেন। সর্বজ্ঞানসম্পন্ন এরূপ ব্যক্তিত্ব সে যুগে খুব অল্পজন ছিলেন। সমসাময়িক অনেকে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন।

হযরত শাহ নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবদ্দশায় একাধিকবার দিল্লির সম্রাট আকবরের নিকট কিছু হিংসাতুর আলিম ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করেন। ফলে তিনি দু'বার আকবর কর্তৃক হিন্দুস্তান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁকে হারামাইন শরীফাইনে হিজরত করতে হয়েছিল। বেশ কিছুদিন পবিত্র শহরদ্বয়ে অবস্থান করে তিনি হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার তিনি মধ্য এশিয়ায় হিজরত করেন। বলখ প্রদেশের শাসনকর্তার নিকটও কিছু হিংসাতুর আলিম তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। শাসনকর্তা তাঁকে দেশ থেকে বের করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। রাতে স্বপ্নে দেখলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলছেন, “খবরদার! নিযামুদ্দীনকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না!” অত্যাশ্চর্য এই স্বপ্ন দেখার পর বলখের শাসনকর্তা হযরতের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরীদ হয়ে গেলেন।

ফিরিশতাদের ইমাম

হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরীর একটি বড় কারামত ছিলো। তিনি ফিরিশতাদের ইমামতি করতেন। নামাযের সময় তিনি ইমাম হতেন আর তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য ফিরিশতা মুক্তাদি হিসাবে দাঁড়িয়ে যেতেন।

বলখে গমন

একদা তিনি স্বীয় শায়খের অনুমতিক্রমে ৬ মাসের এক সফরে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, হযরত! হয় আমি মাক্বামে মাকছুদে পৌঁছুবো না হয় মৃত্যুবরণ করবো! বিদায় বেলা তাঁর মুর্শিদ তাঁকে বললেন, বাবা! আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি প্রত্যেক শ্বাসে ৯০ বার ইসমে যাতের জিকির করবে। এরপর এ সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়াবে। সুতরাং গন্তব্যস্থানে পৌঁছে তিনি এই জিকির শুরু করলেন।

আল্লাহর কী কুদরত! এক শ্বাসে জিকিরের সংখ্যা বাড়িয়ে তিনি ৪০০ বারে যেয়ে উপনীত হলেন। একমাস এভাবে জিকির শেষে হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে উচ্চতর মাক্বাম হাসিল হলো। এই মাক্বামকে তরীকতের সাধকরা বলেন, 'তাজাল্লিয়াতে খাস্সা'। এ স্তর হলো ঐশি নূরে আলোকোজ্জ্বল একটি অবস্থা যার স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয়।

ব্যাপারটি তাঁর মুর্শিদ হযরত জালালুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট প্রকাশ পেল। তিনি প্রিয় ভাগিনা, দামান্দ ও বিশিষ্ট এ মুরীদকে খিলাফত প্রদান করলেন। বললেন, বাবা! এখন তুমি অন্যদেরকে মুরীদ করার যোগ্যতা লাভ করেছো। সুতরাং ইলমে মা'রিফাতের খিদমাত আঞ্জাম দিতে থাকো। শায়খ নিযামুদ্দীনের যোগ্যতা ও কামালিয়াত এতো উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁর মুর্শিদ সকল মুরীদ ও খলিফাকে একদা বললেন, "তোমরা এখন নিযামুদ্দীনের কাছ থেকে তরীকাতের সবক নেবে।"

ওলি তারাশ

ওলি তারাশ অর্থ 'ওলি তৈরীকারী'। হযরত নিযামুদ্দীন উমরী তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এই উপাধি প্রদানের মূল কারণ ছিলো, তাঁর দৃষ্টি যার প্রতি গভীরভাবে পতিত হতো, সে সাথে সাথে 'সাহেবে শুহুদ' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতো। সাহেবে শুহুদ বলে ঐ ব্যক্তিকে যার আত্মা উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য। হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘদিন শায়খ-মাশাইখদের উস্তাদ হিসাবে তরীকতের তা'লিম দিতে থাকেন। অনেকে তাঁর পবিত্র সুহবত লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীতে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত হয়ে ওঠেন গাঙ্গুহ শরীফের দ্বিতীয় মহাত্মন ওলিআল্লাহ শায়খুল মাশাইখ হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হযরত নিযামুদ্দীন উমরী তানেশ্বরী বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বপ্রধান খলিফা। আমরা পরবর্তীতে তাঁর জীবন ও হালতের উপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিবারবর্গ

হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ ক'জন সন্তানের পিতা ছিলেন। তাঁর ছেলেসন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছেলে শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ বলখ্ থেকে হিন্দুস্তানে আসেন। তিনি তানেশ্বর শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। কনিষ্ঠ ছেলের নাম শায়খ আবদুল হক। তিনিও কারনালে এসে জীবন অতিবাহিত করেন। বাকী সকলেই বলখে বসবাস করেন।

লেখক

হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ ক'টি কিতাব রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'লাম'আত' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শরাহ সওয়ানিহে গাযালী', 'রিয়াদ্বে কুদসী', 'তাফসিরে নিযামী', 'রিসালায়ে হাক্বিকাত' এবং 'রিসালায়ে বলখিয়া' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

ইন্তিকাল

রজব মাসের ৮ তারিখ তিনি এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করেন। ইন্তিকালের সনের উপর ইখতিলাফ আছে। অনেকে বলেছেন সনটি ছিলো ১০২৪, ১০৩৫ কিংবা ১০৩৬ হিজরি। তবে প্রথমোক্ত সনটি অধিকাংশ জীবনীকার গ্রহণ করেছেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। তিনি বলখে সমাহিত আছেন। খুলাফাদের মধ্যে তাঁর ছেলে শায়খ আবদুল করীম ও সাঈদ আলী গাউয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা তরীকতের খিদমাত করেন। আমরা ইতোমধ্যে প্রধান খলীফা হযরত শাহ আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর অপর এক খলীফার নাম হলো শাইখুল্লাহ দাদ কাজী সালাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

পরিচ্ছেদ ৪

হযরত শায়খ আবু সাঈদ আসআদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: বরিউল আউয়াল ১০৪০ হিজরি, সমাধি: গাঙ্গুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত।)

হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম মাশাইখে চিশতের লেখক ‘শাহ আবু সাঈদ নু’মানী নাওশারওয়ানী গাঙ্গুহী’ উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা নু’মানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর। এ কারণে তাঁকে নু’মানী বলা হতো। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়খ নূর এবং মাতা ছিলেন স্বীয় পীর জালালুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মেয়ে। প্রাথমিক জীবনে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে ঐশিপ্রেমের লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর এই অবস্থার কথা কাউকে বলতেন না। তবে ইশকে ইলাহীর ছোঁয়া একদা প্রকাশ পেয়ে গেল। তিনি নানার নিকট ছুটে গেলেন এবং সব খুলে বললেন।

হযরত জালালুদ্দীন তানেশ্বরীর বয়স তখন অনেক। খুব বেশী চলাফেরা করতে পারতেন না। তবে তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে, কালে তাঁর এই নাতিটি যুগশ্রেষ্ঠ ওলিদের সমকক্ষ হয়ে ওঠবেন। তিনি হবেন চিশতিয়া তরীকার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। সুতরাং নিজের নিকট না রেখে ইতোমধ্যে যাকে তিনি খিলাফত প্রদান করেছিলেন, তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী তখন স্বীয় পীরের কিছু খলিফাসহ মুরীদানকে সুলুকের বিভিন্ন সবক দিচ্ছিলেন। তাঁর পবিত্র সুহবত পেয়ে সবাই উপকৃত হচ্ছিলেন।

হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা চলে গেলেন। ফলে আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। পীরের সুহবত থেকে বঞ্চিত

হয়ে তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি নিয়মিত জিকির আজকার পালনে উদাসীন হলেন।

হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যুগশ্রেষ্ঠ ওলি শাহ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর ছিলেন। একদা তিনি গাঙ্গুহে গমন করেন। হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবর জিয়ারত করলেন। এরপর কিছুক্ষণ সেখানে বসে ধ্যানরত হলেন। তিনি এক গায়েবী নির্দেশ শুনতে পেলেন: "হে আবু সাঈদ! তুমি বলখে অবস্থানরত তোমার পীর নিযামুদ্দীনের নিকট চলে যাও!"। দীর্ঘ তিনদিন যাবৎ তিনি এই নির্দেশ শুনতে পেলেন। অবশেষে তিনি পায়ে হেঁটে বলখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মুরীদ আগমনের অবগতি

আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামাআতের সর্বসম্মত মত হলো ওলিদের 'কাশফ', 'কারামত' ও 'ইলহাম' সত্য। যুগশ্রেষ্ঠ চিশতি ওলি হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রিয় মুরীদের আগমনের ব্যাপারটি অগ্রেই 'কাশফ' এর মাধ্যমে অবগত হন। এছাড়া এই মুরীদের ব্যাপারে প্রখ্যাত ওলি হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে তিনি আরো অতিরিক্ত কিছু ব্যাপার জানতে পারেন। সুতরাং আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুরীদ বলখের সুতলানকে নিয়ে কিছুদূর পথ এগিয়ে গেলেন।

সুতরাং আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উভয়ে অত্যন্ত আদরযত্নে অভ্যর্থনা জানালেন। হযরত নিযামুদ্দীন তাঁকে এটাও বুঝিয়ে দিলেন যে, গাঙ্গুহী শরীফে তিনি যে গায়েবী নির্দেশ শ্রবণ করেছিলেন, তা ছিলো হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি কারামত।

বলখের সুলতানের তত্ত্বাবধানে হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তিনদিন যাবৎ রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হলো। এরপর আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি বললেন, “হযরত! আমি গাঙ্গুহ থেকে এখান পর্যন্ত পায়ে হেটে আসি নি, এরূপ রাজকীয়ভাবে সংবর্ধিত হতে!”

হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন, “বাবা! তোমার আগমনের কারণ আমার নিকট স্পষ্ট করো?”

তিনি জবাব দিলেন, “আমার দেশ থেকে আপনি যে বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছেন, তা থেকে কিছু নেওয়ার আশায় এখানে এসেছি হযরত!”

হযরত নিযামুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবার কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, “তা-ই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে এই ইহলৌকিক যাবতীয় আকর্ষণ ও চিত্তবিনোদনমূলক বিষয় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নাও!”

তিনি রাজী হয়ে বললেন, “হযরতের সকল নির্দেশ আমার শিরোধার্য।”

কঠোর সাধনা

হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, খাবার হিসাবে এখন থেকে তোমাকে দৈনিক সকাল-বিকেল এক টুকরো শুকনো রুটি দেওয়া হবে। অনুমতি ছাড়া আমার সামনে আসবে না। কোনো জিকির-শুগুল না দিয়ে বললেন, নিয়মিত নামায, রোযা আদায় করো। আর খানকার টয়লেটের দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হলো। সঠিকমতো এই দায়িত্ব পালন করে যাবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

এভাবে কঠোর মুজাহাদার মধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পীরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যেতে লাগলেন। একদিন হযরত শায়খ তাঁর এক খাদিমকে বললেন, এক বালতি ভর্তি আবর্জনা আবু সাঈদের উপর ঢেলে দেবে! খাদিম তা-ই করলো। হযরত আবু সাঈদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠলেন। বললেন, “যদি তুমি গাঙ্গুহীতে আজ থাকতে তাহলে এই দুষ্টামির ফল কী হতে পারে বুঝতে!”

কথামতো খাদিম আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিক্রিয়া হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অবগত করলো। শায়খ মন্তব্য করলেন, “ওহ!

তার মাথায় এখনো শয়তান বিরাজ করছে! গাঙ্গুহের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের গন্ধ এখনো তার মধ্য থেকে চলে যায় নি বুঝি। এখনও তাকে টয়লেটের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে।”

আরো বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হলো। নফসের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে হযরত আবু সাঈদ অনেকটা বিজয়ী হলেন বলে মনে হচ্ছিলো। হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। খাদিমকে বললেন, এবার আরো বেশী দুর্গন্ধময় আবর্জনা তার উপর নিক্ষেপ করবে। প্রতিক্রিয়ার সংবাদ আমাকে জানাবে।

খাদিম সত্যিই এক বালতি ভর্তি দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা হযরত আবু সাঈদের উপর ঢেলে দিল! তিনি নিজেকে সংবরণ করে নিলেন। কিছু বললেন না। খাদিমের দিকে একবার শুধু রাগের দৃষ্টিতে তাকালেন। এই প্রতিক্রিয়া শায়খের নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, “হু! এখনো অতি সামান্য সমস্যা রয়ে গেছে!”

আরো কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর খাদিম দ্বারা পুনরায় হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরে দুর্গন্ধময় আবর্জনা নিক্ষেপ করালেন। খাদিম বেশ আনন্দচিত্তে ছুটে আসলো শায়খের নিকট। বললো, “হযরত! সুখবর! আবু সাঈদ সাহেব তো এবার কিছুই বললেন না, বরং হাসলেন।” সত্যিই এটা ছিলো শায়খের নিকট সুসংবাদ। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর এই প্রিয় মুরীদের ‘নফসে আম্মারা’ মৃত্যুবরণ করেছে। বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ! আবু সাঈদ সর্বশেষ স্তরে উপনীত হয়েছেন।”

এই রাস্তায় সর্বাপেক্ষা বড়ো বাঁধা হলো আত্মম্ভরিতা বা তাকাব্বুর। একটি বিন্দু পরিমাণ তাকাব্বুরী অবশিষ্ট থাকলে তা-ই সালিককে পথভ্রষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। পীরাকি আর যশ-খ্যাতি-তাকাব্বুরী কখনো একই সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না কোনো ব্যক্তির মধ্যে। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থই হলো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেওয়া। এ যুগের শাইখুল মাশাইখ কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “নিজেকে মিটিয়ে দাও! গোবরে পরিণত করো!”

হযরত গোবর বলতেন এজন্য যে, গোবরের মধ্য থেকেই গজিয়ে ওঠে সজীব বৃক্ষ-তরু-লতা। নিজেকে গোবরতূল্য মনে করলে সত্যিকার অর্থে 'বিলুপ্ত' করা হলো। আর এই বিলুপ্ত হৃদয়ে গজে উঠবে ইলমে মা'রিফাতের সজীব-শক্ত বৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আফসোস! আজকের যামানায় এরূপ পীর-মুরীদী বিলুপ্ত হয়েছে, যেরূপ হওয়ার কথা। এখনকার মুরীদদের উদ্দেশ্য খিলাফত লাভ! নিজের নফসের বিরুদ্ধে যে কী কঠোর সংগ্রাম দরকার সে ব্যাপারে তারা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। পীর-মুরীদী যেনো 'আমি অমুক শায়খের খলিফা' এটুকু লোকের মধ্যে প্রচার করার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানুষ তার নফসে আম্মারাকেই চিনতে পারছে না অথচ 'বড় শায়খ' আর বড় 'খলিফা' হওয়ার পেছনে দিনরাত চেষ্টা-তদবিরে মত্ত।

হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পরবর্তীতে গাঙ্গুহ শরীফের তিন যুগশ্রেষ্ঠ শায়খদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আর এই উচ্চ মাক্বামে আরোহণের জন্য তাঁকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল। স্বীয় পীর হযরত নিযামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রূহানী চিকিৎসার অংশ হিসাবে 'নফসে আম্মারাকে' ধ্বংস করার উক্ত পথ ও পাথেয় ছিলো সাধনার শুরু মাত্র। তৃতীয়বার পরীক্ষা শেষে শায়খ বললেন, "আবু সাঈদ! এখন তুমি আমার খানক্বার মজলিসে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করেছ।"

সুতরাং তিনি পীর সাহেবের খানক্বায় প্রবেশাধিকার পেয়ে সুলুকের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনতে লাগলেন। কিছুদিন চলে যাওয়ার পর তাঁকে জিকিরের প্রাথমিক সবক পালনের নির্দেশ করা হলো। এবার জিকির শুরু করার পর থেকেই হযরত আবু সাঈদের মধ্যে রূহানী কাইফিয়াত অনুভূত হতে লাগলো। এসব হালতের কথা তিনি শায়খের নিকট ব্যক্ত করলেন। হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাথে সাথেই বললেন, "তুমি আর জিকির-আজকার করবে না!" একমাত্র শায়খই মুরীদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝতে সক্ষম হোন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আবু সাঈদের মধ্যে ঐসব রূহানী অবস্থা প্রকাশ পাওয়ায় আবারো 'গর্ব' নামক জঘন্য

রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তিনি তাকে বললেন, "হে আবু সাঈদ! আজ থেকে তুমি শিকারী কুকুরগুলো দেখাশোনা করবে!"

একদিন দু'টি শিকারী কুকুরকে চেইনে বেঁধে শাহ আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিকটস্থ জঙ্গলে হাঁটতে গেলেন। কুকুরগুলো হঠাৎ একটি জন্তু দেখে ওর পেছনে ছুটে চললো। আবু সাঈদও চেইনে শক্ত করে ধরে কুকুরগুলোর পেছনে দৌড়াতে লাগলেন। তিনি কিছুতেই চেইন ছাড়লেন না। তবে ব্যাপারটি তার জন্য ভীষণ কষ্টকর হয়ে ওঠলো। শিকারী কুকুরদ্বয়কে আটকানো মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। চেইন ছেড়ে দিতেও তিনি ভীষণ ভয় করছিলেন। তিনি মনে করলেন, চেইন ছেড়ে দিলে কুকুরগুলো হারিয়ে যেতে পারে। তিনি পীর সাহেবের দরবারে যেয়ে কী জবাব দেবেন? সুতরাং তিনি একটি ফন্দি আঁটলেন। চেইনটি নিজের কোমরে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। এরপর কুকুরগুলোর সাথে অনেকদূর পর্যন্ত দৌড়ে চললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এবার কুকুর দু'টো তাকে টেনে টেনে অগ্রসর হতে লাগলো। তারা তাঁকে ছোট ছোট পাথর ও কাটাযুক্ত রাস্তার উপর দিয়ে টানতে লাগলো। তার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হলো, রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু এই অবস্থায় এক অত্যাশ্চর্য তাজাল্লি তাঁকে আড়ষ্ট করে রাখলো। তিনি ভীষণ কষ্টের মধ্যে রূহানী প্রশান্তি অনুভব করলেন।

হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই অবস্থার কথা 'কাশফের' মাধ্যমে তাঁর পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবগত হলেন। তিনি তাঁর খাদিমকে বললেন, "এই মুহূর্তে ফায়েজ ও বরকত আবু সাঈদের উপর পতিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক তাকে এক বিশিষ্ট তাজাল্লি দ্বারা ভূষিত করেছেন। তুমি ঐ জঙ্গলে চলে যাও। তাঁকে নিয়ে আসো।"

খাদিম চলে গেলেন জঙ্গলের দিকে। এদিকে হযরত নিযামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শাইখুল মাশাইখ হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "নিযামুদ্দীন! আমার নাতির উপর আরো বেশী শক্ত কষ্ট আরোপ করার অধিকার তোমার আছে। এরপরও আমি মনে করি নি তুমি এমনটি করবে!"

হযরত নিযামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুঝতে সক্ষম হলেন, আবু সাঈদ এখন তরীকতের রাস্তায় অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছেন। বিশেষ করে ধ্যানরত অবস্থায় হযরত আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথাগুলো তাঁর অন্তরে এক অপূর্ব ইশকের ছোঁয়া প্রদান করে। এ থেকেই তিনি মুরীদ সম্পর্কে অনেক ব্যাপার অবগত হতে পারেন। এরপর খাদিম ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহসর্বস্ব মহাক্লান্ত শাহ আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে তাঁর সম্মুখে হাজির হলেন। তিনি অত্যন্ত প্রেমাসক্ত হৃদয়ে স্বীয় প্রিয় মুরীদকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর থেকেই তিনি তাঁকে তরীকতের উচ্চতর সবক দিতে লাগলেন। শায়খ এবার বুঝতে পারলেন এই মুরীদই হবেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও প্রিয় খলিফা যার মাধ্যমে গাঙ্গুহ শরীফ পুনরায় আলোকিত হবে।

খিলাফত লাভ

হযরত শাহ আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানিয়্যাতের ট্রেনিংয়ের শেষ পর্যায় এসে গেছে। কিন্তু একটি বড়ো পর্দা অতিক্রমের বাকী ছিলো। নিজের শায়খের নির্দেশমতো তিনি কঠোরভাবে জিকির-শুগুলে মত্ত হলেন। কিন্তু বার বার তাঁর অন্তরে কুকুরদের দ্বারা কাটা ও পাথরের উপর টানাটানির সময়কার সেই 'তাজাল্লি' পুনঃপতিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হচ্ছিলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে তাজাল্লির মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ আপাদমস্তক ভেতর-বাইরসহ সাঁতার কেটেছিলেন, তাতো সহজে আসার নয়। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই তাজাল্লির প্রচণ্ড টানে এতোই পাগলপরা হয়ে পড়লেন যে, তিনি তার জন্য এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন। নিজেকে বললেন, "হে আবু সাঈদ! তুমি হয় সেই তাজাল্লির মধ্যে আবার সাঁতার কাটবে না হয় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে!" মনে মনে এটুকু বলে তিনি গভীর রাতে 'হাবসে দম' শুগুল করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি দম বন্ধ করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন ঐ তাজাল্লি না আসা পর্যন্ত তিনি দম ছাড়বেন না। মৃত্যু এসে গেলেও না!

হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ ঘণ্টা খানেক এভাবে দম আটকে রাখলেন। এরপর হঠাৎ ঐ ঐশী তাজাল্লির অনুপম নূরের মধ্যে তিনি সাঁতার

কাটতে লাগলেন। কুকুরদের কর্তৃক টানার সময়কার সেই তাজাল্লি থেকেও এবারকার এটি ছিলো শতগুণ সমৃদ্ধ ও ইশকের ছোঁয়া দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঁর জীবনে এমন রূহানী প্রশান্তির ক্ষণ ইতোমধ্যে অনুভূত হয় নি। তিনি এমন সজোরে দম ছাড়লেন, এতে তাঁর পাঁজর ভেঙ্গে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি অনুভব করলেন, গায়েব থেকে কে যেনো এক কুদরতী হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। হাতের মধ্যে একটি চামচ ও তাতে কিছু ঔষধ। হযরত আবু সাঈদ চোখ বন্ধ অবস্থায় মুখ খুললেন। গায়েবী হাত তাঁর মুখের ভেতর ঔষধ ঢেলে দিল। তিনি বুঝতে পারলেন, পাঁজরের মধ্যে আর বেদনা নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এরপর শুনলেন কে যেনো বলছে, "হে আবু সাঈদ! তুমি কিছুদিন পর্যন্ত মোরগের রসযুক্ত শিরকা পান করবে!"

হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পরদিন ঘটনার আদ্যোপান্ত স্বীয় মুর্শিদের নিকট খুলে বললেন। তিনি তিনদিন পর্যন্ত মোরগের সুপ তাঁকে পান করালেন। অবশেষে একদিন আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে হযরত নিযামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাছে ডেকে আনলেন। বললেন, বাবা আবু সাঈদ! আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রাজী হয়েছেন। তুমি সফলভাবে রূহানী ট্রেনিং সম্পন্ন করেছো। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি তোমাকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করছি। তুমি গাঙ্গুহীতে ফিরে যাও এবং সেখানকার রূহানী রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ করো।

সুতরাং হযরত শায়খ আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুর্শিদের নির্দেশে গাঙ্গুহ শরীফে ফিরে আসলেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন চলে গেলো, তাঁর আগমনের সংবাদ কেউ জানতে পারলো না। তিনি অত্যন্ত নিরীহ জীবন-যাপন করতে লাগলেন। তবে একদিন শায়খ মুহাম্মদ সাদিক এসে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। কথাটি দ্রুত জানাজানি গয়ে গেল। লোকজন এরপর থেকে তাঁর খানক্বায় এসে ভিড় জমাতে লাগলো। অসংখ্য মানুষ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করা শুরু করলো। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এখানে থেকেই তরীকতের খিদমাত করে গেছেন।

পরপারের আহ্বান

তাঁর মৃত্যুর সন ছিলো ১০৪০ হিজরি। তবে কোন্ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য আছে। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ আর কেউ বলেছেন বরিউস সানী মাসের ২ তারিখ। গাঙ্গুহ শরীফেই তিনি সমাহিত আছেন।

হযরতের প্রসিদ্ধ ক'জন খলিফা হলেন: শায়খ মুহাম্মদ সাদিক গাঙ্গুহী, শায়খ ইব্রাহীম রামপুরী, শায়খ খাজা মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী, শায়খ ইব্রাহীম সাহারানপুরী ও শায়খ খাজা পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। চিশতিয়া তরীকার আমাদের শাখায় যে মহাত্মন শায়খের নাম এসেছে তিনি হচ্ছেন শাইখুল মাশাইখ হযরত মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন আমরা তাঁরই জীবন ও হালত নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ৫

হযরত শায়খ মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৯ রজব ১০৫৮ হিজরি, সমাধি, এলাহাবাদ, ভারত।)

তাঁর জন্মস্থান ভারতের সদরপুর। পিতার ইচ্ছা ছিলো ছেলেকে বড় আলিম বানাবেন। সুতরাং সে যুগের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাসমূহে অধ্যয়ন শেষে তিনি উলূমে জাহিরিয়ার উপর অভিজ্ঞ আলিম হলেন। কিন্তু শরীয়তের মধ্যস্থ আরেক জ্ঞান আছে যাকে বলে উলূমে বাতিনিয়া। এই অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানকেই বলা হয় ইলমে তাসাওউফ। শরীয়ত ও তাসাওউফের সমন্বয়ই হলো দ্বীনের পরিপূর্ণতা। হযরত মুহিববুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধুমাত্র বাহ্যিক জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হতে পারলেন না। কোনো এক অজানা প্রবল আভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষা তাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে নিলো। সুতরাং তিনি ইলমে তাসাওউফের সন্ধানে বেহুঁশ হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কি করে যে মা'রিফাতের সন্ধান মিলে? অনেক হাহাকার ও খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন কোনো এক ওলির সমাধিস্থলে যেয়ে চিল্লায় বসে যাবেন। হয়তো এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দিক নির্দেশনা মিলবে।

তিনি ঘুরে ঘুরে দিল্লিতে এসে হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধির নিকট এসে ধ্যানমগ্ন হলেন। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি কালাতিপাত করতে লাগলেন। একদা তিনি দেখতে পেলেন হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বললেন, "হে মুহিববুল্লাহ! তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হলে গাঙ্গুহ শরীফে চলে যাও। সেখানে ইলমে তাসাওউফের তাজাল্লি দ্বারা হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সত্যান্বেষীদের অন্তর আলোকিত করে যাচ্ছেন। তুমি চিশতিয়া-সাবিরিয়ার এই শায়খের সান্নিধ্য লাভ করো।"

বাইআত ও খিলাফত লাভ

সুতরাং কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই রূহানী নির্দেশ পালনে হযরত মুহিববুল্লাহ গাঙ্গুহ শরীফে চলে গেলেন। সেখানে যেয়ে হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেনো এরূপ এক মুরীদের অপেক্ষায় ছিলেন। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব প্রদান সকলকে তো আর দেওয়া যায় না। কিন্তু মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ক্ষেত্রে এক অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম ছিলো। তিনি এতো তাড়াতাড়ি খিলাফত লাভ করেছিলেন যে, অন্যান্য মুরীদান এতে হিংসাতুর হয়ে ওঠেন।

মুরীদ হওয়ার মাত্র ক'দিন পরই হযরত শায়খ তাঁকে ডেকে বললেন, "মুহিববুল্লাহ! আসো, আমি তোমাকে মাক্বামে মাকছূদে পৌঁছে দিতে সহায়তা করি!"

একথা বলে শায়খ আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত মুহিববুল্লাহকে নিয়ে খানক্বার একটি কক্ষে ঢুকলেন। রূহানিয়্যাত মুরীদকে প্রদান করার জন্য শক্তিশালী তাওয়াজ্জুহ দিলেন। এরপর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে ধন্য করলেন। হযরত মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এতে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেন। উলূমে বাতিনিয়ার উচ্চতর মাক্বামে এতো তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন, তা তিনি কখনো ভাবেন নি। তবে ইতোমধ্যে ইলমে শরীয়তের উপর গভীর জ্ঞান ও সুন্নাতের কঠোর অনুসরণ তাঁকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছিল। আর শরীয়তের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানা ও আমল করা সে সাথে সুন্নাত ও নফল ইবাদতে ডুবে থাকার মধ্যেই ইলমে মা'রিফাতের চাবিকাঠি নিহিত। হযরত মুহিববুল্লাহ যে ইলমে মা'রিফাত অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত পীরের সান্নিধ্যে এসে মুরীদ হওয়ার পর প্রকাশ পেলো। আর হযরত শায়খ তাঁকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খিলাফত প্রদান করেছিলেন।

হযরত যাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাশাইখে চিশত' গ্রন্থে সাত প্রকার খিলাফতের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো: ১. খিলাফতে ইসালতী

(পৌঁছানো), ২. খিলাফতে ইযাজতী (অনুমতি), ৩. খিলাফতে ইজমায়ী (মতৈক্য), ৪. খিলাফতে ওয়ারিসানী (উত্তরাধিকারী), ৫. খিলাফতে হুকমী (নির্দেশমূলক), ৬. খিলাফতে তাকাল্লুফী (বাহ্যিক) ও ৭. খিলাফতে ওয়াইসী (গায়েবী - ওয়েস করণী যেভাবে পেয়েছিলেন)।

কথিত আছে হযরত শাহ মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী শেষোক্ত খিলাফতি লাভ করেছিলেন। হযরত আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিছু মুরীদ তাঁর এই খলিফার প্রতি নাখোশ হয়েছিলেন। তাঁরা ভাবলেন, আমরা হযরতের সান্নিধ্যে অনেকদিন যাবৎ আছি। আমরা খিলাফত লাভের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। তথাপি মুহিববুল্লাহ সাহেব এখানে আসলেন মাত্র। আর হযরত সাথে সাথেই খিলাফতদানে তাঁকে ভূষিত করলেন। তাঁদের নিকট ব্যাপারটা কেমন যেনো বেখাপ্পা মনে হচ্ছিলো। শায়খ আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট শেষ পর্যন্ত মুরীদানের এই মনোভাব প্রকাশ পেলো। তিনি তাঁদেরকে ডেকে বললেন:

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন, আল্লাহ মহাকৃপাশীল।" (জুমু'আ : ৪)

এরপর তিনি বললেন, "বাবারা! সকলের রূহানিয়্যাতের ব্যাপারটি একই ধরনের নয়। কারোর জন্য কঠোর ও দীর্ঘ মুজাহাদা (আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা) প্রয়োজন হয়। আবার অন্যদের জন্য খুব অল্প চেষ্টা-সাধনাই যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন।"

ব্যাপারটি এভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পর মুরীদদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি আসলো। তবে হযরত মাওলানা মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফত লাভ করে কোনো ধরনের গৌরব অনুভব করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। বরং মুর্শিদ কর্তৃক উচ্চ পর্যায়ের 'তাওয়াজ্জুহ' (বা হৃদয়কে ইলমে মা'রিফাতের নূরে আলোকিত করার রূহানী দৃষ্টিপাত) প্রদানের সময় তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, এর প্রাবল্য হেতু তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে পড়লো। চিৎকার দিয়ে বললেন, "হযরত! আর না! আর না! আমি সহ্য করতে পারছি না!" খিলাফত লাভের সাথে

সাথেই তিনি বলেছিলেন, "হযরত! আমার মধ্যে এই মহান দায়িত্ব বহনের কোনো যোগ্যতা নেই!"

হযরত শায়খ মুহিববুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফত লাভ শেষে মুর্শিদের নির্দেশে প্রথমে দিল্লি চলে গেলেন। সেখানে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত কিছুদিন আঞ্জাম দেওয়ার পর নিজ জন্মস্থান সদারপুরে আসলেন। কিন্তু এখানেও বেশীদিন থাকেন নি। চলে গেলেন ইলাহাবাদে। এখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হযরতের ফায়েজ ও বরকত অত্র অঞ্চলের সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অনেক মানুষ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে সঠিকভাবে দ্বীন পালনের পথ খুঁজে পেল। অনেক আলিমও তাঁর নিকট মুরীদ হয়ে ধন্য হয়েছেন।

ইন্তিকাল

ইলাহাবাদের হিদাআতের নূর শাইখুল মাশাইখ হযরত মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাঁর হাজার হাজার ভক্ত-মুরীদানকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এই মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর দিন-মাস ছিলো বৃহস্পতিবার ৯ রজব। তবে হিজরি সনের ক্ষেত্রে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি হলো ১০৫৪ আর দ্বিতীয়টি ১০৫৮ সাল। শেষোক্ত সনটি অধিকাংশ জীবনীকার গ্রহণ করেছেন। সূর্যাস্তের সময় অস্তমিত হলেন যুগের এই শ্রেষ্ঠ ওলি। তিনি ইলাহাবাদে সমাহিত আছেন।

খলিফা

হযরত মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা ছিলেন শাহ সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী। তবে কোনো কোনো শাজারায় তাঁর নাম উল্লেখ হয় নি। এছাড়া শাহ সৈয়দ আকবরাবাদীর খলিফা ছিলেন তাঁরই সাহেবজাদা মুহাম্মদ মক্কী জাফরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কোনো কোনো শাজারাতে তাঁর নামও ভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন সা'দ মুহাম্মদ মক্কী, রওশন মুহাম্মদ মক্কী ইত্যাদি। মুহাম্মদ মক্কী জাফরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম-মৃত্যুর তারিখ কিংবা

জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় নি। যা হোক, তাঁর খলিফা ছিলেন হযরত শাহ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা পরবর্তীতে প্রথমে মুহাম্মদ আকবরাবাদী, এরপর শাহ মক্কী ও এরপর শাহ অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের উপর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ৬

হযরত শায়খ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৩ রজব, ১১০৭ হিজরি, সমাধি: আগ্রা, দিল্লি, ভারত।)

হযরত মুহাম্মদী আকবরাবাদী ছিলেন সে যুগের চিশতিয়া তরীকার শ্রেষ্ঠ ওলি। হিজরি ১০২১ সালের ১৪ শাওয়াল সায়্যিদ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। প্রাথমিকজীবনে তিনি যাচ্ছেতাই জীবন-যাপন করতেন। তাঁর বাবা হযরত শায়খ ঈসা হারগামী ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার লোক। ছেলের এসব কর্মকাণ্ড তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি ছেলেকে কঠোর শাসন করতেন। তবে কোনো কাজে আসতো না।

আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাঁর আপন করে নিতে পারেন। এ ব্যাপারে কারো কিছু করার নেই। সবকিছু তাঁর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন। হযরত আকবরাবাদীর জীবন একদা তাঁর বাবার কিছু বক্তব্য দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেল। আবেগপূর্ণ এসব দ্বীনি কথা শুনে তিনি হঠাৎ করে ইলম অর্জনের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। সুতরাং বিলম্বে হলেও তিনি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ইলমে শরীয়ত অর্জনে মনোনিবেশ হলেন। উলূমে জাহিরিয়া অর্জন শেষে তাঁর হৃদয় উলূমে বাতিনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। তিনিজানতেন, এই জ্ঞান কিতাব পাঠ করে কখনো অর্জিত হয় না। এরজন্য প্রয়োজন একজন কামিল পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একদা তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো সে যুগের চিশতিয়া তরীকার শাইখুল মাশাইখ হযরত মুহিববুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে। ফলে আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সৌভাগ্যের দ্বারোন্মোচন হলো। তিনি শায়খের হাতে বাইআত গ্রহণ করে ইলমে মা'রিফাত হাসিলে একনিষ্ঠভাবে ধ্যানমগ্ন হলেন।

হযরত মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একাধারে চৌদ্দ বছর স্বীয় মুর্শিদ হযরত ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিলেন। এসময় তিনি সত্যিকার একজন খাদিম হিসাবে নিজের শায়খের যাবতীয় কাজকর্ম ও খিদমতে থাকতেন। কালে তিনি মুর্শিদের প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আর মুর্শিদ যে মুরীদকে বেশী ভালোবাসেন সে-ই খুব দ্রুত মাক্বামে মাকছুদে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এটা দুনিয়ারও নিয়ম। বলা হয়, আমার বন্ধু যাকে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি। সুতরাং আল্লাহর ওলি যাকে মুহাব্বত করবেন, আশা করা যায় আল্লাহও তাকে দয়া ও করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন। হযরত আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে তাঁর পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পীরের সান্নিধ্যে থাকাকালে মাত্র একবার অনুমতিক্রমে নিজের বাবাকে দেখতে গিয়েছিলেন হযরত আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর বাবা তখন সিতাপুর জিলার হারগাম শহরে বসবাস করতেন। চৌদ্দ বছরের এই সাধনার ফলে নিজের পীরের নিকট থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হোন তিনি।

ইলাহাবাদ থেকে বিদায় হয়ে হযরত আকবরাবাদী প্রথমে আমরুহা যেয়ে কিছুদিন বসবাস করেন। তবে তিনি ছিলেন ভ্রমণবিলাসী। সর্বদা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সফরে থাকতেন ও দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিতেন। আমরুহাবাসীর অনুরোধে তিনি সেখানে কিছুদিন স্থিত ছিলেন মাত্র। এরপর আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আকবরাবাদে চলে যান। তিনি এখানে একটি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য মাঝে মধ্যে আমরুহাবাসীদের অনুরোধে সেখানেও যাওয়া-আসা করতেন। শেষ বয়সে তিনি স্থায়ীভাবে আমরুহায় বসবাস করেন।

আওরঙ্গজেবের নিকট অভিযোগ ও দেশ থেকে বহিষ্কার

হযরত আকবরাবাদীর সময় মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব। কিছু হক্বপন্থী উলামা অথচ তাসাওউফের আসল মর্ম সম্পর্কে অনবহিত এবং খাস করে ওলিদের বিরুদ্ধে সর্বদাই একদল বাহ্যিক আলিম দুশমনী করে আসছেন। আর

বিশেষ করে কোনো ওলির জনপ্রিয়তা তাদেরকে সম্পূর্ণ ধৈর্যহারা করে বসে। হিংসা-বিদ্বেষে তারা মেতে ওঠেন। কিভাবে এই ব্যক্তিকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়- এটাই হয়ে ওঠে তাদের চিন্তা-ফিকিরের কেন্দ্রবিন্দু। সেমতে সম্রাট আওরঙ্গজেব যিনি আসলে খুব উচ্চপর্যায়ের ইবাদতগুজার, পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর নিকট ঐসব হিংসাতুর আলিমরা যেয়ে অভিযোগ করলো। এই মিথ্যা অভিযোগের উপর ভিত্তি করে আওরঙ্গজেব হযরত আকবরাবাদীকে হারামাইন শরীফাইনে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং ১০৯০ হিজরি সনে তিনি সস্ত্রিক হারামাইন শরীফাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

দীর্ঘ ৫ বছর মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনুওয়ারায় তিনি অবস্থান করেন। এসময় তাঁর দু'জন সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত শাহ মুহাম্মদ মক্কী ও শাহ মুহাম্মদ মাদানীর জন্ম হয়। নাম থেকেই বুঝাচ্ছে এই দু'জনের কে কোথায় জন্ম নিয়েছিলেন। হযরত যখন ভারতে ফিরে আসলেন তখন তাঁর দুশমনরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠলো। তাঁর এই আগমন তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতাসহ জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করলো। সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজের দরবারের ব্যক্তিদের প্রতি বেশী আস্থাবান থাকায় এসব মিথ্যা অভিযোগকে সত্য মনে করে যুগের এই শ্রেষ্ঠ ওলিকে শেষ জীবনে আওরঙ্গবাদে বন্ধী করে জেলে প্রেরণ করেন। আর কয়েদী অবস্থায়ই তিনি এই পাপে কলুষিত মাটির ধরা থেকে বিদায় হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

ওফাত

হযরত শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১১০৭ হিজরির ৩ রজব মৃত্যুবরণ করেন। আগ্রার মতি কাটরাহ নামক মহল্লায় তাঁর সমাধি অবস্থিত। হযরতের খলিফাদের মধ্যে স্বীয় পুত্র মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি শাহ অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খিলাফত প্রদান করেছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। সুতরাং পরবর্তীতে মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে হযরত অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা করবো।

পরিচ্ছেদ ৭

হযরত শায়খ মুহাম্মদ মক্কী জাফরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: অজ্ঞাত)

তাঁর মুর্শিদ ছিলেন স্বীয় পিতা শাহ সৈয়দ মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সায়্যিদ বংশের এই মহাত্মনের জন্ম হয় মক্কা মুয়াজ্জমায়। সুতরাং তিনি মুহাম্মদ মক্কী নামেও পরিচিত। চিশতিয়া-সাবিরিয়া শাজারা মুবারকে তাঁর নাম শাহ অইযদুদ্দীন আমরুহী ও শাহ সৈয়দ মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মাঝখানে দেখতে পাওয়া যায়। আমরাও সে হিসাবে তাঁর জীবন ও হালতের উপর যেটুকু সম্ভব আলোচনা করছি। তবে তাঁর খলিফা হযরত অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'মাক্বাদিসুস সাদিক্বীন' কিতাবে নিজের খিলাফত সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন: আমি সরাসরি হযরত সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেছি। এ তথ্যটি অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থ দ্বারাও প্রমাণিত।

হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তা'লিমুদ্দীন' কিতাবে বলেন: "এ ক্ষেত্রে এসে আমাদের শাজারার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনোটিতে দেখতে পাওয়া যায়, মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম শাহ মুহাম্মদ হামিদ শাহ ও শাহ অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাঝখানে লিপিবদ্ধ আছে। আবার কোনো কোনো শাজারায় শুধুমাত্র শাহ হামিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম লিপিবদ্ধ আছে। ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত, শাহ অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে সরাসরি খিলাফত লাভ করেছিলেন। এতে বুঝা যায় গ্রহণযোগ্য শাজারায় এই উভয় মাশাইখের মাঝখানে অপর কেউ নেই।"

'নুখবাতুল তাওয়ারিখ আমরুহী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শাহ মুহাম্মদী এবং শাহ মুহাম্মদ হামিদ দু' ভ্রাতা ছিলেন। শাহ হামিদ তাঁর ভাই শাহ মুহাম্মদীর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। আর শাহ মুহাম্মদীর দু'জন ছেলে সন্তান ছিলেন। উভয়ের জন্ম হয় হারামাইন শরীফাইনে। এরা হচ্ছেন, শাহ মুহাম্মদ মক্কী এবং রওশান মুহাম্মদ মাদানী। এই উভয় ভ্রাতা তাঁদের পিতার নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন।

শাহ হামিদের এক পুত্র ছিলেন। তাঁর নামই হলো শাহ অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি হযরত শাহ মুহাম্মদী তথা নিজের চাচার খলিফা ছিলেন। এছাড়া স্বীয় পিতার নিকট থেকেও ফায়েজ লাভ করেন। সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল শাহ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শাহ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যথাক্রমে মুর্শিদ ও খলিফা। মাঝখানে আর কেউ নেই।

এরপরও আমরা বলতে চাচ্ছি যে, শাজারায় মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম উল্লেখ থাকলে ফায়েজ ও বরকত লাভ হবে। কারণ শাহ অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সরাসরি শাহ মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা ছিলেন, কথাটি সঠিক হলেও, তাঁর রূহানী উন্নয়নে চাচাতো ভাই শাহ মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকেও অনেক ফায়দা লাভ করেন।

হযরত শাহ মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় নি। কোনো কোনো শাজারায় শুধুমাত্র ১১ রজব লিখিত আছে। এছাড়া তাঁর নামও কেউ কেউ 'সা'দ মুহাম্মদ মক্কী' লিখেছেন। যা হোক, এ সম্পর্কে আর অতিরিক্ত বর্ণনা দিয়ে বিষয়টিকে জটিল করে তোলার আদৌ ইচ্ছে নেই! এবার আমরা শাজারা মুবারকে উল্লেখিত পরবর্তী চিশতি মাশাইখের উপর আলোচনা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ৮

হযরত শায়খ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ২৭ রজব ১১৭২ হিজরি, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত।)

হযরতের নামের উপর কিছুটা মতানৈক্য আছে। কেউ লিখেছেন, সায়্যিদ ইযযুদ্দীন, অন্যরা লিখেছেন আদ্বদুদ্দীন। সায়্যিদ বংশের গৌরব এই মহাত্মনের পিতার নাম ছিলো শাহ হামিদ বিন শাইখ ঈসা হারগামী। হারগাম ছিলো তাঁর পূর্বপুরুষদের বাসস্থান।

হযরতের পিতা শাহ হামিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০৭৩ হিজরি সনে আমরুহা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আর এই আমরুহা শহরেই হযরত শাহ অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০৭৭ হিজরির ২৪ রজব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামের শেষে 'আমরুহী' শব্দটি এজন্যই লিখা থাকে। প্রাথমিক জীবনে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ সদন গ্রহণ করেন। ছোট থেকেই তাঁর মধ্যে অত্যাশ্চর্য তাক্বওয়াহ ও জুহদের গুণাবলী ফুটে উঠেছিল। কোনো শাসকের নিকট থেকে কখনো হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। যখন তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এবং শাসকশ্রেণীর অনেকেই বড় অঙ্কের টাকা-কড়ি হাদিয়া হিসাবে তাঁর নিকট পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তা গ্রহণ করতেন না।

যোগীর পরশপাথর

এক হিন্দু যোগী হযরত অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই খানক্বায় এসে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। যোগী একদা একখণ্ড 'পরশপাথর' হাদিয়া হিসাবে নিয়ে আসলেন। কিন্তু হযরত আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। যোগী ছিলেন

নাছোড়বান্দা। তিনি এই মূল্যবান পাথরটি তাঁকে উপহার দেবেন-ই। অবশেষে হযরত তা গ্রহণ করলেন এবং খানক্বার একটি শেলফে রেখে দিলেন। বেশ কিছুদিন চলে গেলো। ঐ যোগী আরেকবার হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমরুহা আসলেন। খানক্বায় ঢুকে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, ঠিক যে স্থানে অনেক দিন পূর্বে তাঁর প্রদানকৃত পরশপাথরটি হযরত আমরুহী রেখেছিলেন সে-ই স্থানেই তা এখনও আছে। ইতোমধ্যে এর গায়ে লেগে গেছে প্রচুর পরিমাণ ধূলোবালি! যোগী প্রশ্ন করলেন, "হযরত! আপনি এই পাথরখণ্ড কাজে লাগান নি কেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "কোনো প্রয়োজন পড়ে নি। আমার কাছে তো এর থেকেও মহামূল্যবান পরশপাথর আছে!"

যোগী কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তাই বুঝি! ঐ পরশপাথরটি কি, হযরত?"

হযরত বললেন, "এটির নাম হলো কানা'আত (অল্পেতুষ্টি)।"

সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত

সে যুগে সংস্কৃত ভাষার কদর ছিলো অনেক বেশী। আরবী ও উর্দু ভাষার উপর পূর্ণ আয়ত্ব লাভের পর হযরত অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভারতের এই প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। বেশ চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট সহ্য করেও তিনি সংস্কৃতের উপর পাণ্ডিত্য লাভ করলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন।

স্বপ্নের তাবির

স্বপ্নের তাবির করা একটি শিল্প বলা চলে। তবে এই শিল্প মূলত বান্দার প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহ। কিছুটা কিতাবাদি এবং ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা পাঠ করে শেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবে সব স্বপ্নের তাবির সবাই করতে পারেন না। হযরত আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায় সকল ধরনের স্বপ্নের তাবির করতে পারতেন। স্বপ্নের তাবির কিভাবে করা যায় তা শেখার জন্য একব্যক্তি তাঁকে অনুরোধ জানালো। তিনি জবাব দিলেন, "বাবা! এটা শেখা তো

কঠিন। আসলে সকল স্বপ্নের তাবির করা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, যার ‘কাশফ’ হয় তার কথা ভিন্ন। ‘সাহেবে কাশফ’ ব্যক্তির জন্য স্বপ্নের তাবির অনেকটা সহজ।” উল্লেখ্য, হযরত আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুব ঘন ঘন কাশফ হতো।

আগেই উল্লেখ করেছি, হযরত অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ‘মাক্বাদিসুল আরিফীন’ নামক তাঁর রচিত কিতাবখানা খুব মূল্যবান। হিজরি ১১২৪ সালে তিনি এটা প্রণয়ন করেন। এই কিতাবে আক্বাঈদ ও সুলুকের উপর বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মৃত্যুবরণ

হযরত শাহ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রজব মাসের ২৭ তারিখ এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুর সন ১১৭০ কিংবা ১১৭২ হিজরি বলে ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখিত আছে। তবে তিনি দীর্ঘ হায়াতে তায়্যিবাহ লাভ করেন। প্রায় ১০০ বছর ইলমে তাসাওউফের খিদমাত এবং অসংখ্য মানুষকে ফুয়ুজ প্রদান করে গেছেন। আমরুহা জামে মসজিদের নিকটে তিনি সমাহিত আছেন।

পরিচ্ছেদ ৯

হযরত শায়খ আব্দুল হাদী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৪ রামাদ্বান ১১৯০ হিজরি, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত।)

তিনি ছিলেন হযরত অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলিফা। সিদ্দীক বংশে তাঁর জন্ম। আমরুহার খারিশিয়্যান মহল্লায় ১০৮৪ হিজরির ১৪ রজব বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ মুহাম্মদ হাফিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শাহ মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ

মাত্র চারটি বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন শিশু আবদুল হাদী। বাড়িতে এক মহান মেহমান আসলেন। তিনি ছিলেন যুগের শাইখুল মাশাইখ বয়োবৃদ্ধ শাহ মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর চোখ দু'টোতে বয়সের ভারে পর্দা পড়ে গেছে। দেখতে অসুবিধা হয়। নামাযের সময় সন্নিকটে। কোন্দিকে কিবলা তা নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এরপরও আন্দাজ করে একদিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। শিশু আবদুল হাদী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ধরে সঠিক কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। নামায শেষে হযরত মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখনও পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আবদুল হাদীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "একদিন এই বাচ্চা জাতির কর্ণধার হবে! সে মানুষকে দ্বীনের সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবে।"

উল্লেখ্য হযরত মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানী দাদাপীর। অর্থাৎ হযরত অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ ও

খলিফা। হযরতের উক্ত মন্তব্য বিফলে যায় নি। আল্লাহ পাক তাঁর ওলির মনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছেন। পরিণত বয়সে এই শিশু আবদুল হাদী সত্যিই চিশতিয়া তরীকার এক নক্ষত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অসংখ্য মানুষ রূহানী ফায়দা লাভে ধন্য হয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সঠিক সীরাতুল মুস্তাক্বিম।

মক্তবে লেখাপড়া ও মজযূবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

হযরত মুহাম্মদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিদায় হওয়ার মাত্র ক'দিন পরই আবদুল হাদীর মাতা তাঁর এই আদুরে সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য স্থানীয় মক্তবে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ফার্সি ভাষার মৌলিক কিতাবগুলো পাঠ করে নেন। একদিন ক্লাসকক্ষ থেকে তাঁর শিক্ষক বেরিয়ে গেছেন। ঠিক এ সময় দেখতে অনেকটা ভয়ঙ্কর ধরনের, এক ভিক্ষুক কক্ষে ঢুকে পড়লো! ছেলেরা পাগল মনে করে ছুটে পালালো। কিন্তু আবদুল হাদী বসে রইলেন। মজযূব তাঁর পাশে এসে মুখ থেকে কি একটা বের করলো। আবদুল হাদীকে বললো, “হাঁ করো!” তিনি হাঁ করলেন। মজযূব ঐ জিনিসটি তাঁর মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, “খাও!”। কিছুটা ভয় হেতু আবদুল হাদী তার কথা মেনে নিলেন। তিনি ঐ বস্তুটি গিলে ফেললেন। এরপর ভিক্ষুক চলে গেল।

আবদুল হাদীর মধ্যে মানসিক পরিবর্তন এসে গেল। তিনি মানুষের সঙ্গে থাকতে পারলেন না। সুতরাং এই অল্প বয়সেই চলে যেতেন জঙ্গলে। ধীরে ধীরে এমন হলো যে, দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ও চিন্তা-ফিকির করতেন।

‘ইয়াতীম শাহ মজযূবে’র সঙ্গে সাক্ষাৎ

আমরুহা শহরের অদূরে ছোট্ট এক জঙ্গলে বাস করতেন ইয়াতীম শাহ নামক এক মজযূব। আবদুল হাদী একদা ঘুরে ঘুরে ঐ জঙ্গলে যেয়ে পৌঁছলেন। তখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন মাত্র। তিনি দেখতে পেলেন সেখানে একটি গাছের নীচে

ইয়াতীম শাহ বসে আছেন। তিনি আবদুল হাদীকে কাছে ডেকে নিলেন। বললেন, "বাবা! আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমার সাথে থাকার জন্য!" একথা শুনে আবদুল হাদীর মনে প্রতিক্রিয়া হলো। ভাবলেন, নিশ্চয় এতে আমার লাভ হবে। সুতরাং কোনো প্রশ্ন না করে মজযূবের সঙ্গে থেকে যেতে রাজী হয়ে গেলেন।

বেশ কিছুদিন উভয়ে জনমানবহীন গভীর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। ইয়াতীম শাহের নিকট থেকে হযরত আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমে তরীকাতের বিভিন্ন দিক শিখতে লাগলেন। ইলমে তাসাওউফ তথা খোদাপ্রাপ্তির উপায়-অবলম্বন সম্পর্কে অনেককিছু জানতে সক্ষম হলেন। একদা মজযূব ইয়াতীম শাহ বললেন, "বাবা! মা'রিফাত বই-পুস্তক পাঠ বা কারো নিকট থেকে জেনে লাভ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একজন কামিল শায়খের। আমারও একজন মুর্শিদ ছিলেন যাঁর সিলসিলা শাইখুল মাশাইখ হযরত নিযামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছেছে। আর এই সিলসিলা অবশ্য চিশতিয়া-সাবিরিয়া সিলসিলা। আমার মনে হয় মুর্শিদ হিসাবে এ যুগে হযরত অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো যোগ্য আর কেউ নেই। তুমি তাঁকে মুর্শিদ হিসাবে গ্রহণ করলে খুব লাভ হবে। চলে যাও, তাঁর দরবারে।" সুতরাং মজযূব ইয়াতীম শাহের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি চলে গেলেন আমরুহায়। চিশতিয়া তরীকার শাইখ হযরত অইযদুদ্দীন আমরুহীর খানক্বায় যেয়ে হযরতের নিকট আরজ করলেন, "হুজুর! এই অধমকে মুরীদ ও খাদিম হিসাবে গ্রহণ করুন!"

পীরের নিকট দু'আর আবদার

একদা খাদিম হিসাবে হযরত আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীর হযরত অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পা টিপে দিচ্ছিলেন। কোনো এক মুহূর্তে সাহস করে একটি দু'আর আবদার করলেন। বললেন, "হযরত! একটা আবদার ছিলো। কিন্তু কিভাবে ...?" পীর সাহেব বললেন, "আরে থামলে কেনো? কি বলতে চাও বলো।" আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আমার মধ্যে অহংবোধ খুব বেশী। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে এই রূহানী রোগ থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাকে রেহাই দিন।"

একথা শুনে হযরত অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুটা তিরস্কারের সুরে বললেন, "আহ্! আবদুল হাদী, তুমি নিজেকে অনেক ধরনের সম্পর্ক দ্বারা দায়ভুক্ত ও দায়িত্বশীল করে নিয়েছো। অথচ, তোমার ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের মতো হবে?"

কথাটি হযরত আবদুল হাদীকে ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত করলো। কিন্তু পীর সাহেবের কথাই তো ঠিক। তাই তিনি দৃঢ়-কণ্ঠে বললেন, "হযরত! আমার ইচ্ছা তা মোটেই নয় বরং আপনার কুকুরটির মতো হতে চাই!" এই উত্তর শুনে তাঁর পীরসাহেব নিজের ভবিষ্যৎ প্রধান খলিফার প্রতি বেশ আনন্দিত হলেন।

খিলাফত লাভ

আমরা ইতোমধ্যে ৭ ধরনের খিলাফতের কথা উল্লেখ করেছি। বাস্তবে সত্যিকার আল্লাহ অন্বেষী মুরীদ খিলাফত লাভের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেন না। আসলে তো এ রাস্তার পথিক হওয়ার উদ্দেশ্য খিলাফত লাভ নয়। তবে ইলমে তাসাওউফের খিদমাতকে সঠিকভাবে প্রজনন থেকে প্রজনন পর্যন্ত আঞ্জাম দিতে যেয়ে 'খলিফা' প্রথার প্রবর্তন করেছেন তরীকতের মাশাইখবৃন্দ। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক বিশিষ্ট মুরীদ, তরীকতের রাস্তায় উচ্চ মাক্বামের অধিকারী হয়েও পীর সাহেবের খলিফা হন নি- বা খিলাফতি দেওয়া হয় নি। এর অর্থ কিন্তু এটা নয় যে, খলিফা না হওয়ার কারণে এই ব্যক্তি মা'রিফাত হাসিল করেন নি। ইতিহাস ঘাটালে দেখা যায় অনেক দরবেশ, ওলি, মজযূব ইলাল্লাহ ছিলেন যাদের সঙ্গ লাভ বা এমনকি এক মুহূর্তের সাক্ষাৎ থেকে অনেকে খিলাফতপ্রাপ্ত তরীকতের শাইখুল মাশাইখের স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

যা হোক, হযরত অইযদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন প্রিয় মুরীদ আবদুল হাদীকে খিলাফত প্রদানের ঐশি ইশারা লাভ করলেন তখন তাঁকে কাছে ডেকে এনে পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ-সহ চিশতিয়া তরীকার খিলাফতি প্রদান করলেন। তাঁর অন্তরইসমে আজমের ঐশি নূরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাক্বামে মাকছূদে পৌঁছে দিলেন। পীরের নির্দেশে তিনি আমরুহায় থেকেই ইলমে তাসাওউফের খিদমাত আঞ্জাম দিতে লাগলেন।

সাহেবে কাশফ

যাদের অন্তরচক্ষু খোলা তাঁদেরকে 'সাহেবে কাশফ' বলা যায়। তবে অন্তরের চোখ এমনিতেই খোলে না। শত বছর বই-পুস্তক পাঠ করেও কিন্তু 'সাহেবে কাশফ' হতে পারবেন না। এই কাশফ বা উন্মুক্ত হৃদয় নেত্র ভিন্ন। তরীকতের মাশাইখরা কাশফের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আমার মুর্শিদ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা লন্ডন শহরে এক মাহফিলে দু'আ করবেন। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর চোখদ্বয় বন্ধ। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললেন, "আপনাদের প্রায় সকলেই টেলিভিশন দেখেছেন, নিশ্চয়। আমি দেখি নি। টেলিভিশনে যেভাবে ছবি দেখা যায়, ঠিক তদ্রূপ অন্তরের চোখে ছবি ভেসে আসে। মনে রাখবেন এটাকে বলে 'কাশফ'। কও, কাশফ!" আমি শ্রোতা হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভাবলাম, হঠাৎ করে 'কাশফ' এর উপর এই কথাগুলো তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসার কারণ কি? যা হোক, এদিনই এক দাওয়াত খেতে যেয়ে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হলো। আমি এই সুযোগে হযরতকে প্রশ্ন করলাম, "শেখ সাহেব! কাশফ অর্থ কি?" তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর জিকির পড়তে পড়তে অন্তরের চোখ খোলে যায়- আর তা দিয়ে অনেক কিছু দেখা সম্ভব হয়- এটার নামই কাশফ"। কী সুন্দর, সহজ-সরল সংজ্ঞা!

আমাদের আলোচিত শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও কাশফওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর কাশফের একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো। মানুষ তাঁর কাছে যেয়ে যা কিছু ভাবতো তা তিনি কাশফের মাধ্যমে দেখে নিতে পারতেন। সুতরাং অনেক সময় দেখা যেতো কেউ কিছু বলার পূর্বেই হযরত মানুষের মনের ইচ্ছা কী, তা অগ্রেই জানিয়ে দিতেন। অবশ্য এরূপ কাশফ হওয়া কামালতির প্রমাণ নয়। কাশফ, কারামত ও ইলহাম কামালিয়াতের প্রমাণ কখনো নয়।

একাকীত্ব বর্জনের নির্দেশ

আগেই বলেছি হযরত আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্জনতা পছন্দ করতেন। এমনকি শহর থেকে খুব দূরে গভীর জঙ্গলে চলে যেতেন নিজেকে মানুষের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখতে। খিলাফত লাভের পরও তিনি এ অভ্যাস ছাড়েন নি। কিন্তু একদা এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন।

তিনি তখন আমরুহা থেকে অনেক দূরে গভীর অরণ্যে ধ্যানমগ্ন। এক পর্যায়ে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। চোখে ভেসে এলো সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামান্নিবিয়্যীন রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাস্যোজ্জ্বল পবিত্র মুখাবয়ব। হযরত আবদুল হাদী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবেগ-আপ্লুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানে। কাছে এসে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আবদুল হাদী! তোমাকে যে ইলম ও বরকত আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন তা থেকে জীবিত মানুষদেরকে বঞ্চিত করো না।" হযরতের তন্দ্রার অবসান ঘটলো। তিনি এই নির্দেশ পেয়ে প্রথমে 'বারাহ' নামক এক স্থানে যেয়ে বসবাস শুরু করলেন। তিনি অন্যান্য স্থানেও ভ্রমণ করতেন। মানুষ তাঁর দরবারে আসতে শুরু করলো। তাঁর সান্নিধ্য ও ফুয়ূজ থেকে উপকৃত হতে লাগলো। ইতোমধ্যে আমরুহা গমনাগমন অনেকটা হ্রাস পেল। অনেক লোক হযরতের মুরীদ হলেন। পরবর্তীতে তিনি অনেক খলিফাও রেখে যান।

অবশেষে হযরতের নিকটবন্ধু কাজি শাইখুল ইসলাম এবং অন্যান্যদের অনুরোধে তিনি বারলি শহরে চলে আসেন। এখানকার খাইখিরাহ নামক মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ইন্তিকাল

খাইখিরায় বসবাস শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেল। তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন, পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের সময় এসে গেছে। আল্লাহর ধ্যানে তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগলেন। অবশেষে পবিত্র রমজান মাসের ৪ তারিখ শুক্রবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাঁর মৃত্যুর হিজরি সন ছিলো **১১৯০**। আমরুহা শহরের শায়খ জুহুরুল্লাহ সিদ্দিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাগানে তিনি সমাহিত আছেন। তাঁর প্রধান খলিফার নাম হযরত শাহ আবদুল বারী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং আমরা এখন তাঁরই জীবন ও হালতের উপর বর্ণনা তুল ধরবো ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ১০

হযরত শায়খ আব্দুল বারী সিদ্দিকী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ১১ শা'বান ১২২৬ হিজরি, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত।)

শাহ আবদুল হাদী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি ও খলিফা ছিলেন হযরত শাহ আব্দুল বারী সিদ্দিকী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর পিতারনাম ছিলো শায়খ জুহুরুল্লাহ সিদ্দিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত আবদুল বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দুই ভাইয়ের মধ্যে শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ছিলেন। উভয়েই তাঁদের দাদা হযরত আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলেন। দুর্বলতা হেতু আবদুল বারীকে মুজাহাদার ক্ষেত্রে পীর সাহেব কিছুটা ছাড় দিতেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি তাঁর দাদা ও পীরসাহেব হযরত আবদুল হাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায় প্রবেশ করেন। পীরের নির্দেশে তিনি খুব দামী কাপড় পরিধান করতেন। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে 'ফকিরী' অবলম্বনেরও তাগিদ দিতেন। এতে তাঁর মধ্যে 'ঐশী প্রেম' প্রবল হয়ে ওঠে। এভাবে তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণের নির্দেশ-দান ছিলো পীরের পক্ষ থেকে রূহানী চিকিৎসার একটি পদ্ধতি। কোন্ মুরীদকে কিভাবে রূহানী চিকিৎসা প্রদান দরকার তা অবশ্যই পীর সাহেব অবগত আছেন। সুতরাং এখানে কোনো ভুল-বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। মাকামে মাকসুদে পৌঁছানোর জন্য মুর্শিদ মুরীদকে যে কোনো শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দিতে পারেন।

হযরত আবদুল বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই ছোট বয়স থেকেই খুব বেশী রোযা রাখা শুরু করেন। স্বীয় মুর্শিদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হযরতের সান্নিধ্যে থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হন। মুর্শিদের প্রধান খলিফা হিসাবে আজীবন ধরার জমিনকে চিশতিয়া-সাবিরিয়া সিলসিলার সিক্ত রূহানী পানীয় দ্বারা সজীব রাখেন।

হযরতের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় নি। তবে তাঁর প্রধান খলিফা ছিলেন ভারতের এক উজ্জ্বল রূহানী রাহবার হযরত শাহ আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা একটু পরই তাঁর জীবন ও হালতের উপর আলোচনা করবো।

পরপারে ভ্রমণ

আমাদের জীবনটা ইহলোকে সংক্ষিপ্ত মুসাফিরী বৈ কিছু নয়। কিছুদিনের জন্য এখানে আমাদের আগমন। উদ্দেশ্য পরকালের অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি নিশ্চিতকরণে সঠিক পাথেয় সংগ্রহ। আর সঠিক পাথেয় সংগ্রহের পূর্বশর্ত হলো এই মুসাফিরীর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র মা'বুদ মহান আল্লাহ তা'আলার গোলামীতে কাটিয়ে দেওয়া। কারণ তিনি বলেছেন, আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ ইহলোকে সে একমাত্র আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো কিছু করবে না- যা আমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এককথায়, এখানের মুসাফিরী জীবন শুধুমাত্র 'আল্লাহকে রাজী' করার নিমিত্তে অতিবাহিত হবে। আর এ ক্ষেত্রে বান্দাদের মধ্যে প্রভুর নৈকট্যশীলতার স্তর আছে। আল্লাহর একান্ত আপনজনরা হলেন তাঁর বন্ধুজন। পরিভাষায় আমরা এসব সৌভাগ্যবান মহাত্মনকে 'আওলিয়া', 'দরবেশ', 'শায়খ', 'পীর', 'মুর্শিদ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে থাকি। আর এরাই হচ্ছেন নবী-রাসূলদের পরের স্তরের নৈকট্যশীল বান্দা।

যা হোক, উপরোক্ত উচ্চস্তরের নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহ আবদুল বারী সিদ্দিকী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুসাফিরী এই ইহলৌকিক জিন্দেগীর অবসান ঘটে ১১ শা'বান ১২২৬ হিজরিতে। দিনটি ছিলো জুমু'আ বার। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাঁর এক পুত্রসন্তান ছিলেন। নাম ছিলো শায়খ রাহমান বকশ। হযরত মোট সাতজন খলিফা রেখে যান। আমরা ইতোমধ্যে শাহ আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা উল্লেখ করেছি। বাকী ছ'জন হলেন: সায়্যিদ হাতিম আলী শাহ, হাজী খাইরুদ্দীন, হাফিজ কুলান শাহ, শায়খ মুহাম্মদ মুনীর, শায়খ আমীনুল্লাহ এবং হাফিজ আবদুল করীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

পরিচ্ছেদ ১১

হযরত শায়খ হাজী আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ২৭ জিলকদ ১২৪৬ হিজরি, সমাধি: পানজার।)

তাঁর জন্ম হয় আফগানিস্তানে। তখনকার যুগের একটি সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ বংশের সন্তান হয়েও ইলমে মা'রিফাতের সন্ধানে আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। ভারতবর্ষে তরীকতের শায়খদের তাসাওউফ তৎপরতা সর্বত্র বিরাজমান ছিলো। তবে হযরত আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মন প্রথমত কাদিরিয়া সিলসিলার প্রতি ঝুঁকে পড়লো। তিনি ছুটে গেলেন সে যুগের কাদিরিয়া তরীকার শায়খ শাহ রহম আলী সাদরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে। বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর মাক্বামে মাকছুদে উপনীত হলেন। কিন্তু এরপরও কেনো যেনো তিনি অতৃপ্ত রয়ে গেলেন। অন্তরের মধ্যে ইলমে মা'রিফাতের প্রচণ্ড পিপাসা তখনো তাঁকে চাঞ্চল্যতার মধ্যে রেখে দিল।

শাহ আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভাবলেন, হয়তো অপর কোনো তরীকায় জিকির-শুগুল এবং মুরাক্বাবা দ্বারা তাঁর দিলের হাহাকারের অবসান ঘটবে। সুতরাং তিনি ছুটে গেলেন যুগের শ্রেষ্ঠ চিশতি শায়খ হযরত শাহ আবদুল বারী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে। তাঁর হাতে তরীকতের বাইআত গ্রহণ করে দীর্ঘদিন জিকির-মুরাক্বাবায় কাটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত চিশতি সিলসিলায়ও তিনি শায়খ আবদুল বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে খিলাফত লাভ করলেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

খ্রিস্টীয় ১৮১৯ সালে হযরত গাজি ফিল্লাহ মাওলানা আহমদ শহীদ বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শত শত জিহাদী কাফেলাসহ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে

হিজাযে গমন করেন। দীর্ঘ ৪ বছর পর পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি **১২** হাজার মুজাহিদের এক শক্তিশালী দলসহ **১৮২৬** সালে রায়বেরিলী ত্যাগ করেন। এসময় তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন হযরত আবদুর রহীম আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এটা ছিলো জিহাদের প্রতিশ্রুতির বাইআত। তবে উভয় বুজুর্গের মধ্যে রূহানী সম্পর্ক দিন দিন গাঢ় হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তারিখে দেওবন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে উক্ত ব্যাপারটি লিপিবদ্ধ করছি।

দু' তরীকায় সংমিশ্রণ সাধন

হযরত সাঈদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জিহাদী সফরকালে বুবনীর এক মসজিদে তাঁর সাথে হযরত আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ ঘটে। ইতোমধ্যে অবশ্য হযরত আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে হযরত আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিহাদের বাইআত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। যা হোক উভয় বুজুর্গ একটি আবদ্ধ কক্ষে ঢুকে পড়লেন। উভয়ের মধ্যে জযবের অবস্থা বিরাজ করছিলো। উল্লেখ্য হযরত সাঈদ সাহেব ছিলেন নকশবন্দিয়া তরীকার শায়খ আর অপরদিকে হযরত আবদুর রহীম ছিলেন চিশতিয়া তরীকার বুজুর্গ। চিশতিয়া তরীকার একটি বৈশিষ্ট্য হলো ইশকে ইলাহীর প্রতি অতি-আকর্ষণ। কাজেই এই তরীকাপন্থী শায়খদের মধ্যে জিকরে জলি, উচ্চতর হাল ও জযবের অবস্থার প্রকাশ পায়। অনেক-সময় দেখা যায় ইশকের প্রাবল্য হেতু তাঁরা নিজের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত ছিড়ে ফেলছেন। দেহের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড 'হারকাত' যা সময় সময় অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। অপরদিকে নকশবন্দিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্য হলো, জিকরে খফী, ভয়, আতঙ্ক, খোদাভীতি ইত্যাদি। প্রথমোক্ত হালকে 'গরম' ও দ্বিতীয়টিকে 'নরম' বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। ইলমে তাসাওউফের ক্ষেত্রে যখন 'গরমটি' অতিবেশী কোনো সালিকের মধ্যে প্রাবল্যতা বিস্তার করে ফেলে, তখন এই পথিককে সম্পূর্ণ মজযূব বা এমনকি পাগল করে দিতে পারে। অপরদিকে 'নরমের' প্রাবল্যতা হেতু সালিকের মধ্যে 'ইশকে ইলাহীর' বিকাশ সম্পূর্ণ স্তিমিত

হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাসাওউফের শিক্ষা হলো মধ্যম-পন্থাবলম্বন। অর্থাৎ সালিকের মধ্যে যেমন ইশকে ইলাহীর প্রচণ্ড পিপাসা বিস্তার লাভ করবে, তেমনি খোদাভীতি, ইবাদাত, পরহেজগারী, খওফ ইত্যাদি শরীয়তসম্মত গুণাবলীও বিরাজমান হবে।

যা হোক, উভয় বুজুর্গ বেশ কিছু সময় কক্ষে অবস্থানের পর বেরিয়ে আসলেন। সবাই লক্ষ্য করলো উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে। হযরত সাঈদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেহারায় ফুটে ওঠেছে স্মিত হাসির রেখা আর অপরদিকে হযরত আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেহারায় কান্নার ভাব, ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের ছাপ। ক্বারী তাইয়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই বাহ্যিক পরিবর্তনের কারণ ছিলো চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া তরীকার হাল বা অবস্থা উভয় বুজুর্গের মধ্যে বিস্তার লাভ করা। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একই সময় দু'টি তরীকার হালই বিরাজমান হয়। ফলে ভবিষ্যতের জন্য তরীকাদ্বয়ের মধ্যে এক স্থায়ী পরিবর্তন সাধন হয় যা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার পর থেকে নকশবন্দিয়া তরীকায় খোদাভীতি, জিকরে খফি, সুন্নাতে নববীর উপর অটল ইত্যাদি গুণাবলীর পাশাপাশি অনুপ্রবেশ করে ইশকে ইলাহী, আহাজারি, জিকরে জলি ও অধিক কান্নাকাটি ইত্যাদি। অনুরূপ চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীকায় নকশবন্দিয়া তরীকার হালও প্রবেশ করে। মোটকথা উভয় তরীকায় সংমিশ্রণ ঘটে। নরম ও গরমের সংমিশ্রণ হেতু এক অতিজরুরী সংস্কারসাধন হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এরূপ 'সংস্কার' প্রতি শত বছর পরপর একবার হয়ে থাকে।

যা হোক, হযরত আবদুর রহীম আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলিফা হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে এই নকশবন্দিয়া মিশ্রিত চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীকা পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে বাতিনী উত্তাপ-জ্বালা ও অন্তর্দাহের সাথে সাথে শরীয়তের আদব ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের দিকটিও প্রাধান্য লাভ করে। এই ব্যাপারটি হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যক্ত করতে যেয়ে বলতেন, "আমি এমন এক পাত্রভর্তি খাবার তৈরি করেছি, শত বছর পূর্বে যা তৈরি করা হয় নি এবং শত বছর পরেও তৈরি করা হবে না।" অর্থাৎ হযরত আবদুর রহীম আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

সুযোগ্য খলিফা এই মহাত্মন বুজুর্গের মাধ্যমেই নকশবন্দিয়া ও চিশতিয়া তরীকার মধ্যস্থ অবস্থাসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে পরবর্তীতে গোটা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছিল। আর এর সর্বপ্রধান ধারক, বাহক ও প্রসারলাভকারী মহান বুজুর্গের নাম হলো আরব ও আজমের যুগের শ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা অবশ্য হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও হালতের উপর আলোচনা শেষে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনকথা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

মুসাফিরী জিন্দেগীর চিরবসান

এই ধরার কোলে আমাদের আগমন কিছুদিনের মুসাফিরী জীবন মাত্র। কবে কোন্ সময় ফিরে যেতে হবে অনন্ত সেই স্থায়ী বাসস্থানের দিকে, তা কেউ জানে না। মুসাফিরী জিন্দেগীটা কিন্তু ঐ স্থায়ী ঠিকানা নির্ধারক সময়। সংক্ষিপ্ত এই সময়টুকু কিভাবে আমরা কাটিয়ে দিচ্ছি তার উপরই নির্ভর করবে চিরন্তন মুক্বিমী জীবনটি শান্তি না শাস্তিময় হবে। প্রভুকে রাজী-খুশী করে যেতে পারলে কামিয়াবী অন্যথায় ভীষণ বিপদ। যারা ক্ষণিকের এই মুসাফিরী জীবনকে প্রভুভক্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তারাই প্রভুর নৈকট্যশীল বান্দা হিসাবে ফিরে যাবেন তাঁর সান্নিধ্যে। এরাই হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'আলার সেই ঘোষণা:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ("আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি")-এর সত্যিকার ধারক-বাহক। এরাই হচ্ছেন সিদ্দীক, শহীদ, সালিহীন, ওলিআল্লাহ।

তরীকতের সংস্কারক, যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ হযরত শাইখুল হাজ্জ শহীদ আবদুর রহীম আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সার্থক মুসাফিরী জীবনের অবসান ঘটে ১২৪৬ হিজরির ২৭ জিলকদ। হযরত সাঈদ আহমদ শহীদ ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার সঙ্গে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তিনি পাঞ্জরের মুল্ক বিলায়াতে সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দারাজাতকে বুলন্দ করুন।

পরিচ্ছেদ ১২

হযরত শায়খ মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ৪ রামাদ্বান ১২৫৯ হিজরি, সমাধি: ঝানঝানা, মুজাফফরনগর, ভারত।)

ভারতের ঝানঝানায় হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২০১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো সায়্যিদ জামাল মুহাম্মদ আলাওয়ী। তিনি ছিলেন শাহ আবদুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধর। হযরত মিয়াজীর নবম ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন কাদিরিয়া তরীকার এই ওলিআল্লাহ।

হযরত সাঈদ আহমদ বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সহযোদ্ধা হযরত আবদুর রহীম আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ শিষ্য ও খলিফা ছিলেন হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নিজের রূহানী হালতকে গোপন রেখে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। থানাবনের নিকট লাহুরী নামক শহরে তিনি বসবাস করতেন। একটি মসজিদের ‘মিয়াসাব’ হিসাবে কর্মরত থেকে বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন।

ইবাদত

হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কঠোরভাবে সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে তিনি একবারও তাকবীরে উলার সঙ্গে জামাআতে নামায আদায় করা ত্যাগ করেন নি। খুব সতর্কতা অবলম্বন করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন, তাই প্রাথমিক জীবনে তাঁর আসল স্বরূপ কেউ জানতে পারে নি। অবশেষে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক স্বপ্ন তাঁর আসল পরিচিতি উন্মোচন করে। আমরা হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

জীবনালোচনায় এই স্বপ্নের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবে কিভাবে তিনি মিয়াজী সাহেবকে খুঁজে পেলেন সে কাহিনী এখানে তুলে ধরছি।

বিশিষ্ট মুরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নযোগে মিয়াজী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের ইঙ্গিত পেয়ে কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর এই কাঙ্ক্ষিত মুর্শিদকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত স্বীয় উস্তাদ হযরত মাওলানা কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপদেশে পায়ে হেঁটে লাহুরীতে পৌঁছেন। পায়দল এই দীর্ঘ ভ্রমণে তাঁর পা ফুলে ওঠে এবং ফেটে যায়।

লাহুরী পৌঁছে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সরাসরি মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মসজিদে চলে গেলেন। তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই প্রাণ-পুরুষের প্রতি প্রথম নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন, তিনিই তো সেই মহাপুরুষ যার চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন অনেক বছর পূর্বে। অশ্রুতে তাঁর চোখদু'টো সিক্ত হয়ে ওঠলো। তিনি ছুটে গেলেন মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। কদমবুসি করে জড়িয়ে ধরলেন। মিয়াজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “তোমার স্বপ্নের উপর কতটুকু আস্থা আছে বলো?”

হযরত ইমদাদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একথা শ্রবণ করে বুঝতে পারলেন স্বপ্নে-দেখা সেই মহাপুরুষ যে এব্যক্তিই তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তিনি তো জানেন না আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি- অথচ তিনি তা ব্যক্ত করে দিয়েছেন। এতো এক বিরাট কারামত। সুতরাং তিনি সাথে সাথে মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন।

জিহাদের ডাকে

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ হযরত আবদুর রহীম আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন হযরত

সাঈদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে। জিহাদী কাফিলায় যোগদানের নির্দেশসহ স্বীয় মুরীদ মিয়াজী সাহেবের নিকট তিনি একটি সংবাদবার্তা পাঠিয়ে দিলেন। এতে লিখিত ছিলো, শীঘ্রই তুমি হযরত সাঈদ আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে জিহাদের বাইআত গ্রহণ করো। ঝানঝানায় এই বার্তা পৌঁছার সময় মিয়াজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে একে পানি পান করাচ্ছিলেন। এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এসময় প্রকাশ পেল। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর এমন এক ভাবান্তরের সৃষ্টি হলো যে, এতে তিনি সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এদিকে ঘোড়ার মধ্যেও এর প্রভাব বিস্তার লাভ করলো। ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কালবিলম্ব না করে সাহারানপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে সাঈদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জিহাদী কাফিলা অবস্থান করছিলো। স্বীয় পীরসাহেব ও সাঈদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং জিহাদের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। কাফেলা যখন পাঞ্জাবের বালাকোটে পৌঁছুলো তখন হযরত আবদুর রহীম আমরুহী এবং সাঈদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হযরত নূর মুহাম্মদ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ঝানঝানায় ফিরে যাও। সুতরাং তিনি নির্দেশ মুতাবিক তখনই ঝানঝানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

জিহাদের ময়দান থেকে এভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ হিসাবে কেউ কেউ মন্তব্য করেন, নির্দেশদাতা উভয় বুজুর্গই শাহাদাতবরণ করেছিলেন। সম্ভবত মিয়াজী সাহেবের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আর এই নির্দেশের মূলে ছিলো 'ইলহামী জ্ঞান'।

বিভিন্ন ঘটনা

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব উঁচু মাপের কারামাতওয়ালা শায়খ ছিলেন। নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে এর প্রমাণ মিলে।

১. অগ্নিকাণ্ড: কোনো কারণবশত লাহুরীর পাঠান সম্প্রদায় হযরতের সঙ্গে অন্যায়ভাবে খারাপ ব্যবহার করে। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে লাহুরী ছেড়ে ঝানঝানায় চলে আসেন। ঐদিকে লাহুরী শহরের বিভিন্ন মহল্লায় অজানা কারণবশত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শুরু হলো। এতে মানুষের জান-মালের ক্ষতি হচ্ছিলো। কিন্তু কিছুতেই অগ্নিকাণ্ডের অবসান হলো না। স্থানীয় পাঠান সম্প্রদায় বুঝতে পারলো যে, হযরত ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তাদের অন্যায় আচরণের ফলেই হয়তো এই বিপদ পুরো শহরে পতিত হয়েছে। তারা ছুটে গেল তাঁর দরবারে। ক্ষমা প্রার্থনা করলো। লাহুরীতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। হযরত ফিরে গেলেন। যেদিন তিনি লাহুরীতে ফিরে আসলেন এদিন থেকেই অগ্নিকাণ্ডের অবসান ঘটলো।

কিছুদিন পর পাঠান সম্প্রদায় তাঁর দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হযরত! আপনি লাহুরী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কোন্ কারণে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছিল? তিনি জবাব দিলেন, "আমি চলে যাওয়ার পর লাহুরী এবং এর অধিবাসীদের প্রতি আমার মুহাব্বতের কথা স্মরণ হয়েছে মাত্র, আর কিছু নয়।"

২. বৃষ্টিপাত: লাহুরী অঞ্চলে বেশ কিছুদিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছিলো না। লোকজন ছুটে এলো হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে। হযরত তখন একখণ্ড ইক্ষু চিবিয়ে রস আহরণ করছিলেন। আগন্তুকদের মধ্যে একব্যক্তির সঙ্গে হযরতের গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি তাকে বললেন, "এই ইক্ষুখণ্ড যদি চিবিয়ে রস খাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হয়তো বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন।" লোকটি ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু অন্যরা বললো, "হযরতের নির্দেশ পালন করো! চুষো!" তিনি শেষ পর্যন্ত ইক্ষুখণ্ড মুখে দিয়ে চুষতে লাগলেন। আল্লাহর কী করুণা! সাথে সাথে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল।

৩. খামারে আগুন: কোনো এক সময় একটি খামারে আগুন ধরলো। হযরত নিকটস্থ কোথাও অবস্থান করছিলেন। খামারের মালিক ছুটে গেল হযরতের নিকট। বললো, হযরত! দু'আ করুন। আমার খামারটি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তিনি

নিজের মাথার টুপি খুলে মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এক্ষুণি ছুটে যাও। এই টুপি অগ্নিতে নিক্ষেপ করো!" খামারের মালিক ছুটে গেল এবং হযরতের নির্দেশ মুতাবিক টুপিটি অগ্নিতে ছুঁড়ে মারলো। সাথে সাথে আগুন নিভে গেল।

৪. অদৃশ্য হাতের কান ধরা: হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাজারে গেলে দোকানিরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতো এবং তাঁকে সালাম জানাতো। দোকানীদের মধ্যে প্রভাবশীল এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা কেনো এভাবে দাঁড়াবো? এরূপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে মতৈক্য সৃষ্টি করলেন। সুতরাং সবাই বললো, না, আমরা এভাবে আর দাঁড়াবো না।

পরদিন হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাজারে আসলেন। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, ঐ হিন্দু মহাজন সাহেবই তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন সবার আগে! এরপর একে একে অন্যান্য সকল হিন্দু-মুসলিম দোকানী দাঁড়ালেন। হযরত চলে যাওয়ার পর সকলে এসে ঐ প্রতিবাদী বাবুকে প্রশ্ন করলো, ব্যাপার কি? সবার পূর্বে আপনিই যে দাঁড়ালেন? তিনি জবাব দিলেন, "ভাইসব! দাঁড়ানো ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। হযরত আসার সাথে সাথেই এক অদৃশ্য হাত আমার কান ধরে টেনে আমাকে দাঁড় করিয়েছে!"

৫. মিয়ান সাহেবের জিকিরের অবস্থা: একদা কারনাল থেকে একজন আলিম এসে মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা শুনতে পাচ্ছি, মানুষ বলাবলি করছে জিকিরের সময় নাকি আউলিয়াদের দেহের বিভিন্ন অংশ আলাদা হয়ে পড়ে? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?"

হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন, "এটা সম্ভব। আমার মামা বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা হযরত মিয়ান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায় গিয়েছিলেন। খানক্বার দরজা বন্ধ ছিলো কিন্তু তালাবদ্ধ নয়। তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেলেন। হযরত মিয়ান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দেহের বিভিন্ন অংশ তথা হাত, পা, মাথা ইত্যাদি আলাদা

অবস্থায় আছে। ক্ষণকাল পরই হযরত মিয়ান সাহেবের অবস্থা স্বাভাবিক হলো। তিনি মামাকে বললেন, তুমি এইমাত্র যা দেখলে তা কারো নিকট বলবে না।”

৬. স্বর্ণের তৈরি দেওয়াল: এক সাধু হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এসে বললো, “মিয়াজী! আমার ব্যাগে একটি পরশপাথর আছে। আপনি গরীব লোক। এটা গ্রহণ করুণ। এর দ্বারা আপনি ধনী হতে পারবেন।” তিনি জবাব দিলেন, “আমার ধনের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার পরশপাথর আপনার কাছেই থাকুক।” কিন্তু এটা গ্রহণ করার জন্য সাধু বার বার তাকে তাগিদ দিতে থাকেন। উভয়ে যে স্থানে দাঁড়ানো ছিলেন সেখানে একটি পুরাতন দেওয়াল ছিল। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি মাটির ঢেলা হাতে তুলে সামনের ঐ দেওয়ালের উপর ছুঁড়ে মারলেন। এরপর বললেন, “সাধু! দেখুন তাকিয়ে!” সাধু অবাক হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ, সমস্ত দেওয়ালটি স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে! সাধু হযরতের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, “মিয়াজী! সত্যিই আপনি ধনী! এ পরশপাথর আপনার জন্য নয়।”

৭. হালের অবস্থা গোপন রাখা: আগেই বলেছি হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে খুব পারদর্শী ছিলেন। এ ব্যাপারে একটি অত্যাশ্চর্য অবস্থার কথা শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাইফিয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, “হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে দীর্ঘ ৬ মাসব্যাপী একটি রূহানী হালের আত্মপ্রকাশ করে। এই একই হালের অবস্থায় উপনীত হয়ে হযরত মানসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘আনাল হাক্ব’ শব্দদ্বয় উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত মিয়াজী এই হালের অবস্থাকে এমনভাবে নিজের অভ্যন্তরে গোপন করে রাখলেন যে, আপন লোমকূপগুলোও এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে নি। তিনি এই অবস্থায়ও বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষাদানসহ বাহ্যিক কাজকর্ম চালিয়ে গেলেন।”

৮. তাওয়াজ্জুর প্রভাব: কোনো একদিন একদল মুরীদ এসে হযরতকে আবদার জানালো, দয়াকরে আপনি আমাদের নফসের ইসলাহের ব্যবস্থা করুন। এসময়

হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফের পাঠদান করছিলেন। মুরীদানের অনুরোধে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাচ্চাদেরকে বললেন, তোমরা তিলাওয়াত করতে থাকো। আমি একটু আসি। এরপর আবেদনকারীদের নিয়ে একটি কক্ষে ঢুকে পড়লেন। দরোজা বন্ধ করা হলো। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে কাছে বসিয়ে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করতে লাগলেন। বাচ্চাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ছেলেটি ভাবলো, হযরত ঐ কক্ষে কি করছেন একটু দেখে নিই। সে কক্ষের দরজার চাবিছিদ্র দিয়ে ভেতরে দৃষ্টিপাত করলো। সবকিছু দেখার পর ফিরে এসে অন্যান্য বাচ্চাদের নিয়ে বসে পড়লো। বললো, উস্তাদ হুজুর সেখানে কি করছেন আমি তোমাদেরকে দেখাবো? তারা বললো, দেখাও। সে বললো, এসো, সবাই চোখ বন্ধ করে আমার সামনে বসো! সব বাচ্চা সামনে বসার পর সে নিজে মিয়াজী সাহেব বনে গেলো এবং অভিনয় করে তাওয়াজ্জুহ প্রদানের বাহ্যিক কাজ দেখাতে অগ্রসর হলো। কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেলো। সে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো।

পরিণত বয়সে তিনি বলেন, আমি যখন মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাওয়াজ্জুহ প্রদান অবলোকন করছিলাম তখন অনুভব করলাম জ্বলন্ত আগুন আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে ফেলছে! আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এরপর হঠাৎ সেই আগুনের প্রভাব মুছে গেল। আজও সে-ই ছোটবেলার অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে আমি মুক্ত হতে পারি নি। অন্ধকার রাতে ঘরের ভেতর, শীতের সময় কম্বলে আবৃত আমার মুখমণ্ডল- তথাপি আমি শুনতে পাই বাইরের নিম গাছের প্রতিটি পাতার কম্পন।

৯. মর্যাদা: হযরত ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর এক সাহেবে-কাশফ বুজুর্গ তাঁর কবর জিয়ারত করেন। পরে তিনি বললেন, "কোন্ যালিম তাঁকে এই স্থানে কবরস্থ করেছে? হযরত ইমাম সায়্যিদ মাহমুদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শ্রদ্ধাহেতু হযরতের নূরকে আটকে রেখে দিয়েছেন। তাঁকে যদি অন্যত্র কবর দেওয়া হতো তাহলে পুরো পৃথিবী তাঁর আনওয়ারের জ্যোতিতে নূরান্বিত হয়ে ওঠতো! ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে আমি তাঁর দেহ কবর থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে পুতে রাখতাম। এতে সকলে তাঁর নূর ও ফুয়ূজ দ্বারা উপকৃত হতো"।

জীবনের সায়াহ্নে

হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শেষ জীবনের বিভিন্ন অবস্থার কথা তাঁর সুযোগ্য খলিফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহিআলাইহি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জুমু'আর নামাযের প্রাক্কালে উপস্থিত মুসল্লিদেরকে নসিহত করেন। তাঁর বয়ান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, হয়তো তিনি অচিরেই এই মায়াবী ধরার কোল ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করবেন। সবাই কাঁদতে লাগলো। তারা হযরতকে বললো, "হযরত! আমরা ভেবেছিলাম আমাদের বাড়িতে মহামূল্যবান সম্পদ বিদ্যমান আছে, প্রয়োজনে তার দ্বারা সর্বদাই আমরা উপকৃত হবো।"

তিনি বললেন, "তোমাদের বাড়িতে আমার অনেক বন্ধুজন আছেন। এদেরকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনে করবেন।"

হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাফিজ মুহাম্মদ জামিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক জনসভায় খিলাফত প্রদান করলেন। এরপর অন্যান্যদেরকে খিলাফত প্রদানে ভূষিত করেন। কিছুদিন পর হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিজের জন্মস্থান ঝানঝানায় যাওয়ার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হয়ে ওঠলেন। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হযরতের ঘোড়ার গাড়িটি থানাবনের মসজিদের নিকট যেয়ে থামলো। আমি হযরতের সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি বললেন, "হে ইমদাদুল্লাহ! তুমি তো এখনও অবিবাহিত। হাফিজ জামিন সাহেব ও শায়খ মুহাম্মদ সাহেবের পরিবার আছেন। তোমাকে মুজাহাদা ও কষ্ট-সাধনার প্রতি ধাবিত করা আমরা ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার উপায় নেই। আখিরাতের ডাক এসে পড়েছে।" হযরতের কথাগুলো শ্রবণ করার সময় আমি ঘোড়ার গাড়ির উপর হেলান অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলাম। আমার চোখ দু'টো অশ্রুতে ভিজে গেল। কাঁদন দেখে হযরত আমাকে সান্ত্বনা দান করে বললেন, "ফকীরের মৃত্যু হয় না। তাকে এক জগত থেকে অন্য জগতে নিয়ে যাওয়া হয় মাত্র। এই ফকীর জীবন্ত থাকতে যেসব উপকার তোমরা লাভ করেছো, মৃত্যুর পর তার কবর থেকেও তা লাভ করবে।"

অবশেষে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরীদান ও শুভাকাক্সক্ষীদেরকে বিরহের সাগরে নিমজ্জিত করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাঁর মৃত্যু তারিখ ছিলো ৪ রামাদ্বান ১২৫৯ হিজরি। দিনটি ছিলো পবিত্র জুমু'আ বার। ওসিয়ত মুতাবিক তাঁকে ইমাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শহীদের সবুজ বাগানে সমাহিত করা হয়। ইন্তিকালের পর কিছু লোক তাঁর কবরের উপর উঁচু করে পাকার কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ স্বপ্নে দেখলো, এক বুজুর্গ এসে বলছেন এরূপ করা সুন্নাতের খেলাফ।

পরিচ্ছেদ ১৩

হযরত শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ১২ জুমাদাল উলা ১৩১৭ হিজরি, সমাধি: জান্নাতুল মা'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা।)

উপমহাদেশের উলামায়ে কিরাম শাইখুল মাশাইখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খুব বেশী শ্রদ্ধা করতেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের পীরসাহেব ছিলেন না, আরববিশ্বেও হযরতের পরিচিতি ব্যাপক ছিলো। বিশেষ করে শেষ বয়সে দীর্ঘদিন মক্কা মুয়াজ্জমায় থাকার ফলে অসংখ্য স্থানীয় মানুষ তাঁর সান্নিধ্য থেকে উপকৃত হন। অবশেষে পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা পবিত্র নগরী মক্কায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিখ্যাত কবরস্থান 'জান্নাতুল মা'ল্লা'য় হযরত ইমদাদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শায়িত আছেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৩৩ হিজরির ২২ সফর, মুতাবিক ১৮১৪ ঈসায়ী সনে ভারতের ইউ.পি.-এর সাহারানপুর জিলার অন্তর্গত নানুতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো মরহুম হাফিজ মুহাম্মদ আমীন। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন, ফলে তিনি "ফারুকী" উপাধিতেও ভূষিত হন। হযরত একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। যদিও শেষমেশ 'হাজী সাহেব হুজুর' বা 'মুহাজিরে মক্কী' হিসাবেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। জন্মের সময় তাঁর পিতা নাম রেখেছিলেন, ইমদাদ হুসাইন। এ নামটি সে যুগের খ্যাতিমান বুজুর্গ শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বদলে দিলেন। তিনি বললেন, তার নাম হবে ইমদাদুল্লাহ। এছাড়া হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেকে 'খোদাবকশ' (আল্লাহর দান) নামেও চিহ্নিত করতেন। কোনো কোনো জায়গায় তিনি 'আবদুল করীম' নামেও পরিচিত ছিলেন।

বেরলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। নিজের চোষা খারাব তার মুখে দিলেন। তখন ইমদাদুল্লাহ সাহেবের বয়স মাত্র ৩ বছর। হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অল্প বয়সে মাকে হারান। মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি ৭ বছরের ছেলে ছিলেন। তাঁর তিন ভাই ও এক বোন ছিলেন। ভাইদের মধ্যে বড়ো দু'জনের নাম ছিলো জুলফিকার ও ফিদা হুসাইন এবং ছোট জনের নাম বাহাদুর আলী শাহ। তাঁর একমাত্র ছোট বোনের নাম ছিলো বাঈ ওয়াজিরুন্নেছা। প্রাথমিক শিক্ষা খুব অল্প বয়সে শুরু হলেও তিনি বাহ্যিক তেমন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নি। ১৬ বছর বয়সে সরফ, নাহু, ফার্সি এবং মিশকাত শরীফের এক চতুর্থাংশ মাওলানা মামলুক আলী দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীসের অন্যান্য কিতাব কোনো উস্তাদের নিকট পাঠ করেন নি। তবে আল্লাহ জাল্লে শানুহু তাঁকে 'ইলমে লাদুনী' দ্বারা মালামাল করে দিয়েছিলেন। জ্ঞানার্জন দুই ধরনের হয়ে থাকে। নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জন ও স্বয়ং রাব্বুল আলামীন থেকে প্রদত্ত সরাসরি জ্ঞানদান। উভয় প্রকার জ্ঞানই কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাধীন। তবে দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আসে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত থেকে। আর এই জ্ঞানকেই বলে ইলমে লাদুনী। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। এছাড়া আল্লাহর খাস অনুগ্রহে নিজের চেষ্টায় তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

প্রায়ই তিনি আলীমদের সঙ্গে দ্বীনি ব্যাপারে আলোচনাকালে সেই ইলমে লাদুনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে মন্তব্য করতেন যা শরীয়তসম্মত হতো। কিন্তু কথা ও শব্দ ব্যবহার সচরাচর 'একাডেমিক' ভাষায় প্রকাশ পেতো না। যুগের প্রসিদ্ধ উলামা ব্যাপারটি জানতেন। তাই তাঁর হাতে অধিকাংশ আলিম বাইআত গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করেছেন। ভারতের স¡নামধন্য যেসব আলিম হযরত মুহাজিরে মক্কীর মুরীদ ও খলিফা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ক'জনের নাম উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতুবী, মাওলানা সাইয়্যিদ আবিদ দেওবন্দী, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, হযরত মাওলানা

আশরাফ আলী থানভী, হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ বাঙ্গালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ নূরোজ্জ্বল তারকারা সকলেই হাজী সাহেবের সান্নিধ্য ও তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হন। যুগশ্রেষ্ঠ এসব মহাত্মনের যিনি পীরসাহেব ছিলেন, তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কতো উচ্চপর্যায়ের ছিলো তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

ইলমে মা'রিফাত অর্জন

হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স যখন মাত্র ১৮ বছর তখন হঠাৎ তাঁর মন ইলমে বাতিন অর্জনের প্রতি ভীষণভাবে আকর্ষিত হয়ে পড়লো। ইলমে জাহির প্রয়োজনাতিরিক্ত অধ্যয়ন তাঁর নিকট কেমন যেনো অসাধু মনে হতে লাগলো। এটা আল্লাহ তা'আলার কারসাজি। তিনি প্রত্যেক মানুষকেই কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পয়দা করেন। সুতরাং সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার নিমিত্তে ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত রাস্তা উন্মুক্ত করেন। ইলমে মা'রিফাত অর্জনের খোদাপ্রদত্ত এই তীব্র আকর্ষণ মনের মধ্যে পয়দা হওয়ার পরই হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন কামিল পীরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সে সময় নকশবন্দিয়া তরীকার কামিল এক বুজুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা নাসিরুদ্দীন দেহলভী নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত ইমদাদুল্লাহ তাঁর দরবারে যেয়ে বাইআত গ্রহণ করলেন।

মাওলানা নাসিরুদ্দীন দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহ মুহাম্মদ আফাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা ছিলেন। তিনি ইলমে শরীয়তের জ্ঞানার্জন করেন শাইখুল হাদীস শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে। এছাড়া হাফিজুল হাদীস শাহ আবদুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর উস্তাদ ছিলেন।

মাত্র কিছুদিন স্বীয় পীরের সুহবতে অবস্থানের পর হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নকশবন্দিয়া তরীকায় খিলাফত লাভ করেন। এরপর তিনি পুনরায় ইলমে শরীয়ত অর্জনের প্রতি মনোযোগী হলেন। এসময় তাঁর উস্তাদ ছিলেন

মাওলানা মুহাম্মদ কলন্দর মুহাদ্দিসে জালালাবাদী ও হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। এছাড়া তিনি আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত ইলমে তাসাওউফের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মসনবী মা'নবী' কিতাবখানি ব্যাখ্যাসহ হযরত শাহ আব্দুর রাজ্জাকের নিকট অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তাঁর ইতোমধ্যে 'পরিশুদ্ধ হৃদয়' ইলমে তাসাওউফের উপর আরো গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠলো। কারণ হযরত জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'মসনবী মা'নবী' হলো 'ঐশী প্রেমের' সুধার সাগর। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হৃদয় এই কিতাবখানি অধ্যয়নের প্রতি ক্রমান্বয়ে অধিক বেশী আকর্ষিত গয়ে পড়ে। তিনি যেনো আল্লাহ-প্রেমের গভীর থেকে গভীরতম মহাসায়রে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন।

পীরের সান্নিধ্য লাভের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট

হযরত মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অধিক আল্লাহ-প্রেমের আকর্ষণ হেতু ক্রমান্বয়ে মজযূব অবস্থায় উপনিত হতে লাগলেন। এমতাবস্থায় তিনি অত্যাশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখলেন।

একদা হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসনবী শরীফ অধ্যয়ন শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় তাশরীফ এনেছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক বুজুর্গ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বুজুর্গের হাতের উপর হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাত রাখলেন। বুজুর্গের মুবারক চেহারা তিনি ভালোভাবে অবলোকন করেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরই তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন ঐ বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার লক্ষ্যে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই মহান ওলির সান্নিধ্যলাভ তাঁর জন্য জরুরী। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে এই ইঙ্গিতই করেছেন। সুতরাং অজ্ঞাতনামা এই বুজুর্গের সন্ধানে লেগে গেলেন।

দীর্ঘ এক বছর সন্ধানের মধ্যে কেটে গেল। হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যস্ততা ও অশান্তি দিন দিন বেড়ে ওঠলো। এরপর একদিন তাঁর উস্তাদ হযরত কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ইমদাদুল্লাহ? তোমাকে যে অত্যন্ত ব্যাকুল মনে হচ্ছে! হাজী সাহেব হুজুর স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমার কথায় মনে হচ্ছে এই বুজুর্গ লোহারীতে অবস্থান করছেন। সেখানকার বুজুর্গের চেহারা তোমার স্বপ্নেদেখা ওলির চেহারার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে বলে মনে হয়।

হযরত কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপদেশ মুতাবিক হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লোহারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পৌঁছার পর কোনো বাক্যালাপের পূর্বেই মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে ওঠলেন, "ওহে! তোমার স্বপ্নের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তো?" হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এই 'কারামতি' প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি নূর মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পদচুম্বন করে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। আর এই বাইআত ছিলো চিশতিয়া-সাবিরিয়া তরীকানুযায়ী। কারণ, নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এই তরীকার শাইখুল মাশাইখ।

খিলাফত লাভ

খুব বেশিদিন অতিবাহিত হয় নি। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে থেকে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দ্রুত চিশতিয়া তরীকার ছবকগুলো সম্পন্ন করে নিলেন। আসলে হযরত হাজী সাহেব তো ইতোমধ্যেই তরীকতের উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি নকশবন্দিয়া তরীকায় খিলাফত লাভ করেন হযরত শাহ নাসিরুদ্দীন দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে। সুতরাং চিশতিয়া-সাবিরিয়া তরীকায় খেলাফত লাভের প্রয়োজনেই তাঁকে স্বপ্নাদিষ্ট করা হয়েছিল। মিয়াজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই বিশিষ্ট মুরীদকে একদিন সামান্য পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ইমদাদুল্লাহ! তুমি আমাকে বলো, তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা কোন্টি? আমার নিকট দু'টি উত্তম জিনিস আছে: তাখসীর ও কিমিয়া। তুমি এর যে কোনো

একটির অধিকারী হতে পারো।” উল্লেখ্য তাখসীর অর্থ, জ্বিন সম্প্রদায়সহ অপরের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবং কিমিয়া অর্থ হলো ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরের কৌশল। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটু ভাবলেন। তাঁর দু'চোখ অশ্রুতে সিক্ত হয়ে ওঠলো। কেঁদে কেঁদে বললেন, “হযরত! পার্থিব জগতের কোনো স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমি আপনার সান্নিধ্যে আসি নি। আমি একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাকেই চাই। আর তিনিইতো আমার ‘মাহবূবে হাক্বিক্বী’। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।” মুরীদের এই প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব শ্রবণ করে মুর্শিদ অত্যন্ত খুশী। জড়িয়ে ধরে বললেন, “আমি দু'আ করি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক!” পরমুহূর্তে তিনি হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খিলাফত প্রদান করলেন।

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৯৬ হিজরি সনে এই মায়াবী ধরার কোল ছেড়ে চলে যান পরলোকে। স্বীয় পীরের ইন্তিকালে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে মানসিক প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। তাঁর মধ্যে ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনা দেখা দিল। তিনি মানুষকে ভয় ও ঘৃণা করতে শুরু করলেন। লোকের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চলে যেতেন পাঞ্জাবের গভীর জঙ্গলে। তবে সুন্নাতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও পাবন্দ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এছাড়া ফক্বর (ফকিরী) হয়ে ওঠলো তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী। খানা-পিনার প্রতিও জন্ম নিলো অন্তরের বিতৃষ্ণা। তিনি কোনো কোনো সময় দীর্ঘ ৮ দিন পর্যন্ত উপবাস থাকতেন। কঠোর এই সাধনার দিনগুলো ছিলো হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনে দুর্বিসহ কাল। সে সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি বলেন, “একদা এমন বেশী অভাবে পড়লাম যে, বাধ্য হয়ে এক ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা ধার চাইলাম। কিন্তু সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সে টাকা দিতে অস্বীকার জানালো।” টাকা না পেয়ে প্রথমত হযরতের মনে ভীষণ আঘাত লাগলো। কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি ভাবলেন, যা হচ্ছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। এতে তাঁর মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

একটি সত্য স্বপ্ন

রাহমানী স্বপ্ন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর উপর অবগত করে থাকেন। আর স্বপ্ন হলো নবুওয়াতের ৪০ ভাগের এক ভাগ।

অবশ্য স্বপ্নের মাধ্যমে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেও থাকেন। ওলি-আবদাল-গউস-কুতুবরা প্রায়ই সত্য স্বপ্ন দেখে থাকেন। সুতরাং শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মহাত্মন ওলি যে সত্য স্বপ্ন দেখবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি একদা ফকিরী হালতে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ঘুরাফেরা থাকাবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল আলাইহিমুস-সালাম অবতরণ করলেন। তাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।" পরবর্তীতে এই স্বপ্নের তাবীর করতে যেয়ে, হযরত কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "এই স্বপ্ন দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত ইলম, হিদায়াত ও রিজিক বুঝাচ্ছে। তিনি যে ভবিষ্যতে 'উলামা' তৈরীর উৎস হবেন তা এ থেকেই জানা যায়।"

দীর্ঘ ৬ মাস যাযাবরের মতো ঘোরাফেরা শেষে হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে স্বপ্নযোগে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ নসিব হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "আমার নিকট আসো!"। এই নির্দেশ পেয়ে মদীনা মুনুওয়ারায় যেতে তাঁর মন উদ্গ্রীব হয়ে ওঠলো। সুতরাং হিজায ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি শীঘ্রই যাত্রা করলেন।

পবিত্র হাজ্জ পালন

হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পূর্বে বর্ণিত স্বপ্ন দেখার পর হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ১২৬১ হিজরি সনে সমুদ্রপথে ভারত থেকে যাত্রা করলেন। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ তথা ইয়াওমুত তারবিয়ায় জিদ্দা শহরের নিকটস্থ বান্দারিস সমুদ্র পোতাশ্রয়ে অবতরণ করেন। পরদিন ছিলো ইয়াওমুল আ'রাফাহ। সুতরাং এখান থেকেই তিনি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার নিয়ত করে যাত্রা শুরু করলেন।

পবিত্র হাজ্জ পালন শেষে মদীনা মুনুওয়ারায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহার জিয়ারতে যাওয়ার পূর্বে তিনি কিছুদিন মক্কা শরীফ

থেকে গেলেন। ভারতের বেশ ক'জন খ্যাতিমান বুজুর্গ তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। এদের মধ্যে হযরত শাহ ইসহাক মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সান্নিধ্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দিলেন। একদিন শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপদেশ হিসাবে তাঁকে বললেন, "তুমি নিজেকে পুরো মহাবিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম বস্তু হিসাবে মনে করবে। হারাম ও মুশতাবাহ (সন্দেহজনক) খাবার থেকে দূরে থেকো। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হারাম ও মুশতাবাহ খাদ্য যে পরিমাণ ক্ষতি করে তা বর্ণনাতীত।" মুরাক্বাবা বা ধ্যান করার ক্ষেত্রে তিনি বললেন, পবিত্র কুরআনের এই আয়াত: (আয়াত ৬৭:১৯) -অর্থাৎ, "অবশ্যই তিনি সবকিছু দেখেন।" এর উপর গভীর মুরাক্বাবা করবে।" হযরত শাহ সাহেব আরো বললেন, "মদীনা তায়্যিবায় জিয়ারত শেষে তোমাকে হিন্দুস্থানে ফিরে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ! একদিন তুমি এখানে ফিরে আসবে। তখন তুমি থেকে যাবে।" শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে বাস্তবে রূপদান করে। মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শেষ জীবন বাইতুল্লাহর শহরেই কাটিয়েছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এখানেই শায়িত আছেন।

মদীনা তায়্যিবায়

সাহেবে কারামত ওলি হযরত কুদরত উল্লাহ বানারসী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বেশ ক'জন মুরীদকে ডেকে বললেন, "তোমরা হাজী সাহেবকে নিয়ে মদীনা শরীফ চলে যাও। তাঁর খিদমাতে ত্রুটি করো না। জিয়ারত শেষে আবার তাঁকে মক্কা শরীফ নিয়ে এসো।"

অবশেষে হযরত মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হলো। তিনি পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজায়ে আতহারের সম্মুখে যেয়ে দণ্ডায়মান হলেন গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ-আপ্লুত হৃদয়ে। অফুরন্ত ফুয়ুজ ও বরকত লাভ করলেন মুবারক এই জায়গা থেকে। তিনি সর্বদা পড়ে থাকতেন রওজায়ে আতহার ও মিম্বরের মধ্যবর্তী 'রিয়াজুল জান্নাহ' বা বেহেশতের টুকরো নামক স্থানে। প্রায়ই এখানে বসে গভীর মুরাক্বাবা করতেন।

একদিন মুরাক্বাবা অবস্থায় দেখলেন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিচ্ছেন।

পবিত্র মদীনার আলো-বাতাসে শুধু শুধু মিশক-আম্বরের সুঘ্রাণ চিরবিদ্যমান। এখানকার অফুরন্ত ফুয়ূজ-বারাকাত থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। একবার এই মুবারক স্থানে আসলে, চলে যেতে আর ইচ্ছা হয় না। মসজিদে নববীতে নামায, রওজায়ে আতহারে সালাম পেশ, জান্নাতুল বাকীতে যেয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে আওলাদসহ হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈনের সমাধি এবং অসংখ্য ওলি-আল্লাহ-গউস-কুতুব ও সাধারণ ভাগ্যবান মুসলমানের কবর জিয়ারত, বেহেশতের টুকরো, আসহাবে সুফফা, মিম্বরে নববী ও মিম্বরে তাহাজ্জুদ ইত্যাদি বরকতপূর্ণ স্থানে নামায ও ধ্যান-মুরাক্বাবার সুযোগ কী কখনো কেউ হারাতে চাইবে? সুতরাং হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন ভারতের বুজুর্গ হযরত শাহ গোলাম মুর্তাজা ঝানঝানাওয়ী মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট যেয়ে বললেন, "হযরত! আমি মদীনা মুনুওয়ারায় থেকে যাবো। আর কোথাও যাবো না।" শাহ সাহেব জবাব দিলেন, "সবর! হে ইমদাদুল্লাহ সাহেব! একদিন অবশ্যই আপনি হিজাযে ফিরে আসবেন। এখন আপনাকে ভারতে ফিরে যেতে হবে।" কিছুদিন পরই তিনি রওজায়ে আতহারের পাশে যেয়ে আবেগ-আপ্লুত হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। মক্কা শরীফ ফিরে এসে আরো কিছুদিন বাইতুল্লাহর নিকটে কালাতিপাত করে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কঠোর সাধনা

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমনিতেই শারীরিকভাবে বেশ দুর্বল ছিলেন। তার ওপর কঠোর সাধনা হেতু আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। রিয়াজত-মুজাহাদা, অল্প খাবার, অধিক হারে নফল রোযা পালন, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি ছিলো তাঁর জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন। শেষমেষ তাঁর অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে, ভীষণ দুর্বলতা হেতু নড়াচড়া করতেও কষ্ট হতো। মক্কা শরীফে হিজরতের পূর্বে তাঁর অবস্থার প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন, হাকীমুল উম্মত হযরত

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি 'মালফুজাত' কিতাবে মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্ত হাফিজ আবদুল কাদিরের হাওলায় বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

হযরত থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন: "ইশার নামায শেষে হযরত প্রথমে বিছানার উপর শুয়ে যেতেন। উপস্থিত সকলেই দেখতো তিনি আরাম করতে চলে গেছেন। সকলে চলে যাওয়ার পর খানক্বার খাদিমকে নির্দেশ দিতেন, দরজা বন্ধ করে দিতে। এরপর তিনি একখানা মুসাল্লা বিছিয়ে জিকিরে লেগে যেতেন। হাফিজ সাহেব বলেন, তাঁর ঘুম অত্যল্প ছিলো। যে সময়ই আমার ঘুম ভাঙ্গতো আমি দেখতে পেতাম তিনি মুসাল্লায় বসে জিকির-মুরাক্বাবায় নিমগ্ন আছেন। হৃদয় বিদারক মা'রিফতি কবিতা আবৃত্তি এবং ক্রন্দনের মধ্যে তিনি রাত কাটিয়ে দিতেন।"

বাইআতের প্রারম্ভ

প্রাথমিক অবস্থায় হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাইআত করানো থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা বললেন, আপনি মুরীদ করুন। আপনার ওয়াসিলায় মানুষ হিদায়াতের নূর লাভ করবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই মানলেন না। অবশেষে ঐশী ইশারা এলো। গায়েবী নির্দেশ হেতু তিনি ১২৯৬ হিজরি সনে সর্বপ্রথম বাইআত করানো শুরু করলেন। অনেক তালিবীন বা খোদান্বেষীরা তাঁর পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করতে লাগলেন। মাত্র ক'দিন এভাবে চলে যাওয়ার পর হজরতের এক নিকটাত্মীয় মহিলা অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাঁকে বলছেন, "ওহে, তুমি সরে যাও! আমি নিজের হাতে ইমদাদুল্লাহর আলীম মেহমানদের খাবার পাক করে দিতে চাই!"

এই স্বপ্নের কিছুদিন পরই তা বাস্তবায়িত হতে লাগলো। দলে দলে উলামায়ে কিরাম হযরতের দরবারে এসে বাইআত গ্রহণ শুরু করলেন। হিজরি ১২৬৩ সনে বাইআত গ্রহণ করেন হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এর কিছুদিনের মধ্যে বাইআত গ্রহণ করেন, দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলভী মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাশাইখে চিশত' নামক গ্রন্থে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও হযরত কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে কিরূপ ধারণা করতেন তার একটি বর্ণনা তুলে ধরেছেন। একবার হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসলিম শরীফের দারস দিচ্ছিলেন। একসময় হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কক্ষে প্রবেশ করলেন। রশীদ আহমদ সাহেব মন্তব্য করলেন, "ওহ! একজন ভালো হাজী এসে গেছেন! আমাদের পাঠদান এখন বন্ধ হয়ে গেল।"

কথাটি উচ্চারণের সময় কিছুটা আত্মম্ভরিতার বিকাশ ঘটেছিল। উল্লেখ্য তখনও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাজী সাহেবের মুরীদ হন নি। কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি উক্ত মন্তব্য শ্রবণ করে সাথে সাথে বললেন, "আরে! এরূপ বলো না। তিনি অত্যন্ত বড় ওলি এবং নির্বাচিতজনদের অন্তর্ভূক্ত।" আল্লাহর কারসাজি কেউ বুঝতে পারে না। প্রাথমিক অবস্থায় যে বুজুর্গ সম্পর্কে ইমামে রাব্বানী গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ধারণা ছিলো অতি সাধারণ, তিনিই শেষ পর্যন্ত ঐ বুজুর্গের হাতে বাইআত গ্রহণ করে চিশতিয়া তরীকার যুগশ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। অবশ্য হযরত কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও পরবর্তীতে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন এবং খিলাফত লাভে ধন্য হন।

উপরোক্ত যুগশ্রেষ্ঠ আলীম বুজুর্গদ্বয় বাইআত গ্রহণ করার পর আরো অনেক আলিম হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে ছুটে আসতে লাগলেন। এসময় যারা বাইআত গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন, ১. হযরত মাওলানা আবদুর রাহমান কান্ধলভী, ২. মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান পানিপথী, ৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতুবী, ৪. মাওলানা বিন মুহাম্মদ হাফিজ জামিন, ৫. হাফিজ মাওলানা ইউসুফ থানাভনী, ৬. হাকিম জিয়াউদ্দীন রামপুরী এবং

৭. ফয়জুল হাসান আদিব সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুজুর্গানে দ্বীন। (মুফতী নূরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত মাশায়েখে চিশত, পৃ: ২৮২)

জিহাদের ডাকে

হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত সাদাসিধে জিন্দেগী যাপন করতেন। জমিদার হওয়া সত্ত্বেও নিজের সম্পদ বলতে কিছুই ছিলো না, যা কিছু ছিলো তা সবই ছোট ভাইকে দান করে দিয়েছিলেন। তিনি জাগতিক চিন্তা-মুক্ত হৃদয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার ধ্যান-ফিকির-জিকির-মুরাক্বাবায় নিমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইশক হযরতের অন্তরাত্মায় স্থায়িত্ব লাভ করে। এ অবস্থায়ও একদিন জিহাদের ডাকে তিনি সাড়া দিলেন। তখন শুরু হয়েছে ১৮৫৭ সালের বৃটিশবিরোধী জিহাদ।

কুতবে আলম শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় দাদাপীর হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে স্বরচিত 'নকশে হায়াত' নামক গ্রন্থে বেশ কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি ১৮৫৭ সালের জিহাদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, এই বিপ্লব যখন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন উলামায়ে কিরামের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বেশ চিন্তা-ভাবনা শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, এই জিহাদে অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরী। হাফিয জামিন সাহেব রাহমাতুল্লাহির নেতৃত্বে এই জিহাদ শুরু হয়। এসময় তাঁর সাথী হিসাবে যোগ দেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরতকে জিহাদে ইমাম বানানো হলো। সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ ও খলিফা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও জিহাদে কাজী হিসাবে যোগ দেন।

অবশ্য জিহাদের ফলাফল তাঁদের অনুকূলে যায় নি। ইংরেজদের হাতে বিভিন্ন কারণে পরাজয়বরণের পর উলামায়ে কিরাম বেনিয়াদের কর্তৃক চরম নির্যাতনের স্বীকার হন। হাজার হাজার আলিমকে তাঁরা বিনা বিচারে গাছের সাথে ঝুলিয়ে হত্যা

করেছে। চতুর্দিকে শুরু হলো ধরপাকড়। খুনী কুখ্যাত উপনিবেশবাদী ইংরেজ বেনিয়াদের শিকারে পরিণত হন উপমহাদেশের বিখ্যাত উলামায়ে কিরাম ও তরীকতের দিশারী মহাত্মনরা। সুতরাং জীবনরক্ষার্থে অনেকে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিহাদের সিপাহসালার হিসাবে ইংরেজদের প্রধান টার্গেট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তারা হযরতকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নেয়। ইতোমধ্যে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আত্মগোপন করেন এবং কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় গ্রেফতার হন। তবে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আগে থেকেই হিজাযে হিজরতের প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলেন।

মক্কা শরীফে হিজরত

আঠারোশ' সাতান্ন সালের জিহাদ-পরবর্তী সময় যখন ধরপাকড় চরমে উঠলো, তখন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্কা শরীফে হিজরতের দৃঢ় প্রত্যয়সহ থানাভন ছেড়ে গোপনে যাত্রা শুরু করলেন। অবশ্য বেনিয়া ইংরেজরা ইতোমধ্যে হযরতের ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ করে ফেলে। প্রথমেই তিনি চলে গেলেন প্রিয় শাগরিদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। সেখানে তিনি তিনদিন অবস্থান করেন। এরপর অতি সংগোপনে পর্যায়ক্রমে আমবালা, তাগরী, পাঞ্জাশালাহ ইত্যাদি স্থানে অবস্থান করে সিন্ধুর পথে করাচী পৌঁছে জাহাজে আরোহণ করলেন। পথিমধ্যে ভারতের মাটিতে শায়িত আগের যুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ওলির সমাধিতে উপস্থিত হয়ে জিয়ারত করেন। ইতোমধ্যে বৃটিশ পুলিশ তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় তিনি বিনা বাধায় মক্কা শরীফে পৌঁছে যান। এরপর আর কোনো দিনই ভারতবর্ষে ফিরে আসেন নি। হিজরতের সময় তাঁর এক অত্যাশ্চর্য কারামত প্রকাশ পায়। নিম্নে হাফিজ মাওলানা হাবীবুর রাহমান প্রণীত 'আমরা যাদের উত্তরসূরী' গ্রন্থ থেকে এই কারামতের বর্ণনা তুলে ধরছি।

হিজরতকালীন অত্যাশ্চর্য কারামত

পাঞ্জাশালাহে পৌঁছার পর হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাও আবদুল্লাহ খান নামক এক সুহৃদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে পুলিশ তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সে এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলো। খান সাহেব বললেন, হযরত! আমার ধারণা শীঘ্রই পুলিশ আসবে। আপনি আমার ঐ পরিত্যক্ত ঘোড়াশালে আত্মগোপন করুন। একদিন ঘোড়াশালের অন্ধকার একটি কামরায় তিনি ওযু সেরে চাশতের নামাযে মনোযোগী হলেন। মুসাল্লায় থাকাবস্থায় উপস্থিত প্রিয় ভক্তবৃন্দকে বললেন, আপনারা আপনাদের নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে নফল আদায় করে নিন। বিরাট ধনী রাও আবদুল্লাহ খান সাহেব ছিলেন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্ত। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী। আর এরূপ ব্যক্তিকে যে আশ্রয়দান করবে সে-ও আইনের চোখে রাষ্ট্রদ্রোহী। সুতরাং হযরতকে আশ্রয়দান করা ছিলো তার জন্য বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তিনি হযরতকে নামায অবস্থায় রেখে আস্তাবলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই চোখে ভেসে আসলো একদল পুলিশ! হতবাক অবস্থায় থমকে দাঁড়ালেন রাও সাহেব। রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধে অভিযুক্ত হযরতকে আশ্রয় দিয়ে তার নিজের পরিণতি কী দাঁড়াতে পারে তা না ভেবে, হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিরাপত্তারচিন্তায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি জানতেন, পুলিশরা আস্তাবলের ভেতর তল্লাশী চালাবে। হায় হায়! এখন উপায়?

সত্যিই পুলিশ-বাহিনীর লোক আস্তাবলের দরোজার একেবারে সামনে দাঁড়ানো খান সাহেবের নিকট এসে গেল। তারা হাসিমুখে রাও সাহেবকে সালাম জানিয়ে অসময়ে এখানে আগমনের আসল কারণ একথা-সেকথা বলে গোপন রাখার চেষ্টা করলো। দূরদর্শী প্রজ্ঞাবান রাও সাহেব কিন্তু সবই অবগত ছিলেন। কোনো দুরাচার তার এখানে হাজী সাহেব আছেন বলে পুলিশকে খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই। পুলিশরা কোন্ কারণে এখানে এসেছে তা তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন। মনে মনে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, "হে আল্লাহ! মান-সম্মান, ধন-সম্পদ এমনকি জীবনের মালিক একমাত্র তুমি। আমি এই মুহূর্তে সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, এমনকি ফাঁসির কাষ্ঠে নিজেকে ঝুলিয়ে দিতেও আমি কোনো পরওয়া করি না। অনুগ্রহ করে তোমার ওলিকে এদের খপ্পর থেকে রক্ষা করো! হে আল্লাহ! আমার

বাড়ি থেকে তিনি গ্রেফতার হলে আফসোসের শেষ থাকবে না, আমার জীবন-মরণ সমান হয়ে যাবে! হে প্রভু তুমি তোমার ওলিকে বাঁচাও!”

রাও আবদুল্লাহ খান জানতেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের পায়ে এই ইংরেজ বেনিয়াদের দেশীয় ধূসর পুলিশরা বেড়ি পরাবে। তবে নিজেকে সামলে নিতে হবে। তাই তিনি খুব শান্তশিষ্ট ভঙ্গিমায় পুলিশদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালালেন। পুলিশদের সম্মুখে যে কোনো উপায়ে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা জরুরী। হয়তো তারা আস্তাবলের ভেতর ঢুকবে না। এরূপ আশা ও সাহসিকতা নিয়ে তিনি বাক্যালাপ শুরু করলেন। অফিসারদের সব কথার জবাব স্বাভাবিকভাবে প্রদানের পর মুসাহাফা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন। অফিসার ঘোড়া থেকে নেমে বললো, রাও সাহেব! আপনার আস্তাবলের ঘোড়ার খুব নামডাক শুনেছি। এ কারণে আপনাকে অগ্রে না জানিয়েই চলে আসলাম। একথা বলে সে আস্তাবলের দরোজার নিকটবর্তী হতে লাগলো।

বাইরে হাসিমুখ কিন্তু ভেতরে তুমুল তোলপাড়। এ ছিলো রাও সাহেবের অবস্থা। না পারছিলেন কিছু বলতে, না পারছিলেন কিছু করতে। তবে তার বাহ্যিক অবস্থা স্বাভাবিকই ছিলো। কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না। অফিসার ভাবলো, খবরদাতা নিশ্চয়ই ভুল তথ্য দিয়েছে! নিজের প্রিয় মুর্শিদ যদি এখানে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন তাহলে রাও সাহেবের অবস্থা এরূপ স্বাভাবিক কিভাবে থাকতে পারে? সে মনে মনে ঐ গুপ্তচরের প্রতি রাগান্বিত হচ্ছিলো। সফরের কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি তাকে আড়ষ্ট করে নিচ্ছিলো। কিন্তু এরপরও ঐ ভাঙ্গা আস্তাবলটির ভেতরে একবার না ঢুকে কিভাবে ফেরত যাওয়া যায়! সে ধীরে ধীরে দরোজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। এ মুহূর্তে রাও সাহেবের অবস্থা কী ছিলো তা পাঠক নিশ্চয়ই অনুভব করে থাকবেন। কিন্তু ভেতরে হাজী সাহেবকে চোখে পড়লো না! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা’আলার মহিমার শেষ নেই। পুরো কক্ষের ভেতর কোথাও হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখা গেলো না। রাও সাহেব তো থ! তিনি বুঝতে পারলেন না হযরত কোথায় আত্মগোপন করলেন? কারণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর কোনো উপায়ই ছিলো না। আর বাস্তবে

তা-ই হলো। হাজী ইমদাদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পুলিশ থাকাবস্থায় সেখানে থেকেও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রাও আবদুল্লাহ খান সাহেব জানতেন, এটা তার প্রিয় মুর্শিদের বিরাট কারামাত। তিনি মনে মনে আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন। এদিকে পুলিশ অফিসার পুরো কক্ষ তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলো। সে ভীষণ রাগান্বিত হচ্ছিল ঐ গুপ্তচরের দিকে। এক পর্যায়ে খান সাহেবকে প্রশ্ন করলো, “এখানে পানির পাত্র এবং পানিতে ভেজা জায়গাটুকু দেখছি কেনো?” তিনি বললেন, “এখানে মুসলমানরা নামায আদায় করে থাকেন। পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে পানি দ্বারা হাতমুখ ধৌত করতে হয়।” আপনি আসার দশ মিনিট পূর্বে তারা এখানে নামায আদায় করেছেন। অফিসার বললো, “আমি তো জানতাম নামায পড়া হয় মসজিদে, তো এই আস্তাবলে ... ?” খান সাহেব সাথে সাথে জবাব দিলেন, “মসজিদ তো ফরয নামায আদায়ের জন্য। এখানে আদায় হয় গোপন নামায। আল্লাহর একান্ত নৈকট্য হাসীলের আশায় এ নামায পড়েন পরহেজগার মুসলমানরা- এ ইবাদতের কথা কেউ টের পায় না!” অফিসার জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল। এরপর দরজা খুলে ঘোড়ায় আরোহণ করে সঙ্গীদেরসহ দ্রুত প্রস্থান করলো। রাও সাহেব তাকে এগিয়ে দিয়ে আসলেন। একটু পরই রাও আবদুল্লাহ সাহেব আস্তাবলে এসে দেখেন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ মুসাল্লায় নামাযরতই আছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁকে তাঁর কুদরতের মাধ্যমে বাঁচাতে পারেন।

মুহাজির হিসাবে মক্কা মুয়াজ্জমায়

মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথমত সাফা পাহাড়ের নিকটস্থ রিবাত নামক স্থানে অবস্থান করেন। তিনি বেশিরভাগ সময় একাকী থাকতেন। আল্লাহর ধ্যান-মুরাক্বাবা-ইবাদতে নিমগ্ন থেকে কালাতিপাত করতে লাগলেন। মক্কা শরীফের স্থানীয়দের সঙ্গে খুব একটা বেশী মেলামেশার সুযোগ পেলেন না। তবে পবিত্র হাজ্জের মওসুমে ভারত থেকে আগত হাজ্জযাত্রীদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদা তিনি ঐশী নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন, “কোনো আরিফের জন্য এটা সঠিক নয় যে, তিনি নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরক করেন।” সুতরাং বিয়ে করা তাঁর জন্য জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে ভেবে, শেষ পর্যন্ত মরহুম হাজী শাফায়াত খানরামপুরীর মেয়ে খাদীজা খানমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হিজরি ১২৮২ সালের পবিত্র রমজান মাসের ২১ তারিখ মক্কা মুয়াজ্জমায় বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সে যুগের ১২৫ রুপির সমপরিমাণ ৬০ রিয়াল টাকা দেনমোহর হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

বিবাহের প্রায় ১২ বছর পর হিজরি ১২৯৪ সনে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিছু বিশিষ্ট মুরীদ ও খাদিম হাররাতুল বাব নামক স্থানে একখানা বাড়ি ক্রয় করেন। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবশ্য নিজেকে সর্বদাই অবিনশ্বর এ ধরার কোলে ‘মুসাফির’ হিসাবে মনে করতেন। ঘরবাড়ি-টাকা-খড়ি, সম্পদ ও বিরাট পরিবার-পরিজন এ সবই ছিলো তাঁর নিকট ‘আত্মার যাতনা’ স্বরূপ। প্রথমে ঐ ক্রয়কৃত বাড়িতে যেতে তিনি নারাজ ছিলেন। কিন্তু খাদিমদের পীড়াপীড়ি হেতু শেষ পর্যন্ত তিনি সস্ত্রিক সেথায় চলে গেলেন।

মাওলার ডাকে চিরবিদায়

হজরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেন। ইলমে তাসাওউফের নূর দ্বারা জগতকে তিনি ৮৪ বছর উজ্জ্বল করেছিলেন। এরপর মক্কা মুয়াজ্জমায় তাঁর মাহবুবের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাঁর ইন্তিকালের ক্ষণ ও তারিখ ছিলো হিজরি ১৩১৭ সনের ১২ই জুমাদাল উখরা। বুধবার দিন ফযরের সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মক্কা মুকাররমার ‘মাদ্রাসাতুল সুলতানিয়া’ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরের পাশে ‘জান্নাতুল মা’আল্লায়’ তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা তাঁর এই বিশিষ্ট ওলির দারাজাতকে বুলন্দ করুন। আমীন।

কিতাবাদি

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ ক'টি কিতাবের রচয়িতা। হযরত মুফতী নূরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বরচিত 'মাশায়েখে চিশত' গ্রন্থে মোট ১০ খানা কিতাবের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এসব কিতাবের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করছি।

১. হাশিয়ায়ে মসনবী: দার্শনিক মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'মাসনবী মা'নবী' কিতাবের টীকা। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবদ্দশায় মাত্র ২ খণ্ড ছাপা হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীতে বাকিগুলোও ছাপা হয়েছে। কিতাবটি ফার্সী ভাষায় রচিত।

২. গিজায়ে রূহ: কবিতার সংকলন। এতে ১৬০০ পংক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৬৪ হিজরি সনে এগুলো রচনা করেন। গ্রন্থে তাঁর পীরসাহেব হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরও আলোচনা করেছেন।

৩. জিহাদে আকবর: হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৮৬ সনে এ কিতাবখানা রচনা করেন। কিতাবটি অপর কোনো বুজুর্গের মূল ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। গ্রন্থে নফসে আম্মারার সাথে 'বড় জিহাদ' সম্পর্কিত তাসাওউফ শাস্ত্রের উপর ৬৭৯টি ছোট্ট কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪. মসনবী তুহফাতুল উশ্শাক্ব: গ্রন্থের শিরোনামের অর্থ 'মসনবী - প্রেমিকদের জন্য উপহার'। এটাও একটি কবিতার বই। এতে আছে ১৩২৪টি উচ্চপর্যায়ের মা'রিফতি পংক্তি। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৮১ হিজরি সনে এসব কবিতা রচনা করেছিলেন।

৫. রিসালায়ে দরদে গমনাক: মাত্র ৫ পৃষ্ঠার এই কবিতার বইয়ে মোট ১৭৫টি পংক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৬. ইরশাদে মুর্শিদ: গ্রন্থের শিরোনামের অর্থ, 'মুর্শিদের জন্য নির্দেশনা'। মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার এই কিতাবে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তরীকতের বিভিন্ন আমলের উপর আলোচনা ও তথ্যাদি তুলে ধরেছেন। এতে আছে অজিফা, মুরাক্বাবা, আওরাদ এবং চার তরীকার শাজারা মুবারক। ১২৯৩ হিজরির ২০ জুমাদাল আউয়াল এটি রচিত হয়।

৭. জিয়াউল কুলুব: সুলুক ও মা'রিফাতের উপর লিখিত একটি মূল্যবান কিতাব। এটি ফার্সি ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়েছে। এখনও উপমহাদেশের সর্বত্র অসংখ্য তরীকতপন্থী এই কিতাবখানা থেকে উপকৃত হচ্ছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে হাফিজ জামান সাহেবের পুত্র হাফিজ মুহাম্মদ ইউসুফ এই কিতাবখানা রচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে ১২৮২ হিজরি সনে কিতাবটি লিখে শেষ করেন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। গ্রন্থটি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি 'মালফুজাত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, হযরত হাজী সাহেব বলেন, "জিয়াউল কুলুবের দুই-তৃতীয়াংশ আমি স্বেচ্ছায় নষ্ট করে দিয়েছি। এতে ছিলো সুফিয়ায়ে কিরামের আশগাল ও আমলের সামারাত (মা'রিফতি কবিতা) এবং পরিণাম। এসব সাধারণ পাঠক সকাশে প্রকাশ না করার ব্যাপারে আমার প্রতি ইলহাম হলো।"

৮. ওয়াহদাতুল উজূদ: শাইখুল আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রখ্যাত থিওরীর উপর আলোচনা।

৯. ফায়সালা হাফতে মাসআলা।

১০. গুলজারে মা'রিফাত: এ কিতাবখানা বর্তমানে 'কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়া' নামে পরিচিত। এতে হযরতের লেখালেখি সংকলিত হয়েছে।

বিবিধ ঘটনা ও মূল্যবান বাণী

১. সুফিয়ায়ে কিরাম মাদ্রাসা পাশকরা আলিম হওয়া জরুরী নয়: হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উলামায়ে কিরাম ভাবতেন, ইলমে তাসাওউফ 'শুধুমাত্র ফারিগহওয়া আলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য'। অবশ্য আগের যুগে এরূপ ধারণা ছিলো না। অতীতে খ্যাতিমান অসংখ্য সুফিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের কেউই মাদ্রাসা-পড়–য়া বা ফারিগহওয়া 'আলিম' ছিলেন না। যা হোক এ ব্যাপারে হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, এক দরবেশ আমাকে বললেন, "আমার নিকট হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর ওলি হওয়ার প্রমাণ এটাই যে, উলামায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ হয়ে দুনিয়া-আখিরাতকে উজ্জ্বল করেছেন। অথচ সাধারণত, উলামায়ে কিরাম 'সুফিদের' বিরোধী হয়ে থাকেন। এখন, সেই উলামায়ে কিরাম তাঁর অনুসারী হয়েছেন, এবার কে আছে সুফিদের বিরোধিতা করে?"

২. আমলী জীবনে কিতাবের তাসির কামনা: হযরত কর্তৃক প্রত্যহ মসনবী শরীফের দারস শেষে দু'আর দরখাস্ত হতো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "হযরত আজ আমরা কিসের দু'আ করবো?" জবাবে তিনি বললেন, "এই মসনবীতে যা লিখা আছে তা-ই যেনো আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়, এই দু'আ করো।"

৩. মনের ভাব ব্যক্তকরণ: হযরত হাফিজ সাহেবের কিরানা মসজিদে একদা হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আল্লাহওয়ালা এক কসাই উপস্থিত হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, কোন্ ব্যক্তি বড়ো বুজুর্গ, হাজী সাহেব নাকি হাফিজ সাহেব? তিনি মুখে কিছুই উচ্চারণ করেন নি। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আহলুল্লাহদের বুজুর্গির পরিমাণ তুলনা করা সঠিক নয়। কে বড়ো আর কে ছোট? একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জ্ঞাত- তাঁর দরবারে কার মর্যাদা কী পরিমাণ। সুতরাং সকলের ব্যাপারে আমাদেরকে ভালো ধারণা রাখতে হবে।"

৪. সুন্নাতের অনুসরণ গুরুত্ববহ: হযরতের একজন খলীফার নাম ছিলো মুহিউদ্দীন বিলায়াতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। একদা উচ্চপর্যায়ের নামায আদায়ের নিয়তে তিনি দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করলেন। একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তিনি এই নামায আদায় করেছিলেন। নামাযের মধ্যে ভীষণ স্বাধ ও খুজুখুশু লাভ করেন। তবে সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যেয়ে চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করতে হলো। সাহেবে কাশফ এই বুজুর্গ ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর এই নামায সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলেন। মুরাক্বাবা অবস্থায় তাঁর এই নামাযকে এক পরমাসুন্দরী নারী হিসাবে 'আলমে মিসাল'-এ দেখতে পেলেন। সবদিক থেকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত এই নারীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হলো। সে ছিলো অন্ধ। ব্যাপারটি তাঁর মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ব্যক্ত করলেন। তবে নামায পালনকালে চোখ বন্ধ রাখার কথা বললেন না।

হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করলেন, "সম্ভবত তুমি নামায পালনকালে চোখ বন্ধ রেখেছিলে।" বিলায়াত সাহেব স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিলেন। হাজী সাহেব বললেন, "এ কারণেই তোমার নামাযকে অন্ধ অবস্থায় দেখেছ। তা হতো না যদি তুমি চোখ খোলা অবস্থায় উক্ত নামায আদায় করতে। কারণ, চোখ বন্ধ রাখা সুন্নাতের খিলাফ।"

৫. জ্বিন সম্প্রদায়ের ভক্তি: একদা তাঁর হুজরায় সাধারণ এক শ্রমিক এসে আরজ করলো, "হযরত! আমার মেয়েকে জ্বিনে ধরেছে। দয়াকরে আসুন, আমার মেয়েকে জ্বিনের কবল থেকে মুক্ত করুন।" তিনি বললেন, "আমি এসব কাজ করি না।" কিন্তু লোকটি বার বার আবদার করতে লাগলো। শেষমেষ তিনি চলে আসলেন শ্রমিকের বাড়িতে। মেয়েটির নিকটে পৌঁছা মাত্র জ্বিন তাঁকে সালাম জানিয়ে বললো, "হযরত! আমাকে মাফ করুন। আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম। নিজে এখানে উপস্থিত না হয়ে একখানা কাগজে যদি শুধু লিখে দিতেন তাতেই আমি এই মেয়েকে ছেড়ে চলে যেতাম।" জ্বিন যাওয়ার সময় আরো বললো, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার সিলসিলার কারোর সাথে জীবনে কখনো আর বে-আদবী করবো না!"

৬. কাবা শরীফ ও গম্বুজে খাদ্বরার প্রতি সম্মান প্রদর্শন: পবিত্র বাইতুল্লাহর প্রতি সকলেই সম্মান প্রদর্শন করেন। এটা ঈমানের অঙ্গ। বাইতুল্লাহর গিলাফের রং কালো। হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই রংয়ের প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। এছাড়া গম্বুজে খাদ্বরার প্রতিও তাঁর সম্মান প্রদর্শনের তুলনা নেই। একদা কেউ তাঁকে কালো রংয়ের একজোড়া জুতা উপহার দেয়। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, "যেদিন আমি দেখেছি পবিত্র কাবা ঘরের গিলাফ কালো রংয়ের সেদিন থেকে কালো রংয়ের জুতা পরিধান ছেড়ে দিয়েছি। অনুরূপ যেদিন দেখলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারের উপরিস্থ গম্বুজের রং সবুজ সেদিন থেকে সবুজ রংয়ের মুজা কিংবা জুতা পরা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছি।"

৭. বিপদে হাসি: মানুষ সাধারণত রোগ-শোক ও বিপদ ক্ষণে হাসে না-বরং কাঁদে। কিন্তু হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ব্যতিক্রম ছিলেন। একদা তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একা একটি কক্ষে অবস্থান করছিলেন। কক্ষের বাইরে কিছু লোক তাঁকে দেখার জন্য বসা ছিলেন। তারা শুনলেন হযরত বেশ জোরেসুরে হাসছেন! কক্ষের ভেতর রোগাক্রান্ত অবস্থায় এভাবে একা একা হাসছেন শুনে তারা বেশ অবাক হলেন। হযরতের মানসিক অবস্থা ঠিক আছে তো? ভেতরে প্রবেশ করে তারা হযরতকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, "বাবারা! শারীরিক এই বেদনাবিধুর ক্ষণে আমি এতো বেশী আনন্দবোধ করছিলাম যে, নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে হাসতে থাকি।"

৮. আমার রং পাত্রের মতো: তিনি একদা বললেন, "প্রত্যেকে আমাকে তার ধারণা মুতাবিক ভিন্ন রংয়ে দেখে। আসলে আমার তো কোনো রং-ই নেই! আমি পানির মতো। পাত্রের রং যেটা আমার রং-ও সেটা।"

৯. হাদীসের ব্যাখ্যা: হাদীস শরীফে আছে, "গীবত জিনা থেকে জঘন্য কাজ"। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে যেয়ে হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "জিনা হলো একটি লজ্জাশীল গোণাহের কাজ। অপরদিকে গীবত এমন এক গোণাহের কাজ যার পেছনে থাকে কিবর। আর কিবর শাহওয়াত থেকেও জঘন্য।"

১০. সূক্ষ্ম অন্তর-দৃষ্টি: একদা তাঁর এক মুরীদ বললেন, যা কিছু রূহানী ফুয়ুজ লাভ হয়েছে তা সবই হযরতের (হাজী সাহেবের) বরকত থেকে প্রাপ্ত। তিনি বললেন, "যাকিছু উপকার হয়েছে, তা তোমার মধ্যেই ছিলো। কিন্তু এসব ফায়দা তোমার শায়খের মাধ্যমে হাসিল হয়েছে বলে মনে করা উচিত। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

১১. আবিদদের জিহ্বা: তিনি একদা বললেন, "আল্লাহ তা'আলা ওসব গাইর ইসতিলাহী তথা উলামা নন- এমন আবিদকে একটি লিসান দিয়ে থাকেন। হযরত শামসে তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জিহ্বা ছিলেন মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমাকে আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ একটি জিহ্বা দান করেছেন, তিনি হচ্ছেন মাওলানা কাসিম নানুতুবী।"

১৪. আল্লাহর জন্য হাদিয়া: হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন বললেন, "আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, হে ইমদাদুল্লাহ! তুমি আমার জন্য হাদিয়াস্বরূপ কি নিয়ে এসেছ? আমি জবাব দেব, কাসিম [নানুতুবী রা.] ও রশীদকে [গাঙ্গুহী রা.] নিয়ে এসেছি।"

১৫. মানুষকে আল্লাহর গোলাম বানানো আমার কাজ: হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন, "দেখুন, আমার গোলাম কেউ হোক, তা আমি মোটেই চাই না। কারণ আমার কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর গোলাম বনতে সাহায্য করা।"

১৬. মানুষ আমাকে বাতিল ভাবুক: একদিন তিনি বললেন, "মানুষ কেনো আমার পেছনে ঘুরে? আমি চাই সকলে ভাবুক আমি বাতিল, অবিশ্বাসী! এতে হয়তো তারা আমার পেছন ছাড়বে এবং একান্ত একাকী আমার মাহবুবের ধ্যানে নিমগ্ন হতে পারবো। আমার উপর সকলের এরূপ আস্থা আমার সময়কে নষ্ট করে দিচ্ছে।"

১৭. যেথায় থাকো হৃদয় থাকবে বাইতুল্লাহর শহরে: তিনি বলতেন, "আপনার দেহ যদি বাইতুল্লাহর শহর মক্কা মুয়াজ্জমায় থাকে আর হৃদয় থাকে ভারতে তাহলে কোনো লাভ নেই। অপরদিকে ভারতে দেহ থাকলেও হৃদয় যদি মক্কা শহরে থাকে তাহলে কামিয়াবী হাসিল হতে পারে।"

১৮. উপদেশদাতার আমল ছাড়া তা'লিমে কাজ হবে না: তিনি বলেন, "উপদেশদাতা শায়খের মধ্যে আমল নেই এমন তা'লিম দ্বারা মুরীদের কোনো ফায়দা হয় না। এমনকি ঐ আমল শায়খের জন্য জরুরী না থাকলেও তাঁকে তা পালন করতে হবে। তবেই কাজে আসবে। রূহানী ফুয়ূজ লাভের আশায় মুর্শিদকেও সর্বদা জিকির-শুগুলে মগ্ন থাকতে হবে। নিজে ফুয়ূজ লাভে ব্যর্থ হলে অপরকে কোত্থেকে ফুয়ূজ দান করবেন?"

১৯. জিকিরের ফায়দা: একব্যক্তি অভিযোগ করলো, আমি জিকির থেকে কোনো ফায়দা লাভ করছি না। তিনি বললেন, "আরে মিয়া! জিকির করার তাওফিক যে আল্লাহ পাক তোমাকে দিয়েছেন, এটা কী কম ফায়দা হলো?"

২০. আদত থেকে ইবাদত: তিনি উপদেশ দিতেন, "যারা ভাবো, ইবাদতে রিয়া প্রকাশ পায়- তারাও ইবাদত করতে থাকো। একদিন দেখবে, আমলের অতিরিক্ত আদত রিয়াহীন ইবাদতে পরিণত হবে।"

২১. ঠাণ্ডা পানির উপকার: তিনি বলেন, "তোমরা ঠাণ্ডা পানি পান করো। এতে 'আল-হামদুলিল্লাহ!' হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত হয়ে বেরিয়ে আসবে।"

২২. সবাই আমার মুক্তির উপায়: একদা হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, "ওহে লোকসকল! আপনারা সবাই আমার মুক্তির ওয়াসিলা। যারাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে তারাই আমার জন্য নাযাতের ওয়াসিলা হিসাবে আমি মনে করি।"

২৩. নামাযে ওঠাবসা মহামূল্যবান আমল: এক দরবেশ এসে প্রশ্ন করলেন, "শায়খ! বলুন তো, মন যদি বসে না তাহলে ইবাদতের সময় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেড়েচেড়ে ওঠাবসা করে লাভ কি?" দরবেশ নামাযে খুজুখুশুর গুরুত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে এই প্রশ্ন করেছিলেন। হযরত একটু ভাবলেন। তারপর জবাব দিলেন, "রোজ কিয়ামতের দিন এই ওঠাবসার মূল্য প্রকাশ হবে। বাস্তবে এসব ওঠাবসা ও নড়াচড়াই সবকিছু। যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এসব কাজ করার তাওফিক দিয়ে থাকেন তাহলে মনে করবেন এটা আপনার জন্য সাত-রাজার-ধন থেকেও মহামূল্যবান। যদিও আপনার মনের স্থিরতা হাসিল না হয়।" দরবেশ এই জবাব শুনে চুপ করে বসে রইলেন।

২৪. দুনিয়া তরক করো না: হযরতের কোনো কোনো মুরীদ প্রশ্ন করতেন, দুনিয়া তরক করা সঠিক হবে কি না? তিনি জবাব দিতেন, "দুনিয়া যদি হালাল হয় তাহলে নিজের ইচ্ছায় একে তরক করতে নেই। জিকরুল্লাহর মধ্যে নিমজ্জিত থেকো। প্রভুর নাম যখন তোমার অন্তরে স্থায়িত্ব লাভ করবে তখন এমনিতেই দুনিয়া তোমাকে ছেড়ে দূরে সরে যাবে।"

২৫. সবাইকে খাদিম হতে নেই: তিনি বলতেন, "তিন ব্যক্তির কাছ থেকে খিদমাত লাভ আমি পছন্দ করি না: এক. আলিম, দুই. সৈয়দ এবং তিন. বৃদ্ধ ব্যক্তি।"

২৬. কেনো সবাইকে মুরীদ করি: হযরতের মুরীদ হাফিজ আবদুর রহীম থানভী বর্ণনা করেন, হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে মুরীদ করতেন। এর কারণ বুঝাতে যেয়ে তিনি একদিন বললেন, "আমি কাউকে বাইআত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি এজন্য করি না যে, এ লোক হয়তো কোনো বিদ'আতীর হাতে বাইআত গ্রহণ করে নিতে পারে। আরো ভয় হয়, আল্লাহ তা'আলা যদি কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করেন, হে ইমদাদুল্লাহ! সে তোমার নিকট আসলো অনেক আশা নিয়ে। তুমি কোন্ কারণে তাকে ফিরিয়ে দিলে? আমি কী জবাব দেবো?"

২৭. দুনিয়া অন্বেষণ সঠিক নয়: হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে অন্বেষণ করে তার উচিত যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা।"

২৮. দশটি খাসলত ছাড়ো ও নয়টি অর্জন করো: হযরত মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'জিয়াউল কুলুব' কিতাবে সালিককে উপদেশ দিতে গিয়ে লিখেছেন, দশটি বদ আমল ছাড়তে হবে এবং নয়টি আমল অর্জন করতে হবে। যে দশটি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা চাই সেগুলো হলো: ১. লোভ, ২. দীর্ঘ আশা, ৩. ক্রোধ, ৪. মিথ্যাচার, ৫. গীবত, ৬. কৃপণতা, ৭. দ্বেষ, ৮. রিয়া, ৯. অহংকার এবং ১০. হিংসা। যে নয়টি গুণ অর্জন করতে হবে, সেগুলো হলো: ১. ধৈর্য, ২. শুকুর, ৩. অল্পেতুষ্টি, ৪. জ্ঞান, ৫. দৃঢ় বিশ্বাস, ৬. তাফবীজ (আল্লাহর উপর সবকিছু সোপর্দ করা), ৭. তাওয়াক্কুল, ৮. রিদ্বা (আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা) এবং ৯. তাসলীম (দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেওয়া)।

২৯. তাওহীদের স্বাধ: তিনি বলেন, "একত্ববাদের মূল হলো তাওয়াজ্জুহ (বদান্যতা)। যাদের মধ্যে বদান্যতা বিদ্যমান, সে তাওহীদের স্বাধ অনুভব করবে।"

৩০. উলামায়ে কিরামের সম্মুখে হাক্বিকাতের উপর আলোচনা: হযরত মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে অনেক যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম প্রায়ই থাকতেন। আমরা ইতোমধ্যে দেখিয়েছি যে, ভারতের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরাম তাঁর মুরীদীন ও খুলাফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আলিমদের উপস্থিতিতে রূহানী বাস্তবতা বা হাক্বিকাতের উপর আলোচনাকালে তিনি বলতেন, "ভাইসব! আমি এসব ব্যাপারে গাফিল। আপনারা হচ্ছেন উলামায়ে কিরাম। আমি যাকিছু বলছি, তা সবই আমার মন থেকে উচ্চারণ করছি। এখন, যদি মনে করেন কোনো কথা কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে চুপ থাকবেন না- আমাকে অবগত করবেন। যদি বলেন না, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি অভিযোগ আনবো, আমি তাঁদেরকে বলেছি, কিন্তু তাঁরা আমাকে অবগত করেন নি।"

৩১. খলীফা দুই ধরনের: তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমার খলীফারা দুই ধরনের। প্রথমত আমি অনেককে ইযাজত দিয়েছি মুরীদ করার জন্য। এরূপ ইযাজত-প্রাপ্তরা কখনো আমাকে ইযাজত দেওয়ার অনুরোধ করেন না। দ্বিতীয়ত আমার কিছু খলীফা আছেন যাদেরকে ইযাজত দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র জিকির-আজকার অন্যদেরকে বলে দেওয়ার জন্য। প্রথমোক্ত খলীফারাই আসল আর দ্বিতীয়োক্তরা তাদের মতো নন।"

খুলাফাবৃন্দ

আমরা হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফাদের পূর্ণ একটি তালিকা প্রাপ্ত হয়েছি। এ গ্রন্থে এই তালিকাটি পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা উপযোগী মনে করি। হযরতের প্রত্যেক-জন খলিফাই ছিলেন ইলমে তাসাওউফের সাগর এবং অলিকুল শিরোমণি। তাঁদের দ্বীনি খিদমাত, বিশেষকরে রূহানিয়্যাতের অবদান থেকে গোটা মুসলিম উম্মাহ অশেষ উপকার লাভ করেছে। আর ব্যক্তিগতভাবে এ বিশ্বাস আমি রাখি, যুগের শীর্ষস্থানীয় এসব বুজুর্গের নাম উল্লেখ করাই বিশেষ বরকতের কারণ। আশা করি পাঠকরা আমার সঙ্গে একমত হবেন। নিম্নে মোট ৬৯ জন খলিফার নামা লিপিবদ্ধ করলাম।

হযরতের খুলাফাদের পূর্ণ তালিকা

১. ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩. হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪. হযরত মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫. হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খাতির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬. হযরত মাওলানা জলীল আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৭. হযরত হাজী সায়্যিদ মুহাম্মদ আবিদ দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৮. হযরত মাওলানা মনসুর আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৯. হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ শাহপুরী পুঞ্জাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১০. হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ বাঙ্গালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

১১. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১২. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতুবী সিদ্দীকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৩. হযরত শাইখুল হিন্দ মুফতি মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আফজাল বুখারী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহিআলাইহি
১৫. হযরত মাওলানা কারামাতুল্লাহ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৬. হযরত মাওলানা শারাফাল হক দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৭. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আমীর হামযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৮. হযরত মাওলানা মুহিব উদ্দীন মক্কী বিলায়িতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৯. হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হুসাইন ইলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২০. হযরত মাওলানা আবদুস সামী বাইদাল রামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২১. হযরত মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২২. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ আনসারী আম্বুটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২৩. হযরত মাওলানা আবদুর রহমান আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২৪. হযরত মাওলানা ফিদা হুসাইন দরবঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২৫. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল কাসিম হানসাভী ফাতেহপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২৬. হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২৭. হযরত মাওলানা আনওয়ার উল্লাহ হায়দরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২৮. হযরত মাওলানা সায়্যিদ পীর মেহের আলী শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২৯. হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইসমাঈল মঙ্গলপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩০. হযরত মাওলানা ফাতেহ মুহাম্মদ থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩১. হযরত মাওলানা কাদির বখশ সাহসারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩২. হযরত মাওলানা শফিউদ্দীন নাগিনভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩৩. হযরত মাওলানা হাফিজ হাকিম মুহাম্মদ ইউসুফ থানভী রাহমাতুল্লাহিআলাইহি
৩৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম আজরাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদুল্লাহ হাজারভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩৬. হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ সুলাইমান ফালওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩৭. হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ সিদ্দীক কাসিম মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৩৮. হযরত মাওলানা মুনশি মুহাম্মদ কাসিম নায়ানঘরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩৯. হযরত মাওলানা ফাইযুল হাসান আদিব সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪০. হযরত মাওলানা বদরুদ্দীন ফালওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪১. হযরত মাওলানা হাকিম জিয়াউদ্দীন বিন গোলাম মুহিউদ্দীন রামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪২. হযরত মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪৩. হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪৪. হযরত মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ আহমদ কাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফি আওরঙ্গবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪৬. হযরত মাওলানা ইনায়াতুল্লাহ মালভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪৭. হযরত মাওলানা সিফাত আহমদ গাজিপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪৮. হযরত মাওলানা শাহ ওয়ারিস হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪৯. হযরত আল্লামা সায়্যিদ আবদুর রহমান কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫০. হযরত মাওলানা শাহ শরফউদ্দীন আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫১. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগর হুসাইন দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫২. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসান পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫৩. হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন মিসওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫৪. হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ (নূর আহমদ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫৫. হযরত মাওলানা হাকিম জাহিদ হাসান আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫৬. হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ লাজকিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫৭. হযরত হাজী নিয়ায মুহাম্মদ জানাশিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫৮. হযরত মাওলানা মুনাওয়ার আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫৯. হযরত মাওলানা আসআদ আফন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬০. হযরত কাজি মুরতাযা হুসাইন আজিজ হায়দরাবাদী মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মাঙ্গুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬২. হযরত মাওলানা কারামত আলী আম্বলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬৩. হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬৪. হযরত মাওলানা শাখাওয়াত আলী আম্বুটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৬৫. হযরত মাওলানা আবদুল হাই গাদ্দলাগামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬৬. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ শাহ জালালাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬৭. হযরত মাওলানা হাকিম সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী লৌখনভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬৮. হযরত মাওলানা কাজি মুহিউদ্দীন খান মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬৯. হযরত হাজী মুহাম্মদ আনওয়ার দেওবন্দী

(**সূত্র:** হযরত ড. হাফিজ ক্বারী ফাইযুর রহমান প্রণীত "হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ. আওর উনকি খুলাফা", মজলিস নিশরিয়াত ইসলাম, ১৯৮৪।)

তালিকার ১০ নাম্বারে উল্লেখিত শায়খের পরিচিতির উপর মূল্যবান কিছু তথ্য হযরত মুফতী নূরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রকাশ করেছেন। এখানে তার সারসংক্ষেপ সবার অবগতির জন্য তুলে ধরছি।

মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ বাঙ্গালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রথমে হযরত ফজলে হক্ব গঞ্জে মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তবে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট মুজায ছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকেই তিনি খিলাফত লাভ করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আরো যারা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মাওলানা সুফী আজিজুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বাংলাদেশের 'উম্মুল মাদারিস' নামে খ্যাত হাটহাজারী মাদ্রাসা আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। (মাশায়েখে চিশত)

আমাদের শাজারায় পরবর্তী বুজুর্গের নাম হচ্ছে ইমামে রাব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুতরাং এখন আমরা তাঁরই জীবনালোচনায় মনোনিবেশ করছি, ইনশাআল্লাহু তা'আলা। ওমা তাওফিক্বী ইল্লা-বিল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ১৪

কুতবুল ইরশাদ হযরত শায়খ
মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(জন্ম: ১২৪৪ হি. (১৮২৬ ঈ), ওফাত: শুক্রবার ৮ জুমাদিউস সানী ১৩২৩ হিজরি, ১১ আগষ্ট ১৯০৫ ঈসায়ী, সমাধি: গাঙ্গুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত।)

ভারতের সাহারানপুরের অদূরে গাঙ্গুহ শরীফ অবস্থিত। চিশতিয়া তরীকার ইতিহাসে এই ছোট্ট শহরটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, এই শহরের জমিনে শায়িত আছেন তরীকার তিন জন জগতখ্যাত শাইখুল মাশাইখ। এই তিন জনের সর্বশেষ মহাত্মন ব্যক্তি হলেন কুতবুল ইরশাদ, ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অপর দু'জন হলেন শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী এবং শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু সাঈদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হলেন জলীল কদর সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ হিসাবে হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন 'আয়ূবী'।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৪৪ হিজরি (১৮২৬ ঈ) সনে গাঙ্গুহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো মাওলানা আহমদ। মাত্র ৭ বছর বয়সের সময় রশীদ আহমদ সাহেব তাঁর পিতাকে হারান। ইয়াতীম এই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল তারকার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর দাদা। প্রাথমিক পড়ালেখার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন।

মিয়াজী কুতুব বখশ গাঙ্গুহী ছিলেন তাঁর প্রথম উস্তাদ। অল্প বয়সের সময়ই হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মেধার বিকাশ ঘটা

শুরু হয়। মিয়াজী সাহেব তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর এক বৈশিষ্ট্য ছিলো: নিজের ছাত্রদের মুখমণ্ডলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন। এরপর ছাত্র বাসায় কি ভক্ষণ করেছে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। এরপর বলতেন, "তুমি একাই খেলে! আমার জন্য একটু খাবার নিয়ে আসলে না কেন?"

মিয়াজী সাহেবের এই অভ্যেস হেতু ছেলে রশীদ আহমদ বাড়ি থেকে খাবার সাথে নিয়ে আসতে লাগলেন। কিন্তু তা ছিলো নিজের নাস্তা। নিজে না খেয়ে উস্তাদের জন্য নিয়ে আসতেন। ব্যাপারটি বাড়ির কেউ প্রথমে জানতে পারেন নি। একদিন দেখা গেল তার কাপড়ের মধ্যে তেলের দাগ পড়ে গেছে। সকলে প্রশ্ন করলেন, এই দাগের কারণ কি? সুতরাং উস্তাদের জন্য তার এই ক্ষুদ্র কুরবানীর কথা জানাজানি হয়ে গেল। এই ঘটনা থেকেই হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাল্যকালীন উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ মিলে।

হযরতের মামা মাওলানা মুহাম্মদ তাকী সাহেবের নিকট তিনি বেশ কিছুদিন ফার্সির উপর লেখাপড়া করেন। এছাড়া যুবক বয়সে আরো যাদের নিকট তিনি ফার্সি, আরবি এবং দ্বীনি শিক্ষালাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে মৌলভী মুহাম্মদ গউস ও মৌলভী মুহাম্মদ বখশ রামপুরীর নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এরপর ১৭ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য চলে যান দিল্লীতে।

উচ্চশিক্ষা লাভ

দিল্লীতে এসে হযরত রশীদ আহমদ সাহেব বিভিন্ন উস্তাদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। তবে কেনো যেনো কারো নিকটই তিনি পুরোদমে মনের খোরাক পাচ্ছিলেন না। সুতরাং দিল্লী শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘুরতে লাগলেন। এরপর আল্লাহর অসীম কৃপায় সকল বিষয়ের উপর পারদর্শী এক উস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। হযরত মাওলানা মামলুক আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজায সফর শেষে নানুতা যাওয়ার পথে দিল্লীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করলেন। তাঁর সাথী ছিলেন হযরত কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। উদ্দেশ্য ছিলো দিল্লীতে থেকে কিছুদিন শিক্ষাদান করা।

ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খবর পেয়ে সাথে সাথে হযরত মামলুক আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ছাত্র হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এভাবে তিনি মাওলানা মামলুক আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বাহ্যিক শরীয়তের উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন। এসময় তিনি 'সদরে শামসে বাযিগাহ' কিতাবখানা একজন হাফিজ যেভাবে কুরআন হিফজ করেন ঠিক সেরূপ অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর 'মানতিক', ও 'কালাম' শাস্ত্রের উস্তাদদের মধ্যে হযরত মাওলানা মুফতি সদরুদ্দীন এবং কাজী আহমাদ উদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। আর হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করেন হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গণি নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। তিনি বলেছেন, দিল্লীতে থাকাকালে দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিদ্রা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিসহ মাত্র ৭ ঘণ্টা নিজের কাজে ব্যয় করতেন। আর বাকী ১৭ ঘণ্টা শুধুমাত্র লেখাপড়ার মধ্যে কেটে যেতো। এভাবে ৪ বছর দিল্লী শহরে থেকে শিক্ষালাভ করেন। বাড়ি থেকে মাসিক মাত্র ৩ রুপি আসতো। এই অল্প টাকার দ্বারাই তিনি যাবতীয় খরচ আঞ্জাম দিতেন।

উস্তাদ হিসাবে গাঙ্গুহে

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২১ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর ফিরে আসেন জন্মস্থান গাঙ্গুহে। এখানকার এক মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। হিজরি ১৩০০ সাল পর্যন্ত কর্মরত থাকার পর হযরত শুধুমাত্র হাদীসের উপর শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি একাই সিহা সিত্তার প্রতিটি কিতাবের পাঠদান করতেন। প্রতি বছরের শাওয়ালে শুরু করে শা'বান মাসে সব কিতাব শেষ করে দিতেন।

বাইআত গ্রহণ ও খিলাফত লাভ

বাইআত ও সুলুক সম্পর্কে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এসময় আমি ও মাওলানা কাসিম সাহেব দিল্লীতে অধ্যয়নরত ছিলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিলো 'সুল্লাম' নামক কিতাবখানা বেশী

পড়বো। কিন্তু আমাদের উস্তাদ খুব ব্যস্ত থাকায় শেষ পর্যন্ত সিন্ধান্ত হলো সপ্তাহে মাত্র দু'দিন এই কিতাব পড়ানো হবে। একদিন সুল্লাম পাঠের সময় সবুজ লুঙ্গি কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় একব্যক্তি ক্লাসরুমে ঢুকলেন। উস্তাদসহ কক্ষের সকলেই একে একে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাগলেন। উস্তাদ সাহেব বললেন, "রশীদ! দারস্ অন্যদিন হবে।"

এতে আমি খুব একটা আনন্দিত হলাম না। মাওলানা কাসিম সাহেবকে অনেকটা বিরক্তিসহ বললাম, "ইনি তো ভালো হাজী! তার জন্য আমাদের দারস্ বন্ধ হয়ে গেল!"

মাওলানা কাসিম নানুতুবী সাহেব সাথে সাথেই পাল্টা জবাব দিলেন, "আরে, এরূপ বলতে নেই। তিনি বড়ো বুজুর্গ এবং নির্বাচিতদের অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, "আমি তখন জানতাম না, এই হাজী সাহেবই শেষ পর্যন্ত আমাদের মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শক হবেন। ছাত্রাবস্থায় হাদীস অধ্যয়নকালে উস্তাদ আবদুল গণি মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে বেশ কিছুদিন ছিলাম। মনে মনে ইচ্ছা ছিলো তাঁরই হাতে বাইআত গ্রহণ করবো। কিন্তু যখনই এ ইচ্ছা পূরণে উদ্যোগ নিয়েছি তখনই আমাকে মাওলানা কাসিম সাহেব বারণ করে দিতেন। তিনি বলতেন, আমাদেরকে হযরত হাজী সাহেবের হাতে বাইআত গ্রহণ করা উচিত।"

এরপর হাজী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ দিন দিন বাড়তে লাগলো।

ইমামে রব্বানী একদা থানাভন গেলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে কোনো এক ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহণ ছিলো এই যাত্রার মূল কারণ। তবে আলোচনা শুরুর পূর্বে তিনি চলে গেলেন হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। এটা ছিলো গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পঞ্চমবারের মতো সাক্ষাৎ। তাঁকে দেখে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুখ

উত্তোলন করে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেনো এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি এসেছি হযরত থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে একটি ব্যাপারে আলোচনা করতে। হাজী সাহেব বললেন, "ওহ! না, না। এরূপ করো না। তিনি আমার বুজুর্গ!"

গাঙ্গুহী সাহেব বললেন, "তিনি যদি আপনার বুজুর্গ হয়ে থাকেন, তাহলে আমারও বুজুর্গ!" এরপর তিনি বললেন, "হযরত! আমার ইচ্ছা আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করবো।" কিন্তু হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অস্বীকৃতি জানালেন। এটা ছিলো সামান্য পরীক্ষা মাত্র। এদিন গাঙ্গুহী সাহেব চলে আসলেন। পরদিন যেয়ে একইভাবে বাইআত গ্রহণের আবেদন জানালেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন।

বাইআতের সময় রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হযরত! আমি জিকির-শুগুল, রিয়াজত-মুজাহাদা আদায় করতে পারবো না! এছাড়া রাত্র জাগরণও আমার জন্য সম্ভব নয়! একথা শুনে মক্কী সাহেব মৃদু হাসলেন। বললেন, "ভালো কথা! এসবের প্রয়োজন নেই!"

পরবর্তীতে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক ঘনিষ্ঠজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! এরপর কি হলো? তিনি জবাব দিলেন, "এরপর? এরপর মৃত্যু ও ফানার ঘটনা ঘটলো!"

তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হে রশীদ আহমদ! এখন থেকে তোমাকে তেরো তাসবীহ জিকির আদায় করতে হবে। সুতরাং পীরের নির্দেশ মুতাবিক তিনি প্রত্যহ রাতে তাহাজ্জুদের সময় জেগে ওঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় শেষে চিশতিয়া তরীকার 'তেরো তাসবীহ' জিকির আদায় করতে লাগলেন। একই সময় তাঁর পীর হজরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অপর একটি কক্ষে তেরো তাসবীহ আদায় করছিলেন। অল্প বয়স হেতু রশীদ আহমদ সাহেব ভীষণ আগ্রহভরে জিকির আদায় করতেন। একদিন ভোরে

হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “তুমি তো দেখছি বেশঅভিজ্ঞ লোকদের মতো জিকির করতে জানো!”

ইমামে রব্বানী পরবর্তীতে বলেছেন, এদিন থেকেই আমি জিকিরের মধ্যে ভীষণ স্বাধ অনুভব করতে লাগলাম। এভাবে এক সপ্তাহ চলে যাওয়ার পর, হাজী সাহেব কোনো এক মুহূর্তে বললেন, “মৌলভী রশীদ আহমদ! আল্লাহ তা’আলা আমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, আমি তা-ই তোমাকে দান করেছি। ভবিষ্যতে এসব নিয়ামতকে আরো কার্যকরী করা তোমার দায়িত্ব।”

হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন, “সেদিন হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে কী দিয়েছিলেন? আমি দীর্ঘ ১৫ বছর পরে তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম।”

ইমামে রব্বানী হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বমোট ৪২ দিন স্বীয় পীরের সুহবতে অবস্থান করেন। বিদায়ক্ষণে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “মিয়া রশীদ আহমদ! যদি কেউ তোমার হাতে বাইআত গ্রহণ করার ইচ্ছাপোষণ করে তাহলে তুমি অস্বীকৃতি জানাবে না। বাইআত করে নেবে।” সুতরাং হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র ৪২ দিন পীরের সুহবতে থাকার পর খিলাফত লাভ করলেন।

খিলাফত লাভ করার পর হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ইমামে রব্বানী জিজ্ঞেস করলেন, “হযরত! আমার কী-ই বা যোগ্যতা আছে যে, আমার হাতে বাইআত গ্রহণ করতে কেউ আসবে?” তিনি জবাব দিলেন, “এতে চিন্তার কারণ নেই। আমি শুধু বলছি কেউ আসলে দূরে সরিয়ে দেবে না। আমি যা বলছি তা-ই করো, কে আসবে বা না- তা চিন্তা করো না।”

জিকির-মুরাক্বাবা

মাত্র ৪২ দিন পীরের সুহবতে থাকার পর খিলাফত লাভ এবং বাইআত করার নির্দেশ পেয়ে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মস্থানে ফিরে এসে কঠোর ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-মুরাক্বাবা ও রিয়াজত-মুজাহাদায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তবে তিনি তখনো একজন যুবক মাত্র। কাউকে মুরীদ করার সাহস পাচ্ছিলেন না। যদিও অনেকে মুরীদ হওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি নিজের মধ্যে অনুভব করছিলাম, কাউকে বাইআত করার যোগ্যতা আমার মাঝে নেই। কিন্তু কী করা যায়? মুর্শিদ আমাকে নির্দেশ করেছেন, তা-তো মানতে হবে।"

তাঁর কঠোর সাধনার সামান্য নমুনা মিলে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে। থানাভন থেকে গাঙ্গুহে এসে তিনি প্রথমে স্বীয় চাচাতো ভাই মাওলানা আবু নাসির সাহেবের বাড়িতে উঠেন। গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে আবু নাসির বলেন, "রাতের গভীরে তিনি জেগে উঠতেন এবং মসজিদে চলে যেতেন। আমি প্রায়ই তাঁর পেছনে অগ্রসর হতাম। তিনি যখন মসজিদে বসে একা একা 'জিকরে জলি' করতেন তখন সমগ্র মসজিদের দেওয়াল পর্যন্ত কাঁপতে থাকতো। এ সময় তাঁর অবস্থা কি ছিলো একমাত্র তিনি নিজেই জানতেন।"

এ সময় থেকে হযরতের ক্রন্দনের মাত্রাও বেড়ে যায়। কোনো সময় সারারাত কেঁদে কাটিয়ে দিতেন। হযরতের মাতা একখানা সবুজ চাদর বানিয়ে দিলেন। ভীষণ ঠাণ্ডার রাতে মসজিদে যাওয়ার সময় এই চাদরখানা তাঁর গায়ে থাকতো। অঝোর ধারায় চোখের অশ্রু পড়ার সময় এই চাদর দ্বারা তিনি চোখদ্বয় মুছে নিতেন। ফলে চাদরের রং বদলে যায়। অবশ্য একইসময় তিনি হাদীসের পাঠদানে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর অবস্থার কথা হজরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জানতে চাইলেন।

তিনি পত্র লিখে জবাব দিলেন:

"উভয় জগতকে বিসর্জন দেওয়া সম্পর্কে আপনি এই অধমের হালত কীরূপ জানতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার মতো এক নালায়েক অবস্তুর অবস্থা কী-ই বা মূল্য

রাখে যে, তা প্রকাশ হবে সর্বোত্তম ও সবদিক থেকে পরিপূর্ণ অশেষ নিয়ামতের ফোয়ারার সম্মুখে? খোদার কসম! আমি সত্যিই লজ্জিত। আমি কিছুই নয়। তবে হযরতের নির্দেশহেতু আমি দু'একটি কথা লিখতে বাধ্য। হযরত মুর্শিদ! আমার ইলমে জাহিরের হাল হলো, আপনার সুহবত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাত বছরের মধ্যে মোট ২০০ জন হাদীস শাস্ত্রের উপর পারদর্শী হয়েছেন। যাদের সকলেই আমার ছাত্র। এদের অধিকাংশ ইলমে হাদীসের খিদমাত আঞ্জাম দিচ্ছেন নিজেরা পাঠদানের মাধ্যমে। তাঁরা দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করছেন। আল্লাহ তা'আলা যদি কবুল করেন তাহলে এ থেকেও বড়ো কোনো খিদমাত আঞ্জাম দেওয়া যায় না।

মোটকথা, হযরত! আপনার খিদমাতে উপস্থিতির সুফল হলো, কারো উপকার কিংবা অপকারের প্রতি আমি ভ্রূক্ষেপই করি না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনাই আমার ব্রত। ওয়াল্লাহ! কোনো কোনো সময় মাশাইখদের নৈকট্য থেকে আমি বঞ্চিত হই। কিন্তু কারো পক্ষ থেকে প্রশংসা লাভ কিংবা সমালোচনার শিকার হওয়ার প্রতি আমি মোটেই চিন্তিত নই। আমি এই উভয় দল থেকে বহু দূরে।হযরত মুর্শিদ! ইতোমধ্যে আমার মাঝে দু'টি ব্যাপার বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে: গুনাহ হওয়ার প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা এবং বাধ্যতার প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ। এই অবস্থার কারণ অবশ্যই আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আর অতিরিক্ত কিছু বলছি না, বেশ বে-আদবী হয়ে যাবে। আমি মিথ্যা বলা থেকে আল্লাহর দরবারে ফানাহ চাই। আমি এসব কথা বললাম, হযরত! একমাত্র আপনার নির্দেশ পালনার্থে। বাস্তবেই আমি কিছুই নয়। এসবই আপনার ছায়া- একমাত্র আপনার অস্তিত্ব। আমি কে? আমি কেউ নয়। শুধু তিনি। 'তুমি' এবং 'আমি' শিরকের উপর শিরক! আস্তাগ¦ফিরুল্লাহ! আস্তাগ¦ফিরুল্লাহ! আস্তাগ¦ফিরুল্লাহ! ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ। অতিরিক্ত বলায় আমাকে দয়াকরে ক্ষমা করুন। ওয়াসাল্লাম (১৩০৬ হিজরি)।" (মাকাতিবে রাশীদিয়া - হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'মাশাইখে চিশত' থেকে।)

হযরত ইমামে রব্বানীর ইলমী মাক্বাম

তাঁর ইলমের গভীরতা ও দূরদৃষ্টি ছিলো বিরাট। হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী হচ্ছেন এ যুগের আবু হানিফা”। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা’আলার অত্যাশ্চর্য ‘কুদরত’ ছিলেন। তাঁকে মানুষ ‘চলন্ত কুতুবখানা’ বলে সম্বোধন করতো। এই চলন্ত কুতুবখানা একবার বললেন, “আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে যদিও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী উঁচু দরজার অধিকারী নন, তবে তাঁর থেকে খুব একটা নীচেও তিনি অবস্থান করছেন না। যে কোনো আলিম মাত্রই আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাক্বাম সম্পর্কে অবগত, যার অপর পরিচিতি হলো, ‘রাদ্দুল মুহতার’।”

ইলমী কোনো ‘ইশকাল’ তথা প্রশ্নের ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম যখনই হতাশগ্রস্ত হয়েছেন তখনই তাঁরা সেটা হযরত ইমামে রব্বানীর দরবারে পেশ করতেন সমাধানকল্পে। তিনি এমন সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য জবাব দিতেন যে, তাতে সকলেই সন্তুষ্ট হতেন। খ্যাতিমান আলিম মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন এক উঁচু দরজার ব্যক্তিত্ব যে, তিনি আল্লাহ তা’আলার মা’রিফাতের মহাসাগরে ডুবন্ত থেকেও ঢেকুর পর্যন্ত দেন না।”

একদা একব্যক্তি হযরত ইমামে রব্বানীকে জিজ্ঞেস করলো, “হযরত! দিনের বেলা জিকির করার বদলে কেউ যতি রাতে করে তাহলে কি সমান নেকী লাভ করবে?” তিনি জবাব দিলেন, “কেনো লাভ করবে না?”। এরপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

-"তিনিই স্বীয় রাহমাতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অনে¡ষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (২৮:৭৩)

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশ্ববিখ্যাত "ফাতওয়ায়ে রশীদিয়া" কিতাবখানা অনেকদিনে সংগ্রহিত হয়েছিল। তিনি সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দান করতেন হানাফী ফিকহ্ অনুযায়ী। এসব প্রশ্ন-উত্তরের সংকলনই হলো উক্ত কিতাবখানা যা থেকে আজো মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

কথিত আছে বিয়ের পর হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফ মাত্র ১০০ দিনে হিফজ করেছিলেন। এ থেকে তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রখরতা কিরূপ ছিলো তার প্রমাণ মিলে।

উত্তম আখলাক

তিনি খুব পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব বেরেলভীর আহমদ রেজা খান হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে লিখিতভাবে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেন। হযরতের বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাক্সক্ষীরা এতে বেশ মর্মাহত হতেন। তাদের ইচ্ছা হতো ওসব অগ্রহণযোগ্য লেখালেখির সমুচিত জবাব দেবেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বারণ করে দেন। বললেন, "কিছুই বলো না বা লিখো না।" তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, রেজা খান সাহেবের বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব দেওয়া সময় নষ্ট করার নামান্তর বৈ নয়। তিনি কোনো উপদেশও গ্রহণ করবেন না।

অন্য আরেক দিন একজন ভক্ত হযরতকে আবদার জানালো, হযরত! দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন। আমি রেজা খান সাহেবের সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে চাই। তিনি বললেন, "আমার পক্ষ থেকে মাওলানা রেজা খানকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার বদলে তোমার উচিত কোনো এক কোণে বসে আল্লাহর জিকির করা। তার কথার জবাব দিতে যে সময় ব্যয় হবে তা জিকিরের মধ্যে কাটানো

তোমার জন্য ঢের বেশী উপকারী হবে। কারণ, মাওলানা রেজা খানের বিরুদ্ধে লিখে তোমার কোনো ফায়দা হবার নয়।” কী অপূর্ব দিকদির্দেশনা! ভেবে দেখার বিষয়, আজকের যুগে আমরা সময়ের কিরূপ অপচয় করছি। মহামূল্যবান সময়কে খরচ করছি এমন কিছু কাজে যা থেকে আমাদের কোনো উপকার হচ্ছে না।

মাওলানা রেজা খান বেরেলভী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন। তার বিরুদ্ধবাদীরা এতে খুব আনন্দিত হলো। অনেকে এটাও মন্তব্য করলো যে, আল্লাহর ওলি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি ভীষণ বে-আবদীপূর্ণ ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে এই কঠিন রোগে আক্রান্ত করেছেন। কিন্তু যখন ইমামে রব্বানী রেজা খানের অসুস্থতার সংবাদ শ্রবণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন, “কেউ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়, সে তোমার যত বড়ো দুশমনই হোক না কেনো, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এ সময় খুশী হতে নেই।”

হাকীম

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উচ্চ পর্যায়ের ওলি এবং ফকীহ তো ছিলেন-ই, সেসাথে একজন দক্ষ হাকীম বা ডাক্তার হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিলো। তাঁর পরিবারের একজন মহিলা একদা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হযরতের কাছে এসে বললেন, “আপনি হচ্ছেন বিজ্ঞ আলিম। দয়া করে কিতাব দেখে আমার রোগমুক্তির উপায় খুঁজে দেখুন। ইতোমধ্যে সব ডাক্তার-কবিরাজ ব্যর্থ হয়েছেন।”

হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তাঁর এক চাচা হাকিম ছিলেন। মহিলার রোগ ও তার প্রতিকার কী হতে পারে সে ব্যাপারে হযরতের ধারণা জন্মালে চাচার নিকট যেয়ে সব কথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর চাচা হযরত রশীদ আহমদকে খুব শ্রদ্ধার চোখে

দেখতেন। তিনি জানতেন, তাঁর এই ভাতিজা সাধারণ ব্যক্তি নন। সবকিছু দেখার পর তিনি বললেন, “হ্যাঁ ভাতিজা! তোমার ধারণা সঠিক।” এদতশ্রবণে হযরত ঐ মহিলাকে ঔষধ সেবন করানোর পর আল্লাহর মর্জিতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠলেন।

সফল এই চিকিৎসার সংবাদ শীঘ্র সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। অনেক মানুষ তাঁর দরবারে ছুটে আসতে লাগলেন। হযরতের চিকিৎসার বদৌলতে অনেকেই আল্লাহর হুকুমে আরোগ্যলাভ করলেন। তাঁর এক পুত্রের নাম মাসুদ। পরবর্তীতে তিনি হাকীম মাসুদ হিসাবে পরিচিত হন। তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাকিমী শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

পবিত্র হাজ্জ পালন

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মোট তিনবার পবিত্রহাজ্জ পালন করেন। প্রথমবার হাজ্জে গমন করেন ১২৮০ হিজরি সনে। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত মাওলানা আবদুল হাক্ব রামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এছাড়া আরোও যারা তাঁর সঙ্গী হন তাদের মধ্যে হাকিম জিয়াউদ্দীন, হাফিজ ওয়াহিদুদ্দীন, হাজী আলাউদ্দীন, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ এবং মাওলানা আবুন নাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন হযরতের মামাতো ভাই।

এসময় অবশ্য মক্কা মুয়াজ্জমায় হযরতের মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবস্থান করছিলেন। প্রিয় মুরীদ ও খলীফার আগমনে তিনিও বেশ উৎফুল্ল হয়েছিলেন। আগন্তুকদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মক্কা শরীফ থাকাকালে ইমামে রব্বানী ও তাঁর সকল সাথীদের মেজবান হিসাবে স্বয়ং মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হাজ্জ পালনের সময়ও মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরউট হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উটের সাথে সাথে বিচরণ করে।

স্বপ্ন

পবিত্র মক্কায় থাকাকালে হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম আহলে খিদমাতের একটি বড় কাফিলা কোথাও ভ্রমণরত আছে। আমি স্বপ্নে থাকাকালেই দুআ করলাম: "হে আল্লাহ! আমাকে এই মুবারক কাফিলার সঙ্গী করুন"। এরপর দেখলাম, আমি কাফিলার দিকে দৌড়ে চলে তাদের সাথী হলাম।" ভোরে এই স্বপ্নটি মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি মৃদু হাসলেন। এরপর বললেন, "তুমি আর কি চাও? তুমি তো ইতোমধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে গেছো!"

ফিরতি যাত্রার সময় হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাহাজযোগে বোম্বে শহরে পোঁছার পর বিভিন্ন ডাক্তার তাঁকে ঔষধপত্র দিলেন। কিন্তু ডায়োরিয়ায় আক্রান্ত হযরতের অবস্থার তেমন উন্নতি হলো না। অবশেষে প্রখ্যাত ডাক্তার হাকিম মুহাম্মদ আজম খান সাহেব তাঁর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। আল্লাহর রহমতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠলেন। হিজরি ১২৮২ সালের মুহাররম মাসে প্রথম হাজ্জ শেষে তিনি গাঙ্গুহতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৯৪ হিজরি সনে দ্বিতীয়বার হাজ্জের সফরে যান। এসময় তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। ফলে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাজ্জে যাওয়ার নামে বাস্তবে বৃটিশ বিরোধী জিহাদের প্রস্তুতির জন্য হিজায সফরে যাচ্ছেন। কিন্তু এই গুজব ছিলো সত্যবহির্ভূত। তিনি আসলে বাইতুল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই হাজ্জে যাত্রার ইরাদা করেন। এই সফরেও একদল উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কিরামসহ শতাধিক লোক তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। এখানে বিশিষ্ট ক'জনের নাম উল্লেখ করছি: হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতুবী, হাকিম জিয়াউদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ মাজহার এবং তাঁর স্ত্রী, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব, মাওলানা রফিউদ্দীন, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসান এবং মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রপথিক এসব উলামায়ে

কিরাম একসাথে হিজায ভ্রমণে যাচ্ছেন জেনেই কিছু লোক আগে উল্লেখিত গুজব তুলেছিল।

কারামত

দ্বিতীয় হাজ্জে যাত্রার সময় এক অত্যাশ্চর্য কারামত প্রকাশ পায়। হযরতের ভাতিজা ও সফরসঙ্গী মৌলভী আজিজুর রহমান বর্ণনা করেন, “আমরা যাত্রার শুরুতে ট্রেনযোগে বুম্বাই যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক স্টেশনে পৌঁছলে ফযরের নামাযের ওয়াক্ত হলো। সফরের আমীর ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে নির্দেশ দিলেন, নামুন। ফযরের নামায স্টেশনের প্লাটফর্মে পড়ে নেবো। সুতরাং সকলে নেমে গেলেন। হযরত প্রথমে দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করলেন। ট্রেনের সকল মুসলমান পুরুষ নামাযের জন্য নেমে পড়লেন। জামাআত শুরু হয়ে গেল। ঐদিকে ট্রেন ছাড়ার হুইসেল পড়লো। নামাযের তখনো অনেক বাকী। অনেক লোক হুইসেল শোনে নামায ভেঙ্গে ট্রেনে উঠে গেলেন। এদিকে ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব ধীরস্থিরে নামায পড়াচ্ছিলেন। ট্রেন চলে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি যেনো কিছুই বুঝেন নি। ট্রেনের চালক চেষ্টা চালালো ট্রেন ছেড়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহর কী কুদরাত! ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। চালক বার বার চেষ্টা করেও ট্রেন চালাতে পারলো না। পুরো পনের মিনিট চলে গেল। ইমামে রাব্বানী শান্তিমতো নামায পড়ে ট্রেনে আরোহণ করলেন। তাঁর সীটে বসার পরই ট্রেনখানার ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে ওঠলো। ট্রেন চলতে লাগলো। অবশেষে ট্রেনখানা ঠিক সময় মতোই বুম্বাই স্টেশনে পৌঁছলো।

অপর আরেক কারামত প্রকাশ পেলো বুম্বাই শহরে অবস্থানকালে। হযরতের বেশ কিছু সফরসঙ্গী তখনো কাফিলার সঙ্গে এসে যোগ দেন নি। যেদিন জাহাজ আসার কথা ছিলো সেদিন আসলো না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ ২২ দিন পর জাহাজ আসলো। ইতোমধ্যে হযরতের সকল সফরসঙ্গী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাফিলার সঙ্গে যোগ দিলেন। বুম্বাই থেকে একটি জার্মান জাহাজযোগে কাফিলা ৮ দিনের সমুদ্রভ্রমণ শেষে আদেন শহরে পৌঁছলেন। একদিন ও একরাত এখানে অবস্থানের পর জাহাজ

জিদ্দার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো। আরো ৬ দিনের ভ্রমণশেষে জাহাজ জিদ্দায় এসে থামলো। ২১ জিলকদ কাফিলা মক্কা মুকাররমায় পৌঁছলেন।

এই বিরাট কাফিলার আগমন সম্পর্কে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আগে থেকেই অবগত ছিলেন। বাবে মক্কার নিকটে তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে শহরে প্রবেশরত কাফিলাকে উষ্ণ স্বাগত জানালেন। ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উট থেকে অবরোহণ করেই প্রিয় মুর্শিদকে আবেগ-আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর কাফিলাকে নিয়ে যাওয়া হলো হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রিবাতে।

রাত্রি যাপন শেষে সবাইকে নাস্তা দেওয়া হলো। তবে ইমামে রব্বানী রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, হযরত! কাফিলা তো বিরাট বড়ো। আপনার বেশ তাকলিফ হবে। কিন্তু হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মানলেন না। সবাইকে তৃপ্তিসহ আপ্যায়ন করালেন। বিরাট এই মুবারক কাফিলার আতিথেয়তার সুযোগ পেয়ে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, “আমার জন্য এই সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।”

পবিত্র হাজ্জ সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পুরো কাফিলাসহ মদীনা মুনুওয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজায়ে আতহার জিয়ারত করে পুনরায় মক্কা শরীফ ফিরে আসলেন। আরো একমাস চলে গেল। পবিত্র নগরী থেকে চলে যেতে মন চাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত একদিন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রিয় এই খলীফাকে ডেকে বললেন, “মাওলানা! আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হোক তা মানতে আমার অন্তর নারাজ। তথাপি, আপনার সাথীদের টাকা সীমিত হয়ে আসছে। এছাড়া হিন্দুস্থানের মানুষ আপনার অনুপস্থিতি হেতু ফুয়ূজ-বরকত থেকে বঞ্চিত আছে। আমার মনে হয় কাফিলাকে নিয়ে ফের যাত্রার সময় এসে গেছে।” হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আর কালবিলম্ব না করে সবাইকে নিয়ে হিন্দুস্থানের পথে পাড়ি জমালেন।

তাঁর শেষ হাজ্জের সফরে তেমন বেশী সফরসঙ্গী ছিলেন না। অনেকে জানতেন-ই না। হিজরি ১২৯৯ সালের জিলকদ মাসের ৪ তারিখ এই যাত্রা শুরু করেন হযরত ইমামে রাব্বানী। বুম্বাই পৌঁছে জানতে পারলেন হিন্দুস্থানী প্রায় সকল হজ্জযাত্রী জিদ্দার উদ্দেশ্যে জাহাজযোগে রওয়ানা হয়ে গেছেন। মাত্র ক'জন যাত্রী তখনো আশা ছাড়েন নি- বুম্বাই বসে অপেক্ষা করছিলেন। হয়তো কোনো রাস্তা খুলে যেতে পারে। হযরত ইমামে রব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বন্ধুদের অনেকেই কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়লেন। তারা জিদ্দা যাত্রার টিকিট ক্রয় করতে তাঁকে নিষেধ করলেন। বললেন, এখন আর জিদ্দাগামী জাহাজ মিলবে না। এছাড়া হজ্জের তারিখও অনেকটা নিকটে। সৌদি সরকার ঐ বছর থেকে নতুন আরেক 'কুয়ারান্টিন' আইনও করে নিয়েছিল। এই আইনের আওতায় হজ্জ যাত্রীদেরকে অন্তত ১০ দিন পূর্বে জিদ্দায় যেয়ে উপস্থিত হতে হবে। এতোসব সমস্যার কথা জেনেও ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হজ্জে যাত্রার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। একখানা জিদ্দাগামী জাহাজের টিকিট ক্রয় করে যাত্রা শুরু করলেন।

দীর্ঘ ৭ দিন অনবরত যাত্রাশেষে জাহাজখানা আদেন সমুদ্রবন্দরে এসে নোঙ্গর ফেললো। তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিরতি শেষে আবার তা ছেড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন- যাতেকরে জিদ্দা সমুদ্রবন্দরে সময়মতো পৌঁছা যায়। সুতরাং মাত্র ৯দিন সমুদ্রপথে ভ্রমণশেষে জাহাজখানা সকল হজ্জযাত্রী নিয়ে গন্তব্যস্থলে হাজির হলো। কুয়ারান্টিন আইন সম্পর্কে কেউ অবগত ছিলেন না। তবে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো জিদ্দা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। জেটি থেকে বেশ দূরে নোঙ্গরকরা জাহাজ থেকে সকল যাত্রী ছোট্ট ছোট্ট নৌকোয় তীরে এসে অবতরণ করলেন।

পবিত্র হজ্জ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে আদায় হলো। হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তৃতীয় ও শেষবারের মতো প্রিয় মুর্শিদ হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভ করলেন। সর্বশেষ এই হজ্জ শেষে ইমামে রাব্বানী ভারতে ফিরে এসে বাকী জীবন শিক্ষাদান ও তাযকিয়ায়ে নফসের খিদমাতে কাটিয়ে দেন। গণনাতীত মানুষ হযরতের সান্নিধ্য থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর মুরীদিনের সংখ্যা ছিলো বিরাট।

জীবনের শেষ ক'টি দিন

মানুষ মরণশীল। এ বসুন্দরায় আগমন মাত্র ক'দিনের মুসাফিরী বৈ নয়। তবে এখানে আসার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক অতি গুরুত্ববহ রহস্য। আলমে আরওয়ায় সেই আদি যুগে আমাদের সৃষ্টি হলেও আমরা ছিলাম সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অচেতন। শিশু যেভাবে মায়ের পেটে অবস্থানকালীন কিছুই স্মরণ রাখে না, ঠিক তদ্রূপ রূহানী জগতে আমাদের অবস্থানের 'স্মৃতি' আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এরপর শিশু যেভাবে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে ও পারিপার্শ্বিকতা ও নিজের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়, ঠিক তদ্রূপ রূহানী জগত থেকে আমাদের 'আত্মাকে' দেহপিঞ্জরে এনে 'জন্ম' দেওয়া হয়েছে এবং বেড়েওঠা তথা প্রভুকে 'স্মরণ' করার যাবতীয় উপায়-উপাদান শেখানো হয়েছে। এ কারণেই মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা বার বার তাঁর স্মরণ বা 'জিকির' করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইহলোকে আসার আসল কারণ হলো প্রভুকে 'স্মরণ' করা এবং তাঁর আনুগত্যে নিমজ্জিত হওয়া। জিকির ও আনুগত্য ছাড়া পরকালের অনন্ত জীবনে অফুরন্ত সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না। আর তা-ই যদি হয় আমাদের পরিণতি তাহলে এই ধরায় আগমন ব্যর্থ-নিষ্ফল হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি।

সবার মতো ইমামে রাব্বানীও একদিন এই বসুন্দরা থেকে বিদায় হলেন। জীবনের সায়াহ্নে এসে ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। হিজরি ১৩১৩ সাল পর্যন্ত দ্বীনের কাজে নিজেকে জড়িত রাখার পর ১৩১৪ হিজরির শুরুতে তিনি অন্ধত্ববরণ করেন। তবে এরপরও আরো ১১ বছর তিনি ভীষণ কষ্টে জীবন-যাপন করেছেন। এসময় উলূমে জাহির শিক্ষাদানে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে অপারগ হলেও উলূমে বাতিন প্রদানে কোনো কসুর করেন নি। তাঁর অসংখ্য মুরীদ সান্নিধ্য ও সুহবত দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। অবশেষে ১৩২৩ হিজরির ৮ জুমাদিউস সানী শুক্রবার দিন জুমু'আর আযানের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মহান আল্লাহ তা'আলা অনেক ফযল ও করম দান করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিলো, শহিদী দরজা। তাঁর মৃত্যুর ওয়াসিলা ছিলো অতি বিষাক্ত একটি সর্পের দংশন। হযরত তখন গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাহাজ্জুদের নামাযে রত ছিলেন। ঠিক এসময় ঐ বিষাক্ত সাপ তাঁকে কামড় মারে। প্রথমে তিনি সাপের দংশন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খিয়াল ছিলেন। ভোরের আলো পূর্বাকাশে আবির্ভাবের পর যখন তিনি ফযরের নামাযের প্রস্তুতি নেন তখনই তাঁর খাদিম দেখতে পান হযরতের পায়ে রক্ত। হযরতের পাজামা রঞ্জিত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পাজামা পাল্টিয়ে ওযু সেরে নামাযে ইমামতি করলেনতিনি।

হিজরি ১৩২৩ সালের ১২ কিংবা ১৩ জুমাদিউল আওয়াল গভীর রাত্রে হযরত ইমামে রব্বানীকে সর্প দংশন করে। এর সপ্তাহ তিনেক পর অর্থাৎ ১৩২৩ হিজরির জুমাদিউস সানীর ৮ তারিখ তিনি এই ধরা থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। নশ্বর এ পৃথিবীর ক্রোড়ে তিনি ৭৮ বছর ৭ মাস ৩ দিন জীবিত ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে 'বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণকারী শাহাদতের দরজা লাভ করবে'। সুতরাং হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই উচ্চতর দরজা লাভ করলেন।

জানাযা ও দাফন

হযরতের বিশিষ্ট খলীফা, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন, হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো ভ্রষ্ট জাদুকর কর্তৃক 'সেহর'র শিকার হয়েছেন। অনেক চেষ্টা-তদবীর ও ডাক্তারী হয়েছে। এতে কোনো ত্রুটি হয় নি। কিন্তু 'নির্ধারিত মুহূর্তে' মৃত্যু এসেই যায়। এটাই জীবনাবসানের প্রভু-প্রদত্ত নিয়ম। এর হেরফের কখনো হয় না। গাঙ্গুহ শরীফে হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দার মাক্বামাত উন্নততর করুন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিশতি মাশাইখ। তাঁর উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি হিসাবে পরবর্তীতে তরীকার

নামকরণ হয় 'চিশতিয়া-সাবিরিয়া-রশীদিয়া'। ইলমে জাহির ও বাতিনে তিনি যে অবদান রেখেছেন তার তুলনা নেই। এই মহাত্মন বুজুর্গের জীবনের হৃদয়াকর্ষক বিভিন্ন ঘটনা ও বাণী থেকে সকলেই উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে। হযরতের জীবনের উপর প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নিম্নে এরূপ কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি।

মৃত্যুকালীন ঘটনা: হযরতের মৃত্যুর তখনো ৬ দিন বাকী। সেদিন ছিলো শনিবার। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কি জুমু'আর দিন?" এরূপ প্রশ্নে সকলে অবাক। জুমু'আ বার তো ছিলো গতকাল। আজ আবার এ প্রশ্ন? হযরতের প্রশ্নের কারণ তো আর, কেউ তখন বুঝতে পারে নি। এরপর একই প্রশ্ন করলেন বাকী ৫ দিনের প্রায় প্রতিদিন। এমনকি মৃত্যুর দিন সকালে খাদিমকে আবারজিজ্ঞেস করলেন, "আজ শুক্রবার?" এবার খাদিম জবাব দিলেন, "জী হযরত! আজ শুক্রবার"। হযরত এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি যেনো জানতেন, পবিত্র শুক্রবার দিন মহান আল্লাহর দরবারে তিনি ফিরে যাবেন।

স্বপ্ন: হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু হয় মক্কা মুকাররমায়। এর ক'দিন পর তাঁর এক ঘনিষ্ঠজন আশ্চর্য একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দে আগমন করেছেন। তাঁর চেহারা সূর্যের মতো নূরোজ্জ্বল। আমাকে বললেন, "আমি ইতোমধ্যে ধরার কোল ছেড়ে চলে গেছি। এবার নিতে এসেছি আমার প্রিয় মৌলভী রশীদ আহমদকে। জিলহাজ্জের ২০ তারিখের ভেতরই আমি তাঁকে নিয়ে যাবো!"

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বন্ধুরা এই স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রীতিমতো চিন্তিত। স্বপ্নটির কথা হযরতের কানে আসলে মন্তব্য করলেন: "স্বপ্নের তাবির তো স্পষ্ট, তবে তা পূর্ণ হতে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। এছাড়া মানুষ একাধিকবারও মরতে পারে!" কোনো কোনো সময় বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলতেন: "ঠিকই যদি হযরত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে নিয়ে যেতে তাশরিফ আনেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে অত্যন্ত আদরের সাথে নেবেন।"

আরেক স্বপ্ন: সুরাত জিলার এক মসজিদের ইমামের নাম ছিলো সুলাইমান মিয়া। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, নূরানী চেহারাবিশিষ্ট দু'জন বুজুর্গ শানদার একটি সিংহাসনে বসে আছেন। নীচে আরেক ব্যক্তি দাঁড়ানো। মিয়া সাহেব এ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সিংহাসনে উপবিষ্ট দু'জন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুজুর্গ কারা? লোকটি জবাবে বললেন, "বেশী নূরান্বিত চেহারাবিশিষ্ট বুজুর্গ হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর অপরজন হলেন মৌলভী আহমদ বুজুর্গের শায়খ, দাবেল দারুল উলূম মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহতামিম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি!" সুবহানাল্লাহ!

স্বপ্নটি ইমাম সুলাইমান মিয়া মৌলভী আহমদের কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই স্বপ্ন কবে দেখেছেন? জবাব দিলেন, ৮ কিংবা ৯ জুমাদিউস সানী। উল্লেখ্য এই তারিখেই হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলেন।

অন্যান্য ঘটনা ও বাণী

১. তাওবার দরোজা ফকিরী থেকে বড়: একদা বাইআত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একব্যক্তি হযরতের দরবারে এসে হাজির হলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, "বলো তো বাবা! তুমি তাওবাহ করবে না ফকির হবে?"

আগন্তুক ব্যক্তি জবাব দিলেন, "আমি তাওবাহ করবো না- ফকির হবো।"

হযরত পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তুমি যদি তাওবাহ করতে তাহলে আমি তোমাকে সহযোগিতা করতাম। কিন্তু আমি নিজেই যেহেতু ফকির নই- তাহলে বলো, তোমাকে ফকির বানাবো কিভাবে?"

আগন্তুক এতে হতাশ হলেন, "তাহলে আমি অন্য কারোর নিকট চলে যাচ্ছি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

২. উস্তাদের প্রতি সম্মানবোধ: হযরতের এক উস্তাদ ছিলেন মাওলানা মামলুক আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই উস্তাদের পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব একদিন হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গাঙ্গুহ আসলেন। তখন আসরের নামায শুরু

হবে মাত্র। ইমামে রাব্বানী উস্তাদের পুত্রকে ইমামতির জন্য বললেন। মুসাল্লায় ওঠার পূর্বে গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের চাদর দ্বারা উস্তাদ-পুত্রের পা মুছে দিতে লাগলেন। পায়দল আসার কারণে ইয়াকুব সাহেবের পায়ে অনেক ধূলোবালি লেগে গিয়েছিল। গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এহেন আচরণে কিছুটা হতচকিত অবস্থায় ইয়াকুব সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন।

৩. মানুষের প্রতি দয়া: হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন জলিল কদর খলিফা। কোনো একদিন তিনি হযরতের সুহবতে থাকাকালে একব্যক্তি এসে বেশ বে-আদবীপূর্ণ আচরণ করলো ইমামে রব্বানীর সঙ্গে। লোকটির প্রতি হযরতের বদ-দু'আ পতিত হবে এই ভয়ে তিনি সবিনয় অনুরোধ জানালেন, "হযরত! দয়া করে এই অজ্ঞ লোকটির প্রতি বদ-দু'আ করবেন না।" তিনি আতঙ্কচিত্তে বলে ওঠলেন, "এ কী বলছো! তাওবাহ! তাওবাহ! কেউ কি কোনো দিন অপর মুসলিম ভাইকে বদ-দু'আ দিতে পারে? আস্তাগ¦ফিরুল্লাহ!"

৪. পীরের প্রতি শ্রদ্ধা: স্বীয় পীরের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন বললেন, "মনেকরুন কোনো এক মুবারক মজলিসে যুগশ্রেষ্ঠ মহাত্মন হযরত জুনায়িদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও বিরাট বিরাট উচ্চ পর্যায়ের ওলিদের আগমন ঘটলো। সেই একই মজলিসে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও উপস্থিত হলেন। তখনও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হবে হাজী সাহেবের প্রতি। কারণ তিনি আমাদের পীর। অপরদিকে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৃষ্টি থাকবে অন্যান্য বুজুর্গের প্রতি।"

৫. জিকির জারির ওয়াসিলা: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক মুরীদের নাম ছিলো মুনশি তজমুল আলী। তার বাড়ি আমবেতা শহরে। তিনি দরবেশদের সুহবতে থাকতে খুব পছন্দ করতেন। তার স্ত্রী ব্যাপারটি হযরত গাঙ্গুহীকে অবগত করলেন। তিনি একদিন তজমুল আলীকে জিজ্ঞেস

করলেন, "হাজী সাহেবের মুরীদ হয়েও আপনি অমুক-তমুকের সুহবতে থাকতে এতো উদ্গ্রীব কেনো?"

মুনশি সাহেব জবাব দিলেন, "অবশ্যই, অবশ্যই এটা সন্দেহাতীত, আমাদের মুর্শিদ সর্বোৎকৃষ্ট। আল্লাহর ফজলে তাঁরই নিকট মনের সব খোরাক মিলে। কিন্তু, আল্লাহর ইচ্ছায় হৃদয়ে সময় সময় কম্পন শুরু হয়ে যায়। এ কারণেই আমি এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই।"

হযরত গাঙ্গুহী: "এই যাযাবরতার মধ্যে কী আছে?"

মুনশি সাহেব: "আমি জানি, এতে কিছুই নাই। কিন্তু কি আর করবো, আমার হৃদয় তো বেঁধে রাখতে পারি না।"

হযরত গাঙ্গুহী: "এখনই আপনি চলে যান মসজিদে। সেখানে বসে থাকবেন।"

হযরতের নির্দেশ মুতাবিক মুনশি সাহেব মসজিদে যেয়ে বসে রইলেন। এদিকে ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওযু সেরে মসজিদের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরতের পায়ে ছিলো কাঠের তৈরী খড়ম। খড়মের কট-কট শব্দ শ্রবণ করামাত্র মুনশি সাহেবের মধ্যে অপূর্ব এক পরিবর্তন শুরু হলো। তাঁর হৃদযন্ত্রে আল্লাহর জিকিরের আওয়াজ বুলন্দ হতে লাগলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গিয়ে হযরতের পায়ে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "আমি যার জন্য উদ্গ্রীব ছিলাম, তা পেয়ে গেছি হযরত! এখন থেকে আমি আর অন্য কোনো ওলির সন্ধানে বের হবো না।"

৬. তাওয়াজ্জুর প্রভাব: একদা কাজী ইসমাঈল ম্যানগ্লোরী আব্দার করলেন, "হযরত! অনুগ্রহ করে সময় সময় তরীকতের সন্ধানীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান করুন।" তিনি জবাব দিলেন, "আমি কী যোগী? কেনো আমি তাদের মতো কাজ করবো?"

হযরতের কণ্ঠে এরূপ জবাব শ্রবণ করে কাজী সাহেব অবাক হলেন। কারণ, তিনি মনে করলেন, ইমামে রাব্বানী মাশাইখের প্রতিষ্ঠিত একটি আমলকে যোগীদের আমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন! তবে এ ব্যাপারে পাল্টা কোনো প্রশ্নের সাহস তিনি পেলেন না। এদিকে ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিষয়টির উপর পরবর্তীতে দেওবন্দের জলসায় ওয়াজ ফরমালেন। বয়ানের ভাষা ও গাম্ভীর্যতা

এতোই শক্তিশালী ও প্রভাবশীল ছিলো যে, শ্রোতাদের প্রায় সকলেই খুব বেশী কাঁদলেন। এমনকি কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মাহফিলে কাজী ইসমাঈল সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। বয়ান শেষে তিনি ছুটে গেলেন ইমামে রব্বানীর নিকটে। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ মৌলভী সাহেব, হ্যাঁ! এভাবে আপনাকে সময় সময় এটা (তাওয়াজ্জুহ) দেওয়া উচিৎ!” হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাথা নীচু করে বললেন, “আমি কী করলাম, কিছুই তো করি নি!”

৭. খাদিমদের প্রতি সম্মানবোধ: একদা কয়েকজন খাদিম হযরতের শরীর টিপে দিচ্ছিলেন। এসময় এক গ্রামীণ সাধারণ ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করলো। মন্তব্য করলো, “মৌলভী সাহেব! অনেক খাদিমের খিদমাত হেতু আপনি অবশ্যই খুব খুশী হয়ে থাকবেন।”

তিনি বললেন, “ভাই! অবশ্যই, এই খিদমাত পেয়ে আমি আনন্দিত ও আরাম অনুভব করি। কিন্তু হৃদয়ে কোনো ফখর নেই। যারা আমার খিদমাত করছেন তাদের চেয়ে আমার মর্যাদা বেশী, এরূপ কোনো অনুভূতি আমার অন্তরে নেই।”

একথা শোনে লোকটি বললো, “তাহলে, খিদমাত গ্রহণ করার মধ্যে কোনো দোষ নেই।”

৮. ওলিদের পরিধান: হজ্জের সফরে একদা হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফরত ছিলেন। পরনে ছিলো সূক্ষ্ম মসৃণ সূতার তৈরী জুব্বা। মাতহাফে বসা ছিলেন এক আরব অন্ধ বুজুর্গ। হযরত রশীদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাওয়াত পালনের সময় এই বুজুর্গের নিকটে আসতেই তিনি আরবীতে বললেন, “খাশ্শিন! খাশ্শিন!” (অমসৃণ! অমসৃণ!)। গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুঝতে পারেন নি, কার উদ্দেশ্যে তিনি এই নির্দেশমূলক শব্দদ্বয় উচ্চারণ করছিলেন। পরবর্তী শাওয়াতে ঐ অন্ধ বুজুর্গ আবার বললেন, খাশ্শিন! খাশ্শিন! এবার হযরত বুঝতে পারলেন, তাকেই উদ্দেশ্য করা হচ্ছে। তিনি অন্ধের নিকটে দাঁড়ালেন। অন্ধ বললেন, “সালফে সালিহীনের বস্ত্র পরিধান করুন!”

হযরত জবাব দিলেন, “আমি তো তাঁদেরই বস্ত্র পরিধান করছি।”

অন্ধ জবাব দিলেন, "না! না! তাঁদের পরিধেয় হলো মোটা সূতার এবং সাধারণ।"

সাথে সাথে ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দিলেন। বললেন, "জী হযরত! ভালো কথা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বরকত দান করুন।" এরপর তিনি পুনরায় শাওয়াত শুরু করলেন।

১০. পরহেজগারী: একবার দেওবন্দ মাদ্রাসার দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে হযরত ইমামে রাব্বানী যোগদান করলেন। আসরের নামাযের জামাআত ঘনিয়ে আসলে হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামতির জন্য সামনে যেয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অসংখ্য মানুষ ঘিরে মুসাহাফা করছিলেন। ফলে নামাযে দাঁড়াতে বেশ দেরী হয়ে গেল। নামায শেষে হযরত আক্ষেপ করে বললেন, "আহ! আজ দীর্ঘ বাইশ বছর পর তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হলাম।"

১১. নিসবত আল্লাহর দান: তিনি বলেন, নিসবত হলো আল্লাহর নৈকট্য। এটা তাঁরই দান। কেউ তা কারো নিকট থেকে কেড়ে নিতে পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত কোনো কিছু, কেড়ে নেওয়ার বস্তু হতে পারে কি?"

১২. উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করতে হবে: মানুষ প্রায়ই হযরতের নিকট এসে নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করতো। তারা অপর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এরূপ অভিযোগও আনতো। কিন্তু হযরত এদের কথায় তেমন বেশী কান দিতেন না। সহানুভূতি দেখাতেন না। ব্যাপারটা অনেকের নিকট কেমন যেনো অস্বস্তিবোধক হিসাবে প্রকাশ হতো। একদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহস করে বলেই ফেললেন, "হযরত! মানুষ আপনার নিকট তাদের দুঃখ-বেদনার কথা ব্যক্ত করে। এতে কি আপনার মায়া বোধ হয় না?"

হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আরে মিয়া সাহেব! এটা আমি বুঝি, অপরের দুর্ব্যবহার হেতু মানুষ দুঃখে-কষ্টের শিকার হয়ে থাকে।

কিন্তু অভিযোগকারীর কথাই কি শুধু শুনতে হবে? অভিযুক্তের বক্তব্যও যে শ্রবণ করা চাই। অন্যথায় কে দোষী আর কে নির্দোষ তা নির্ণয় কিভাবে করবো?”

১৩. ক্বারী ইব্রাহীম উজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হুজরায় প্রবেশ: হযরত ইমামে রাব্বানীর বিশেষ খলিফা ছিলেন বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ওলি ক্বারী ইব্রাহীম উজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ক্বারী সাহেবের জীবন থেকে একটি ঘটনার কথা জানা যায়।

বাইআত গ্রহণের জন্য যখন তিনি উদ্গ্রীব হয়ে ওঠলেন তখন গভীর রাতে আবেগাপ্লুত হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন, “হে আমার প্রভু! আমাকে আপনার কোনো পিয়ারা কামিল বান্দার নিকট পৌঁছে দিন যার হাতে বাইআত গ্রহণ করে আমি উপকৃত হবো।” উল্লেখ্য ইতোপূর্বে তিনি ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুকালীন ঘটনা পাঠ করেছিলেন। কথিত আছে, নাযমুদ্দিন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামক একজন কামিল পীরের হাতে বাইআত হওয়ার ফলে ইমাম সাহেব মৃত্যুকালে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাকেন।

ক্বারী সাহেব আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে আবদার শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে দেখলেন, কোনো এক কামিল ব্যক্তি তাঁকে বয়ান করে শুনাচ্ছেন ইশকে ইলাহীর কথা। বয়ানের শেষের দিকে বললেন, “ওহে! তুমি চিন্তা করো না। যতো তাড়াতাড়ি পারো কুতবে আলম রশীদ আহমদের দরবারে চলে যাও। তিনি গাঙ্গুহীতে থাকেন।” সুতরাং কালবিলম্ব না করে ক্বারী সাহেব চলে গেলেন গাঙ্গুহ শরীফে।

বাইআত হওয়ার পর তিনি কঠোর রিয়াজত-মুজাহাদা এবং জিকির মুরাক্বাবা শুরু করলেন। ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিজস্ব একটি ছোট্ট ইবাদতখানা ছিলো। এ কক্ষে প্রবেশ করার অনুমতি কারোর ছিলো না। একদিন ক্বারী সাহেব রাহমাতুল্লাহি মসজিদে আল্লাহর জিকির করতে করতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। নিজের অজান্তেই তিনি ছুটে গেলেন হযরতের হুজরার কাছে। দরজার

সামনে যেয়ে সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এসময় কক্ষের ভেতর গভীর মুরাক্বাবার অবস্থায় ছিলেন ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় হুজরার দরজা এমনিতেই খুলে গেল। ক্বারী সাহেবের জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর প্রিয় মুর্শিদ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের সমগ্র দেহব্যাপী এক অপূর্ব নূর বিরাজ করছে। এর আলোতে সমগ্র কক্ষটি আলোকিত হয়ে গেছে। এরপর গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ক্বারী সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইব্রাহীম! তোমার মাকছুদ পূর্ণ হয়েছে। যাও! দেশে ফিরে যেয়ে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত করো। মানুষকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দাও।" ক্বারী সাহেব এদিনই খিলাফত লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩. তরীকাতের বাস্তবতা: আমরা জানি তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের পণ্ডিত লেখক। বিশ্ববিখ্যাত 'ফাতওয়ায়ে রশীদিয়া' তাঁরই রচনা। তরীকতের উপর তিনি অল্প বয়স থেকেই গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশ করেন। এরূপ একটি প্রবন্ধের সারমর্ম হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'মাশাইয়ে চিশত' গ্রন্থ থেকে এখানে তুলে ধরছি।

হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: "সুফিদের জ্ঞান হলো দ্বীনের জাহির, বাতিন এবং ইয়াক্বীন সম্পর্কে অবগতি। এই জ্ঞানই সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা। তাসাওউফের বাস্তবতা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অলঙ্করণ, আত্ম ইচ্ছার বিস্মৃতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাঝে ডুবে যাওয়ার মধ্যে নিহিত। সুফিদের আখলাক আসলে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক আখলাকেরই প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

-"অবশ্যই (হে মুহাম্মাদ!) আপনাকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (৬৮ : ৪)

এছাড়া, পবিত্র হাদীস শরীফে যা কিছুই আছে সে অনুপাতে সুফিয়ায়ে কিরামের আখলাক গঠিত। সত্যিকার সুফির মধ্যে যেসব চরিত্র বিদ্যমান তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(১). নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করা। এর বিপরীতকে বলে 'তাকাব্বুর' (আত্মম্ভরিতা)।

(২). সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হওয়া। সৃষ্টি কর্তৃক দুঃখ-কষ্টের শিকার হলে তা ধৈর্যসহ মেনে নেওয়া।

(৩). নরম হৃদয়, আশাবাদ এবং রাগান্বিত হওয়া থেকে বিরত থাকা।

(৪). অপরের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান এবং সহানুভূতিশীল হওয়া।

(৫). দয়ালু হওয়া।

(৬). অপরের দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া এবং তাদেরকে মাফ করা।

(৭). ছলনা থেকে দূরে থাকা।

(৮). মিতব্যয়ী হওয়া। অনর্থক বেশী খরচ করা থেকে বিরত থাকা, অন্যদিকে কৃপণ না হওয়া।

(৯). আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা।

(১০). জাগতিক সম্পদের প্রতি আকর্ষণ না থাকা। অল্প সম্পদ হলেও তুষ্ট থাকা।

(১১). পরহেজগারী গ্রহণ করা।

(১২). অনর্থক তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ এবং রাগ-গোস্বা থেকে বিরত থাকা।

(১৩). হিংসা এবং ঘৃণা থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

(১৪). সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা ও যশ-খ্যাতির আশা ত্যাগ করা।

(১৫). যে কোনো মূল্যে ওয়াদা রক্ষা করা।

(১৬). মুসলিম ভাইদের প্রতি দয়া, সহযোগিতা, সমর্থন ও দূরদর্শিতামূলক আচরণ রাখা।

(১৭). উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

(১৮). ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিজের মান-সম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া।

আখলাক দ্বারাই সুফি বুজুর্গ তাঁর জাহির ও বাতিনকে অলংকৃত করেন। তাসাওউফ মানেই ‘আদব’। আর স্বর্গীয় দরবারের আদব হলো, একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া সবকিছু মুছে দেওয়া। কারণ আল্লাহর শান, মহিমা ও মাহাত্ম্যের সম্মুখে ‘গ্বাইরুল্লাহ’র প্রতি আকর্ষণ ‘লজ্জাস্কর’ ব্যাপার। সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ হলো নফসের সঙ্গে (খাহিশাতের) কথোপকথন। এটাই হচ্ছে রূহানী অন্ধত্বের মূল কারণ।”

১৪. হিদায়াতের সূত্র: মাওলানা ওইলিয়াত হুসাইন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রশ্ন করলেন, “কেউ কেউ বলেন মুরীদের কাছে নিজের শায়খের রূপে শয়তান আসতে পারে না। কথাটি কতটুকু সত্য?” তিনি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ। তবে শর্ত হলো মুরীদকে ‘তাওহিদ-ই-মতলব’ এর স্তরে উন্নীত হতে হবে। এ স্তরে উপনীত মুরীদ মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখে, তার হিদায়াতের একমাত্র মাধ্যম হলেন স্বীয় মুর্শিদ।”

১৫. হযরত বলতেন: “যারা উলামায়ে কিরামের প্রতি কুৎসা রটায় এবং তাদেরকে বেইজ্জত করে, কবরে এসব লোকের মুখ কিবলামুখী থাকবে না।”

১৬. তিনি আরো বলেন: “গ্বাইর মুক্বাল্লিদরা যেহেতু আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উপর কুৎসা রটায়, তাই এদের পেছনে নামায পড়া মাকরুহ হবে।”

১৭. হযরত প্রায়ই বলতেন: “আল্লাহ তা’আলা অন্তর থেকে যদি ‘অহঙ্কার’ নামক বস্তুকে তুলে নেন, তাহলে তো সবই পাওয়া হয়ে গেলো।”

ইলমের ব্যাপ্তি

ইলমে বাতিন ছাড়াও হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ইলমে জাহির তথা শরীয়তের বাহ্যিক জ্ঞানের সাগর। এ ব্যাপারে দু’একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি।

১. সত্যিকার দ্বীন কাদের নিকট সংরক্ষিত: জগতখ্যাত আলিম হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত আনযর শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "পাঠদানকালে আমার সম্মানিত পিতা অনেকবার উল্লেখ করেছেন, 'আমরা যখন কাশ্মীর থেকে (ভারতে) আসলাম তখন দ্বীন পেলাম গাঙ্গুহী সাহেবের নিকট। এরপর দ্বীনের সন্ধান মিললো হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে। এখন যদি কেউ সত্যিকার দ্বীন কি জিনিস জানতে চায় তাহলে থানাভনে (হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আরী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট) তাকে যেতে হবে।" [হালতে মাশায়িখে উম্মাত রাহ. খণ্ড ৩, পৃ: ৩৩৫]

২. সায়্যিদী ওয়া সানাদী: শায়খ মুফতি তাক্বী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, "আমি দাদীজীকে দেখেছি। তাঁর কাজও কথাগুলো আমার মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন বিশিষ্ট মুরীদা। তাঁর ক্বলবে 'আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির জারী ছিলো। প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে এই জিকিরের আওয়াজ বেরিয়ে আসতো এবং কাছের লোক তা শুনতে পেতো। এ থেকে প্রমাণ হয়, শায়খ ইমামে রাব্বানী স্বীয় মুরীদদেরকে কিভাবে অধিক জিকিরের প্রতি আকর্ষিত করতেন।" [দারুল উলূম করাচীতে তারাবীহ শেষে বয়ানকালে তিনি একথা বলেন, ২৭ রমজান ১৪২৩ হিজরি]

৩. জিকিরের প্রভাব: হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই লিখেছেন, "সর্বদা আল্লাহর জিকির করলে ক্বলব আলোকিত হয়ে ওঠে। জাগতিক কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকাবস্থায় কেউ যদি নিজের অজান্তেও জিহ্বা দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তাহলেও সে ফায়দা পাবে।" [মাযমূনে জিকির, মাযমু'আ তালিফাতে মুসলিহুল উম্মাত রাহ. খণ্ড ৩, পৃ: ৬]

৪. রূহানী অবনতির কারণ: একজন মুরীদ এসে আবদার করলেন, 'হযরত! আমি রূহানিয়্যাতের দিক থেকে দুর্বল অনুভব করছি। অথচ ইতোমধ্যে আমার অবস্থা ভালো ছিলো। আমার এই রূহানী অবনতির কারণ কি?'

তিনি বললেন, “রূহানী অবনতির তিনটি কারণ আছে: ১. কলুষিত সুহবত, ২. সন্দেহযুক্ত খাবার এবং ৩. পাপকার্য।” এরপর তিনি মুরীদকে নির্দেশ দিলেন, “এখন তুমি নিজের প্রতি খিয়াল করে দেখো, এসব দোষের কোন্টি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছ? এরপর তা শোধরে নাও।” [সূলুক ওয়া আহসান: ইরশাদাতে ফকীহুল উম্মাত রাহ. পৃ: ৩৩৩]

খুলাফাবৃন্দ

হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে থেকে যারা ধন্য এবং খলীফা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের সকলেই পরবর্তীতে উম্মাহর আকাশে উজ্জ্বল তারকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এরূপ মোট ত্রিশজন নূরোজ্জ্বল ব্যক্তির নাম তাঁর খুলাফার তালিকায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিখ্যাত ক'জন হলেন:

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
হযরত শাইখুল ইসলাম মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
হযরত মাওলানা শাহ সিদ্দীক আহমদ আম্বেটী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রওশন খান মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
হযরত মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম উজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ ইসহাক নাহতুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

উপরে উল্লেখিত প্রত্যেক বুজুর্গ গোটা উম্মাতের গৌরব ছিলেন। তাঁরা দেশ-বিদেশে ইলমে দ্বীনের খিদমাতে সারাজীবন উৎসর্গ করে গেছেন। শুধু বাহ্যিক শরীয়তের জ্ঞান নয়, ইলমে বাতিনেও তাঁরা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ওলিআল্লাহ। আজ গোটা উপমহাদেশে চিশতি তরীকাভুক্ত অসংখ্য মানুষ তাঁদেরই খিদমাতের ফসল। রূহানিয়্যাতের ক্ষেত্রে দেওবন্দ-অধ্যয়নকৃত উলামা-মাশাইখের অবদান এখনো অব্যাহত আছে। গোটা মুসলিম উম্মার মধ্যে তাঁদের স্থান শীর্ষে। এ সত্য বিনাপ্রশ্নে সকলে মেনে নেবেন।

হযরত ইমামে রব্বানীর হাতেগড়া মাশাইখের উপরোক্ত কীর্তিমান তালিকার একটি স্বনামধন্য নামের অধিকারী ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের আকাশে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান হয়ে উদীয়মান থেকে দীর্ঘদিন দ্বীনের খিদমাতে নিয়োজিত ছিলেন। এই নামটি হলো হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমাদের চিশতি শাজারায় পরবর্তী নাম তাঁরই। সুতরাং এখন হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও সাধনার উপর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করছি। ওয়ামা তাওফিক্বী ইল্লাহ বিল্লাহ।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

আউলিয়ায়ে চিশত

(যাঁদের পদধূলিতে ধন্য এ ধরার কোল)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

চতুর্থ খণ্ড

কুতবে আলম শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা
সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
থেকে
কুতবে যামান হযরত মাওলানা
আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
পর্যন্ত

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা

আল্লাহর পবিত্র দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বিশ্ববিখ্যাত 'তরীকায়ে চিশতিয়া'র পীর-মাশাইখের উপর রচিত এ গ্রন্থের সর্বশেষ খণ্ড পাঠকদের হাতে তুলে ধরার তাওফিক আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। সকলের প্রতি অনুরোধ আগের খণ্ডগুলো পাঠ করে না থাকলে ওগুলো সংগ্রহ এবং মনোযোগসহ অধ্যয়ন করুন।

হাযারাত আউলিয়ায়ে চিশত বিশ্ববিখ্যাত। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ যুগ পর্যন্ত তরীকার হাজার হাজার বুজুর্গানে দ্বীন, শাইখুল মাশাইখ, দরবেশ, ওলি, যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, মুজাহিদ-মুজাদ্দিদ এ ধরার কোলকে সঠিক দ্বীনদারিত্ব, দাওয়াত ও তাবলীগ, খাঁটি রূহানিয়্যাত এবং সঠিক পীর-মুরীদীর ঔজ্জ্বল্য দ্বারা নূরান্বিত করে গেছেন। গণনাতীত এসব ওলিআল্লাহ মহাত্মন বুজুর্গদের জীবন ও কর্মের উপর একক কেনো গ্রন্থ আজো কেউ প্রণয়ন করেন নি। করা সম্ভব হয় নি। এ বিরাট কাজ সাধারণ কোনো লেখকের পক্ষে আঞ্জাম দেওয়া সুদূরপরাহত। তবে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। খাস করে আরবি, ইংরেজি, উর্দু ইত্যাদি বিদেশী ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব পাঠ করে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হচ্ছেন যুগ যুগ ধরে। বাংলা ভাষায়ও বেশ কিছু গ্রন্থ অনেক আগে থেকেই প্রকাশ হচ্ছে আউলিয়াদের জীবন ও কর্মের উপর। তবে শুধুমাত্র চিশতিয়া তরীকার মাশাইখদের নিয়ে মুফতি নূরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'মাশায়েখে চিশত' ছাড়া অনুরূপ একটি মাত্র সিলসিলার সকল মাশাইখের জীবনালোচনা সম্বলিত কোনো বই-পুস্তক প্রকাশ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

যাক, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। আমি অধম বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রমের বদলে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে 'আমাদের' চিশতি শাজারার ৪১ জন অলি এবং স্বয়ং রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও সাধনার উপর বিস্তারিত বর্ণনা গ্রন্থ'স্থ করতে পেরেছি। এটা আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত, ফজল ও করম এবং গ্রন্থে আলোচিত আউলিয়াদের রূহানী ফুয়ুজের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। এতে আমার নিজের 'গৌরবের' কিছু নেই। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো ভালো কাজে হাত দেওয়ারও ক্ষমতা আমাদের নেই। আমি আবারো মহান প্রভুর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থখানা পাঠ করে সকলে উপকৃত হবেন এই কামনা করছি প্রভুর দরবারে। আর রোজ কিয়ামতের কঠিন সে দিনে তিনি যেনো একে পাঠকবর্গ, আমি ও আমার আহলে আওলাদ এবং সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মদীর [সা.] জন্য নাযাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

'আউলিয়ায়ে চিশত' এর সকল খণ্ড প্রণয়নে আমাকে অনেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। প্রথম খণ্ডে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টজনদের নাম উল্লেখ করেছি। এখানেও সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ পাক সকলকে উত্তম যাজা দিন।

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি আরজ, আপনারা দু'আর সময় আমার কথা স্মরণ করবেন। ভবিষ্যতে আরো এক দু'টো অনুরূপ 'তাযকিয়ায়ে নফস' বিষয়ক গ্রন্থ রচনার তাওফিক প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে আবদার জানাচ্ছি। আপনারাও দু'আ করবেন। লেখার মধ্যে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন। আগামী সংস্করণে অবশ্যই সতর্কতার সাথে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
২৮ জুলাই ২০১২ ঈসায়ী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ حْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরিচ্ছেদ ১

কুতবে আলম শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: শুক্রবার ১৩ জুমাদাল উলা, ১৩৭৭ হিজরি, ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী, সমাধি: মাকবারায়ে কাসিমী, দেওবন্দ, ভারত।)

আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক। ইলমে জাহির ও বাতিনে তাঁর মতো ব্যক্তি খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাঁর অপূর্ব জীবন ও কর্মের উপর পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন আদৌ সম্ভব কি না সেটাই প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উপর আমাদের আলোচনা 'তাসাওউফে অবদান' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। অবশ্য অতি সংক্ষেপে এই মহাত্মন বুজুর্গের রাজনীতিক ও উলূমে শরীয়ত শিক্ষাদানের উপরও আলোচনা করবো। চিশতি মাশাইখের জীবন ও সাধনা নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটি মূলত তাসাওউফের খিদমাতে উৎসর্গিত। আশাকরি পাঠকরা গ্রন্থটিকে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই যাচাই ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

জন্ম

হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আত্মজীবনীমূলক স্বরচিত গ্রন্থ 'নকশে হায়াত'-এ তাঁর জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "১২৯৬ হিজরির শাওয়াল মাসের ১৯ তারিখ রাত ১১টায় সোমবার দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর, অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতে আমি বেঙ্গরমেউ, জেলা আন্নাউ-য়ে জন্মগ্রহণ করি। তারিখভিত্তিক নাম চেরাগ মুহাম্মদ। মরহুম পিতা তাঁর 'বিয়ায' অর্থাৎ স্মারকলিপিতে তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন। খ্রিস্টীয় তারিখ ও সন লেখেন নি। হিসাব করলে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ হয়। সে সময় পিতা বেঙ্গরমেউর একটি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে হেড মাস্টার এবং কয়েক বছর ধরে সপরিবারে সেখানেই বসবাসরত ছিলেন।" [নকশে হায়াত, পৃষ্ঠা ৩; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত চেরাগে-মুহাম্মদ (সা.), পৃ: ৫৭ থেকে উদ্ধৃত]

শাইখুল ইসলামের পিতার নাম ছিলো সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৮৫৩-১৯১৬ ঈ)। পিতা কর্তৃক 'চেরাগে মুহাম্মদ' নাম রাখা হলেও তিনি মূলত 'হুসাইন আহমদ' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। বংশ পরম্পরায় হযরতের ৩৩তম উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এই মুবারক 'সায়্যিদ' বংশ সর্বযুগেই ইলম ও আধ্যাত্মিকতার ধারক-বাহক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ২৭তম পূর্বপুরুষের নাম ছিলো সায়্যিদ মুহাম্মদ মাদানী। মদীনা মুনুওয়ারা থেকে ইসলাম-প্রচারের লক্ষ্যে তিনি সপরিবারে উজবেকিস্তানের তিরমিযে হিজরত করেন। তাঁরই এক অধস্তন সন্তানের নাম ছিলো সায়্যিদ আহমদ তূখনা যাকে মানুষ 'তিমসালে রাসূল' অর্থাৎ রাসূলের অনুরূপ বলে সম্বোধন করতো। তিনি আলিম ও আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার ছিলেন। এই বুজুর্গ পরবর্তীতে লাহোরে এসে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। হিজরি ৬১২ সনে এখানেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর উত্তরপূরুষদের মধ্যে অনেকেই সুফি, দরবেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। লাহোর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে হিজরত করে দ্বীনের কাজে ছড়িয়ে

পড়েন। [শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ড. মুশতাক আহমদ]

উক্ত সুফি পরিবারের অন্যতম এক পুরুষের নাম ছিলো শাহ নূরুল হক টান্ডবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন চিশতিয়া, কাদিরিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকায় খিলাফতপ্রাপ্ত ওলি। তিনি ‘এলাহদাদপুরা’ অঞ্চলকে আবাদ করেন। শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁরই বংশধর। হযরতের পিতা ও মাতা উভয়েই শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলেন। অত্যন্ত ধার্মিক, জিকর-শুগুলকারী, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পালনকারী এবং উত্তম আখলাকের অধিকারী আধ্যাত্মিক এই দম্পতির ঘর উজ্জ্বল করে শাইখুল ইসলাম ধরার পৃষ্ঠে আগমন করেছিলেন। হযরতের মাতার নাম ছিলো নূরুন্নিছা। [ফরীদুল ওয়াহিদী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, দিল্লী, কওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২, পৃ: ৩৪, প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত)

বাল্যশিক্ষা

জীবনের ৩ বছর জন্মস্থান বেঙ্গরমেউতে অতিবাহিত করার পর শিশু হুসাইন আহমদ পিতার সাথে টান্ডায় চলে যান। বারো বছর বয়স পর্যন্ত এখানে থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেন। তাঁর সুযোগ্য মাতার নিকট পবিত্র কুরআনের এক ষষ্ঠাংশ অধ্যয়ন শেষে পিতা হাবীবুল্লাহ সাহেব ছেলের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব নেন। সে যুগে স্কুলের শ্রেণীর হিসাব ছিলো উল্টো। প্রথম শ্রেণীর অর্থ ছিলো আজকের অষ্টম শ্রেণীর সমান। আর অষ্টম ছিলো আজকের প্রথম শ্রেণী। যা হোক, আজকের হিসাবে শাইখুল ইসলাম টান্ডায় পিতা-মাতার সঙ্গে থাকাবস্থায় মডেল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। কিন্তু যিনি হবেন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ও আধ্যাত্মিক রাহবার, তিনি কি আর সাধারণ শিক্ষার্জনের মধ্যে থাকতে পারেন? হিজরি ১৩০৯ (১৮৯২) সনে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে।

দেওবন্দে উচ্চশিক্ষার্জন

দারুল উলূম দেওবন্দে তখন সদরুল মুদাররিস ছিলেন শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৮৫১-১৯২০ ঈ)। মুহতামিম হিসাবে দায়িত্বপালন করছিলেন চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীকার বিশিষ্ট শায়খ, দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম হাজী সায়্যিদ আবিদ হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৮৩৪-১৯১২ ঈ)। এসময় দারুল উলূম দেওবন্দের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শাইখুল ইসলামের পীর কুতুল ইরশাদ, ইমামে রাব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

দারুল উলূম দেওবন্দে শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মোট ৭ বছর লেখাপড়া করেন। শুরুর কিছুদিন পরই তিনি প্রধান শিক্ষক হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৃষ্টির আকর্ষণে পড়ে যান। স্বীয় উস্তাদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্ম নেয়। ঈসায়ী ১৯২০ সালে শাইখুল হিন্দের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে থেকেছেন। এমনকি ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে নেতৃত্বদানকালে মাল্টায় বন্দী অবস্থায় তিনি উস্তাদের সঙ্গী হোন একরূপ স্বেচ্ছায়। উস্তাদের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আকর্ষণ খুব বিরল। অথচ তিনি শাইখুল হিন্দের মুরীদ ছিলেন না।

ঈসায়ী ১৮৯৮ (১৩১৬ হিজরি) পর্যন্ত তিনি দেওবন্দে লেখাপড়া করেন। এসময় জগৎখ্যাত আরো যারা দারুল উলূমে অধ্যয়নরত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (১৮৭২-১৯৪৪), আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৮৭৫-১৯৩৩) ও মুফতী কিফায়েতুল্লাহ দেহলভী (১২৯২-১৩৭২ হি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। ইলমে হাদীসের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধাবোধ ও শিক্ষাকর্ষণ ছিলো। দাওরায়ে হাদীস শেষ করার পরও তিনি পুনরায় ১৯০৮ সালে শাইখুল হিন্দের কাছে হাদীস অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এসময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন মাওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী (১৮৮৯-১৯৭২), আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলয়াবী (১৩০৪-১৩৮৭ হি.) এবং মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী (১৩১০-১৩৭৫ হি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বিখ্যাত বুজুর্গানে দ্বীন।

দেওবন্দের ২৬ শালা দস্তারবন্দী সম্মেলন

দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ ১৯১০ সালে ২৬ শালা দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে। হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই অনুষ্ঠানে স্বীয় উস্তাদ শাইখুল হিন্দ কর্তৃক সম্মানের পাগড়ী লাভ করেছিলেন। তিনি পাগড়ী পান দ্বিতীয় স্থানে। প্রথমে পাগড়ী লাভ করেন হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তবে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ছিলো, সবাই একটি করে সবুজ পাগড়ী লাভ করলেও শাইখুল ইসলাম বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেন তিনটি পাগড়ী। এর মধ্যে প্রথমটি প্রদান করেন শাইখুল হিন্দ, দ্বিতীয়টি গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা মাওলানা মাসউদ আহমদ এবং তৃতীয়টি বেধে দেন মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য হযরত মাওলানা আহমদ রামপুরী। [শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, ড. মুশতাক আহমদ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ: ১১৮-১২৭ দ্র:)

বাইআত গ্রহণ ও মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরত

তাসাওউফের উপর হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবদান ছিলো অপরিসীম। তাঁর যুগের বয়োবৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ শাইখ ছিলেন আরব ও আযমের বড়ো পীর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহিআলাইহি। কিন্তু তিনি তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন নি। তবে তাঁর পবিত্র সুহবতে ধন্য হয়েছেন। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলীফা ইমামে রাব্বানী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে তিনি বাইআত গ্রহণ করেন। নকশে হায়াতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা স্বয়ং মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তুলে ধরেছেন।

হিজরি ১৩১৬ সনে হযরতের পিতা হাবীবুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপরিবারে মদীনা মুনুওয়ারায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় শাইখুল ইসলাম সবেমাত্র উনিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। অবশ্য ইতোমধ্যেই তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শরীয়তের উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ভ্রমণের প্রাক্কালে

একদিন শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পিতাকে বললেন, “মদীনা শরীফে যাত্রার পূর্বেই আপনার উভয় ছেলেকে (সাইয়্যিদ সিদ্দীক আহমদ ও হুসাইন আহমদ) হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের হাতে বাইআত করিয়ে নিন। আল্লাহ না করুন, এখান থেকে যাওয়ার পর কোনো বিদআতীর খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা আছে।”

এই উপদেশ মুতাবিক হাবীবুল্লাহ সাহেব পুত্রদ্বয়কে নিয়ে হযরত গাঙ্গুহী সাহেবের দরবারে উপস্থিত হলেন। ইমামে রাব্বানী উভয়কে মুরীদ হিসাবে গ্রহণ করার পর বললেন, “আমি তো বাইআত করে নিলাম। এবার তোমরা মক্কা মুয়াজ্জমায় যেয়ে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাতে হাজির হবে। তিনি তোমাদেরকে সঠিক তালকীন (শিক্ষাদীক্ষা) দান করবেন।” (নকশে হায়াত)

হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে

মদীনা শরীফ হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রার এক পর্যায়ে ১৩১৬ হিজরির (১৮৯৮ ঈ) জিলকদ মাসে হাবীবুল্লাহ পরিবার পবিত্র মক্কা শহরে উপস্থিত হন। বয়োবৃদ্ধ শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শারীরিক দিক দিয়ে তখন বেশ দুর্বল। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে প্রথমেই গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সালাম ও পয়গাম পেশ করলেন। হাজী সাহেব এতে আনন্দিত হলেন। দীর্ঘক্ষণ মনোযোগসহ আলোচনা শেষে হযরত মাদানীকে বললেন, “আমি তোমাকে পাস-আনফাস [দমের] জিকিরের তা’লিম দিচ্ছি। তুমি মনোযোগসহ নিয়মিত এই জিকির আদায় করবে। প্রতিদিন সকালে আমার এখানে চলে আসবে। আমি তোমাকে এই জিকির করতে সাহায্য করবো।”

হযরতের নির্দেশ মুতাবিক যে ক’দিন মক্কা মুয়াজ্জমায় ছিলেন, মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে এসে হাজির হতেন। পবিত্র ভূমিতে মহান এই বুজুর্গের সুহবত থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হন। মদীনা মুনুওয়ারার উদ্দেশ্যে বিদায়ক্ষণে খুব আদর-সোহাগের সাথে পিঠের উপর হাত রেখে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাইখুল ইসলামকে বলেছিলেন, “যাও!

আমি তোমাকে মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি।” কথাটি শুনে শাইখুল ইসলাম নিশ্চুপ রইলেন। মক্কী সাহেব আবার বললেন, “বলো! আমি কবুল করলাম!” এবার মাদানী সাহেব বললেন, “আমি কবুল করলাম।” শাইখুল মাশাইখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ৬ মাস পরই (১৩১৭ হিজরিতে) ইন্তিকাল করেন।

সবার সঙ্গে শাইখুল ইসলাম চলে গেলেন মদীনা শরীফে। পবিত্র রওজায়ে আতহারের সম্মুখে বসে তিনি কিভাবে জিকির-আজকার করতেন সে বর্ণনা মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেন।

“আমি মদীনার হারাম শরীফে বসে পাস-আনফাস (দমের) জিকির করতাম। অল্পদিনের মধ্যেই চিশতিয়া তরীকার নিসবতের চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগলো। কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হলো। ইতোমধ্যে নিদ্রাবস্থায় সত্যস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। একাধিকবার রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নসীব হলো। জিকিরের কারণে সমগ্র শরীরে অনিচ্ছাকৃত হারকাত (নড়াচড়া) শুরু হতো। স্বভাবতই মসজিদে নববীর ভেতর লোক সমাগম বেশী হয়। অনেকে আমার অবস্থা দেখে ভিড় জমাতে লাগলো। সুতরাং মানুষ যে সময় কম থাকে সে সময়টা জিকির-আজকারের জন্য বেছে নিলাম। তা ছিলো সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর। কিন্তু জিকিরের প্রাবল্য ও হারকাত বৃদ্ধি পেলো। নিজেকে লুকানোর উদ্দেশ্যে চলে গেলাম অদূরে অবস্থিত জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে। কিন্তু কয়েক দিনের ভেতর সেখানেও লোকজন এসে আমার চতুর্দিকে ভিড় জমাতে লাগলো। এবার চলে গেলাম আরো বেশ দূরে একটি জঙ্গলে। কোনো কোনো সময় মসজিদে ইযাবায় যেয়েও জিকির-আজকার করেছি। এই স্থানে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু দু’আ কবুল হয়েছিল। মসজিদের নিকটে খেজুর বৃক্ষের বাগানে বসেও একা একা জিকির করতাম। এসময় বেশ কয়েকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নসীব হয় স্বপ্নযোগে। একদা খুব মনোযোগসহ একখানা কিতাব দেখে ‘নাতে রাসূল’ পাঠ করছিলাম। এতে কবিতার একটি পংক্তি ছিলো: ওহে বন্ধু! চেহারা থেকে পর্দা তুলে দাও! এ কথাগুলো আমার অন্তরে সাড়া জাগালো। ছুটে গেলাম রওজায়ে আতহারের নিকটে। অত্যন্ত ভক্তি-আদবের সঙ্গে সালাম জানিয়ে

কান্নাভরা কণ্ঠে ঐ পংক্তিটি পাঠ করতে লাগলাম। আমার অন্তরে তখন দীদার লাভের তীব্র পিপাসা বিরাজমান। অনেকক্ষণ এ হালের উপর কেটে গেল। আমি ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারলাম, নিজ ও রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কোনো প্রাচীর নেই, নেই কোনো জালি বা পর্দা। যেনো তিনি আমার সম্মুখে একখানা কুরসিতে উপবিষ্ট। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল আমার সম্মুখে ঝলঝল করছে!” (নকশে হায়াত)

মদীনা মুনুওয়ারায়

হিজরি ১৩৩৫ সাল (১৯১৬) পর্যন্ত পবিত্র মদীনা মুনুওয়ারায় হযরত শাইখুল ইসলাম বসবাস করেছেন। দীর্ঘ এই ১৮ বছরের মধ্যে মাত্র তিনবার জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেছিলেন। নূরে নূরে আলেয়া, মিশক-আম্বরের খুশবোতে সয়লাব, সোনার মদীনা। যে পবিত্র নগরে অবস্থানকারীর তনু-মন-প্রাণ মুহাব্বতের রোমাঞ্চকর ছোঁয়ায় সদা-মাতোয়ারা, যে মাটি ধন্য রাহমাতুল্লিল আলামীনের চিরাবস্থানে। যেখানে রোজ কিয়ামত অবধি শায়িত আছেন রিয়াদুল জান্নাতে আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গম্বুজে খাদ্বরার চিরশান্ত ছায়াতলে পবিত্র সেই রওজায়ে আতহারের সন্নিকটে থেকে কঠোর সাধনার মাধ্যমে সৌভাগ্যশীল যুবক হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুলুকের স্তরগুলো একে একে অতিক্রম করে যেতে লাগলেন। দীর্ঘ দু’টি বছর কেটে গেল। হযরতের তরীকতের মুর্শিদ ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন ভারতে। প্রিয় মুরীদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট খবর পাঠালেন: “তুমি শীঘ্রই স্বদেশে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো।” সেমতে পীরের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩১৮ হিজরি (১৯০০) সনে প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

খিলাফত লাভ

গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ভারতে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে আসার প্রধান কারণ ছিলো, তাঁর এই প্রিয় মুরীদকে সুলুকের

উন্নততর স্তরে উপনীত করতে সাহায্য করা। কেউ বাহ্যিক ইলমে শরীয়তের যতো বড় আলিমই হোন না কেনো, ইলমে হাক্বিকাতের ক্ষেত্রে উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ না করা পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে উবুদিয়াতের উচ্চতর স্তরে উপনীত হতে পারবেন না। শরীয়তের অভ্যন্তরেই মা'রিফাত। কিন্তু সুলুক তথা পীর-মুরীদী ছাড়া সেই মা'রিফাত অর্জন আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের আকাবির ও আসাতিজায়ে কিরামের সকলেই পীর-মুরীদীর মাধ্যমে তরীকতের উচ্চতর মাক্বামে পৌঁছেছিলেন। আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হওয়া ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির একমাত্র পথই এটা।

হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুরীদ যুবক মাদানীকে ভারতে নিয়ে এসে নিজের সুহবতে দীর্ঘ ২ বছর রাখেন। শাওয়াল ১৩১৮ হিজরি সনে ভাই সিদ্দীক আহমদসহ তিনি গাঙ্গুহ শরীফে অবস্থান শুরু করেন। হযরত শাইখুল ইসলামকে এ সময় কঠোর সাধনায় লিপ্ত হতে হলো। উভয় ভাইকে গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'খানক্বায়ে কুদ্দুসিয়া'র দু'টি আলাদা কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর পীরের নির্দেশে তাঁরা জিকির-মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হলেন। হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বলেন: "হযরতের শিখানো মুরাক্বাবার আমল শুরু করলাম। আসরের নামাযান্তে হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাধারণ মজলিস করতেন। আমি তখন খানক্বায়ে কুদ্দুসিয়ার বারান্দার পিলারের পেছনে বসে পড়তাম। এরপর মুরাক্বাবায় নিজেকে নিমগ্ন করতাম। মাগরিব পর্যন্ত এ অবস্থায় কেটে যেতো। এ মুরাক্বাবা থেকে আমি বেশ উপকারলাভ করেছি।" [নকশে হায়াত - চেরাগে মুহাম্মদ (সা.) থেকে)

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এক রাতে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে দেখলেন, নূরোজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট এক বুজুর্গ এসে তাঁকে বলছেন, "চল্লিশ দিন পরই তোমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে"। স্বপ্নটি সত্যে পরিণত হলো। ঠিক চল্লিশ দিন পর হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে কাছে ডেকে নিলেন এবং খিলাফত প্রদানে ধন্য করলেন। হযরত মাদানী তখন মাথানত অবস্থায় বললেন, "হযরত! এই গুরুভার দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আমার নেই। তাছাড়া খিলাফত লাভের উদ্দেশ্যে এই রাস্তায় নামি নি।" গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুচকি হেসে বললেন, "এরপরও খিলাফতের প্রয়োজন আছে।" হযরত মাদানী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “হযরত! নকশবন্দিয়া তরীকায়ও সুলুক অতিক্রমের ইচ্ছা রাখি।” ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “আমি তোমাকে যে তা’লিম দিয়েছি তা সকল সিলসিলার সর্বশেষ তা’লিম। এখানে সকল সিলসিলা মিলিত হয়েছে। এরই অনুশীলন করবে।”

পরবর্তীতে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক চিঠিতে লিখেছেন, “আমার মুর্শিদ ও মুরব্বী হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে চার তরীকায়ই মুরীদ করেছিলেন। তন্মধ্যে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া তরীকাও রয়েছে। কিন্তু তাঁর আসল তরীকা এবং সাধারণ তা’লিম ছিলো, চিশতিয়া-সাবিরিয়া।” [চেরাগে-মুহাম্মদ (সা.)]

অধ্যয়ন ও মসজিদে নববীতে হাদীসের পাঠদান

হিজরি ১৩২০ (১৯০২ ঈ) সনে শাইখুল ইসলাম মদীনা শরীফ ফিরে আসেন। ডাক্তার মুহাম্মদ খাজা সাহেব ইতোমধ্যে মদীনা শরীফে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি “শামসিয়্যাবাগ মাদ্রাসা” নামক এই প্রতিষ্ঠানে ২৫ ভারতীয় রুপি বেতনে চাকুরী শুরু করলেন। সাথে সাথে অন্যান্য সব কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে নববীতে বিনা বেতনে হাদীসের দারস শুরু করেন। মাত্র ক’মাসের মধ্যেই শিক্ষক হিসাবে হযরতের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। আরব ও আজমের বহু শিক্ষার্থী তাঁর দারসে যোগ দিতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে খাজা সাহেব তাঁকে নির্দেশ দিলেন, “আপনি মসজিদে নববীতে আর দারস না দিয়ে সব ছাত্রসহ শুধুমাত্র মাদ্রাসায় যেয়ে পাঠদান করুন।” কিন্তু সুন্নাতের মূর্ত প্রতীক, নবীজীর আশিক ও ফিদাকার শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ নির্দেশ পালনে নারাজ হলেন। তিনি পবিত্র মসজিদের পরিবেশ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে খাজা সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন। হযরতকে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত শামসিয়্যাবাগ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে হলো।

শাইখুল ইসলামের নবীপ্রেমের নমুনা এখানে ফুটে উঠে। তাঁর এক ছাত্র মাওলানা আবদুল হক মাদানী বর্ণনা করেন: “সম্মানিত উস্তাদের (শাইখুল ইসলাম)

আত্মমর্যাদাবোধ এতো বেশী ছিলো যে, আমার পিতা দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত মোটা অঙ্ক বেতনের আশ্বাস দিয়েও তাঁকে আমাদের বাসায় টিউশনির জন্য সম্মত করতে পারেন নি। তিনি প্রতিবারই আমার পিতাকে উত্তর দিয়েছেন, আবদুল হককে মসজিদে পাঠিয়ে দিন। এখানে আমি বিনা বেতনেই পড়িয়ে দেব। অথচ সেকালে তাঁর পরিবারে অভাব-অনটন এতো বেশী ছিলো যে, বহুদিন তাঁকে না খেয়ে রোযা রাখতে আমি দেখেছি। তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আবদুল হক! আমার পরিবারের অবস্থা তুমি কারো কাছে ব্যক্ত করো না।" [সায়্যিদ রশীদ উদ্দীন হামিদী, ওয়াকিয়াত ওয়া কারামাত, ড. মুশতাক আহমদ, শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, পৃ: ১৩১ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বেও মসজিদে নববীর পবিত্র পরিবেশে একাধিক ভারতীয় আলিম হাদীসের পাঠদান করেছেন। তবে তাঁর দারসে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ভিড় জমাতেন তা ছিলো অনন্য। এ ব্যাপারে হযরত মিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক অমৃতসরী একজন আল্লাহপ্রেমিক আলিম ও পূর্ববর্তীগণের নমুনা ছিলেন। তিনি মদীনায় যেয়ে পাঠদান শুরু করেন। তাঁর ইন্তিকালের কিছুদিন পরই মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (শাইখুল ইসলামের বড় ভাই) পবিত্র দারুল হিজরতে বিশেষভাবে আপন গৃহে এবং মসজিদে নববীতে শিক্ষাদান কর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর ছোট ভাই মাওলানা হুসাইন আহমদের পাঠদান বৃত্ত খাস মসজিদে নববীতে রওজা মুবারকের সামনে এমন মাহাত্ম্য ও বরকতের সাথে চালু হয়, যাতে বড় বড় পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রজ্ঞ উস্তাদগণের বৃত্তও ছোট হয়ে আসে। মদীনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সন্তানরা মাওলানা হুসাইন আহমদের খিদমাতে এসে আদব সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে।" [হায়াতে শায়খুল হিন্দ, পৃ: ২২, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, চেরাগে-মুহাম্মদ (সা.) থেকে, পৃ: ৭৫]

পবিত্র পরিবেশে বসে পাঠদানের নমুনা হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "১৩২০ থেকে ১৩২৬ হিজরি পর্যন্ত লাগাতার শিক্ষাকর্ম চালিয়ে যাই। প্রত্যহ বিভিন্ন শাস্ত্রের চৌদ্দটি পর্যন্ত কিতাব অধ্যয়ন করতাম। হিন্দুস্থানে পাঠদান হয় না এমনও কিছু কিতাব আমাকে পড়াতে

হয়েছে। এসব কিতাব মদীনা, মিসর ও ইস্তাম্বুলের মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যেমন: আজরুমিয়া, দাহলান, কাফরাভী, আলফিয়াইবনেআকীল, শরহে আলফিয়া ইবনে হিশাম; নাহু শাস্ত্রে শরহে ওকূদুজ জামান, রিসালা মুস্তাআরা এবং রিসালা ওযবিয়া লিলকাজী আযদ ইত্যাদি। মাআনী ও বয়ান শাস্ত্রে বদিইয়া ইবনে হুজ্জা, ফিকাহ শাস্ত্রে নূরুল ঈযাহ, মুন্তাকাল আবহুর, শরহু জমউল জাওয়ামি লিসসুবকী, শরহে মুস্তাসফাল উসূল, ওয়ারাকাত, শরহে মুন্তাহাল উসূল ইত্যাদি। শাফিঈ ও মালিকী উসূল শাস্ত্রে মাসামির শরহে মুসায়ারা, শরহে তাওয়ালিউল আনওয়ার, জাওয়াহারা ইত্যাদি। আক্বায়িদ শাস্ত্রে আলফিয়া উসূলুল হাদীস। তাফসীর, হাদীস, মাআনী, ফিকাহ, উসূল ইত্যাদি শাস্ত্রের যেসব কিতাব ছাত্রজীবনে পড়েছিলাম, সেগুলোও বারবার পড়াতে হয়েছে। ... বুজুর্গ উস্তাদগণের বরকত ও দু'আ এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ আমার সঙ্গে ছিল। এর ফলে জ্ঞানগত অগ্রগতি হতেই থাকে এবং ফায়িজ দান ও ফায়িজ লাভের বৃত্ত শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।" [মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত চেরাগে-মুহাম্মদ (সা.), পৃ: ৭৬]

হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আধ্যাত্মিক স্তর তখনই খুব উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ ব্যাপারে একটি বর্ণনা আমরা তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই। তিনি নকশে হায়াতে বলেন, "একবার হিদায়া আখিরাইন কিতাবে এমন এক মাসআলা এসে গেল, যা অনেক চিন্তা-ভাবনা, প্রান্তটীকা এবং টীকা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেও সমাধান করা গেল না। নিতান্ত অক্ষম হয়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা শরীফে উপস্থিত হয়ে সালাম ও দরূদের পর বিষয়টি আরয করলাম। এতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমাধান হয়ে গেল।" [নকশে হায়াত, প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত]

হযরতের পাঠদান পদ্ধতি প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আশিকে ইলাহী মিরাঠী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। তিনি বলেন, "মাওলানা হুসাইন আহমদের দারস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হারাম শরীফে অনেক শীর্ষস্থানে রয়েছে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন উচ্চতর সম্মান ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলেন, যা ভারতীয় উলামা তো দূরের কথা, ইয়ামনী, সিরীয় এবং মাদানী আলিমগণেরও অর্জিত হয় নি। তিনি এমন সব গুণে গুণান্বিত, যা দর্শকদের

জন্যে বিস্ময়কর।” [তাযকিরাতুর রশীদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯; প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ৭৭]

হযরত শাইখুল ইসলামের আধ্যাত্মিক চর্চা

শাইখুল আরব ওয়াল আজম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি। তিনি ছিলেন চিশতিয়া তরীকার উচ্চতর শাইখ। ইসলামী রূহানিয়্যাত প্রচার-প্রসার ও বিকাশে হযরতের অবদান ছিলো অপরিসীম। যুগের চাহিদানুযায়ী রাজনীতির চরম ব্যস্ততার মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন তিনি। কিন্তু এরপরও রূহানিয়্যাতের দিকটিকে তিনি প্রাধান্য দান করেছেন। তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনাকালে এ সত্যটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে। সেই উনিশ বছর বয়সে ইমামে রাব্বানী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণের পর থেকেই তিনি তাসাওউফের সাধনায় নিজেকে নিবেদিত করেন। এ অবস্থা তাঁর ইন্তিকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

ফানা ফিশ-শাইখ

তরীকতের রাস্তায় প্রাথমিক স্তরকে বলে ফানা ফিশ-শাইখ। নিজের মুর্শিদের প্রতি অত্যধিক মুহাব্বত ও আত্মিক সংযুক্তি হেতু এই হালের সৃষ্টি হয়ে থাকে।হযরত কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিক অবস্থায় স্বীয় উস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত ও নৈকট্য হাসিলে সর্বদা উদ্গ্রীব থাকতেন। এমন কি তাঁর তরীকতের শাগরিদ হওয়ারও ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে পাঠিয়ে তাঁকে বাইআত গ্রহণের নির্দেশ দেন। মদীনা মুনুওয়ারায় পৌঁছে হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারুকী মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাতলে দেওয়া জিকির-আজকার নিয়মিত পালন করতে থাকেন যুবক মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ধীরে ধীরে তাঁর তনু-মন-প্রাণ চিশতিয়া তরীকার রূহানী নিসবত হেতু উদ্বেলিত হয়ে ওঠতে লাগলো। এক পর্যায়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শরীরে ‘হারকাত’

শুরু হলো। পাস-আনফাস জিকির পালনকালে তাঁর শরীর বেশ প্রবলভাবে কাঁপতে থাকে। তিনি মসজিদে নববীর পবিত্র পরিবেশে বসে জিকির করতে লাগলেন।

একদিন এক আশ্চর্য ব্যাপার উন্মোচন হলো। হযরত কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষারত। কিছুক্ষণ পরই শুরু হবে মসজিদে নববীতে নামাযের জামাআত। হযরতের মধ্যে হঠাৎ আত্মিক পরিবর্তন শুরু হলো। তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলেন। বুঝতে পারলেন, এই শরীর ও মন নিজের নয়- অপর কেউ যেনো তাঁর সবকিছু হরণ করে নিয়ে গেছে! হ্যাঁ, বুঝা যাচ্ছে তিনি কে। তিনি তো রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি! বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি হয়ে গেছেন স্বীয় পীর! নামাযের ইক্বামত শুরু হলো। নামায শেষে আরো বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলো। প্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা এ হালের মধ্যে কেটে গেল। এরপর তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে গেল। নিজের মধ্যে ফিরে আসলেন।

এ আশ্চর্য ব্যাপারটি হযরত কুতবে আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীরের নিকট পত্রযোগে জানালেন। হযরত ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন: "ভাবার কিছু নেই। এটা সুলুকের একটি হালত। মা'রিফাত হাসিলের রাস্তায় প্রাথমিক এই স্তরকে বলে ফানা ফিশ-শাইখ। তুমি এই স্তরে উপনীত হয়েছো। এই মাক্বাম অতিক্রম করার পর ফানা ফির-রাসূলের স্তরে উন্নীত হবে। এরপর মনজিলে মাকসুদে- ফানা ফিল্লাহর স্তর তোমার ভাগ্যে জুটবে।"

স্বীয় পীরের চিঠি পেয়ে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন। একই সাথে সুলুকের মাক্বামগুলো অতিক্রম করতে তাঁর অন্তরাত্মা আরো বেশী আগ্রহশীল ও উদগ্রীব হয়ে ওঠলো। হাদীস ও ফিকহী কিতাব পাঠদানের সাথে তিনি তাসাওউফের আমলী চর্চায়ও নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

উৎসাহব্যঞ্জক স্বপ্ন

ইলমে মা'রিফাত অর্জনের পথে সাধনাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা বা 'হাল' আত্মপ্রকাশ করে। সুফিরা বলেন, এসব হাল হলো রাস্তার পার্শ্ববর্তী 'আবর্জনা' মাত্র। তবে এগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সালিক তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আশা রাখতে পারে। শর্ত হলো এসব, 'কারামত', 'কাশফ', 'ইলহাম' ও 'সত্যস্বপ্ন' বা অন্যান্য অত্যাশ্চর্য বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। এসব ব্যাপার তো আসল মাকসুদ নয়। মাকসুদ একমাত্র 'প্রেমাস্পদ'।

উল্লেখিত 'হাল' এর কোনো একটির প্রতিও যদি সালিক নিজেকে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত করে নেন, তাহলে এখানে তার স্থিতি রচিত হবে। তিনি আর উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করতে পারবেন না। মূলত এসব হালের অবস্থা আত্মপ্রকাশের আসল কারণ হলো সালিকের মধ্যে আরো বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি। তরীকতের রাস্তায় আরোও অধিক সাধনায় রত হওয়া এবং সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার শুভ ইঙ্গিত। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মদীনা মুনুওয়ারায় থাকাবস্থায় কয়েকটি এরূপ উৎসাহব্যঞ্জক স্বপ্ন দেখেন। নিম্নে এর বর্ণনা তুলে ধরছি।

এসময় হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফত লাভ করেন নি। একদা তিনি একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখেন। বিভিন্ন যুগের ১১ জন বিশিষ্ট ওলির আগমন ঘটেছে। তাঁরা হযরতকে বললেন, 'আমরা তোমাকে ইযাজত প্রদান করলাম!'। ঘুম ভেঙ্গে গেল। আরেক রাতে দেখলেন, পূর্বের যুগের চিশতিয়া তরীকার সুবিখ্যাত শাইখুল মাশাইখ হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি কুরসিতে উপবিষ্ট আছেন। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মহান বুজুর্গের সেবাকল্পে সামনে দণ্ডায়মান। বুজুর্গ একটি খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ হযরতকে প্রদান করে বললেন, "অবশিষ্ট দু-তৃতীয়াংশ তরীকতের অন্যান্য মাশাইখের মাধ্যমে তোমাকে প্রদান করা হবে।" ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্য আরেকদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, শাইখুত তরীকাত ওয়াল মা'রিফাত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারুকী মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে বেশ কিছু খেজুর পাঠিয়েছেন। পরক্ষণে দেখেন, নিজেই তাঁর দরবারে উপস্থিত। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন,

"ওহে! এ খেজুরগুলো তুমি নিজেই বণ্টন করে দাও!" মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরয করলেন, "হযরত! এগুলো তো আমি আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছি। আমার কাছে খেজুরের দোকান আছে।" হাজী সাহেব বললেন, "না! তা হয় না। আমার এটা জানা, এসব খেজুর যোগাড় করতে কত কষ্ট হয়েছে।" ঘুম ভেঙ্গে গেল। শেষোক্ত এই স্বপ্নটি মদীনা শরীফ থেকে গাঙ্গুহ শরীফ যাত্রাপথে তিনি দেখেছিলেন।

গাঙ্গুহে পৌঁছে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীরের নিকট এসব স্বপ্নের বর্ণনা করলেন। ইমামে রাব্বানী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহাস্যে বললেন, "হে হুসাইন আহমদ! শেষোক্ত স্বপ্নের অর্থ হলো, প্রিয় শাইখী হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবার থেকে তোমাকে 'ইযাজত' প্রদান করা হয়েছে!" পীরের মুখ থেকে একথা শ্রবণ করে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশেষভাবে আবেগ-আপ্লুত হলেন। তাঁর চোখ দু'টো অশ্রুতে ভরে গেল।

দু'টি বছর মাত্র পার হয়েছে। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামে রব্বানীর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন। এরপর পীরের নির্দেশে গাঙ্গুহে আগমন ও আড়াই মাস সুহবতে থাকার পর খিলাফত লাভ। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর। সবকিছু যেনো খুব দ্রুত অর্জিত হয়ে গেল। আসলে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যশীল এক যুবক। বাইআত গ্রহণের পরই মক্কা মুয়াজ্জমায় যেয়ে বাইতুল্লাহর জিয়ারত এবং সেখানে উপস্থিত 'দাদাপীর' হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত লাভ। এরপর শরীয়ত ও তরীকতের প্রাণকেন্দ্র, রাহমাতুল্লিল আলামীনের পবিত্র নগরী মদীনায় গমন, সেখানে রওজায়ে আতহারকে সামনে রেখে তাসাওউফের আ'মল ইত্যাদি সবই তো আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামতের নিদর্শন। তিনি যে যুগের শ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখের মর্যাদায় ভূষিত হবেন, তার ইঙ্গিতবহ এসব 'সুযোগ-সুবিধা' প্রাপ্তি থেকেই অনুমেয়। দ্রুত খিলাফত লাভের ব্যাপারটির উপর মন্তব্য করতে যেয়ে অধ্যাপক খালিক আহমদ নিযামী বলেন, "হযরত গাঙ্গুহীর খানক্বায় যদিও আড়াই মাসের বেশী অবস্থানের সুযোগ হয় নি তবুও এই আড়াই মাস অবস্থানের প্রকৃতি

ছিলো হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যা মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থানের ন্যায়। অর্থাৎ অবস্থানকাল অল্প কয়েক দিনের কিন্তু অর্জন অনেক কিছুর। লোকেরা তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলে শায়খ সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিয়েছিলেন, মৌলবী বাহাউদ্দীন একটি শুষ্ক ঠনঠনে কাষ্ঠের ন্যায় পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে এখানে এসেছেন। ফলে এক ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাতে মা'রিফাতের আগুন ধরে গিয়েছে।" [ড. মুশতাক আহমদ, শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, পৃ: ৩৭০]

অনন্য প্রতিভাবান হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন দক্ষ রাজনীতিক ছিলেন। তরীকতের উচ্চপর্যায়ের মাশাইখদের জীবন নিয়ে গবেষণায় আমরা খুব অল্পজনকেই দেখতে পাই যাদের বিচরণ রাজনীতির মধ্যে পড়েছে। কারণ, রাজনীতিক জীবন খুব বেশী জটিল-কঠিন ও ব্যস্ততাপূর্ণ হয়ে থাকে। ফলে সুলুকের প্রতিষ্ঠিত আমল এবং কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া অনেকসময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সূফিরা তাই সাধারণত রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসতেন।

হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে রাব্বুল আলামীন এমন কিছু গুণাবলী দান করেছিলেন যা সচরাচর সুফি-দরবেশদের তুলনায় অনন্যসাধারণ। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছেন তরীকতের দীক্ষা-শিক্ষা-আমল-আখলাক এবং চর্চার মধ্যে। রেখে গেছেন ১৬৭ জন তারকাসদৃশ খলিফা। এদের সকলেই পরবর্তীতে ভারত উপমহাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের খিদমাত করেছেন এবং করে যাচ্ছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তৎমধ্যবর্তী বিশ্বসমাজের চাঞ্চল্যকর ও পরিবর্তনশীল আর্থরাজনীতিক দিনগুলো ছিলো হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনের তারুণ্য, গতিময়তা ও সুপক্ক সময়। চতুর্দিকের এই বহুমুখী ইতিহাস সৃষ্টিকারী সময়ে বেঁচে থাকা তাঁর মতো সমাজসচেতন এবং পরহেজগার কেউ কি কখনো নীরব থাকতে পারেন? এছাড়া তাঁর বহুদিনের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সক্রিয়ভাবে ভারত থেকে 'ইংরেজ খেদাও'

আন্দোলনের নেতৃত্বে জড়িত ছিলেন। উস্তাদের সঙ্গে থাকার ফলে তাঁর মধ্যে স্বভাবতই প্রভাব পড়ে। বাস্তবে শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং সকল উলামায়ে দেওবন্দের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার উদ্দেশ্য দেশের মন্ত্রী-শাসক কিংবা উচ্চপদস্থ কোনো পেশায় গদিনশীন হওয়া মোটেই ছিলো না। ভারতবর্ষকে উপনিবেশবাদী ইংরেজ বেনিয়াদের কবল থেকে মুক্ত করাই ছিলো এই কর্মব্যস্ত বৈপ¬বিক রাজনীতিক জীবনের মূল লক্ষ্য। আলহামদুলিল্লাহ! হযরত শাইখুল ইসলাম জীবদ্দশায় এই লক্ষ্যর্জনকে দেখে গেছেন- যদিও তাঁর নিজের দূরদর্শী ভিশন অনুযায়ী স্বাধীনতা আসে নি। মহাত্মা গান্ধি ও অন্যান্যদের মতো তিনি চেয়েছিলেন একটি সুসমৃদ্ধ সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষ। যা হোক, সে ইতিহাসের দিকে আমরা এ প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।

আগেই বলেছি এ গ্রন্থে হযরতের রাজনীতিক জীবনের উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছু উল্লেখ করবো না। তরীকতের একজন শাইখুল মাশাইখ হিসাবে উপমহাদেশের এই মহান ব্যক্তির তাসাওউফচর্চার জীবনালোচনাই এখানে মূখ্য। তবে স্বভাবতই জীবনের গতিমতি পরিবর্তনের বর্ণনায় প্রাসঙ্গিকক্রমে অনেক কথা এসে যাবে। সুতরাং রাজনীতির দিকগুলো ভাসাভাসাভাবে তুলে ধরতেই হয়। এছাড়া আমরা আশা করছি, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের সংক্ষিপ্ত একটি ঘটনাপঞ্জী সুপ্রিয় পাঠকদেরকে শেষের দিকে উপহার দেওয়ার, ইনশাআল্লাহ।

মাল্টায় কারাবরণ

দীর্ঘ ১৮ বছর হযরত কুতবে আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মদীনা মুনুওয়ারার পবিত্র মসজিদে নববীতে রওজায়ে আতহারের সম্মুখে বসে ইলমে দ্বীনের দারস প্রদান করেছেন। আরব-আজমের মোট ক'জন ছাত্র তাঁর এসব দারস থেকে উপকৃত হয়েছিলেন এর সঠিক কোনো তালিকা পাওয়া যায় নি। এর মূল কারণ হলো, মসজিদে নববীর ভেতর যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলো তা ছিলো অপ্রাতিষ্ঠানিক। যার ইচ্ছে, দারসে শরীক হতে পারতেন। কোনো রেকর্ড রাখা হতো না। এরপরও বিভিন্ন উৎস থেকে বেশ কিছু নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবি শায়খ আব্দুল

হক মাদানী (মৃ: ১৯৫৪/১৩৭৪), মদীনা মুনুওয়ারার সরকারী উচ্চপদস্থ পরিষদ-সদস্য শায়খ আবদুল হাকীম আল-কুরদী আল-কাওরানী, হানাফী মুফতি নায়েবে কাজী শায়খ আহমদ বাতাসী, পৌর চেয়ারম্যান শায়খ মাহমুদ আবদুল জাওয়াদ এবং আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত ইমান আবদুল হামিদ ইবনে বাদিস (১৮৮৯-১৯৪০ / ১৩০৬-১৩৫৯) ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী শায়খ মুহাম্মাদ বাশীর ইব্রাহিমী প্রমুখ হযরতের ছাত্র ও শিষ্য ছিলেন। (ড. মুশতাক আহমদ, শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, পৃ: ১৪৮ দ্র:)

মুহাররম ১৩৩৪, ১৯১৫ সালে শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিপ্লবসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হিজায সফরে যান। এ সময় হযরত শাইখুল ইসলামের বয়স ৩৬ বছর। সফরের এক পর্যায়ে শাইখুল হিন্দ মদীনা মুনুওয়ারায় গমন করেন। বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাঁকে পবিত্র নগরীতে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এসময় প্রিয় উস্তাদের নেতৃত্বাধীন 'ইংরেজ খেদাও' আন্দোলনে শাইখুল ইসলাম যোগ দেন। মাত্র একটি বছর কেটে যেতে না যেতেই তিনি জীবনের প্রথম কারাবরণ করেন।

পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ১৩৩৫-১৯১৫ সালের সফর মাসে স্বীয় উস্তাদের সঙ্গে মাল্টায় নির্বাসিত হন মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুদীর্ঘ ৩ বছর ৭ মাস ভূমধ্যসাগরের এই দ্বীপে বন্দী জীবনশেষে মুক্তি পান। তখন ছিলো ১৩৩৮-১৯২০ সালের রমজান মাস। উল্লেখ্য হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় উস্তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দরুন স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গী হয়ে কয়েদী জীবন বেছে নিয়েছিলেন। শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। প্রাণপ্রিয় উস্তাদ দূরবর্তী স্থানে একা কারাবরণ করবেন, এটা তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। তাই নিজেও কয়েদী হওয়ার এক কৌশল আঁটলেন।

মক্কা শরীফের তখনকার বিদ্রোহী উসমানী শাসক শরীফ হুসাইন বিশ্বাসঘাতকতা করায় শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তায়েফে অবরুদ্ধ হন। হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উস্তাদকে কৌশলে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেন। পুলিশ শাইখুল হিন্দকে খুঁজে না পেয়ে হযরত মাদানীকে গ্রেফতার

করে নিয়ে যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে শাইখুল হিন্দও বন্দী হলেন। তাঁকে জিদ্দায় প্রেরণ করা হলো। অপরদিকে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর বড় ধরনের কোনো অভিযোগ ছিলো না। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দান করলো। তিনি যখন জানতে পারলেন প্রিয় উস্তাদকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ আটক করে নিয়েছে, তখন নিজের কষ্ট ভুলে কিভাবে উস্তাদের সঙ্গলাভ সম্ভব হয় সে কৌশল করলেন। ইচ্ছে করলে অবশ্য মদীনা মুনুওয়ারায় ফিরে যেতে পারতেন। তিনি কৌশলে কর্তৃপক্ষকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলেন যে, হযরত শাইখুল হিন্দের একজন বিশেষ সহচর হিসাবে কাজ করছেন। ফলে তাঁকে বন্দী করে জিদ্দায় স্বীয় উস্তাদের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। (সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক আওর উনকে মুজাহিদানা কারনামে, পৃ: ১৫১-১৫৭ দ্র:)

গ্রেফতার হওয়া হিন্দুস্থানী এই উভয় বুজুর্গকে একই বছর (১৩৩৫ হিজরি) সফর মাসে মিসরের রাজধানী কায়রোতে প্রেরণ করে কর্তৃপক্ষ। নীলনদের অপর তীরে ছিলো প্রখ্যাত জিযার প্রাচীন কারাগার 'আল মাকালুল আসওয়াদ'। জেলখানার একটি কক্ষ তখন সামরিক আদালত। উভয়কে সেখানে উপস্থিত করে বিচারকার্য শুরু করল ইংরেজরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় শাইখুল ইসলামের জবাবদিহিতা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত ও জোরালো। ফলে তিনদিনব্যাপী উকিল-মুক্তাররা তাঁর জবানবন্দী নিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ট্রাইবুনালের সদস্যদের ইচ্ছে ছিলো উভয়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা।

বিচারকার্য পরিচালনার সময় আসামীদের আলাদা সেলে রাখা হয়েছিল। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানোর এটাই ছিলো আলামত। উভয়কে এমন কড়া নজরে রাখা হলো যে, একে অন্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা পরামর্শের কোনো সুযোগই দেওয়া হয় নি। নকশে হায়াতে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বলেছেন, "মাল্টায় কারাবন্দী জীবনের পূর্বে এভাবে আলাদা থাকাই ছিলো আমাদের সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্ত। পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় আমরা জানতাম না কারউপর কোন্ সময় মৃত্যুদ- কার্যকর হচ্ছে। দীর্ঘ এক মাস কেটে যায়। কর্তৃপক্ষের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন হলো। গোয়েন্দা রিপোর্টের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ মিললো না। এছাড়া স্বীকারোক্তি উদ্ধারেও তারা ব্যর্থ হলো। ফলে আদালত আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের

বদলে মাল্টা দ্বীপে প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়।” (নকশে হায়াত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৬৫৪) উল্লেখ্য, এসময় বৃটিশরা যুদ্ধবন্দীদের সেখানে কারারুদ্ধ করে রাখতো। হযরত শাইখুল হিন্দ ও হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা যখন মাল্টায় পৌঁছেন তখন আরও প্রায় ৩,০০০ যুদ্ধবন্দী মাল্টায় কারাবরণ করছিলেন।

বন্দীবস্থায় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন

কারাবন্দী হিসাবে সুদূর ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ মাল্টায় থাকাকালে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মূল কাজ ছিলো স্বীয় উস্তাদ বয়োবৃদ্ধ শায়খ হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাত করা। তাকযিয়ায়ে নফসের একটি বাস্তব সত্য হলো ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এই পরীক্ষা সুফিদের ভাষায় ‘রাস্তায় চলার মূল উপাদেয়’। আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে সালিকের উপর পতিত এসব পরীক্ষা মূলত দয়া ও মুহাব্বতের নিদর্শন। তবে হ্যাঁ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে অবশ্যই ধৈর্যের সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। আর পরীক্ষা যতো বড়ো নৈকট্যের সম্ভাবনাও ততো উন্মুক্ত হয়ে থাকে।

হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনে যেসব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তিনি লোকসমক্ষে খুব একটা ব্যক্ত করতেন না। এটা তাঁর উচ্চতর তাক্বওয়াহ ও পরহেজগারীর সাক্ষ্য বহন করে। এরপরও কিছু কথা লুকিয়ে থাকে নি। মাল্টায় ৩ বছর ৭ মাসের দীর্ঘ কষ্টের জীবনের রোজনামচা হযরতের স্বরচিত আত্মজীবনীমূলক ‘নকশে হায়াত’ এবং ‘আসীরে মাল্টা’ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এখন আমরা হযরত মুহিউদ্দীন খান দামাত বারাকাতুহুম অনূদিত ‘চেরাগে মুহাম্মদ (সা.)’ থেকে এরূপ ক’টি ঘটনার কথা তুলে ধরবো।

১. নিকটাত্মীয়দের মৃত্যু: মাল্টায় কারাবন্দী থাকাকালে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিজের পরিবারের সাত জনের মৃত্যু ঘটে। এরূপ বিরাট দুর্ঘটনায় পতিত হলে মানুষের অবস্থা কী হতে পারে, চিন্তার ব্যাপার বৈকি। হযরতের একজন জীবনীকার ফরিদুল ওহীদী এ চরম দুর্দিনের কথাগুলো অত্যন্ত বেদনাতুর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন

মদীনা তায়্যিবাহ থেকে বের হয়েছিলেন তখন তাঁর বাড়িতে রেখে যান একঝাঁক জীবনচঞ্চল ঘরপূর্ণ ফুলেল প্রিয়জন। কথাছিলো মাত্র ক'দিন সফর করবেন। কিন্তু ভাগ্যের ফের, তিনি বন্দী হয়ে মাল্টায় নির্বাসিত হলেন।

একদিন খবর এলো হযরত শাইখুল ইসলামের বৃদ্ধ পিতা হাবীবুল্লাহ ও যুবক দুই ভাইকে তুর্কী সরকার বন্দী করে তুরস্কের এড্রিয়ানোপলে পাঠিয়ে দিয়েছে। রয়ে গেছেন পরিবারের সকল মহিলা সদস্যা অবলা অসহায় অবস্থায়। তুর্কী সরকারের এই আচরণে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্তরে খুব বেশী আঘাত পেলেন। একে তো নিজের পিতা ও ভাইদের উপর পতিত বিপদ। কিন্তু এরা তো কেউ তুর্কী খিলাফতের বিরোধী ছিলেন না। সারাজীবন মাদানী পরিবারের সকলই উসমানী খিলাফত কিভাবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে চিন্তা-চেতনায় দেহ-মন-তন উৎসর্গিত করেছিলেন। আজ সেই তুর্কী সরকারই এদের গ্রেফতার করেছে শুধু এ কারণে যে, তারা ছিলেন ভারতীয়।

তখন চলছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বৃটিশ শাসিত ভারত তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। সুতরাং ভারতীয় হওয়াটাই ছিলো তাদের অপরাধ। একেই বলে 'মন্দ সময় আসলে আলো হয়ে যায় অন্ধকার'।

হযরত শাইখুল ইসলামের পিতা পবিত্র মদীনার জমিতে সমাহিত হবেন, আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীনের রওজা শরীফের অদূরে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির গর্ভে চিরশান্ত পরিবেশে ঘুমোবেন। এটাই ছিলো তাঁর মনের আকুতি। তাই স্বপরিবারে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আজ দু'টি পুত্রসন্তানসহ সুদূর তুরস্কে বন্দী, প্রিয় আরেক পুত্র সে-ই মাল্টা দ্বীপে জেলখানায়। সর্বোপরি মদীনা তায়্যিবায় অসহায় অবস্থায় ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন পরিবারের মহিলাদের। আহ! কী করুণ অবস্থা! যুদ্ধকালীন দুঃসময়ের নীরব শান্তিপ্রিয় নির্দোষ একটি পরিবার এরূপ বিপদগ্রস্ত!

হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মনের অবস্থা এ খবর থেকে কিরূপ দুঃখভারাক্রান্ত হয়েছিল, তা যে কোনো মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু এ খবর

কিছুই ছিলো না। সামনে অপেক্ষারত ছিলো আরো একাধিক হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী। ইশকে ইলাহীর রাস্তায় সবরের বিরাট সুউচ্চ পর্বত সামনে। এর উপর আরোহণ করতেই হবে- চরম ধৈর্যসহ গন্তব্যস্থল পর্বতশৃঙ্গে যেয়ে উপনীত হওয়া চাই। সোনা খাঁটি হবে তখনই যখন তা জ্বলন্ত অঙ্গারে উত্তপ্ত হতে হতে গলে যাবে।

২. আটকে পড়া চিঠিপত্র: মাল্টায় বন্দীবস্থায় কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করা শুরু করেন। একবার একখানা চিঠি আসলো ডাকযোগে। তিনি তা খুলে দেখলেন না। এরপর আসলো আরেকখানা। এটিও তিনি খুললেন না। এভাবে বেশ ক'টি পত্র আটকে রাখলেন স্বেচ্ছায়- খুলে পাঠ করলেন না। এদিকে তিনি খুব মনোযোগসহ কুরআন শরীফ হিফজ করছিলেন। যে মুহূর্তে ঐ চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু হযরতের চোখে পড়েছিল তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা সম্ভবত হযরতের ভাতিজা মাওলানা ওয়াহিদ আহমদ মাল্টা থেকে ফিরে এসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন।

তখন ছিলো বাদ যুহর। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যথারীতি কুরআন তিলাওয়াতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। মাওলানা ওয়াহিদ আহমদ সবগুলো চিঠি নিয়ে আসলেন। হযরতের হাতে তুলে দিলেন। একমাত্র আল্লাহ মা'লুম তাঁর অন্তরে কী ছিলো। কুরআন শরীফ বন্ধ করে এদিন তিনি চিঠিগুলো খুলে ফেললেন। একে একে পত্রগুলো পাঠ করলেন নীরবে। প্রতিটি চিঠি পাঠান্তে তাঁর চেহারা বদলে যেতে লাগলো। চিঠির মধ্যে যে চরম দুঃসংবাদ লিপিবদ্ধ ছিলো তা সহজে অনুমেয়। হযরতের চেহারায় তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিলো। বিবর্ণ চেহারা, চোখ অশ্রুতে ভাসমান। কপোল বেয়ে ভিজে যাচ্ছে তাঁর কালো লম্বা দাড়ি। সবগুলো পাঠ শেষে কান্নাবিজড়িত ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করলেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন!" এরপর খুব শক্তভাবে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলেন ক্ষণকাল। তারপরও দশটি মিনিট কেটে গেল অশ্রুঝরা শোকাতুর অবস্থায়। এরপর পবিত্র কুরআন শরীফের পাতা উল্টিয়ে পুনরায় তিলাওয়াতে মশগুল হলেন। ধৈর্যের কী অপূর্ব আদর্শ! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

-'যখন তাদের কোনো মুসিবত স্পর্শ করে, তখন তারা বলে, ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন (নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো)।" (২ : ১৫৬)

পাঠক! একটু ভাবুন। একই সাথে নিজের একান্ত সাত-সাতজন আপনজনের মৃত্যুসংবাদ পেলে আপনার আমার অবস্থা কী হবে! ঐ চিঠিগুলোতে সেদিন হযরত কুতবে আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঠিক তা-ই পাঠ করেছিলেন। যেসব আপনজনের মৃত্যুসংবাদে ঐ পত্রগুলো বেদনারঞ্জণে রঞ্জিত ছিলো তারা হলেন হযরতের পিতা, যুবতী কন্যা, সম্ভাবনাময় পুত্র, নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রী, রুগ্না মাতা এবং দু'জন ভাবী! ইয়া আল্লাহ! কী করুণ ঘটনা! সাতজন অন্তরাত্মা, দেহ-তনু-মনের সঙ্গে জড়িত আপনজনের করুণ মৃত্যুসংবাদ একত্রে শ্রবণ করার পর সাধারণ কোনো মানুষ কী কখনো নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হবে? অথচ কুতবে আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পর্বতসম ধৈর্যশক্তির প্রতিটি অণুকণা সেদিন তাঁর জন্য উদ্ধারসূত্র হিসাবে কাজ করেছিল। তিনি শুধু পরীক্ষার এই চরম পর্যায় অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি, মাত্র দশটি মিনিট পরই আবার প্রেমাস্পদের নিজের বাণীসম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াতমালা পাঠ করতে লাগলেন। তাঁর নিকট এই পবিত্রতম কথাগুলো সেদিন তার সকল সৌন্দর্য, রোমাঞ্চ, গোপন রহস্যাবলী নিয়ে উন্মোচন হয়ে গিয়েছিল। ইলমে মা'রিফাতের একেকটি স্তর অতিক্রমের সূত্র ছিলো ঐ একেকটি পত্রের দুঃসংবাদ। তিনি প্রতিটি স্তরই অতিক্রম করে গেলেন এবং সর্বশেষ সপ্তমটি পার হয়ে যেনো মিলনের শুভক্ষণে পাঠ করতে লাগলেন, প্রেমাস্পদের বাণী-কথা ... যেনো মিলনক্ষণে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের গোপন বাক্যালাপ!

ভাতিজা ওয়াহিদ উদ্দীন তখনো সেখানে দাঁড়ানো। তিনি অপেক্ষা করছিলেন, স্বজনদের সুসংবাদের কথা পত্রপাঠ শেষে হযরত তাকে বলবেন। কিন্তু কোনো কথা নেই। হযরত দশ মিনিট দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় কেটে দিয়ে তিলাওয়াতে মশগুল। কী বা বলার ছিলো? তিনি কিভাবে বলতে পারেন, হে ভাতিজা! তুমি যাদের সুসংবাদ, কোশলাদি শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায়, তারা তো সকলেই এই দুনিয়া

ছেড়ে বিদায় হয়ে গেছেন! যে গৃহের স্বজনদের হাল-অবস্থা তুমি জানতে উদ্গ্রীব সে গৃহতো উজাড় হয়ে গেছে! হায় আল্লাহ! পবিত্র আত্মার অধিকারী এই মহান প্রেমিকদের দারাজাতকে আপনি বুলন্দ করে দিন।

৩. কুরআন পাকের অনুবাদে সাহায্য: হক্কানী উলামায়ে কিরাম যুগ যুগ ধরে রচনা করে গেছেন উম্মাতে মুহাম্মদীর সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত চিরসুন্দর ফুলের তোড়াসদৃশ চিরন্তন অনুসরণযোগ্য এবং উপকারী অসংখ্য দ্বীনি কিতাবাদি। অনেক বুজুর্গানে দ্বীন বন্দীদশায়ও রচনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। কালাপানিতে বন্দীবস্থায় মুহাম্মদ ইনায়াত আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৭৫ হিজরিতে ‘সীরাতে হাবীবুল্লাহ’ নামক একটি সীরাতগ্রন্থ মুসলিম উম্মাহকে উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে যান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে বৃটিশ বেনিয়ারা তাঁকে ‘ইন্ডিয়ান পোর্ট ব্লেয়ার’ নামক দ্বীপে বন্দী রেখেছিল। এ গ্রন্থখানা পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্য কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ-বিতাড়নের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি আহমদনগর দুর্গে বন্দী থাকাবস্থায় ‘তরজমানুল কুরআন’ এর কিছু অংশ রচনা করেছিলেন। এভাবে আরোও অনেকে দ্বীনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বন্দীদশায় থেকে প্রণয়ন করে উত্তরসূরীদের জন্য রেখে যান।

হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও মাল্টায় দীর্ঘ ৩ বছর ৭ মাস কয়েদী থাকাবস্থায় কুরআনে পাকের একখানা কালজয়ী অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এসময় তাঁর নিকট শুধুমাত্র ‘তাফসীরে জালালাইন’ শরীফের একখানা কপি ছিলো। তরজমা রচনার সময় তিনি প্রায়ই হযরত শাইখুল ইসলামের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। মাওলানা উযায়র গুলের সাথেও এ ব্যাপারে আলোচনা করতেন। এই তরজমাটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি তোহফা যা তিনি উম্মাতকে উপহার দিয়েছেন। এটা ইহ-পরকালে সকলের সৌভাগ্যের পাথেয় হিসাবে স্বীকৃত।

হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআনের অনুবাদগ্রন্থ মাল্টায় কয়েদি অবস্থায় থেকে সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হন নি। ইলমে হাদীসের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল কিতাব বুখারী শরীফের শিরোনামের উপর গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'তারাজিমুল আবওয়াব' নামক একখানা উচ্চতর গবেষণাগ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন। এসময় হযরতের নিকট মিশরে মুদ্রিত বুখারী শরীফের একটিমাত্র কপি ছিলো। এতে না ছিলো শব্দার্থ কিংবা প্রান্তটীকা। বেশ ক'টি শিরোনামের উপর গবেষণা শেষ করার পূর্বেই তিনি মুক্তি পেয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। আর এর মাত্র কয়েক মাস পরই এ মায়াবী ধরার কোল ছেড়ে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

উপরোক্ত কিতাব রচনাকালেও মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় উস্তাদকে সার্বিক সহযোগিতা দান করেছিলেন। চিরাচরিত অভ্যেসানুযায়ী তিনি এ ব্যাপারেও পরবর্তীতে আলোচনা করেন নি। কিন্তু খোদ হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভূমিকায় উল্লেখ করেন, "সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে হুজ্জাতুল্লাহ আলাল আলামীন হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর একটি আলাদা গ্রন্থে হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। সেটি দেখে মৃত প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে, গ্রন্থকারের অনেক গোপন রহস্য এ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত আছে। গ্রন্থটি নেহায়েত বিস্ময় সৃষ্টিকারী, কিন্তু অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততার কারণে এ থেকে পূর্ণ উপকার লাভ করা কঠিন অবশ্যই, কিন্তু দীর্ঘ দিনের আগ্রহ সকল বাধা দূর করে এ কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। তবে আমার অক্ষমতা উপেক্ষণীয় ছিল বিধায় বাধ্য হয়ে এ পন্থা বের করলাম, কয়েকজন জ্ঞানী, সমঝদার ও যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে যথাসম্ভব তাদের সহযোগিতায় এ কাজ সম্পন্ন করব।" - মোকাদ্দিমা, 'তারাজিমুল আবওয়াব' পৃ. ৪ [মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, চেরাগে মুহাম্মদ (সা.) থেকে উদ্ধৃত]

এটা প্রকাশ করা উচিৎ যে, ওসব 'জ্ঞানী, সমঝদার, যোগ্য' ব্যক্তিদের মধ্যে যারা শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে মাল্টায় বন্দীদশায় থেকে তাঁর

খিদমাত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

মাল্টার বন্দীদশা থেকে মুক্তি এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ ৬ বছরের অজস্র রক্তক্ষয়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ঈসায়ী ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আটক অনেক যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাল্টার বন্দীদের মুক্তি তখনো দেওয়া হয় নি। এদিকে বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। বৃটিশদের কঠোর অবস্থান হেতু বেশ কিছু লোকের প্রাণহানি তাদের পুলিশী নৃশংসতার কারণে ঘটে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনাটি হলো ঈসায়ী ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল 'জালিয়ানওয়ালাবাগের' হত্যাকাণ্ড। সেদিন পাঞ্জাবের ল্যাফটেনেন্ট গভর্ণরের নির্দেশে অনেক হিন্দু-মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় ঐ সমাবেশস্থলটি। অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ও হতাহতের প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশ-খেদাও আন্দোলনের মোড় ঘুরে যায়। জমিয়তুল উলামায়ে হিন্দ অমৃতসর অধিবেশনে 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এদিকে খিলাফত কমিটির আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধিও খিলাফতে যোগ দেন। এভাবে জমিয়ত, খিলাফত ও জাতীয় কংগ্রেস একযোগে চরম প্রতিবাদমূখর হয়ে ওঠে। দাবী ওঠে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন বন্দীশালায় আটককৃত সকল ভারতীয় রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির। বৃটিশ সরকার এ দাবী মানতে বাধ্য হয়। সেমতে, ২৫ জুমাদাস সানী ১৩৩৮ হিজরি (১০ মার্চ ১৯২০) হযরত শাইখুল হিন্দ ও হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা অন্যদের সঙ্গে মাল্টার বন্দীজীবন থেকে মুক্তিলাভ করে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ২০ রমযান ১৩৩৮ হিজরি (৮ জুন ১৯২০) বন্দীদেরকে নিয়ে একটি প্রিজন জাহাজ বুম্বাই [বর্তমান মুম্বাই] পৌঁছে। সকল বন্দীদেরকে চেইনে বেধে প্রিজন জাহাজে তুলে আনা হয়েছিল। বুম্বাই পৌঁছার পরই সবাইকে চেইনমুক্ত করা হয়। (নকশে হায়াত)

শাইখুল হিন্দ ও শাইখুল ইসলামের মুক্তি এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দ্রুত সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁদের ভক্ত-মুরীদান আবেগ-আপ্লুত হয়ে ওঠলেন। প্রকাশ করতে থাকেন কবিতার ছন্দে ভক্তি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবণতার কথা।

স্বজনহারা ইয়াতীম বেশে

মাল্টার বন্দীদশায় থাকাকালে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বজন বলতে যারা ছিলেন তাদের প্রায় সকলকেই হারান। মা-বাবা, স্বজনহারা ইয়াতীম বেশে তিনি ভারতের জমিনে পদার্পণ করলেন। নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন? হযরতের বয়স তখন ৪১ বছর। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেন জীবনের বাকী অংশ কাটিয়ে দেবেন পেয়ারে নবীজীর পাশে। পবিত্র মসজিদে নববীতে দাসরদান, রওজায়ে আতহারের নিকটে বসে জিকির-মুরাক্বাবা- এই ইবাদাত-বন্দেগীর মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। সুতরাং ৮ জুন ১৯২০ ঈসায়ী বুম্বাই সমুদ্রবন্দরে কয়েদী জাহাজ থেকে অবতরণের পরই হিজাযে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তিনি শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট অবগত করলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ প্রিয় উস্তাদ একরূপ অনুরোধের সুরে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে দেওবন্দ চলো, আরো কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকো"।

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমাল্টায় থাকাবস্থায় বুখারী শরীফের শিরোনামের উপর গবেষণামূলক 'তারাজিমুল আবওয়াব' নামক গ্রন্থটি রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এটা মাল্টায় থাকাবস্থায় সমাপ্ত করতে পারেন নি। গ্রন্থটি রচনার কাজে শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহযোগিতা করেছিলেন।

মাল্টা ফেরার পথে কয়েদী যাত্রীজাহাজ যখন সুয়েজ অতিক্রম করছিলো তখন শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত মাদানীকে বললেন, "আমি 'তারাজিমুল আবওয়াব' কিতাবখানা ভারতে পৌঁছে সমাপ্ত করার ইচ্ছা রাখি। তোমাকে এ কাজে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।" বৃদ্ধ, দুর্বল- প্রিয় উস্তাদকে

শাইখুল ইসলাম তখন বলেছিলেন, "হযরত! আপনার আদেশ শিরোধার্য- তবে একটা শর্ত আছে! যে সময়টুকু এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করবেন, তখন কেউ যেনো আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে আপনাকে অন্যমনস্ক করে না দেয়।" শাইখুল হিন্দ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "ঠিক আছে, এ শর্ত মেনে নিলাম। তবে আমারও একটি শর্ত আছে! তবে তা এখন ব্যক্ত করবো না।" [শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, পৃ. ১৫৫ দ্র:)

হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে শর্তটি সেদিন গোপন রেখেছিলেন তা প্রকাশ পেল যখন তিনি মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, "তোমাকে আমার সঙ্গে দেওবন্দ যেতে হবে"। সুতরাং আপাতত তিনি উস্তাদের সঙ্গে দেওবন্দ চলে গেলেন। তিনি যে, মূলত রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে আদৌ আগ্রহশীল ছিলেন না, তার প্রমাণ মিলে এসব তথ্য থেকে। বুম্বাই পৌঁছে মদীনা শরীফ ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থেকেও তা স্পষ্ট। দেওবন্দ গমনের মূল কারণও ছিলো 'তারাজিমুল আবওয়াব' গ্রন্থের রচনাকার্যে উস্তাদের সহযোগিতা করা। যা হোক, স্বাধীনতা সংগ্রামে শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একনিষ্ঠতা দেখে সম্ভবত তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি স্বীয় উস্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন এবং জীবনের শেষাংশ রাজনীতি ও তাযকিয়ায়ে নফসের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন।

রাজনীতিক বেশে শাইখুল ইসলাম

প্রচলিত রাজনীতি কতটুকু ইসলামসম্মত সে প্রশ্ন আমরা এখানে তুলবো না। এ গ্রন্থখানা মূলত তাসাওউফ শাস্ত্রের উপর গবেষণা বৈ নয়। কিন্তু বর্তমানে যে মহান ব্যক্তির উপর আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত তিনি শুধু বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ এবং তরীকতের দিশারী ছিলেন না। উভয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যস্থ আর্থসামাজিক ও রাজনীতিক পরিবর্তনশীল এক চাঞ্চল্যকর সময়ে জীবিত থাকায় এবং স্বীয় উস্তাদ শাইখুল হিন্দের সংস্পর্শে পড়ে তিনি নিজেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁর মতো সৎ, স্বীয় রাজনীতিক আক্বীদায় দৃঢ়পদ আদর্শ রাজনীতিবিদের সংখ্যা খুব বিরল ছিলো। তাঁর রাজনীতিক জীবনটা উৎসর্গিত

ছিলো ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম তথা সকল মানুষের সেবায়। অথচ তিনি কখনো মন্ত্রী-মিনিস্টার কিংবা গদিনশীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত ব্যক্ত করেন নি। ইংরেজ বেনিয়াদের কবল থেকে দেশকে কিভাবে মুক্ত করা যায় এবং জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া যায়, এ চিন্তাই ছিলো তাঁর রাজনীতিক ভিশন।

আগেই বলেছি, হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় উস্তাদের উৎসাহ ও অনুসরণে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মাল্টা থেকে মুক্ত হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরই খিলাফত আন্দোলন কমিটি শাইখুল ইসলামের উস্তাদ হযরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে 'শাইখুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করে। কারামুক্তির পর তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। ঈসায়ী ১৯২০ সালের ১৩ জুন, ২৫ রমজান ১৩৩৯ হিজরি হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। [ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬] মৃত্যুর আগের দিন রাজনীতিক কারণে নিজেই প্রিয় শাগরিদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পাঠিয়ে দেন কলিকাতার উদ্দেশ্যে। সুতরাং প্রাণপ্রিয় উস্তাদের নামাযে জানাযায় হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীক হতে পারলেন না। শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শায়িত আছেন তাঁর প্রিয় উস্তাদ হযরত কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাশে দেওবন্দের প্রখ্যাত 'মাকবারায়ে কাসিমী' কবরস্থানে।

মাল্টায় বন্দী থাকাকালে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদিসহ একান্ত স্বজন হারিয়েও তিনি শাইখুল হিন্দের স্নেহ-মমতার পাত্র হিসাবে থাকায় অনেকটা আস্বস্তবোধ করতেন। এখন পিতৃতূল্য এই সর্বশেষ ভরসাস্থলও হারিয়ে গেলেন। শাইখুল হিন্দের মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত ও অসহায় হয়ে পড়েন। কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললেন, "হায়! এখন আর ভারতে আমার কে আছে? আমার অভিভাবক বেঁচে নেই। আমি আশ্রয়হীন হয়ে গেলাম।"

শাইখুল হিন্দের মৃত্যুর পর সত্যিকার অর্থে 'বৃটিশ খেদাও' আন্দোলনে শাইখুল ইসলাম স্বীয় উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সকল কর্মী ও ভক্তদের নিকট, 'জা-নিশীনে শাইখুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত। এমনকি পত্র-পত্রিকায়ও হযরতের নামের

পূর্বে এ উপাধিটি সাংবাদিকরা সংযুক্ত করতেন। [ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৮]

তৃতীয় বিবাহ

হযরত শাইখুল ইসলামের দ্বিতীয় স্ত্রী মাল্টায় বন্দী থাকাবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন শেষে শাইখুল হিন্দের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার পর আমরুহা মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। এ সময় জরুরী মনে করে তৃতীয়বারের মতো তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আমরুহা মাদ্রাসার মুহতামিম হাফিয জাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্যোগে হযরতের মরহুমা দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছোট বোনের সাথে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য হযরতের প্রথম বিবাহ হয়েছিল আজমগড়ের মৌজা কিতালপুরে। এ স্ত্রীর গর্ভে দু'জন কন্যাসŠতানের জন্ম হয়। উভয়েই বাল্যকালে মারা যান। এরপর এই স্ত্রীবিয়োগ ঘটলে হযরত মাদানী বসরায়ুনের ক্বারী গোলাম আহমদ সাহেবের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। এ পক্ষে দু'জন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

মাল্টায় কারাবন্দী থাকাকালে তাদের মাতাসহ উভয় পুত্র মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন। তৃতীয়বার বিবাহের পর এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের পিতা হন হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। পুত্রসন্তান ছিলেন ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কন্যা মাজিদা খাতুন শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। সম্ভবত এই কন্যসন্তানের কবর সিলেট শহরের মানিকপীরের টিলায় অবস্থিত। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট শাগরিদ ও মুরীদ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন, "কুতবে আলমের এক মেয়ের কবর মানিকপীরের টিলায় আছে।" তবে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

হিজরি ১৩৫৫ সনে হযরতের তৃতীয় স্ত্রী ফিদায়ে মিল্লাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাতা দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন। এরপর শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চতুর্থবারের মতো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইলাহদাদপুরের মাওলানা

সায়্যিদ বশীরুদ্দীন সাহেবের মধ্যমা মেয়েকে তিনি স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। এই পক্ষে দু'জন পুত্রসন্তান ও পাঁচজন কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হন। পুত্ররা হলেন, হযরত সায়্যিদ আরশাদ মাদানী ও হযরত সায়্যিদ আসজাদ মাদানী। কন্যাদের নাম হলো রায়হানা, হিসানা, ইমরানা, সাফওয়ানা ও ফারহানা। হিসানা মাত্র ৮ বছর বয়সে মারা যান। অবশিষ্টদের অনেকেই এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় জীবিত ছিলেন। হযরত শাইখুল ইসলামের ইন্তিকালের পর সুযোগ্য পুত্র ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জা-নিশীন হিসাবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

ঈসায়ী ১৯৫৭ সালে শাইখুল ইসলামের মৃত্যুর পরই তাঁর খুলাফাবৃন্দ হযরত আসআদ মাদানীকে তরীকতের খিলাফত প্রদানে ভূষিত করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের নূর জগতব্যাপী ছড়িয়ে গেছেন। উপকৃত হয়েছেন অসংখ্য তাওহিদী মানুষ। মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত হন। গত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী, ৭ মুহাররম ১৪২৭ হিজরি ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমগ্র মুসলিম উম্মাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। হযরতের ছোট ভাই হযরত আরশাদ মাদানী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। অপর ভ্রাতা সায়্যিদ আসজাদ মাদানীও ইলমে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। আল্লাহ তা'আলা 'আওলাদে রাসূল' এই পরিবারের সবাইকে হায়াতে তায়্যিবাহ প্রদান করুন।

কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা

শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় উস্তাদের নির্দেশে কলকাতা পৌঁছেন ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। শাইখুল ইসলাম এ মাদ্রাসায় হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী শিক্ষার উপর অধ্যাপনা শুরু করেন। সত্যিকার অর্থে এখানে থাকাকালেই তিনি এককভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য মদীনা শরীফে অবস্থানরত তাঁর ভাই হযরত মাওলানা

সিদ্দীক আহমদ ও হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা তাঁকে সেখানে যেতে বার বার পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আপাতত মদীনা শরীফ যেতে তিনি সম্মত হন নি।

জমিয়ত ও অন্যান্য সংগঠনের বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১১ নভেম্বর ১৯১৮ ঈসায়ী। বছর খানেক পরই গঠিত হয় আলিমসমাজের সুবিখ্যাত সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'। ঈসায়ী ১৯১৯ সনের ২৮ ডিসেম্বর অমৃতসরে ইসলামিয়া হাই স্কুলের একটি বড়ো কক্ষে জমিয়তের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ৫২ জন দেশবরেণ্য আলিম অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুল বারী ফেরেঙ্গিমহল্লী লৌক্ষèভী এই মহতি সভার সভাপতি ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন মুফতি কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

কলকাতায় থাকাবস্থায় হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেটের মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠিত জমিয়ত-খিলাফত যৌথ অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এরপর ১৯২১ ঈসায়ীর ২০-২১ ফেব্রুয়ারী সিউহারায় খিলাফত ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উভয় সংগঠনের অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তৎকালীন ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। একই বছর বর্তমান বাংলাদেশের রংপুরের মাহিমাগঞ্জে 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গাল' -এর মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের আমন্ত্রণে শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সভাপতি হিসাবে যোগদান করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি সমসাময়িক রাজনীতি ও আলিম সমাজের ভূমিকার উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

করাচী মামলা ও কারাবরণ

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সভাপতিত্বে ১৯২১ সালের ৮-৯ জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্স'। আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসাবে কলকাতা থেকে করাচী পৌঁছে হযরত শাইখুল ইসলাম বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা দেন, 'ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে কোনো মুসলমানের চাকুরী গ্রহণ হারাম'। উপস্থিত সকল আলিম তাঁর এই ঘোষণাকে স্বাগত ও সমর্থন করেন। স্ব-স্ব বক্তৃতা প্রদানকালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা নিসার আহমদ, ড. সাইফুদ্দীন কিচলু এবং স্বামী কৃষ্ণ তীর্থ প্রমুখ এই 'ফাতওয়ার' সমর্থনে জোর দেন। পরে এই ফাতওয়াটি লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়।

বলাই বাহুল্য বৃটিশরা এতে ক্ষেপে ওঠলো। তারা এই ফাতওয়াকে বৃটিশবিরোধী উস্কানিমূলক ও সহিংস প্রস্তাব আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে। উক্ত পাঁচ নেতার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী মামলা করে গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট জারী করলো। (ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮-১৭১ দ্র:)

করাচী কনফারেন্সের আড়াই মাস পর হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পুলিশ দেওবন্দে গ্রেফতার করে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর ১৯২১ পর্যন্ত তদন্তের কাজ চলে। এসময় করাচীর 'খালেকদীনা' ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আসামীদের নিয়মিত উপস্থিত করে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। নিজের জবানবন্দী প্রদানকালে শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবেগপ্রবণ ভাষায় ইসলামে ফাতওয়ার গুরুত্ব, অতীতের বিশিষ্ট আলিমদের ফাতওয়া, বিশেষ করে হযরত আবদুল হাই লখনোবী, শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী এবং মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন ফাতওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেন। বৃটিশ বাহিনীতে মুসলমানদের চাকুরী গ্রহণ যে হারাম তার স্বপক্ষে জোরালো দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সবশেষে তিনি ঘোষণা দিলেন, "যদি লর্ড রেডিং (১৯২১-২৬) ভারতে এ উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়ে থাকেন যে, তিনি কুরআন শরীফ পুড়ে দেবেন, হাদীস শরীফ মিটিয়ে দেবেন, ফিকহের কিতাবসমূহ খতম করবেন তাহলে জেনে রাখুন, পবিত্র ইসলাম ধর্ম রক্ষার্থে নিজ জীবন উৎসর্গের জন্য সর্বপ্রথম আমিই আমার নাম পেশ করছি!"

বক্তব্য শেষে সমগ্র আদালতকক্ষ ভর্তি দর্শকরা ‘মারহাবা’, ‘মারহাবা’ ধ্বনিতে আওয়াজ তুললেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার অদূরে দাঁড়ানো ছিলেন। আবেগভরে তিনি ছুটে আসলেন শাইখুল ইসলামের পাশে। আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। পদচুম্বন করলেন। কী অপূর্ব ছিলো সে দৃশ্যটি! (ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত)

মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষণে কিন্তু ইংরেজদের হৃদয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া করলো না। জন্মান্ধ কি কোনদিন দেখতে পায়? বধির কি কখনো শুনে? তালাবদ্ধ অন্তপুরে কিভাবে সত্যের আলো পৌঁছুবে? ইংরেজরা আগে থেকেই কয়েদীদেরকে কারাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল। আদালতকক্ষে জবানবন্দী গ্রহণ ‘নাটক’ ছাড়া আর কিছু ছিলো না। নিম্ন কোর্টে মামলা পাঠানোর পর শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানেও জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। শেষ পর্যন্ত অপরাধ আইনের ৫০৫ ও ১০৯ ধারায় তাঁকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেমতে মাল্টা থেকে মুক্তির মাত্র ১৫ মাস পরই তিনি আবার কারারুদ্ধ হলেন। প্রথমে তিনি করাচী জেলে ছিলেন এরপর আহমদাবাদের সাবেরমতি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃটিশ বেনিয়ারা আমাদের সবার মুরুব্বী, শাইখুল আরব ওয়াল আজম, শরীয়ত ও তরীকতের দিশারী, অসংখ্য মুসলিম জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা কুতবে আলম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জেলে থাকাবস্থায়ও কঠোর কষ্ট-নির্যাতন করেছে। সাধারণ কয়েদীদের মতো তিনি রোজ ৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেছেন। মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেনো এই মহাত্মন ওলিকে উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত করেন।

দীর্ঘ দুই বছর সশ্রম কারাবরণের পর শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯২৩ সালের অক্টোবরে মুক্ত হন। রাজবন্দী নেতাদের মুক্তিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বড়ো বড়ো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কিন্তু মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব অনুষ্ঠান এড়িয়ে যান। তিনি বলতেন, ইংরেজরা যেখানে দিন দিন জিতে যাচ্ছে আর আমরা হেরে যাচ্ছি, সেখানে কিসের আনন্দফুর্তি? কিসের সংবর্ধনা?

তুরস্কের উসমানী খিলাফতও তখন নড়বড়ে অবস্থা। খিলাফত ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছিলো অনেকদিন যাবৎ। মনে হচ্ছিলো অচিরেই দুশমনরা সফল হবে। আর হলোও তা-ই। ১৯২২ ঈসায়ীর নভেম্বরে কামাল পাশার উত্থানের ফলে খলীফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মদ পদচ্যুত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিক্রিয়া সমগ্র মুসলিম উম্মায় প্রভাব ফেললো। নি¯েতজ হয়ে গেল ভারতবর্ষে 'খিলাফত আন্দোলনের' জীবনীশক্তি। বৃটিশদের প্ররোচনায় সমগ্র দেশব্যাপী শুরু হলো হিন্দু-মুসলিম টেনশন, বৈষম্য, হানাহানি। হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হলো।

নৈরাজ্যকর এই পরিস্থিতিতেও হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একেবারে নিস্তেজ হলেন না। ভারতের দূর-দূরান্তে সফর করে একদিকে আধ্যাত্মিক খিদমাত এবং অপরদিকে রাজনীতিক গণসংযোগ অব্যাহত রাখলেন। বাস্তবে উসমানী খিলাফত ধ্বংসের পর থেকেই হযরতের জীবনের মূল লক্ষ্য হাদীসের দরসদান ও তাসাওউফের খিদমাতের প্রতি নিবিষ্ট হয়। তবে রাজনীতির মাঠ থেকে মোটেই সরে পড়লেন না। খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ খেদাও আন্দোলন তো নিস্তেজ হতে দেওয়া যায় না। শত বাধা থাকলেও 'অবিভক্ত স্বাধীন ভারত' সৃষ্টির আন্দোলন অব্যাহত রাখতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্তির ঘোষণা দেন। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভিশন অনুযায়ী 'অবিভক্ত স্বাধীন ভারত' হলো না।

উসমানী খিলাফত ধ্বংসের পর রাজনীতিক কর্মের সারসংক্ষেপ

আরব ও আজমের মহান ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনায় তাঁর রাজনীতিক জীবনকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তিনি এটাকেও 'ইবাদত' মনে করতেন। আর খাস করে তাঁর সময়টা ছিলো বিশ্বব্যাপী আর্থ-রাজনীতিক পরিবর্তনশীল একটি কাল। আমরা ইতোমধ্যে তাঁর রাজনীতিক জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করেছি। তাসাওউফের উপর গবেষণামূলক এই গ্রন্থে আর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এরপরও সুহৃদ পাঠকের মনের খোরাক যোগাতে আমরা নিম্নে মৃত্যুর পূর্ব

পর্যন্ত হযরতের রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের একটি ঘটনাপঞ্জী তুলে ধরছি। পরবর্তীতে অবশ্য তাঁর তাসাওউফচর্চার উপর বিস্তারিত আলোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ।

করাচী মামলায় কারাবরণ: ২২ অক্টোবর **১৯২১** ঈসায়ী।

কারাগার থেকে মুক্তি লাভ: অক্টোবর **১৯২৩**।

কোকনাদে জমিয়তের অধিবেশনে সভাপতিত্ব: ২৯ ডিসেম্বর **১৯২৩** ঈসায়ী। 'যতদিন পর্যন্ত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত না নিজেরা সুস্থির নিঃশ্বাস ফেলব আর না সাম্রাজ্যবাদকে সুস্থির নিঃশ্বাস ফেলতে দেব' - সভাপতির ভাষণে শাইখুল ইসলাম দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন।

সিলেটে হাদীসের দারসদান শুরু: ডিসেম্বর **১৯২৪** ঈসায়ী।

সিলেট থেকে সদর মুদাররিস (শাইখুল হাদীস) পদে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন: **১৯২৮** ঈসায়ী।

দারুল উলূম দেওবন্দে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা: হিজরি **১৩৪৬** থেকে **১৩৭৭** সাল পর্যন্ত দীর্ঘ **৩২** বছর শাইখুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পূর্বে **৬১** বছরের ইতিহাসে দারুল উলূম থেকে মোট দাওরায়ে হাদীস সম্পন্নকারীদের সংখ্যা ছিলো **২,৭৫১** জন। হযরতের **৩২** বছর দরসদান শেষে দাওরা সমাপ্ত করে আলিম হয়েছেন সর্বমোট ৪,৪৭৩ জন। এদের সকলেই তাঁর ছাত্র। (তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ)

সায়মন কমিটি বয়কটের দাবী: **১৯২৭-২৮** সালে বৃটিশ সরকার আইনজীবী স্যার জন সায়মনের নেতৃত্বে ভারতে একটি কমিশন প্রেরণ করে। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিলো **১৯১৯** সালের সংস্কার আইন কতটুকু কার্যকর হয়েছে তা তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ। ৭ সদস্যের সকলেই ছিলেন বৃটিশ। ভারতীয়দের না রাখায় ক্ষোভ সৃষ্টি হয় নেতাদের মধ্যে। সুতরাং ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এ কমিশন বয়কট করে।

হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী তখন কমিশন বয়কটের দাবী নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেন।

আমরুহার জমিয়তের অধিবেশনে যোগদান: ৩ থেকে ৬ মে ১৯৩০ সালে আমরুহায় জমিয়তের বার্ষিক অধিবেশনে এ পর্যায়ে সভাপতিত্ব করেন হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এ সময় জমিয়তের সভাপতি ছিলেন মুফতি কিফায়েতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, 'স্বাধীনতা অর্জনে জমিয়তের নেতৃত্বে মুসলমানরা কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে একজোটে কাজ করবে'।

পবিত্র হজ্জে গমন: ১৯৩১ ঈসায়ী। স্ত্রী-পুত্রসহ পরিবারের ৮ জন সদস্য তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

জমিয়ত-কংগ্রেসের যৌথ নেতৃত্বে 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এ অংশগ্রহণ: ১৯৩২ সালে বৃটিশ সরকার জমিয়ত ও কংগ্রেস উভয় দলকে বে-আইনী ঘোষণা করে। জমিয়ত নিজেদের স্বার্থে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করে একটি 'এ্যাকশন কমিটি' গঠন করে। এই কমিটির ৩য় অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্বপালন করেন হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ১ম ও ২য় অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে মুফতি কিফায়াতুল্লাহ ও মাওলানা আহমদ সাঈদ। অধিনায়কগণ গোপনে কাজ করতেন। একজন পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলে অপরজন কার্যক্রম চালিয়ে যেতেন। এভাবে একজন থেকে অপরজনের নিকট ঝাণ্ডা স্থানান্তরিত হতো। মুফতি কিফায়াতুল্লাহ ও মাওলানা আহমদ সাঈদ গ্রেফতার হলেন। ৩য় অধিনায়ক শাইখুল ইসলাম নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। শুক্রবার জুমু'আর দিন নামাযান্তে দিল্লী জামি মসজিদে গুরুত্ব বক্তব্য প্রদান করবেন। দেওবন্দ থেকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর বক্তব্য বৃটিশরা বেশী ভয় করতো। পথিমধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি লিখিত বক্তব্য মুজাফফরনগর স্টেশনে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তা হস্তান্তর করলেন মাওলানা আবুল মাহাসিন সাজ্জাদের নিকট। সাজ্জাদ দিল্লী মসজিদে নিয়ে গেলেন এবং তা পাঠ করে শুনানো হলো। স্বাধীনতার মহান আন্দোলনে এ নিয়ে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তৃতীয়বারের মতো গ্রেফতার হলেন। তিনি এ সময় মাত্র দেড় সপ্তাহ পর্যন্ত জেলে বন্দী ছিলেন।

মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট গঠন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ: ১৯৩৬ সালে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে জমিয়ত মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট গঠন করে ও যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। পরে অবশ্য মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাতিল করা হয়।

শাইখুল ইসলামের বিরুদ্ধে কবি ইকবালের 'কবিতা' ও 'ক্ষমা চাওয়া' প্রসঙ্গ: ১৯৩৮ সালের ৮ জানুয়ারী শাইখুল ইসলাম দিল্লী সদর বাজারে মাওলানা নূরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য প্রদান করছিলেন। এক পর্যায়ে বহির্দেশীয় রাষ্ট্র ও জাতি সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি বলেন, "বর্তমান বিশ্বে কাওমিয়্যত (জাতীয়তা) ভূখণ্ডের নিরিখে নিরূপিত হচ্ছে। বংশ কিংবা ধর্মের নিরিখে নয়।"

পরদিন দিল্লীর দৈনিক আল-আমানে এ বক্তব্যটি বিকৃত করে ছাপানো হয়। এতে বলা হয়, মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "জাতীয়তা ভূখণ্ডের নিরিখে নির্ণিত হয়; ধর্মের নিরিখে নয়।" এই বিকৃত সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় আল-আমান ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় শাইখুল ইসলামকে অনেকে গালিগালাজ পর্যন্ত শুরু করে দেয়। বৃটেনে শিক্ষিত দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল 'আল-আমান' পত্রিকার সংবাদটি পাঠ করে গভীর চিন্তা না করেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য ইতোমধ্যেও তিনি একাধিকবার কারো কারো সমালোচনা করে পরে লজ্জিত হয়েছিলেন। ক্ষমাও চেয়েছেন। তিনি 'কওম' ও 'মিল্লাত' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা যাচাই-বাছাই না করেই কঠিন বিদ্রূপাত্মক একটি কবিতা উর্দুতে রচনা করে শাইখুল ইসলামকে আক্রমণ করেন। এই কবিতাটি ছিলো (বঙ্গানুবাদ):

"অনারব লোকেরা আজো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি দীনের গূঢ় রহস্য। নতুবা দেওবন্দে হুসাইন আহমদের নেতৃত্ব এটি এক আশ্চর্যের কথা! ধর্মব্যাখ্যার মিম্বরে বসে সে বলে যে, জাতীয়তা (মিল্লাত) ভূখণ্ডের নিরিখে নয়, আরবী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি থেকে সে কত দূরে! তুমি আগে নিজেকে মুহাম্মদ মুস্তফা সা. পর্যন্ত পৌঁছুতে চেষ্টা করো। কারণ

সেই পর্যন্ত যদি পৌঁছুতে সক্ষম না হও, তাহলে যা শিখেছ তা সবই হবে আবূ লাহাবের কথা!”

এখানে তিনি হাফিয সিরাজীর এ কবিতার প্রতি ইঙ্গিত করেন:

حسن زبصری بلال از حبش صهیب از روم
زخاك مكه ابو جهل بن جه بوالعجي ست

উক্ত কবিতায় সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহাবায়ে কিরামের বিপরীতে আবু জাহলের সমালোচনা করেছেন। আর মরহুম ইকবাল এরই অনুসরণে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিপরীতে হযরত কুতবে আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমালোচনা করেছেন। (ড. মুশতাক আহমদ, শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, পৃ: ২৩৩-২৩৪)

মহাকবি ইকবালের মতো প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তি কিভাবে ‘কওম’ ও ‘মিল্লাত’ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হলেন তা বুঝা মুশকিল। কওম শব্দের অর্থ কোন ভূখণ্ড বা ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠি। শব্দটির ব্যাপকতা বিরাট। কিন্তু মিল্লাত শব্দের অর্থ তেমন ব্যাপক নয়। মিল্লাত অর্থ হলো, ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক জনমসষ্টি। উভয় শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকায়ই পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ‘কওম’ বলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে। অন্যদিকে মিল্লাত শব্দ দ্বারা শুধু বিশেষ কোনো সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইকবাল আবেগের আতিশয্যে শব্দদ্বয়ের এই পার্থক্য বিবেচনার সুযোগ পান নি বলেই প্রমাদ ঘটে যায়। পরে বৃদ্ধ কবির আবেগ পশমিত হলে ব্যাপারটির সত্যতা উপলব্ধি করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে যে বিরাট ক্ষতি হয়, তা আর কোনদিন শোধরানোর সুযোগ মিলে নি। কবিতা প্রকাশের মাত্র ৩ মাস পরই ইকবাল মৃত্যুবরণ করেন।

ইকবালের এহেন আক্রমণাত্মক কবিতার জবাব চতুর্দিক থেকে জোরালো ভাষায় আসতে থাকে। পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সাময়িকীতে তার বিরুদ্ধে কবিতার

সংখ্যা শতাধিক হয়। শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক ভক্ত এসে প্রার্থনা জানালেন, হযরত! এই কবিতাগুলোর একখানা সংকলন প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। অনুমতি প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, “না! এ অনুমতি আমি দেবো না!”

ইকবালের কবিতার প্রতিবাদে সর্বাপেক্ষা শক্ত যে কবিতা প্রকাশ পায় তা ছিলো কবি সায়্যিদ আজিজের নিম্নোক্ত কবিতাটি:

(বঙ্গানুবাদ) “চুপ করো, হে বে-আদব কবি! নিজে তুমি কি তা বুঝতে চেষ্টা করো। নিজের সীমানার বাইরে পা বাড়ানো চরম ধৃষ্টতা।” (ড. মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৬)

এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, এতোবড় বিষোধগারের শিকার হয়েও শাইখুল আরব ওয়াল আজম, তরীকতের মহান রাহবার, ইলমে হাদীসের পথিকৃৎ, সত্যিকার সিয়াসতের প্রবর্তক হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন ‘আল্লামা’ কবি ইকবালের মৃত্যুসংবাদ শুনলেন তখন কী করলেন?

মৃত্যুর সময় হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মীরাঠে ইসলাহুল মুসলিমীনের এক ধর্মীয় সভায় ভাষণ দান করছিলেন। তিনি ইকবালের মৃত্যুসংবাদ শুনে সবাইকে নিয়ে পাঠ করেন, “ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন”। সভাশেষে তাঁর নেতৃত্বে মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দু’আ অনুষ্ঠিত হয়।

কবি আল্লামা ইকবাল ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন বলে কথিত আছে। তবে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ মিলে নি। তিনি ২৮ মার্চ ১৯৩৮ সনে দৈনিক ‘ইহসান’ লাহোরে এই বিবৃতি প্রকাশ করেন: “তিনি (মাদানী) ভারতীয় মুসলমানদের নতুন জাতিতত্ত্ব অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন- একথা মাওলানা পরিষ্কার অস্বীকার করেছেন। তাই আমি একথা ঘোষণা করা জরুরী মনে করি, মাওলানার এ অস্বীকৃতির পর তাঁর সম্পর্কে কোনো প্রকার আপত্তি করার অধিকার আমার থাকে না। আমি মাওলানার অনুরাগ উদ্দীপনাকে সমর্থন করি। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মাওলানার দীনি আত্মসম্মানবোধের মর্যাদাদানে আমি তাঁর কোনো ভক্তের

পশ্চাতে নই”। (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, চেরাগে মুহাম্মদ (সা.), পৃ: ৫৭১)

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, আল্লামা ইকবাল ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন না তা এড়িয়ে গেলেন, এটা ভালো করে অনুধাবন করুন। আল্লামা ইকবালের এই বিবৃতি প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ২১ এপ্রিল ১৯৩৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ বিষয়টির উপর আর কোন মন্তব্য করা আমার জন্য আদৌ সমীচীন হবে না।

সিলেটে দ্বীনি তা'লিম ও আধ্যাত্মিক খিদমাত

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, করাচী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেটবাসীর অনুরোধে শাইখুল হাদীস হিসাবে নয়াসড়কস্থ 'খিলাফত বিল্ডিংয়ে' দারসপ্রদান শুরু করেন। খিলাফত আন্দোলনের সময় এই বিল্ডিংটি তৈরী হয়েছিল। তখন এ দারসগাহের নাম ছিলো, “মাদরাসায়ে মারকাযিয়া খেলাফত বিল্ডিং”। দীর্ঘ পাঁচ বছর এখানে থেকে তিনি শুধু বৃহত্তর সিলেটকে নয়, সমগ্র বাংলাদেশকে ইলমে দ্বীন তথা শরীয়ত ও মা'রিফাতের উজ্জ্বল আলো দ্বারা নূরান্বিত করেছিলেন। সিলেট ও বাংলায় হযরতের ঐতিহাসিক অবদানের কথা তুলে ধরার পূর্বে সমসাময়িক দীনি অবস্থার উপর কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

কুতবুল ইরশাদ হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধরদের এক বিশিষ্ট গবেষক জনাব ইযাজুল হক কুদ্দুসীর একটি বর্ণনা আল্লামা কাজী মুহাম্মদ যাহিদ আল-হুসাইনী প্রণীত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত 'চেরাগে মুহাম্মদ (সা.)' গ্রন্থে (পৃ. ১৭২-১৭৩) উদ্ধৃত হয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সে উদ্ধৃতি থেকে কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি। জনাব ইযাজুল হক কুদ্দুসী বলেন:

৪৪২ হিজরি মুতাবিক ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ইসলামের নূর উদিত হয়েছিল। এরপর উলামায়ে কিরাম, সুফি বুজুর্গ এবং মুসলিম সুলতানগণ এদেশে ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসার করতে থাকেন। কিন্তু হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে

বাংলা অঞ্চল দীন-ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলছিলো। শিথিল হয়ে যাচ্ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ, মসজিদসমূহ জনশূন্য হচ্ছিল। ... ধর্মীয় অধঃপতন এবং চারিত্রিক দীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এ অবস্থায় একজন মর্দে খোদা আলিম, সুফি সাধক, দরবেশ, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আবির্ভাব ঘটলো। ... ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে (১৮ মুহাররম ১২১৫ হিজরি) তিনি জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আঠারো বছর বয়সে ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি হযরত সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তরীকতের দীক্ষা নেন। মাত্র আঠারো দিন পর হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যস্থতায় খিলাফতনামা ও শাজারায়ে তরীকাত লাভ করেন।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাবলীগ ও ইসলামী শিক্ষা প্রচারের ফলে লাখো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া নড়বড়ে হিন্দুয়ানী রিওয়াজ প্রথায় নিমজ্জিত লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি উদ্ধার করে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করেন। জীবনের একান্নটি বছর এই নবুওয়তী কর্মে উৎসর্গ করেছিলেন। অবশেষে এ বাংলাতেই ১৮৭২ (মুতাবিক ৮ মুহাররম ১২৯০ হিজরি) ইন্তিকাল করেন। তিনি বাংলাদেশের রংপুর জেলাশহরে মুনশীপাড়া মহল্লার জামে মসজিদের নিকটে সমাহিত আছেন।

হযরত জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সন্তানগণ পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে বহুদিন দীনি কাজ অব্যাহত রাখেন। এদের মধ্যে মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জৌনপুরী সিলসিলার বুজুর্গানে দীন সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি এক চিঠিতে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পৌত্র হযরত মাওলানা আবদুল বাতিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে লিখেন: "মুহতারামুল মাক্বাম, যিদা মাজদুকুম, আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আল্লাহ তা'আলার কৃপা আপনার পিতামহ হযরত মাওলানা কারামত আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাথায় বাংলা ও আসামে শরীয়ত পুনরুজ্জীবিত করার মুকুট রেখেছেন।

তাঁর প্রাণপণ আন্তরিক প্রচেষ্টায় এমন উচ্চ পর্যায়ের সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যা এ উম্মতের অতীত বিশেষ বুজুর্গগণের মধ্যেই কেবল দৃষ্টিগোচর হয়"। (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮০)

মোটকথা বাংলায় তখন বিরাজ করছিলো দীনি শিক্ষা, তাহজিব-তামাদ্দুন ও খাস করে ইলমে তাছাওউফের আকাল অবস্থা। তবে ভণ্ড পীর-মুরীদীর অভাব ছিলো না। এই নাজুক অবস্থার শিকার বাংলা-আসামে একজন সুপণ্ডিত ইলমে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ সেসাথে সঠিক তরীকতের খিদমতগার উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির বেশ প্রয়োজন দাঁড়ায়। যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামিল এবং আধ্যাত্মিক রাহবার শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পদার্পণ পড়ায় সে অভাব পূরণ হয়।

সিলেটে শায়খুল ইসলামের আগমন

হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শাহ পরাণ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তিনশত ষাট আউলিয়ার পদার্পণে ধন্য বৃহত্তর সিলেটভূমি বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী নামে খ্যাত। এ ভূখণ্ড পীর-আউলিয়াদের নিরাপদ আস্তানা হিসাবে চিহ্নিত করা মোটেই অযৌক্তিক হবে না। হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে ১৮ মে ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে (২০ জিলকাদ ৭৪০ হিজরি) ইন্তিকাল করেন। তাঁর নূরোজ্জ্বল সমাধি আজো উপমহাদেশের একটি যিয়ারতস্থান। তাঁর মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত এই পুণ্যভূমিতে অসংখ্য আউলিয়ায়ে কিরামের আগমন ঘটেছে। আর এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবেই আল্লাহ তা'আলা হিজরি চতুর্দশ শতকের কুতুবুল ইরশাদ হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকত দ্বারাও এ ভূমিকে ধন্য করেছেন। তাঁর আগমন সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বলেন:

"সিলেটবাসীরা প্রায় দেড় বছর যাবৎ জোর দিয়ে আসছেন। আসাম ও বাংলা প্রদেশের মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। কিন্তু সেখানকার মানুষের শিক্ষাগত অবস্থান খুবই নিম্ন পর্যায়ে আছে। ধর্মীয় শিক্ষায়ও তারা দুর্বল। বিশেষত হাদীসশিক্ষা

ও চর্চা একেবারে নেই বললেই চলে। তাই এখানে এসে কিছুদিন অবস্থান এবং একদফা পূর্ণ সিহাহ সিত্তার পাঠদান অপরিহার্য। ..” (শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী, চেরাগে মুহাম্মদ (সা.) থেকে উদ্ধৃত)

সুতরাং ২১ রবিউল আওয়াল তারিখে (ডিসেম্বর ১৯২৪ ঈসায়ী) তখনকার আসামের প্রসিদ্ধ শহর সিলেটে তিনি আগমন করেন। হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খেলাফত বিল্ডিংয়ে প্রথমে উসুলে হাদীসের কিতাব ‘নুখবাতুল ফিকাহ’ পাঠদান শুরু করেন। এরপর তিরমিযি শরীফ দৈনিক ৫ ঘণ্টা পর্যন্ত দারস দিয়েছেন। ইতোমধ্যে কিছু সময় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীর করতেন। নুখবাতুল ফিকাহ শেষে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত ‘আল-ফাওযুল কবীর’ কিতাবখানা পড়ানো শুরু করেন। [মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম]

চেরাগে মুহাম্মদের লেখক বলেন, তখনকার বাংলার মুসলমানরা ধর্মীয় শিক্ষায় দুর্বল। তাদের মেধা ও শ্রম আধুনিক শিক্ষা থেকে সরিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিলো। এ কাজের জন্য এমন একজন যুগোপযোগী শিক্ষকের প্রয়োজন ছিলো, যিনি শুধু কিতাবী শিক্ষায় পারদর্শী হবেন না, বরং রূহানিয়্যাতের দিকেও প্রভাবশীল হবেন। বলাই বাহুল্য, এজন্য সে যুগের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিই ছিলেন। তাই তিনি নিজেই সিলেটে অবস্থানের অগ্রাধিকার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “এখানে একটি বড় দল আছেন যারা মাদ্রাসায়ে আলিয়া কলকাতা, সিলেট আলিয়া ইত্যাদি থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তাঁরা সমঝদার ও প্রতিভাবান। তাঁরা আরবী বিষয়াদিতে উচ্চস্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাঁদের অনেকেই ইংরেজি ভাষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওয়াকিফহাল। তারা ওসব ছাত্রদের মতো মেধাহীন, অবুঝ, অনাগ্রহী ও পরিশ্রমবিমুখ নন, যারা এসব এলাকায় যান। এরা বাঙালী হিন্দুদের অনুরূপ ভাঙ্গাগড়ায় পারদর্শী। তাদের ধর্মীয় আগ্রহ-উদ্দীপনা, ইসলামী চিন্তা-ভাবনা ও সহানুভূতি অনেক বেশী। দীর্ঘদিন ধরে এ দলের আগ্রহ ছিলো, সিহাহ সিত্তার পাঠ যেনো পুরোপুরি সম্পন্ন করে নিতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে এসব ছাত্র বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে আমার এখানে সমবেত হয়েছেন। আর এখনও হচ্ছেন।

এই এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যা প্রচুর। কোনো কোনো জিলায় তো শতকরা নব্বুই জনই মুসলমান এবং বাকীরা হিন্দু"। [শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী]

সিলেট অঞ্চলে হযরত শাইখুল ইসলামের শুভাগমনের আরেক কারণ ছিলো, এখানকার মানুষের মধ্যে খোদাভীতি, দীনদারী, সুন্নাত ও শরীয়ত মেনে চলার রুচি অত্যন্ত ব্যাপক। হযরত যখন কলকাতায় ছিলেন তখন সিলেট থেকে এক বিরাট দীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী দল সেখানে যেয়ে তাঁর সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁকে নিয়ে আসতে আবেদন করেছেন। হযরত প্রাথমিক দিকে আসতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু সিলেটিদের পীড়াপীড়ি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খিলাফত আন্দোলনের কাজ জোরেসুরে সিলেটেও শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় 'খেলাফত বিল্ডিং'। অবশেষে ১৯২৪ সালে খিলাফত আন্দোলনের অবসান ঘটলেও এর অবশিষ্ট স্ফুলিঙ্গ তখনও সিলেটভূমিতে জ্বলন্ত ছিলো। সিলেট অঞ্চলের এই পরিস্থিতি হযরত শাইখুল ইসলামের মিশনেরও অনুকূলে ছিলো। তাই তাঁর মনে আগ্রহ জন্মালো। শেষ পর্যন্ত তিনি ইস্তিখারা করলেন ও ১৩৪৪ হিজরি তথা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে আগমন করেন। [শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী]

সিলেটভূমি হলো বরকতপূর্ণ

যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, তরীকতের রাহবার, ইসলামী রূহানিয়্যাতের পথিকৃৎ শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সিলেটে আগম ছিলো এ অঞ্চলের জন্য সৌভাগ্য ও বরকতের কারণ। এ মাটিতেই শুয়ে আছেন ইসলামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, শরীয়ত ও মা'রিফাতের মণিমুক্তার অফুরন্ত ভাণ্ডার, হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দ ও তার যুলুমকে চিরতরে উৎখাতকারী মর্দে মুজাহিদ, ওলিকুল শিরোমণি হযরত শাহ জালাল মুজাররদে ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এখানকার মানুষের মধ্যে ইলমে তাসাওউফচর্চা এবং শরীয়তের বাহ্যিক জ্ঞানের কিছুটা আকাল পড়ে যায়। এই অভাব পূরণ একান্ত জরুরী ছিলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এই অভাব পূরণে পাঠিয়ে দিলেন সিলেট ভূমিতে যুগের এক মহান চিন্তানায়ক, মর্দে মুজাহিদ, ইলমে

শরীয়ত ও মা'রিফাতের সাগর হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে। ঠিক যেভাবে তিনি দয়াপরবশ হয়ে সেই ৭ শতাধিক বছর পূর্বে পাঠিয়েছিলেন অত্র ভূমিকে জালিম রাজার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত ও সত্য দ্বীনের আলো দ্বারা চিরতরে উজ্জ্বল করতে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে। মূলত সিলেটভূমি আগে থেকে দীন ও দীনদারীর এক বিরাট শক্ত ঘাঁটি ছিলো- ছিলো উপমহাদেশের এক সমুজ্জ্বল 'রূহানী কেন্দ্র'। এ অঞ্চলের মুসলিম জনতার অন্তর থেকে তখনো মিটে যায় নি ইলমে শরীয়ত ও মা'রিফাতের জ্ঞানান্বেষার আগ্রহ- বরং তা আবারো কোনো মহাত্মন ওলিআল্লাহর পুনঃপরশে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠতে অপেক্ষারত ছিলো। কবির ভাষায়:

এ ঘরে লেগেছে আগুন ঘরের সেই চেরাগ থেকেই। (চেরাগে মুহাম্মদ)

মহান আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মুহাব্বতের দৃষ্টি এ এলাকার মানুষের প্রতি পড়ায় ধন্য হলো সিলেটভূমি হযরত শাইখুল ইসলামের পদার্পণে। বরকতময় হলো হযরত শাহ জালালের পুণ্যভূমি, তখনকার আসামের রাজধানী সিলেট শহর। হযরতের দারসদান ও তাসাওউফের খিদমাতে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এলাকায় অচিরেই সৃষ্টি হলেন একঝাঁক সোনার মানুষ। প্রায় ৫ বছর (১৯২৪-১৯২৮) তিনি মাদ্রাসায়ে মারকাযিয়া খেলাফত বিল্ডিংয়ে হাদীসের পাঠদান করেছেন। কিন্তু অবসর সময়ে বসে থাকেন নি। বৃহত্তর সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনকি নিভৃত পল্লী এলাকায় সফর করেছেন দীনের খাতিরে, মানুষকে দীনদার বানাতে সাহায্য করতে। তাঁর হাতে দলে দলে লোকজন বাইআত গ্রহণ করতে থাকেন। সব অঞ্চলে মাদ্রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসব সফরের অংশ হিসাবে একদা হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চলে গেলেন, হবিগঞ্জ জিলার নবীগঞ্জের নূরপুরে (তখনকার নাম কামারগাঁও)। হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন, শেষ জীবনের শাগরিদ, সফরে ছায়ার মতো অনুসরণকারী, ডাইরি রক্ষক 'সেক্রেটারী' ড. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। পরবর্তীতে খিলাফত লাভে ধন্য হযরতের এই বিশিষ্ট ভক্তের বাড়িতে আগমনের পর পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য বাড়িস্থ বাংলোটি ব্যবহার করেন। মসজিদ ছিলো বেশ দূরে। ডাক্তার

সাহেব পরবর্তীতে এই বাংলোটিকে একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

মাদানী-ভক্ত এই মহান ওলির বাড়িতে অধম (লেখক) বেড়াতে গিয়েছি। হযরত শাইখুল ইসলাম যে স্থানে নামায আদায় করেছিলেন, সেই মসজিদটির ভেতরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত করেছি। আমার সঙ্গে ছিলেন হযরত শাইখুল ইসলামের বিশিষ্ট শাগরিদ ও মুরীদ, হযরত ড. আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা কুতবে যামান মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল কদর খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব। আরো ছিলেন, হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা আবদুল মতিন নবীগঞ্জী, হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা মাওলানা ইউসুফ আমিনী এবং কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ হাজী সোহেল মিয়া। হযরত ড. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ দামাত বারাকাতুহুম আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করান। স্বীয় ওয়ালিদ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সংলগ্ন নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। আমরা অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ জিয়ারত করি ড. নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরটি। যা হোক, ড. নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও খিদমাতের উপর শীঘ্রই আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

ভবিষ্যৎ খুলাফাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

সিলেটের খেলাফত বিল্ডিংয়ে দারসদানকালে হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাতে আসেন পরবর্তীতে তাঁর সুহবতে থেকে ধন্য বেশ ক'জন বিখ্যাত ব্যক্তি। এদের মধ্যে আমার জানামতে কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া, হযরত মাওলানা বশির আহমদ শায়খে বাঘা, হযরত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি, হযরত মাওলানা বদরুল আলম শায়খে রেঙ্গা, হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান শায়খে বরুণা, হযরত মাওলানা আবদুল করিম শায়খে কৌড়িয়া, হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন শায়খে

গহরপুরী, হযরত মাওলানা আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ সকলেই এসময় হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অবশ্য কে কোন্ সময় সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেছিলেন তার সঠিক তথ্য আমার জানা নেই। তবে হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে নিজেই বলেছেন, "খেলাফত বিল্ডিংয়ে দারস-দানকালে আমি যখন কুতবে আলমের (মাদানী রহ.) সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন আমার বয়স ছিলো ১০ বছর।"

যদিও সঠিক সন-তারিখ আমাদের জানা নেই, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯২৮ সালে সিলেট থেকে দেওবন্দে চলে যাওয়ার পরও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেটবাসীর একান্ত অনুরোধে খেলাফত বিল্ডিংয়ের অদূরে 'মাদানী মসজিদে' (নয়াসড়ক মসজিদে) প্রত্যেক রমজান শরীফে এসে ই'তিক্বাফ পালন করেছেন এবং উপরোক্ত বুজুর্গানে দ্বীন তখন তাঁর সুহবত লাভের আশায় ছুটে আসতেন। অনেকে সে সময়ই মুরীদ হয়েছিলেন। উক্ত বুজুর্গানে দ্বীনসহ অনেকেই পরে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন ও হযরতের শাগরিদ, খাদিম ও ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরে প্রায় সকলেই তাঁর খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন।

সিলেটভূমি ধন্য হলো হযরতের আধ্যাত্মিক চর্চায়

আগেই বলেছি অসংখ্য মানুষ হযরতের হাতে তরীকতের বাইআত গ্রহণে ধন্য হয়েছেন। উপকৃত হয়েছেন দুনিয়া-আখিরাতে। যুগের শরীয়ত ও তরীকতের মহান রাহবার হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আধ্যাত্মিক চর্চা সিলেট অঞ্চলে কোন্ পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছেছিল তার এক জ্বলন্ত নিদর্শন পাওয়া যায় বৃহত্তর সিলেটে খুলাফাদের সংখ্যা থেকে।

হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মোট ১৬৭ জন খলিফা রেখে যান। এর মধ্যে শুধু বৃহত্তর সিলেট জিলায় (বর্তমানে বিভাগে) ৩১ জন খলিফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, তাঁর রূহানিয়্যাতের খিদমাত অন্য কোথাও এতো বেশী ব্যাপকতর ছিলো না। আর এই ৩১ জনের প্রত্যেকে

ছিলেন (আল-হামদুলিল্লাহ, এই কিতাব প্রণয়নের সময় পর্যন্ত দু'জন খলিফা- হযরত মাওলানা আবদুল মতিন গুনই ও হযরত মাওলানা আবদুল মু'মিন শায়খে ইমামবাড়ি দামাত বারাকাতুহুমা জীবিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়কে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন।) একেকজন উজ্জ্বল তারকাসদৃশ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও রূহানী তাজাল্লিতে সিলেট বিভাগসহ বাংলাদেশের সমগ্র পূর্বাঞ্চল আলোকিত হয়েছে। তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন অসংখ্য দ্বীনি বিদ্যাপীঠ 'কওমী মাদ্রাসা'। দারুল উলূম দেওবন্দের 'বাচ্চা' নামে খ্যাত এসব 'পাবলিক' মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছর বেরিয়ে আসছেন শত শত সুযোগ্য উলামায়ে কিরাম। তাঁরা দেশ-বিদেশে দ্বীনের খিদমাতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন।

এ সবই আল্লাহ তা'আলার একান্ত মুহাব্বত অত্র অঞ্চলের মুসলমানদের প্রতি ও তাঁর একান্ত আপনজন শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেটভূমিতে আগমনের সুফল। সিলেটবাসী মুসলমান কখনো হযরতের এই অবদানকে খাটো করে দেখতে পারেন না। যুগ যুগ ধরে মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে যাবেন, যেমনটি তারা করে আসছেন আজ সাত শতাধিক বছর ধরে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে।

দারুল উলূম দেওবন্দে শাইখুল হাদীস হিসাবে যোগদান

১৯২৭ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে ভীষণ গণ্ডগোল বাঁধে। সদরুল মুদাররিসীন হিসাবে আসীন হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইস্তফা দিয়ে চলে যান ডাবেল মাদ্রাসায়। এই শূন্য পদটি পূরণের জন্য মজলিসে শূরার বিশিষ্ট সদস্য হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অনেকেই হযরত শাইখুল ইসলামের নাম উল্লেখ করেন। সেমতে, ১৯২৮ সালে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেট থেকে বিদায় নেন এবং প্রধান শিক্ষক (শাইখুল হাদীস) হিসাবে দারুল উলূম দেওবন্দে যোগ দেন। রাজনীতিক নেতা হিসাবে ইতোমধ্যে তাঁর প্রিয় উস্তাদ শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। এবার তিনি শাইখুল হিন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস হিসাবে কর্ম শুরু করলেন।

হযরত শাইখুল ইসলামের আগমন এবং অন্যান্য নিবেদিতপ্রাণ বুজুর্গদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আল্লাহর অনুগ্রহে দারুল উলূমে স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসে। এছাড়া দারুল উলূমের দীর্ঘদিনের সম্মানিত মুহতামিম হযরত ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯২৯ সালে নতুন মুহতামিম হিসাবে নিযুক্ত হন। ফলে একদিকে সদরুল মুদাররিস হিসাবে শাইখুল ইসলাম আর অপরদিকে দক্ষ মুহতামিম, দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম হযরত কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি ক্বারী তায়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে লাগলো। শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই সম্মানিত পদে আসীন থেকে অসংখ্য ছাত্রদেরকে ইলমে দ্বীনের আলোদানে নূরোজ্জ্বল করে তুলেন- যাঁদের প্রায় সকলেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যান দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে।

আত্মশুদ্ধির মুর্শিদ হিসাবে

আমাদের এই গ্রন্থটি মূলত তাসাওউফের খিদমাতে নিবেদিত। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে প্রসিদ্ধ সুফি তরীকা ‘চিশতিয়া’র ৪১ জন শাইখুল মাশাইখের জীবন ও আত্মশুদ্ধির হাল-হাক্বিকাত এবং খিদমাতের উপর আমাদের গবেষণা কেন্দ্রিভুত। কিন্তু কোনো কোনো ওলির জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকও প্রাসঙ্গিকক্রমে বর্ণনা দেওয়া জরুরী। সেমতে, আমরা ইতোমধ্যে শাইখুল ইসলাম হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কর্মব্যস্ত রাজনীতিক ও নূরোজ্জ্বল শিক্ষকতার জীবন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাঁর এসব কীর্তিমান জীবনবৃত্তান্ত উপেক্ষা করা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তিনি ছিলেন আমাদের যুগেরই একজন অতি কাছের মানুষ। তাঁর সুহবত ও সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছেন এমন অনেক মহাত্মন এখনো জীবিত আছেন। আমরা আশা করবো হযরত শাইখুল ইসলামের সকল ভক্ত-শুভাকাক্সক্ষী এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে উপকৃত হবেন এবং তৃপ্তিবোধ করবেন। এবার আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক

খিদমাতের দিকে মনোনিবেশ করবো। রাজনীতিক প্রসঙ্গ যদি প্রয়োজন মনে করি, তাহলে অবশ্য বর্ণিত হবে।

ইলমে মা'রিফাতের প্রাণপুরুষ, চিশতিয়া-সাবিরিয়া-কুদ্দুসিয়া তরীকার যুগশ্রেষ্ঠ শাইখ কুতবে আলম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহির সান্নিধ্য ও তরীকতের দীক্ষা লাভ করে উপকৃত হয়েছেন গণনাতীত মুসলমান নর-নারী। হযরতের জীবন মূলত ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গিত ছিলো। আদর্শ রাজনীতিক, বড় আলিম এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক, এসব গুণেও তিনি গুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে শরীয়তের প্রতিটি গুরুত্ব বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন ও আমল এবং সেসাথে রূহানিয়্যাত সম্পৃক্ত না থাকলে পূর্ণাঙ্গ 'কামালিয়াত' হাসিল হয় না। মোটকথা আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল করে জীবনকে ধন্য করা আদৌ সম্ভব নয়। আর এই লক্ষ্যর্জনে প্রয়োজন গুরু-শিষ্যতা বা পীর-মুরীদী।

হযরত শাইখুল ইসলামের পরিবার আদি যুগ থেকেই পীর-মুরীদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। টান্ডায় অবস্থিত তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন 'খান্দানী পীর'। হযরতের পূর্বপুরুষ শাহ নূরুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব উঁচুমানের কামিল দরবেশ ছিলেন। সে যুগে তাঁর প্রশংসায় সকল ছিলেন পঞ্চমুখ। শাইখুল ইসলামের দেওবন্দী উস্তাদগণও সমকালীন শ্রেষ্ঠ তরীকতের দীক্ষাগুরু হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং শিক্ষকমণ্ডলীর সুহবত-সান্নিধ্য দ্বারা হযরত শাইখুল ইসলাম প্রথম থেকেই রূহানিয়্যাতের এক অপরূপ ইশকের সাগরে নিমজ্জিত হন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে বাইআত গ্রহণ করেন যুগের শায়খ কুতুল ইরশাদ ইমামে রাব্বানী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে। অচিরেই সুযোগ পেলেন মক্কা মুয়াজ্জমায় বসবাসরত আরব ও আজমের রূহানী জগতের বাদশাহ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে থাকা ও তরীকতের দীক্ষালাভ। এরপর চলে গেলেন সকল যুগের সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ নবী, সকল জ্ঞানের সাগর, ইশকে ইলাহির অফুরন্ত মণিমুক্তার মহাখনি, দ্বীন ও রূহানিয়্যাতের একমাত্র সঠিক পথপ্রদর্শক, আল্লাহর মনোনীত মহান রাসূল আমাদের পেয়ারে নবীজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারের নিকটে মদীনা মুনুওয়ারায়। সেখানে দীর্ঘ ১৮ বছর অবস্থান করে রূহানী চর্চায় সফলতার চরমে পৌঁছে গেলেন। হযরত শাইখুল ইসলামের জীবনে চলে আসা এসব সৌভাগ্যশীল সুযোগ অবশ্যই এক বিরাট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত ছিলো। মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকুর, তাঁর দয়ামায়ার সুদৃষ্টি আমাদের ভারত উপমহাদেশের প্রতি পড়েছিল। ফলে এই অঞ্চলে জন্ম নিলেন বেশ কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ রূহানী রাহবার। তাঁদের সান্নিধ্য দ্বারা উপকৃত হলেন এবং এখনো হচ্ছেন অসংখ্য বনী আদম। ইলমে ওহির সুযোগ্য ধারক-বাহক, আধ্যাত্মিক জগতের 'পরশপাথর' হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম।

জীবন সায়াহ্নে

জীবনটি ক্ষণকালের। হ্যাঁ, আশি-নব্বুই বছরও বাস্তবে তেমন বেশী দিন নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় তা সত্যিই নগণ্য। তবে এখানে তো আসা থাকার জন্য নয়। যে মহান প্রভু সৃষ্টি করে পাঠালেন তাঁকে জানা-চেনা ও তাঁর আনুগত্য যেভাবে তিনি চেয়েছেন সেভাবে করা। এরপর একদিন ফিরে যাওয়া চিরদিনের জন্য। এই তো জীবন। এই তো জীবনের উদ্দেশ্য। তবে অধিকাংশ মানুষ এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে গাফিল। আর যারা সচেতন, সতর্ক ও প্রভুপরিচিতির সাধনায় জীবন কাটান, সঠিক সত্যধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত, তাঁরাই সফল- দুনিয়া-আখিরাতে।

এক অপূর্ব ব্যস্ততম কর্মময় জীবন কাটিয়ে হযরত শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শেষ পর্যন্ত জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে গেলেন। তাঁর অন্তরাত্মা প্রেমাস্পদের সঙ্গে মহামিলনের অভিপ্রায়ে হয়ে ওঠলো উদ্গ্রীব। কিন্তু জীবনাবসান তো কারো ইচ্ছাধীন নয়। যে এই জীবন দান করেছেন, শুধুমাত্র তিনিই এর ইতি টানতে পারেন এবং তাঁরই একক অধিকার এর ওপর।

হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৫৫ ঈসায়ী সালে সর্বশেষ হজ্জ পালন করেন। হিজাযে থাকাকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেশে ফিরে

রোগাক্রান্ত অবস্থায় যেটুকু সম্ভব তাঁর দীনি সফর ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অব্যাহত রাখলেন। রোগমুক্তির আশায় রীতিমতো ডাক্তারী চলছিলো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। তিনি দিন দিন দুর্বল হতে লাগলেন। অবস্থার অবনতি ঘটলো।

অসুস্থ হওয়ার দু'বছর পর ১৯৫৭ সালের ৩০ নভেম্বর হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দে অবস্থান করছিলেন। ফযরের নামাজ আদায়কালে চৌকি থেকে পড়ে গেলেন। পুনরায় নামায আদায় করেন কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর। ২রা ডিসেম্বর তিনি যেনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠলেন। তাঁর শ্বাসকষ্ট ও বুকের ব্যথার অবসান ঘটলো। ভক্ত-মুরীদ-শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই চিন্তামুক্ত হলেন। ভাবলেন, হযরত বুঝি এ যাবৎ বেঁচে গেলেন! সুস্থ হয়ে ওঠেছেন। আবারো দেশব্যাপী না পারলেও অন্তত দেওবন্দে থেকে ইলমে শরীয়ত ও মা'রিফাতের নূর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে থাকবেন। অসংখ্য মুরীদ, শাগরিদ, ভক্তদের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসির ঔজ্জ্বল্য দ্বারা, সুন্দর মহামূল্যবান বাক্য উচ্চারণ করে সকলকে আপ্লুত করবেন। কিন্তু হায়! এ ধারণা ছিলো ভুলের। কেউ জানতেন না, হযরতের দুনিয়াবী জীবনের ইতি ছিলো অতি নিকটে।

ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার। হযরত শুয়ে আছেন বিছানায়। হযরতের সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিদমতে নিয়োজিত আছেন। শরীর দাবাচ্ছেন। এক পর্যায়ে দুপুর বারোটার দিকে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কী সুন্দর তিনি ঘুমোচ্ছেন! যেনো প্রশান্তির সায়রে নিমজ্জিত হয়েছেন। হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভাবলেন, একটু সরে যাই। ঘুমের অবস্থায় তাঁর শরীর দাবিয়ে দিলে হয়তো নিদ্রাভঙ্গ হবে- হযরতের কষ্ট হবে।

বেলা আড়াইটা হলো। হযরত ঘুম থেকে উঠছেন না। এটা ব্যতিক্রম, যুহরের নামাযের সময় চলে যাচ্ছে তবুও তাঁর ঘুম ভাঙ্গছে না। সবাই কিছুটা বিচলিত। হযরতের স্ত্রী ডাক দিলেন। কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু না, কোনো সাড়া নেই। হৃদয়টা তার ধুরু ধুরু করে ওঠলো। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছেলে আসআদকে ডাকলেন। তিনি ছুটে আসলেন। হযরতের হৃদযন্ত্রের কম্পন পরীক্ষা করলেন। হায়! বন্ধ হয়ে

গেছে তাঁর ক্বলব। কোনো সাড়া নেই। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠলেন হযরত ফিদায়ে মিল্লাত। ডাকাডাকি শুরু করলেন। ছুটে এলেন ক্বারী আসগর হুসাইন সাহেব, সঙ্গে মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেবও। তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন না কী হয়েছে! তিনি আছেন না চলে গেলেন। হায়! হায়! তিনি তো বারোটার দিকে খুব শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিলেন। এবার আসলেন হাকীম মুহাম্মদ ও ডাক্তার সাহেব। পরীক্ষা করলেন। উভয়ের চোখদু'টো অশ্রুতে ভরে গেল। ভাঙ্গাভাঙ্গা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "হায়রে! হযরত মাদানী সাহেব এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন!" ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।

উম্মাতে মুহাম্মদীর এক সূর্যপুরুষ এক্ষণে আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। তিনি চলে গেছেন তাঁর মাহবুবের সান্নিধ্যে নীরবে, নিদ্রাবস্থায়। দুনিয়াজোড়া তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরীদ-শুভাকাঙ্ক্ষী, খুলাফাবৃন্দ শোকের সায়রে নিমজ্জিত হলেন। মুহূর্তে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র।

হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরি ১৩৭৭ সালের ১১ই জুমাদাল উলা, মুতাবিক ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী এ মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর ৬ মাস ২৪ দিন। (শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী)

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي *
وَادْخُلِي جَنَّتِي *

হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের কাছে
ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।
অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও,
এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। [আল-কুরআন]

হযরত শাইখুল ইসলাম ৩ পুত্র ও ৮ কন্যাসহ অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত-মুরীদ, খুলাফা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। হযরতের মৃত্যুসংবাদে শোকে মুহ্যমান হয় গোটা ভারতসহ মুসলিম বিশ্ব। শোকবার্তা প্রেরণ করেন ভারতের তখনকার প্রেসিডেন্ট ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু, শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আযাদ এবং মন্ত্রী-মিনিস্টারসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। দিল্লী থেকে অল-ইন্ডিয়া রেডিও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনাসহ শোক সংবাদ প্রচার করে। রেডিও সৌদি আরব থেকে অনুরূপ শোক সংবাদ প্রচারিত হয়। পরদিন ভারতের জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর অপূর্ব জীবন ও কর্ম সম্পর্কে মূল্যবান অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ হয়। তখনকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, মিশর ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তাঁর মৃত্যুতে স্মরণসভার আয়োজন করেন ভক্তবৃন্দরা। (প্রাগুক্ত)

কাফন-দাফন

হযরতের নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া কান্ধলভী মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। পরদিন ছিলো শুক্রবার। অনেকের মত ছিলো বাদ জুমু'আ জানাযা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাত ১২-৪০ মিনিটের সময় অসংখ্য ভক্ত-মুরীদ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে জানাযা নামায সমাপ্ত হয়। দেওবন্দের প্রখ্যাত কবরস্থান মাকবারায়ে কাসিমী মাত্র ১০ মিনিটের পথ। মরদেহসহ এটুকু রাস্তা পাড়ি দিতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। অবশেষে গভীর রাতে চিরদিনের জন্য মাটির গর্ভে রেখে দেওয়া হলো অসংখ্য মানুষের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন এই মহান বুজুর্গকে। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রধান হযরত কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরের মাঝখানে তিনি চিরশয্যায় সমাহিত হলেন।

পরিবার পরিজন

ইন্তিকালের সময় শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে তিনজন পুত্র রেখে যান তাঁরা হলেন: ১. ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ

মাদানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ২. মাওলানা সায়্যিদ হাফিজ মুহাম্মদ আরশাদ মাদানী (দামাত বারাকাতুহুম) এবং ৩. মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আসজাদ মাদানী (দামাত বারাকাতুহুম)। কন্যাগণ হলেন: মুছাম্মাত রায়হানা, মুছাম্মাত ইমরানা, মুছাম্মত সাফওয়ানা ও মুছাম্মাত ফারহানা।

হযরতের ইন্তিকালের সময় এক বিশিষ্ট মুরীদের স্বপ্ন

শাইখুল ইসলাম হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে আসলে বেশ ক'জন বুজুর্গ বিভিন্ন স্বপ্ন দেখেন। নিম্নে চেরাগে মুহাম্মদ থেকে একটি স্বপ্নের বর্ণনা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

সালিকের স্বপ্ন: মৃত্যুর মাত্র একদিন আগের কথা। হযরতের একজন বিশিষ্ট মুরীদ অতি নিকটে অবস্থান করে রূহানিয়্যাতের শেষ স্তরগুলো অতিক্রম করছিলেন। তিনি রাতে স্বপ্নে দেখলেন, শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘরের বাইরে দু'টি ঘোড়ার পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে। ওগুলো খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। এরপর সাদা পোশাকধারী একব্যক্তি এসে তাঁর চোখ দু'টি চেপে ধরে বন্ধ করে দিলেন। বললেন, চোখ বন্ধ রাখো! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করছেন। গদি আঁটা ঘোড়াটি সঙ্গেই আছে। মুরীদ আরয করলেন, তাহলে ঐ খালি ঘোড়াটি কার জন্য আনা হয়েছে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ ঘোড়াটি হুসাইন আহমদের জন্য! আমি তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি।” মুরীদ লক্ষ্য করলেন, ঐ ঘোড়াটির উপর একটি ডিম রাখা আছে। তিনি আবার আরজ করলেন, “এই ডিম কেন?” তিনি জবাব দিলেন, “এটা মুহাদ্দিসদের মাক্বাম”। মুরীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। (সাজারাতুল আউলিয়া)

বুজুর্গানে দ্বীন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া

হযরতের মৃত্যুসংবাদে অসংখ্য উচ্চ পর্যায়ের বুজুর্গানে দ্বীন শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এসব প্রতিক্রিয়ার পুরো বর্ণনা এ প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। এর পরও

আমরা বেশ ক'জন মহাত্মনের উক্তি এখানে তুলে ধরছি। এ বক্তব্যগুলোর অধিকাংশ সংকলন করেছি, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, চেরাগে মুহাম্মদ (সা.) থেকে।

১. হযরত শাহ আবদুল কাদির রায়পুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: "আমরা যখন এ মর্দে মুজাহিদকে চোখ তুলে দেখলাম, তখন যেখানে শায়খ মাদানীর পা ছিলো সেখানে নিজের মস্তক পড়ে থাকতে দেখি।"

২. হযরত আহমদ আলী লাহোরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি চৌদ্দবার হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত করেছি। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তর্দৃষ্টির নূর দান করেছেন। আমি কামিল ও ওলিআল্লাহদের চিনতে পারি। কাবা শরীফের হারামে আউলিয়ায়ে কিরামের একাধিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমি যখন স্বীয় রূহানী দৃষ্টি দিয়ে সমাবেশের দিকে তাকালাম তখন সেখানে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমকক্ষ কাউকে দেখি নি।"

৩. হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "তাঁর মৃত্যু এ শতাব্দির সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক ঘটনা। দীনি শিক্ষাক্ষেত্রে এ এক মহাক্ষতি। ... তাঁর শিষ্যবর্গ এশিয়া থেকে নিয়ে ইউরোপীয় তুরস্ক পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছেন। অবশেষে জীবনের দীর্ঘ ৩৩ বছর দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুদাররিস পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবে হায়াত দ্বারা তিনি সিক্ত করেছেন।"

৪. হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "মাওলানার ইন্তিকালে ইসলামী শিক্ষা ও রাজনীতির আসরে যে জায়গা খালি হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশকারী এবং শূন্যতা অনুভবকারীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু চরিত্র ও মানবতার রাজাসনে যে জায়গা খালি হয়েছে তার অনুভবকারী সম্ভবত খুবই কম। ... আমার মতে মানবতার এ দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাপক অধঃপতনের যুগে মাওলানা মাদানীর ইন্তিকাল এক বিরাট চারিত্রিক ক্ষতি ও মানবিক দুর্ঘটনা। কবি বলেন, একটি বাতি জ্বলন্ত ছিলো- তা-ও আজ নিভে গেল।"

৫. আমীরে তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "হযরতের সম্মানিত সত্তা পূত-পবিত্র ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিল। তাঁর ইন্তিকালের বেদনায় এ সময় মুসলিম উম্মাহর অনুভূতিপরায়ণ, সচেতন দরদী মানুষ বেদনার্ত। এটা প্রকৃতপক্ষে এক বিশ্ব-আলিমের তিরোধানে যে মুসিবত হওয়ার কথা, তারই সমান। তাঁর সত্তা সম্পর্কে যা কিছু বলা হবে, তা চোখে দেখা অথবা কানে শোনার সার হবে। ... তিনি নিজের বাতিনী উন্নতির সাথে সাথে সর্বপ্রকার বাতিলকে নিশ্চিহ্ন এবং সত্যের প্রতিটি দৃষ্টিকোণকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করেছেন। জীবনের অন্তিম দিনগুলোতেও কান্নাকাটিযুক্ত দু'আয় নিমগ্ন থেকে প্রিয় মালিকের হাতে প্রাণকে সোপর্দ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন।"

৬. শায়খুল ইসলাম মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "... হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চলে গেলে হযরত থানভী, হযরত মাদানী, হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরীর মতো ব্যক্তিবর্গ স্থলাভিষিক্ত হিসাবে মওজুদ ছিলেন। কিন্তু হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাকে ছেড়ে গেলেন, যখন কোনো একজনের মধ্যেও তাঁর গুণাবলী নেই এবং কোনো স্তরেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ... প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুসলমান ও আলিমসমাজ এবং খানক্বাহ ও মাদ্রাসাওয়ালারা আজ ইয়াতীম হয়ে গেছেন। ... ইয়া আল্লাহ! তাঁকে মাফ করুন। মর্যাদা বুলন্দ করার মাধ্যমে তাঁকে বিস্তৃত প্রশস্ত রাহমাত দান করুন।"

৭. হযরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "... তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা ছিলো অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু। তাঁর ইন্তিকাল একটি জাতীয় ক্ষতি অবশ্যই।" [মাস্টার কাওসার, আওলাদে রাসূল (বঙ্গানুবাদ)]

৮. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মুনীম আন্নামির বলেন: "ইতিহাসের পাতায় আমরা অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের অভ্যুদয় দেখতে পাই। এর কেউ আদর্শ রাজনীতিবিদ, কেউ সাহস ও বীরত্বের প্রতীক, কেউ বা জ্ঞান মনীষার অনন্যসাধারণ আদর্শ, কেউবা সাধুতা ও আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু

একাধারে এ সমস্ত গুণের সংমিশ্রণ এবং অপূর্ব বিকাশ একই ব্যক্তির মধ্যে বহুকাল যাবৎ দেখার সৌভাগ্য ইতিহাস লাভ করে নি। বহুযুগ পরে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যেই আমরা এ অনিন্দ্যসুন্দর সমাবেশ এবং বিস্ময়কর বিকাশ দেখার সৌভাগ্য লাভ করলাম। ... রাতের গভীরে তপস্যা ও দিনের আলোকে সংগ্রামমুখর, এই বহুবিশ্রুত প্রবাদ বাক্যের বাস্তব পুরুষ ছিলেন তিনি।” [প্রাগুক্ত]

৯. মুফাস্সীরে কুরআন হযরত মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “... রিয়াজত, মুজাহাদা, সাধনা ও ইবাদত, কাশফ-কারামতের হিসাব তাঁরাই ভালো জানেন যারা রমযানের রজনীতে হযরতের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অথবা জিন্দানখানার সংকীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাঁর সাথে রাত্রি যাপনের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন। ... হযরত শাইখুল ইসলাম ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জানবায জেনারেল, অকুতোভয় বীর সেনানী। আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, উস্তাদুল আরব ওয়াল আজম, ইলম ও আমল, জুহুদ ও তাকওয়া, ইচ্ছার কুরবানীর মূর্ত প্রতীক, চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলীর সুউচ্চ বহিঃপ্রকাশ, সালফে সালিহীনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি”। [মাস্টার কাওসার আলী, আওলাদে রাসূল (বঙ্গানুবাদ)]

হযরত শাইখুল ইসলামের খুলাফাবৃন্দ

যুগের শ্রেষ্ঠ শাইখুত-তারিকাত হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বমোট **১৬৭** জন সুযোগ্য খুলাফা রেখে যান। এদের অনেকেই স্ব-স্ব এলাকায় কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামের খিদমাতে জীবন কাটিয়েছেন এবং কাটাচ্ছেন। সর্বোপরি তাঁর রূহানী খিদমত থেকে উপকৃত হয়েছেন গণনাতীত মানুষ। চিশতি মাশাইখে কিরামের উপর রচিত গবেষণামূলক এই বিশিষ্ট গ্রন্থে আমরা হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সকল খলিফার তালিকা লিপিবদ্ধ করা জরুরী মনে করছি। নিম্নে এই তালিকাটি বেশ ক’টি প্রামাণ্য গ্রন্থ পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়েছে।

ক. বাংলাদেশ

মোট খুলাফার সংখ্যা ৫১ জন। [আওলাদে রাসূল]

সিলেট বিভাগ: মোট ৩১ জন।

১. মৌলভী শায়খ তাখলিস হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

২. হাজী শায়খ আবদুল বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ঝিঙ্গাবাড়ি, কানাইঘাট, সিলেট।

৩. হাজী শায়খ আবরু মিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তালবাড়ি, কানাইঘাট, সিলেট।

৪. হযরত মাওলানা বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বাঘা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

৫. মৌলভী শায়খ মুকাদ্দাস আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মহল্লা শায়খ, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

৬. মৌলবী শায়খ সৈয়দ আবদুল খালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৭. ডাক্তার শায়খ আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নূরগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

৮. মৌলভী শায়খ হাবীবুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, রায়পুর, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

৯. জনাব শায়খ সুলাইমান খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ..., ..., মৌলভীবাজার।

১০. মৌলভী শায়খ আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, চরিপাড়া, কানাইঘাট, সিলেট।

১১. মৌলভী শায়খ মুজাহিদ আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, গঙ্গাজল, জকিগঞ্জ, সিলেট।

১২. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল মতিন চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফুলবাড়ি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

১৩. মৌলভী শায়খ আবদুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ধুলিয়া, ..., হবিগঞ্জ।

১৪. হযরত মাওলানা শায়খ তাজাম্মুল আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর, ..., সিলেট।

১৫. মৌলভী শায়খ আলাউদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বানিয়াচং, বানিয়াচং সদর, হবিগঞ্জ।

১৬. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল মান্নান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ..., সিলেট।

১৭. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল লতীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নালিহরী, ঢাকাদক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

১৮. হযরত মাওলানা শায়খ সিরাজুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, পুরানগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

১৯. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, গাজিনগর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

২০. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল মু'মিন দামাত বারাকাতুহুম, পুরানগাঁও, ইমামবাড়ি, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

২১. হযরত মাওলানা শায়খ ইউনুস আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ঢাকাদক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২২. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ..., ..., ...।

২৩. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল মান্নান দামাত বারাকাতুহুম, গুনই, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

২৪. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল গাফফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মামরখানি, জকিগঞ্জ, সিলেট।

২৫. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বলরামপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

২৬. হযরত মাওলানা শায়খ রিয়াযুর রব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ঢাকাদক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২৭. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

২৮. হযরত মাওলানা শায়খ হাসান আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ..., গোয়াইনঘাট, সিলেট।

২৯. হযরত মাওলানা শায়খ লুৎফুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হমিদনগর, বরুণা, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

৩০. হযরত মাওলানা শায়খ হাফিজ আবদুল করীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কৌড়িয়া, বিশ্বনাথ, সিলেট।

৩১. হযরত মাওলানা শায়খ বদরুল আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, রেঙ্গা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল: মোট ২০ জন। (প্রাগুক্ত)

চট্টগ্রাম: মোট ১০ জন। (আওলাদে রাসূল)

৩২. হযরত মাওলানা শায়খ মাসউদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

৩৩. হযরত মাওলানা শায়খ মুফতি আহমাদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৪. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুস সাত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, চট্টগ্রাম।

৩৫. হযরত মাওলানা শায়খ আহমদ শফী দামাত বারাকাতুহুম, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৬. হযরত মাওলানা শায়খ উবাইদুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমামনগর, চট্টগ্রাম।

৩৭. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, গশ্চি, চট্টগ্রাম।

৩৮. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ নোমান দামাত বারাকাতুহুম, আন্ধরপাড়া, চট্টগ্রাম।

৩৯. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইদ্রিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সারং সন্তোষপুর, চট্টগ্রাম।

৪০. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, পীরখান, চট্টগ্রাম।

৪১. হযরত মাওলানা শায়খ শামসুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কাঞ্চননগর, চট্টগ্রাম।

পাবনা: মোট ১ জন। (প্রাগুক্ত)

৪২. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল গণি দামাত বারাকাতুহুম, পাবনা।

নোয়াখালী: মোট ২ জন। (প্রাগুক্ত)

৪৩. হযরত মাওলানা শায়খ রায়হানুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী।

৪৪. মৌলভী শায়খ আযিযুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আছীলপুর, নোয়াখালী।

লাঙ্গলকোট: মোট ১ জন। (প্রাগুক্ত)

৪৫. হযরত মাওলানা শায়খ কলিমুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, লাঙ্গলকোট।

কুমিল্লা: ৩ জন।

৪৬. হযরত মাওলানা শায়খ দিলওয়ার হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফেনুয়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

৪৭. হযরত মাওলানা শায়খ মুহিব্বুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফেনুয়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

৪৮. হযরত মাওলানা শায়খ আশরাফ আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সীরামপুর, কুমিল্লা।

ঢাকা: ১ জন। (প্রাগুক্ত)

৪৯. হযরত মাওলানা শায়খ আমিনুল হক মায়মনসিংহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, লালবাগ, ঢাকা।

বাকেরগঞ্জ: ২ জন। (প্রাগুক্ত)

৫০. মৌলভী শায়খ মুহাম্মদ ইউনুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, চরখলিয়া, ভোলা, বাকেরগঞ্জ।

৫১. মাওলানা হাফিজ শায়খ তৈয়ব আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বাকেরগঞ্জ।

আসাম (ভারত): মোট ৪২ জন। (প্রাগুক্ত)

(নিম্নোক্ত বুজুর্গদের ক'জন জীবিত কিংবা মৃত তা জানা যায় নি।)

৫২. মৌলভী শায়খ আবদুল ওয়াজিদ, মোল্লাগ্রাম, কাছাড়।

৫৩. হযরত মাওলানা শায়খ সাঈদ আহমদ আলী, বটরশি, কাছাড়।

৫৪. হযরত মাওলানা শায়খ মুখাদ্দাস আলী, বুড়িবাইল, কাছাড়।

৫৫. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল জলিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বদরপুর, করিমগঞ্জ, আসাম।

৫৬. হযরত মাওলানা শায়খ মুসাদ্দার আলী, দারুল উলূম বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৫৭. হযরত মাওলানা শায়খ বাশারত আলী, দারুল উলূম বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৫৮. হযরত মাওলানা শায়খ আহমদ আলী, বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৫৯. হযরত মাওলানা শায়খ মকবুল আলী, বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৬০. মাস্টার শায়খ গোলাম আহমদ, বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৬১. মৌলভী শায়খ মুঈনুদ্দীন, কাছাড়।

৬২. হযরত মাওলানা শায়খ জাওয়াদ আলী, বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৬৩. হযরত মাওলানা শায়খ হরমুজ আলী, তারাপুর, কাছাড়।

৬৪. হাফিজ শায়খ মুহাম্মদ মুস্তাক্বিম, বেরঙ্গা, শিলচর, আসাম।

৬৫. হাফিজ শায়খ মুহাম্মদ মুকাররম আলী, বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৬৬. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল, জালালপুর, কাছাড়।

৬৭. হাফিজ শায়খ শফিকুর রহমান, বাঁশকান্দি, কাছাড়।

৬৮. হযরত মাওলানা শায়খ ক্বারী আবদুল মুতাহ্হির, ভাগাদড়, কাছাড়।

৬৯. হযরত মাওলানা শায়খ ক্বারী আবদুস সামাদ, বুড়িবাইল, কাছাড়।
৭০. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল মুসাওয়িব, মহাফল, কাছাড়।
৭১. হযরত মাওলানা শায়খ মু'তাসিম আলী, মুহাম্মদপুর, আসাম।
৭২. হযরত মাওলানা শায়খ মুজাফফর আলী, আলগাপুর, আসাম।
৭৩. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হক, মুহাম্মদপুর, আসাম।
৭৪. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হক, আছিমগঞ্জ, সাতঘড়ি, আসাম।
৭৫. হাফিজ শায়খ আবদুন নূর, গন্দরজ্জানী, কাছাড়।
৭৬. মৌলভী শায়খ জালালুদ্দীন, খুদরাকুন্দি, কাছাড়, আসাম।
৭৭. হাফিজ শায়খ আবদুর রহীম, মুল্লাগ্রাম, কাছাড়।
৭৮. শায়খ মুহাম্মদ নাজাবত আলী, খুদরাকুন্দি, কাছাড়, আসাম।
৭৯. হাফিজ শায়খ হাজী আবদুল মালিক, বটরশি, আসাম।
৮০. হাজী শায়খ শামসুল হক, বটরশি, আসাম।
৮১. হাজী শায়খ মুহাব্বত আলী, সোনাবাড়ি মাঠ, কাছাড়।
৮২. হযরত মাওলানা শায়খ রহীম উদ্দীন বাঁশকান্দি, কাছাড়।
৮৩. মৌলভী শায়খ মুহসিন আলী, বাঁশকান্দি, কাছাড়।
৮৪. হযরত মাওলানা শায়খ ফরমান আলী, বাঁশকান্দি, কাছাড়।
৮৫. মৌলভী শায়খ আছদ্দর আলী, রপাই বালি, কাছাড়।
৮৬. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুর রাজ্জাক, আলগাপুর, কাছাড়।
৮৭. হযরত মাওলানা শায়খ মুনযির আলী, তারাপুর, আসাম।
৮৮. হযরত মাওলানা শায়খ আমানুল্লাহ, গুমড়িকুণ্ডি, করিমগঞ্জ, আসাম।
৮৯. হযরত মাওলানা শায়খ করীমুদ্দীন, বাঁশকান্দি, কাছাড়।
৯০. হযরত মাওলানা শায়খ সাঈদ আহমদ, রংপুর, আসাম।
৯১. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল বারী, নেতাইনগর, আসাম।
৯২. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক, গুডিমারি, আসাম।
৯৩. হযরত মাওলানা শায়খ জমীরুদ্দীন, ঢোবরী, গোয়ালপাড়া, আসাম।

বিহার (ভারত): ২২ জন। (প্রাগুক্ত)

(নিম্নোক্ত বুজুর্গদের ক'জন জীবিত কিংবা মৃত তা জানা যায় নি।)

৯৪. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুর রহমান, মাদ্রাসা শামসুল হুদা, পাটনা।
৯৫. জনাব শায়খ আতহার হুসাইন, পুরাইল, ভাগলপুর।

৯৬. হাজী শায়খ মুহাম্মদ আইয়ুব, চিলমিল, পুরাইল, পাটনা।

৯৭. জনাব শায়খ খলীলুর রহমান, পুরাইল, পাটনা।

৯৮. মৌলভী শায়খ মুহাম্মদ ইয়াকুব, ববুরা, পাটনা।

৯৯. জনাব শায়খ আশরাফ আলী, আজমতপুর, ভাগলপুর।

১০০. জনাব আবদুর রহমান, আজমতপুর, ভাগলপুর।

১০১. হাজী শায়খ মাযহারুল হক, সুমুরিয়া, ভাগলপুর, বিহার।

১০২. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আনওয়ার, কিথাটিকির, ভাগলপুর।

১০৩. হাকীম শায়খ ফিদা হুসাইন, সুমুরিয়া, ভাগলপুর।

১০৪. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুস সালাম, কুরুডিয়া, ভাগলপুর।

১০৫. হাজী শায়খ আহমদ হাসান, সনহোলী, ভাগলপুর।

১০৬. হযরত মাওলানা শায়খ ক্বারী ফখরুদ্দীন, জামিয়া কাসিমিয়া, গয়া।

১০৭. হযরত মাওলানা শায়খ নাবীহ হাসান, কোদমারি, গয়া।

১০৮. হাজী শায়খ মনিহাজ উদ্দীন, ধামীটোলা, গয়া।

১০৯. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ, ছাপরভি, মানঝা স্টেট, সারন।

১১০. হাজী শায়খ মুহাম্মদ আকিল, বিলাসপুর, দারভাঙ্গা।

১১১. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আজহার, রথুস, দারভাঙ্গা।

১১২. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুর রশীদ, মুবারকপুর, মুঙ্গের।

১১৩. ক্বারী শায়খ মাহদী বুখারী, জামে মসজিদ, মুঙ্গের।

১১৪. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইদ্রিস, নওকাট্টা, পুর্ণিয়া।

১১৫. হযরত মাওলানা শায়খ আযহার আওরঙ্গবাদী, বরওয়াতীহ, হাজারীবাগ।

উত্তর প্রদেশ (ভারত): ২৬ জন। [প্রাগুক্ত]

(নিম্নোক্ত বুজুর্গদের ক'জন জীবিত কিংবা মৃত তা জানা যায় নি।)

১১৬. হযরত মাওলানা শায়খ নাঈমুল্লাহ, ভুলেপুর, ফয়েজাবাদ, ইউপি।

১১৭. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল জাব্বার, হানসুর, ফয়েজাবাদ।

১১৮. হযরত মাওলানা শায়খ হাফিজ মুহাম্মদ তৈয়ব, নাবিনা, ভদ্রাস, ফয়েজাবাদ।

১১৯. হযরত মাওলানা শায়খ ফায়জুল্লাহ গঙুভী, মাদ্রাসা আহমদিয়া, ফয়েজাবাদ।

১২০. হযরত মাওলানা শায়খ ওয়ায়েস নেগরাম, লোখনৌ, ইউপি।

১২১. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইউনুস, বাঘরা, মুজাফফরনগর।

১২২. হাফিজ শায়খ আবদুল লতিফ, গড়হী পোখতা, মুজাফফরনগর।

১২৩. হাকীম শায়খ মুহাম্মদ সুলাইমান, নূলী গাজিপুর, মুজাফফরনগর।

১২৪. হযরত মাওলানা শায়খ ক্বারী আসগর আলী, মাদানী মনযিল, দারুল উলূম দেওবন্দ।

১২৫. হযরত মাওলানা শায়খ সৈয়দ মাহমুদ হাসান, পঠেড়, সাহারানপুর।

১২৬. হযরত মাওলানা শায়খ হিদায়াত আলী, ফরহিবস্তী, সাহারানপুর।

১২৭. হযরত মাওলানা শায়খ কুতুবুল্লাহ, মখিয়া, সাহারানপুর।

১২৮. হযরত মাওলানা শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ আহমদ, নগিনা, বিজনৌর।

১২৯. হযরত মাওলানা শায়খ আজিজুর রহমান, মুহতামিম ইয়াতিমখানা, বিজনৌর।

১৩০. হযরত মাওলানা শায়খ সৈয়দ আহমদ শাহ মুরাদাবাদী, ইন্টার কলেজ, বিজনৌর।

১৩১. হযরত মাওলানা শায়খ সৈয়দ আবদুল হাই, আনজান শহীদ, আজমগড়।

১৩২. হযরত মাওলানা শায়খ সিফাতুল্লাহ, বাল্লাকীপুরা।

১৩৩. হযরত মাওলানা শায়খ মুশতাক আহমদ, কাযীদা, মুপুরা।

১৩৪. হাজী শায়খ মুহাম্মদ আহমদ, মাওগাঁও, এলাহাবাদ।

১৩৫. জনাব শায়খ করীম বখশ, গলি কর্ণেলগঞ্জ, কানপুর।

১৩৬. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল সম্ভলী, আমরুহা, মুরাদাবাদ।

১৩৭. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ আহমদ, হাসানপুর, ইউপি।

পশ্চিমবঙ্গ (ভারত): ৫ জন। [প্রাগুক্ত]

১৩৮. হযরত মাওলানা শায়খ আহমাদুল্লাহ, বরনপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান।

১৩৯. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল খালিক, শান্তিবাগ, বর্ধমান।

১৪০. শায়খ গোলাম মুহিউদ্দীন, রহমতনগর, বর্ধমান।

১৪১. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ, বর্ধমান।

১৪২. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ তাহির করিমগঞ্জী, মুহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া মাদানিয়া, কলিকাতা।

মধ্যপ্রদেশ (ভারত): ১ জন। [প্রাগুক্ত]

১৪৩. হাফিজ শায়খ আবদুল লতিফ, নবীনা, বেজনাথপুর, রায়পুর, মধ্যপ্রদেশ। (এই বুজুর্গ জীবিত না মৃত তা জানা যায় নি)

মাদ্রাজ (ভারত): ২ জন। [প্রাগুক্ত]

১৪৪. মুন্সি শায়খ বশীর আহমদ, প্রমাণবট, উত্তর আরকাট।

১৪৫. হযরত মাওলানা শায়খ হাসান মালাবারী, প্রমাণবট, উত্তর আরকাট। (এই উভয় বুজুর্গ জীবিত না মৃত তা জানা যায় নি)

পূর্ব পাঞ্জাব (ভারত): ৩ জন। [প্রাগুক্ত]

১৪৬. হযরত মাওলানা শায়খ নিয়াজ মুহাম্মদ, উপশহর, নূহ গোড়াগাঁও।

১৪৭. হযরত মাওলানা শায়খ জামিল আহমদ, উপশহর, নূহ গোড়াগাঁও।

১৪৮. মিয়াঁজী শায়খ মুহাম্মদ রমযান, উপশহর, মালব।

(এই তিনজন বুজুর্গ জীবিত না মৃত তা জানা যায় নি)

দিল্লী (ভারত): ২ জন। [প্রাগুক্ত]

(এই বুজুর্গদ্বয় জীবিত না মৃত তা জানা যায় নি)

১৪৯. জনাব মুন্সি শায়খ আল্লাহদাতা, তাবলিগী মারকাজ, নিযামুদ্দীন, নয়াদিল্লী।

১৫০. ক্বারী শায়খ আবদুশ শুকুর হাঁসপুরী, হাউযওয়ালী মসজিদ, নয়াদিল্লী।

মুম্বাই (ভারত): ৯ জন। [প্রাগুক্ত]

(এই বুজুর্গদের মধ্যে ক'জন জীবিত বা মৃত তা জানা যায় নি)

১৫১. হযরত মাওলানা শায়খ আহমদ বুযুর্গ সমলক, সুরাট, মুম্বাই (বোম্বাই)।

১৫২. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুস সবুর কাছভী, সুরাট।

১৫৩. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুস সামাদ, ভানকানীর, সুরাট।

১৫৪. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল গফুর কোরায়শী, মাদ্রাসা ফুরক্বানিয়া, ওসমানাবাদ শাহর।

১৫৫. হযরত মাওলানা শায়খ সৈয়দ সুলায়মান শাহ, মুম্বাই।

১৫৬. হযরত মাওলানা শায়খ সৈয়দ বদীউদ্দীন, মুম্বাই।

১৫৭. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হাকিম, মুম্বাই।

১৫৮. শায়খ সৈয়দ তালিব আলী, শাস্তর, মুম্বাই।

১৫৯. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুস সামাদ, মুম্বাই।

পাকিস্তান: ৬ জন। [প্রাগুক্ত]

(এই বুজুর্গগণ জীবিত না মৃত তা জানা যায় নি)

১৬০. হযরত মাওলানা শায়খ খুরশীদ আহমদ, আবদুল হাকিম, মুলতান।

১৬১. হযরত মাওলানা শায়খ হামিদ মিয়া, মুসলিম মসজিদ, চক আনারকলি, লাহোর।

১৬২. হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হাকিম, ফয়েযবাগ, লাহোর।

১৬৩. হযরত মাওলানা শায়খ মাজহার হুসাইন, ভীম, চকওয়াল।

১৬৪. হযরত মাওলানা শায়খ রহমতুল্লাহ, চক, বাহওয়ালপুর।

১৬৫. হযরত মাওলানা শায়খ রহমতুল্লাহ আবদুল হক মাদানী, শিরোকুহনা, ডেরা ইসমাঈল খান।

বার্মা (মায়ানমার): ১ জন। [প্রাগুক্ত]

১৬৬. হযরত মাওলানা শায়খ মুজাফফর আহমদ, মিংজি, আকিয়াব, মায়ানমার।
(এই বুজুর্গ জীবিত না মৃত তা জানা যায় নি)

দক্ষিণ আফ্রিকা: ১ জন। [প্রাগুক্ত]

১৬৭. হযরত মাওলানা শায়খ বায়েযিদ শহীদ, রিস্টনবার্গ, ট্রান্সভাল।
(এই বুজুর্গ জীবিত না মৃত তা জানা যায় নি)
এবং
১৬৮. ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা শায়খ আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাদানী মনজিল, দেওবন্দ।

[এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত থাকতে হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বাহ্যিক খিলাফত প্রদান করেন নি। তবে ইন্তিকালের পরই হযরতের পক্ষ থেকে খুলাফায়ে কিরামসহ শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া কান্ধলভী মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফত প্রদান করেন। হযরতের জানিশীন হিসাবে সকলেই ফিদায়ে মিল্লাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রহণ করে নেন। - আওলাদে রাসূল]

কে ছিলেন হযরতের প্রথম খলিফা?

হযরত কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি সর্বপ্রথম কা'কে ইযাজত প্রদান করেছিলেন, কোনো জীবনী গ্রন্থে তার উল্লেখ আমি খুঁজে পাই নি। তবে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্যটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা জানি সুনামগঞ্জ জিলার জগন্নাথপুর উপজেলার প্রখ্যাত গ্রাম সৈয়দপুরে হযরতের দু'জন খলিফা ছিলেন। খুলাফাদের উপরোক্ত লিস্টে এ দু'টি নাম ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি। তাঁরা হলেন শায়খ সৈয়দ তখলিস হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শায়খ আবদুল খালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। উপরোক্ত

তালিকায় তাঁদের নাম যথাক্রমে ১ ও ৬ নাম্বারে এসেছে। এখন, সৈয়দপুরের এক কৃতি সন্তান সৈয়দ ওহিদ উদ্দীন আহমদ 'সৈয়দপুরের কিছু কথা' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। মে, ২০১২ ঈসায়ীতে প্রকাশিত এই পুস্তকে উল্লেখ করেছেন:

"১৯২৪ সালে আং খালিক সাহেব রমজানে শাইখুল ইসলাম (র.) এর কাছে বয়াত হন। আমার জানা মতে তিনিই সৈয়দপুরের মধ্যে শাইখুল ইসলাম র. এর প্রথম মুরিদ। পরের বছর ১৯২৫ সালে রমজানে এতেকাফ করার জন্য তাঁর সাথে তখলিছ হোসেন সাহেব ও আমার ওয়ালিদ সাহেব সৈয়দ আং জহুর পন্ডিত সিলেট যান। এই রমজানেই তারা উভয়ে শায়খুল ইসলাম (র.) এর কাছে বয়াত হন।বয়াত হওয়ার সময় কোনো এক ব্যক্তি হঠাৎ বলে উঠেন 'পন্ডিত সাহেব বসুন', তখন মাদানী (র.) বললেন:

'কিয়া হিন্দু মেরে পাস বয়াত হনে কে লিয়ে আয়া'!

উক্ত রমজানের ২৬ তারিখ আছরের পরক্ষণে শায়খুল ইসলাম মাদানী রাহ. আং খালিক রাহ. কে বলেন তোমার সাথে যে দুই ব্যক্তি এসেছেন যিনি হালকা পাতলা উনাকে বুলাও। তখলিছ হোসেন সাহেবকে সাথে নিয়ে হযরত আং খালিক সাহেব মাদানী রাহ. এর সামনে দাঁড়ান। তখলিছ হোসেন সাহেব তখন কাঁপতে থাকেন। মাদানী র. চোখ তুলে বললেন 'কিয়া নাম?'

'তখলিছ হোসেন'।

'কিয়া করতা হায়?'

'বাপকে সাত জমিন মে কাম করতা হো'।

'কয়ি খাছ আমল হায়?'

'জি, না'।

'আগর কোচ হ তো কাহ দো'

'অজুকে সাথ রহনে কি কোশীশ করতা হো। আওর হর অজুকে বাদ দু রাকাত নামায কি কোশীশ করতা হো'।

তখলিছ হোসেন সাহেব এভাবে উত্তর দিলেন। এরপর মাদানী র. চলে আসার জন্য বললেন। তখলিছ হোসেন সাহেবের আদত ছিল জীবনে বিনা প্রয়োজনে

হযরতের চোখের সামনে বসতেন না এবং সামনেও আসতেন না। হযরত বলতেন, তখলিস হুসেন মাদারজাদ ওলী। তাঁর সাথে সবাই আদব ও এহতেরামের সাথে আচরণ করবে। ১৯২৫ সালের ২৭ রমযান [অর্থাৎ পরের দিন] এশরাকের পর হযরত শায়খুল ইসলাম র. বলেন আমি তখলিছ হোসেনকে চার তরীকার এজাযত দিলাম। তিনিই শায়খুল ইসলাম র. এর সর্ব প্রথম ও সর্ব শ্রেষ্ঠ খলিফা। তাঁর দ্বিতীয় খলিফা আং বারী রাহ. ঝিংগা বাড়ী। তৃতীয় খলিফা হাজি আব্রু মিয়া রাহ. তালবাড়ী। বাঘার শায়েখ বশীর আহমদ রাহ. খেলাফত লাভ করেন ১৯৩৬ সালে।" [সৈয়দপুরের কিছু কথা, পৃ: ৬-৭]

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট, হযরত শাইখুল ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন মৌলভী শায়খ তাখলিস হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি খিলাফত লাভ করেন ১৯২৫ ঈসায়ী সনে। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফার নামও লেখক উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

বিভিন্ন ঘটনা

১. ওলির সঙ্গে বে-আদবির কঠোর পরিণতি: হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার বাংলাদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর রেলস্টেশনে আসলেন। উদ্দেশ্য ছিলো সেখানে এক মিটিংয়ে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান। স্টেশনে একদল উগ্র মুসলিম লীগ সমর্থক তাঁর উপর হামলা চালালো। স্থানীয় বিশিষ্ট বুযুর্গ মাওলানা রিয়াজ আহমদ তখন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন, 'হযরত রেল স্টেশনে পৌঁছার পরই শত শত মানুষ তাঁর উপর হামলা চালায়। আমরা দশ-বারোজন তাঁকে ঘিরে রাখলাম। তারা আমাদের উপরও হামলা চালালো। লাথি-ঘুষি দিতে থাকে। তারা খুব অকথ্য ভাষায় মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁর উপর গোবর-ময়লা ইত্যাদি ছুঁড়তে শুরু করলো। হযরতকে গরুর গাড়িতে ওঠানোর চেষ্টা করলাম। সন্ত্রাসীরা লাঠি দিয়ে তাঁকে মারতে উদ্যত হলো। একজন তাঁর মাথা থেকে টুপি বলপূর্বক খুলে নিয়ে পায়ের নীচে পিষতে শুরু করলো। গালি-গালাজ করে তা শেষ পর্যন্ত পুড়িয়ে দিল। আরো কিছু নরাধম দুর্বৃত্তের দল হযরতের আবায় ধরে টানাটানি

করতে লাগলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো তারা এখই হযরতকে হত্যা করে ফেলবে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে স্টেশনের ওয়েটিং কক্ষে ফিরে আসলেন। আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভারতবর্ষের বীর পুরুষদের সামনে এ ধরনের ঘটনা বহুবার এসেছে, আরোও আসবে। তবে সেদিন বেশী দূরে নয়, ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে এ অপেক্ষা আরো কঠিন আচরণ করা হবে। হয়তো তোমরা নিজের চোখেও তা দেখবে'।

আল্লাহর ওলির সঙ্গে বে-আদবী ও খারাপ ব্যবহার করলে, সরকারবাদী কেইস হয়ে যায়। এ কথাটি হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য শাগরিদ ও ছাত্র কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন। ঘটনার পরদিনই দুর্বৃত্তদের উৎসাহদাতা মদদগার দারোগার বড় ছেলে পানিতে ডুবে মারা গেল। যে দুর্ভাগা তাঁর মাথার টুপি খুলে পায়ের নীচে ফেলে পিষেছিল সে-ও ঐদিন পানিতে ডুবে মারা যায়। এতে সৈয়দপুর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। তারা বুঝতে পারলো, আল্লাহর ওলির সঙ্গে বে-আদবীর কুফল কি দাঁড়াতে পারে। সবাই তাওবাহ করলো।

২. ওপর আরেক বে-আদবির ঘটনা ও এর পরিণতি: শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা পাঞ্জাব প্রদেশে সফরে গেলেন। মুসলিম লীগের লেলিয়ে দেওয়া একদল গুণ্ডা হযরতকে অপমান করলো, হত্যার হুমকি দিল, ভীষণ বিপদগ্রস্ত করলো। এক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন, '১৯৪৬ সালে শাইখুল ইসলাম দেওবন্দ থেকে পাঞ্জাব সফরে আসেন। বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা প্রদান শেষে লাহোর থেকে একখানা মেইল ট্রেনে আরোহণ করলেন। একই ট্রেনে মুসলিম লীগের এক নেতার সফর করার কথা ছিলো। কিন্তু তার প্রোগ্রাম মুলতবী হয়ে যায়। এদিকে প্রতিটি স্টেশনে তার সমর্থকরা অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষারত ছিল। ট্রেনটি অমৃতশর স্টেশনে পৌঁছার পর মুসলিম লীগ সমর্থক গার্ড ঐ সমর্থকদের বললেন, তাদের নেতা আসেন নি। তবে ব্যঙ্গ করে বললেন, ট্রেনের ঐ ক্যামেরায় (!) মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব আছেন।

কথাটি বলার পেছনে ষড়যন্ত্র ছিলো। মুসলিম লীগাররা শ্লোগান দিতে দিতে সামনে এগিয়ে এসে হযরতের দিকে টমেটো ইত্যাদি ছুঁড়ে মারতে লাগলো। তারা বগিতে উঠে তাঁকে হামলার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় ট্রেনের দরজায় আবদুর রশীদ নামক এক যুবক হযরতের নিরাপত্তাদানে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। গুণ্ডারা তার উপর হামলা করলো। কিন্তু কিছুতেই তাকে দরোজা থেকে হঠাতে পারলো না। আবদুর রহমানের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দিল নরাধমরা- এরপরও তারা বগিতে ঢুকতে পারলো না। স্বস্থান থেকে এক বিন্দুও সরলেন না এই মর্দে মুজাহিদ।

পরবর্তী স্টেশন জলন্দর। এখানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটলো। আক্রমণকারীদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখে শামসুল হক শামসী, ফজল মুহাম্মদ ও ফতেহ মুহাম্মদ। দাড়ি ধরে টানাটানি, টুপি নিয়ে মাটিতে ফেলা, গালি-গালাজ করা, ময়লা নিক্ষেপ, বালিশ কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি জঘন্য কর্মে তারা জড়িত ছিলো। চরম ধৈর্যসহ হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বসে থাকেন। কাউকে কিছু বললেন না।

ঐদিন রাতেই জলন্দরের যুবক ফজল মুহাম্মদ জ্বরে আক্রান্ত হয়। সকালে পিঠের মধ্যে দু'টি বিষফোড়া বের হলো। ভীষণ বেদনায় সে কাতর হয়ে পড়লো। কয়েক মাস এভাবে যন্ত্রণায় কেটে যাওয়ার পর সে মারা যায়। ফাতেহ মুহাম্মদ তার স্ত্রী ও ৬ সন্তানসহ শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। শামসুল হক পরবর্তীতে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শামসুল হকের শামসীর এক ঘনিষ্ঠ সহচর আফসোস করে বলতো, হায়! মাওলানা মাদানীকে অপমান করার দরুনই আমার এই অবস্থা! সে আমৃত্যু পাগল হয়ে গিয়েছিল।

জলন্দরের ডাক্তার একরামুল হক বর্ণনা করেন, 'যে যুবকটি তাঁর দাড়ি ধরে টেনেছিল এবং যেটি তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিল তারা খুব করুণ পরিণতির শিকার হয়। এদের একজন 'বিয়াস' নদীতে ডুবে মারা যায় আর অপরজন জনৈক লীগী নেতার হাতে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পুড়ে মরেছে।'

৩. মাথার উপর জুতা: আবদুর রশীদ আরশাদ প্রণীত, 'বীস বড়ে মুসলমান' গ্রন্থে একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থের ৫১৬ পৃষ্ঠায় লেখক উল্লেখ করেন: লাহোরের মাওলানা আবদুল্লাহ ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ছিলেন। এছাড়া তিনি মুরীদ ছিলেন খ্যাতিমান বুজুর্গ হযরত শাহ আবদুল কাদির রায়পুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহেবের। সুতরাং হযরত কুতবে আলমের সঙ্গে তাঁর গভীর মুহাব্বত ছিলো। একদা মদীনা মুনুওয়ারার মসজিদে নববীতে শাইখুল ইসলামের সাথে প্রবেশকালে আবদুল্লাহ ফারুক সাহেব হযরতের জুতো হাতে তুলে বহন করে ভেতরে নিলেন। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন কিছুই বললেন না।

অপর আরেক দিন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার সময় এক অত্যাশ্চর্য কাজ করে বসলেন শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি মাওলানা ফারুক সাহেবের জুতো নিয়ে নিজের মাথার উপর তুলে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন! এদিকে মাওলানা ফারুক সাহেব তো একেবারে থ! তিনি বার বার পেছন থেকে আবদার করলেন, এ আপনি কী করছেন? এ আপনি কী করছেন হযরত?

শাইখুল ইসলাম জুতো জোড়া মাথার উপর তুলে এতো তাড়াতাড়ি চলছিলেন যে, ফারুক সাহেব কিছুতেই তাঁর সাথে থাকতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি চিৎকার দিলেন, "হযরত! আল্লাহর ওয়াস্তে জুতো জোড়া আপনার মাথার উপর থেকে নামিয়ে ফেলুন!"

মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থামলেন। বললেন, "আগে আমার সাথে ওয়াদা করুন, ভবিষ্যতে কখনো হুসাইন আহমদের জুতা হাতে তুলে নেবেন না!" মাওলানা ফারুক সাহেব অগত্যা 'অঙ্গীকার' করতে বাধ্য হলেন। এরপর শাইখুল ইসলাম মাথার উপর থেকে জুতো জোড়া নামালেন।

৪. জরাজীর্ণ মানুষের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে খুব বেশী: চিরাচরিত নিয়মানুসারে একদা হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ ক'জন সঙ্গীসহ বড় একখানা থালায় একত্রে খাবার খাচ্ছিলেন। অদূরে একজন শীর্ণদেহী

ময়লাযুক্ত কাপড়-পরনে এক লোক কিছুটা ভয় ও কিছুটা লজ্জায় থালায় বসে খেতে সংকোচ বোধ করছিলেন। হযরত টের পেয়ে তাকে ডাক দিলেন। লোকটি তখন অপর আরেক ব্যক্তির কাছে এসে বসলেন যার পরনের কাপড়-চোপড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও দামী ছিল। জরাজীর্ণ লোকটি তার একেবারে নিকটে বসে পড়ায় তিনি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিলেন। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিষয়টা আঁচ করে ঐ লোকটিকে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, "লোকেরা জানে না, জরাজীর্ণ মানুষের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে খুব বেশী।" কথাটি শুনে ঐ দামী পরিপাটি পোশাক পরনে লোকটি লজ্জা পেলেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলেন। [মাওলানা আবদুর রশীদ, বীস বড়ে মুসলমান; ড. মুশতাক আহমদ প্রণীত, 'শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ.' থেকে]

৫. হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন কাজ করার দুঃসাহস আমার নেই: একদিন তিনি হাদীসের পাঠদান করছেন। এক ছাত্র হযরতের হাতে একখানা চিরকুট দিলেন। এতে লিখা ছিলো, হযরত! আপনার পাজামা টাখনুর নীচে পড়ে আছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা হারাম!

চিরকুট পাঠ করেই শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "কৈ, আমার পাজামা তো টাখনুর উপরেই আছে। ভুলবশত হলে ভিন্ন কথা, অন্যথায় হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন কাজ করার দুঃসাহস আমার নেই।" [প্রাগুক্ত]

৬. আমিও এক সাধারণ রোগী: একবার হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাকিম মুহাম্মদ ইয়ামীন সাহেবের চেম্বারে চিকিৎসার জন্য গেলেন। ডাক্তার সাহেব দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মুসাহাফা করে বললেন, আসুন। নিজের কাছে বসিয়ে তিনি হযরতের চিকিৎসার কাজ সবার আগে সেরে নিতে চাইলেন। এটা ছিলো হযরতের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানবোধের নিদর্শন। কিন্তু শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমি কিছুতেই অন্যান্য রোগিদের আগে যেয়ে চিকিৎসা করাবো না। তাঁরাও রোগী এবং আমিও এক সাধারণ রোগী। তাঁদের আগে যেয়ে আমার

কাজ সেরে নেওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না। সুতরাং অনেক্ষণ অপেক্ষা করলেন তাঁর সিরিয়াল আসার আগ পর্যন্ত। [মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, শাইখুল ইসলাম মাদানীর মালফূযাত কারামাত ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, ঢাকা: ইসলামী রিসার্চ ফাউন্ডেশন, প্রাগুক্ত থেকে]

৭. অমুসলিমরাও আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ: শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। একদিন ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরতকে বললেন, "হযরত! মুসলমানদের জন্য দু'আ করুন।" শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে জবাব দিলেন, "কেনো ভাই? অমুসলিম লোকেরা কী আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ নয়?" [ইহ্তিশামুল হাসান কান্ধলভী প্রণীত, "রাহনূমায়ে ইনসানিয়্যাত" আল জমিয়ত পত্রিকা, শাইখুল ইসলাম সংখ্যা, পৃ: ২৫, প্রাগুক্ত থেকে।]

৮. স্থিরতা খুঁজে পাই প্রিয় নবী ও তাঁর হাদীস আলোচনার মধ্যে: শাইখুল ইসলামের স্ত্রী (ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাতা) যেদিন ইন্তিকাল করলেন, সেদিনই তিনি হাদীসের দারস দানের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল হাদীসের দিকে অগ্রসর হলেন। স্বভাবত শোকাহত অবস্থায় তাঁকে দারুল হাদীসে যেতে অনেকেই বারণ করতে চাইলেন। হযরত শাব্বির আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও বললেন, হযরত! আজ দারসে না যাওয়াটাই ভালো। তিনি বললেন, "মনের অস্থিরতা কাটানোর উদ্দেশ্যেই আমি নবীজীর হাদীসচর্চার শরণাপন্ন হতে চাই। স্থিরতা খুঁজে পাই প্রিয় নবী ও তাঁর হাদীস আলোচনার মধ্যে।" [আসীর আদরবী প্রণীত, 'মাআছিরে শাইখুল ইসলাম', প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ৪৩৯]

৯. ইকরামুল মুসলিমীন: হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্য মুসলমান ভাইয়ের সুবিধার্থে যাকিছু সম্ভব আঞ্জাম দিতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতেন না। করাচী জেলে অবস্থানকালে সেলে তাঁর সাথে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি প্রস্রাবজনিত রোগে ভুগছিলেন। কামরার

ভেতর রাখা প্রস্রাবের ভাণ্ডে প্রস্রাব করতে হতো। প্রত্যহ ফযরের নামাযের পূর্বে তিনি লক্ষ্য করতেন, ভা-টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। কিন্তু কে এ কাজটি করে, তা তিনি জানতেন না। এক রাতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানা থেকে লক্ষ্য করলেন, হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ প্রস্রাবপূর্ণ ভা-টি পরিষ্কার করে ধুঁয়ে নিচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে মাওলানা জওহার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিস্মিত হয়ে গেলেন। [সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী প্রণীত, 'ওয়াকিয়াত ওয়া কারামাত', প্রাগুক্ত থেকে]

১০. ভীষণ ক্রন্দন: তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার একদিন পূর্বে মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমদকে কাছে ডেকে আনলেন। বললেন, "আজ ক'দিন হয়, বাধ্য হয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হচ্ছে। এতে নিজের অনেক ত্রূটি হয়ে যাচ্ছে। মনে ভয়ানক কষ্ট অনুভব করছি। আল্লাহর দরবারে যেয়ে কি জবাব দিব?" এটুকু বলে তিনি অঝোর ধারায় চোখের পানি ফেলে কাঁদতে লাগলেন। বর্ণনাকারী মাওলানা ফখরুদ্দীন বলেন, আমি হযরত শাইখুল ইসলামকে এতো কান্নাকাটি করতে ইতোপূর্বে কখনো দেখি নি।" [আবুল হাসান বারাবাংকুটী প্রণীত, 'হযরত আঙ্গীয ওয়াকিয়াত', প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত]

কারামত

কারামত প্রকাশ হওয়া ওলায়তের 'প্রমাণ' নয়। এরপরও অধিকাংশ ওলির জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, সময় সময় তাঁদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ হয়। এ গ্রন্থে আমরা ইতোমধ্যে ৩৯ জন চিশতি মাশাইখের জীবন ও তাসাওউফের খিদমতের উপর আলোচনা করেছি। এদের প্রায় সবার জীবনে কারামত প্রকাশ হয়েছে বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে ওলায়তের দলীল 'কাশফ-ইলহাম-কামারত' না হলেও এসব 'অতিস্বাভাবিক' ঘটনা ওলিদের ক্ষেত্রেই ঘটতে দেখা যায়। যুগের শ্রেষ্ঠ শাইখুত-তরীকাত, কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনেও কাশফ-কারামত-ইলহামের অনেক ঘটনা বিভিন্ন কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হযরত মুহিউদ্দীন খান অনূদিত 'চেরাগে মুহাম্মদ', ড. মুশতাক আহমদ প্রণীত 'শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী',

মুফতী নূরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত ‘মাশায়েখে চিশত’ ইত্যাদি গ্রন্থে হযরতের জীবনে কারামত প্রকাশের ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। আমরা নিম্নে এর কয়েকটি মাত্র পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

১. দু’আর বরকত: সিলেট শহরের কোথাও একবার অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন সিলেটে অবস্থান করছিলেন। একদল লোক ছুটে এলো তাঁর কাছে। আগুন থেকে রেহাই পেতে দু’আ চাইলো। তিনি দু’আ করলেন। সাথে সাথে হঠাৎ আগুন নিভে গেল। [চেরাগে মুহাম্মদ]

২. ট্রেন ফিরে আসা: সিলেট থেকে দেওবন্দ যাচ্ছিলেন শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সিলেট স্টেশনে তখন মাগরিবের সময় আসন্ন। এদিকে প্লাটফর্ম ছেড়ে গাড়ি চলে যাওয়ার সময়ও উপস্থিত। সবাই তাড়াহুড়ো করেগাড়িতে আরোহণ করলো। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশ্চিন্তে স্টেশনের এক জায়গায় জামাআতের সঙ্গে নামায শুরু করলেন। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিল। বেশ দূরে চলে গেল। অত্যন্ত ধীরস্থিরে নামায আদায় করে তিনি বসে আছেন। দেখা গেল ট্রেনখানা আবার প্লাটফর্মে ফিরে আসছে! আল্লাহ মা’লুম, ট্রেনের ইঞ্জিনে কী যেনো গণ্ডগোল ছিল। স্টেশনে ফিরে আসার পর মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর ‘নামাযী’ সঙ্গীরা ট্রেনে আরোহণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনের যান্ত্রিক সমস্যা দূর হলো এবং তা গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলো। [প্রাগুক্ত]

৩. খাট থেকে জিকিরের আওয়াজ: জে.কে. স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৌলভী আবদুল বারী নবীগঞ্জী বলেন, ‘একবার হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি করিমগঞ্জ আসলেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমিও সেথায় গেলাম। ঐদিন বদরপুরের বার্ষিক জলসাও ছিলো। আমি বদরপুর মাদ্রাসায়ও গেলাম। মাদ্রাসার বারান্দায় একখানা ছোট্ট খাট। আমি সেটির উপর বসলাম। কী আশ্চর্য! একটু পরই শুনতে পেলাম জিকিরের শব্দ। একই সঙ্গে খাটখানায় শুরু হয়েছে কম্পন। আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। খাট থেকে উঠে খোঁজ করে জানতে পারলাম, হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই খাটের উপর বসে অযু করেছেন। এখানে খাটটি রাখার উদ্দেশ্যও ছিলো তা-ই।’ উল্লেখ্য মৌলভী আবদুল বারী সাহেব এই ঘটনাটি হযরত

মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল কদর খলিফা হযরত লুৎফুর রহমান বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ই'তিক্বাফ পালনকালে বর্ণনা করেছিলেন। [প্রাগুক্ত]

৪. খাদ্যে বরকত: মুখিয়া, দেওবন্দের হাজী আহমদ হুসাইন সাহেব বর্ণনা করেন, 'একবার দেওবন্দে জমিয়তের কনফারেন্স হয়। আমি হযরত শাইখুল ইসলামসহ মোট ৫০ জন মেহমানকে আপ্যায়নের আয়োজন করি। ... কিন্তু হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন খাবার খেতে আসলেন তখন দেখা গেলো তাঁর সঙ্গে অন্তত চার-পাঁচ শত লোক! আমি একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। সময় খুব অল্প, কিছুতেই আরো খাবার পাকানো সম্ভব নয়। কী করি? একজন পরামর্শ দিলেন, ব্যাপারটি আপনি নিজে যেয়ে হযরতকে অবগত করুন। আমি তা-ই করলাম। তিনি আমার সঙ্গে খাবার কক্ষে ঢুকলেন। রুটির ঝুড়ি পোলাওয়ের ডেগের নিকট রেখে দীর্ঘক্ষণ কিছু পাঠ করার পর ফুঁ দিলেন। এরপর বললেন, মেহমানদের খাবার পরিবেশ করো। খাবার বের করার সময় ডেগের ঢাকনা ওঠাবে না। আমার জন্য একটি চারপায়ী এনে দাও। আমি তা-ই করলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আমরা মেহমানদের খাওয়ানো শুরু করলাম। তিন মাহফিল খাওয়ানো হলো। চতুর্থ মাহফিলে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও শরীক হলেন। আল্লাহর কী অপূর্ব দয়া! মাত্র ৫০ জনের খাবার দ্বারা প্রায় চারশত মেহমান তৃপ্তিসহ খেলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর ভাবলাম, খাদিম যারা রয়ে গেছি তাদের জন্য তো নিশ্চয়ই কোনো খাবার আর বাকী নেই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ঢাকনা উঠিয়ে দেখি আমাদের সবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পোলাও ডেগের মধ্যে রয়ে গেছে। [প্রাগুক্ত]

৫. এক বিস্ময়কর কারামত: মদীনা মুনুওয়ারায় কিবলা দক্ষিণ দিকে। প্রখ্যাত সবুজ গম্বুজটি পূর্ব কোণে অবস্থিত। পশ্চিমদিকে 'বাবুর রাহমাত' সংলগ্ন দেওয়ালের নিকট বসে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারস দিচ্ছেন। সবুজ গম্বুজের জাফরী সামনেই দেখাচ্ছে। দারসে উপস্থিত ছাত্রদের একজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কবর শরীফে জিন্দা আছেন', আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের এই আক্বীদার উপর সন্দেহ করতেন। বার বার তিনি প্রশ্ন করছিলেন। তিনি এটা মানতে সম্পূর্ণ নারাজ। এক পর্যায়ে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে বললেন, তোমারা চোখ বন্ধ করো। ক্ষণকাল পর বললেন, এবার রওজা

মুবারকের দিকে তাকাও। সবাই অবাক! তাদের চোখের সামনে না ছিলো জাফরী কিংবা কোন পর্দা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় স্নিগ্ধ হাসির রেখা। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছু বলতে চাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মুবারক দ্বারা ইশারা করে মানা করলেন। ক্ষণকাল পর সবকিছু পুনরায় স্বাভাবিক হলো। [ঘটনাটি হযরত আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অনেকে বর্ণনা করেছেন]

৬. দু'আর বরকতে ফাঁসির আদেশ রহিত: এ ঘটনার মূল বর্ণনাকারী ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। একদা সবেরমতি জেলে বন্দী থাকাবস্থায় একব্যক্তি হযরতের নিকট ছুটে এসে তাঁর এক সঙ্গীর ফাঁসির হুকুম থেকে বাঁচার জন্য দু'আ চাইলো। তিনি প্রথমে রাগ করলেন। মুনশী মুহাম্মদ নামক এ ব্যক্তির নিকট ফাঁসির হুকুমের আসামী বারবার আবদার করতে লাগলো, তুমি তোমার বাপুকে গিয়ে বলো, আমার জন্য দু'আ করতে। সুতরাং খুব পীড়াপীড়ি করায় হযরত এক পর্যায়ে বললেন, আচ্ছা। তাকে অমুক ওজিফা পাঠ করতে বলুন। দু'তিন দিন কেটে গেল। ফাঁসির আদেশ কার্যকর হওয়ার খুব বেশিদিন বাকী নেই। লোকটি আবার আবদার করলো, যাও! তোমার বাপুকে বলো, আমার জন্য দু'আ করতে। মুনশি সাহেব আবার আসলেন। আবদার করলেন। হযরত এবার বললেন, তাকে গিয়ে বলো সে মুক্ত হয়েছে! কিন্তু আসলে তার মুক্তির কোনো হুকুম আসে নি। দু'এক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকটি ছটফট করতে লাগলো। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলার সময় আসন্ন। কিন্তু আল্লাহর কী কুদরত! ফাঁসি কার্যকর হওয়ার একদিন মাত্র বাকী থাকতে তার আদেশ রহিত হল। লোকটি হযরতের দু'আর বরকতে বেঁচে গেল। [প্রাগুক্ত]

৭. দুরাত্মা যোগির তাসাররুফ থেকে মুক্তি: একব্যক্তি দেওবন্দে এসে হযরতের নিকট আবদার করলো, হুজুর! চৌদ্দ বছর পূর্বে এক কূপ থেকে পানি উত্তোলনকালে এক যোগি আমার নিকট এসে কি যেনো করলো, সেই থেকে আমি তার পেছনে লেগে আছি। তার আকর্ষণ থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছি না। কিন্তু আমি মুসলমান। হযরত একথা শুনে লোকটিকে থাপ্পড় মারলেন! একটি ওজিফা পাঠের

নির্দেশ দিলেন। রাতে ওজিফা পাঠ করে সে ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখে, একটি সিংহ তার উপর হামলা করছে। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একখানা তরবারি হাতে ঐ সিংহের উপর হামলা করে বধ করে দিলেন। সকালে সে এই স্বপ্নের কথা হযরতের কাছে বললো। তিনি বললেন, যাও! এখন তোমার বাড়িতে চলে যাও। [প্রাগুক্ত]

চিরপোকারী বাণী

১. উস্তাদ, পীর, পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে বা যে কেউ হোক না কেন, সবাই সৃষ্ট এবং অস্থায়ী। এদের কেউই মাহবুব হওয়ার উপযুক্ত নয়। মাহবুব হওয়ার উপযুক্ত কেবল আল্লাহ তা'আলা।

২. ওহে ভাই! পৃথিবী কারো সাথে কখনো থাকে নি। কাজেই সৃষ্টিকর্তার সাথে দিল বেঁধে বাছ করে নাও।

৩. কুরআন শরীফের আয়াত:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

এখানে 'الْمَوْت' শব্দটি প্রথমে এবং 'الْحَيَاة' পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, মানুষ যেনো পার্থিব জীবনকে অস্থায়ী মনে করে এবং মৃত্যু সম্পর্কে গাফিল না থাকে।

৪. আল্লাহ তা'আলা সবার আগে তা'লিমের কারখানা সৃষ্টি করেছেন। উপরন্তু:

'وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا'

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন আল্লাহ তা'আলা, আর ছাত্র হলেন আদম আলাইহিস্সালাম।

৫. নফসের ইসলাহের জন্য ইলমে হাদীসের খিদমাতে লেগে থাকা সবচে বড় ওয়াসিলা। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফুয়ুযুল হারামাইন' কিতাবে উল্লেখ করেন:

তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে মুশাহাদা করেছেন। যারা ইলমে হাদীসের খিদমাতে সর্বদা লেগে থাকেন তাঁদের ক্বলব এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মুবারকের মধ্যে একটি নূরানী তারের রেখা জ্বলতে থাকে।

৬. জিকির দুই প্রকার: ১. জিকরে ইস্তিলাহী, ২. জিকরে হাক্বিক্বী। এছাড়া শরীয়তসম্মত সকল আমলই জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। বেচা-কেনাসহ যাবতীয় দুনিয়াবী জরুরত, কাজ-কর্ম শরীয়তের হুকুমের আওতাভুক্ত ও নির্দেশ মুতাবিক হতে হবে। এতে এসব কর্মও জিকিরে পরিগণিত হবে। কারণ, হাক্বিকী জিকির তো শুধু বলা হয়, গাফিলতি দূর করাকে।

৭. তালিবে হক্ব বা তরীকাতপথে উন্নতির আকাঙ্ক্ষির জন্য প্রথম কর্তব্য হলো ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ বা 'মুক্তিপ্রাপ্ত দল' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা মুতাবিক নিজের আক্বাইদের সংশোধন করা। অতঃপর জরুরী মাসাঈল জেনে নিতে হবে। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের চাল-চলন ও কথাবার্তার ইত্তিবা করে চলতে হবে। নফসকে মন্দ স্বভাব ও খারাপ অভ্যাস থেকে পাক-সাফ করা। এসব খারাপ অভ্যাস হলো, লোভ, দীর্ঘ আশা, নাজায়িয রাগ বা ক্রোধ, মিথ্যা, গীবত, কার্পণ্য, পরশ্রীকাতরতা, লোক দেখানো আমল, অহঙ্কার, ঈর্ষা ইত্যাদি। এ সবই নফসের মন্দ স্বভাব ও অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

৮. মানুষের দিল হলো আয়নার মতো। গাইরুল্লাহর চমক থেকে এই আয়নাকে হিফাজতে রাখবেন। সম্মানের মোহে পড়ার গোমরাহী থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট পানাহ চাইবেন।

৯. মুরীদের প্রতি উপদেশ: বাতিনী রোগের ইজমালী চিকিৎসা হলো, বেশী করে আল্লাহর জিকির করা। কুরআন শরীফের মাআনী ও মতলবের মধ্যে গভীর চিন্তা করে তা বুঝার চেষ্টা করা। তিলাওয়াতও বেশী বেশী করবে।

১০. যদি কোনো সুন্দর সুরত সামনে এসে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ধারণা করবে যে, এটাতো নাপাক বীর্য বৈ কিছু নয়। নাপাক রক্তের তৈরী একটি (সুন্দর) মূর্তিবিশেষ। এর শরীরের ভেতর থেকে প্রত্যহ পেশাব-পায়খানার হালতে কয়েক সের নাজাসাত নির্গত হয়। মৃত্যুর পর তার এই সৌন্দর্য আর থাকবে না, ঘৃণ্য, দুর্গন্ধময় পঁচা-গলা বস্তুতে পরিণত হবে। এরূপ ধ্যান করলে মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে।

১১. ফরয নামায যাতে কিছুতেই ছুটে না যায় সেদিকে খিয়াল রাখবে। নামাযে মন লাগুক বা না, সর্বাবস্থায় নামায অবশ্যই পড়তে হবে।

১২. আমলে তাখসীর বা অন্যকে বাধ্য করার আমল যদি থাকতো তবে আমি কেনো এখানে জেলে পড়ে আছি? তাখসীরের সবচে বড় আমল হলো তাক্বওয়াহ।

১৩. জিকির হেতু সালিকের মধ্যে যেসব হালত প্রকাশ হয় তা তরীকতের রাস্তা থেকে দূরে আছে এমন কোনো ব্যক্তির নিকট কখনো ব্যক্ত করা উচিত নয়। নিজের সকল বাতিনী হালত আপন শায়খ অথবা এমন কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবে যিনি তরীকতের রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সালিকের শুভাকাঙ্ক্ষী।

১৪. মাহবুবে হাক্বিকী (আল্লাহ তা'আলা) সব কিছুই জানেন। সবকিছু দেখেন ও শুনেন। কোনো ব্যাপারই তাঁর নিকট গোপন নয়। প্রেম ও ইশকের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আত্মসম্মানী, উঁচুমনা ও নিরাধার। সুতরাং তাঁর সামনে নেহায়েত খুশুখুজু, বিনয় ও পূর্ণাঙ্গ দাসত্বের বিকাশ এবং সায়্যিদুল উশশাক জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কেননা আল্লাহর নিকট মান-সম্মানের প্রত্যাশাও তাঁর নারাজীর কারণ হতে পারে।

১৫. শরীয়তমতো কোনো মানুষ যদি কলিমায়ে তায়্যিবাহ সাচ্চা দিলে পড়ে নেয়, তাহলে শরীয়ত মতে তার ইজমালী ঈমান প্রমাণিত হয়ে যায়। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলমানের ঐকমত্য। যদি কোনো ব্যক্তি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যে সকল ইয়াক্বীন কথাবার্তা, যেমন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বা তাওহীদ ও রিসালাত, ফিরিশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, ক্বিয়ামাত, তাক্বদীর, খতমে নবুওয়াত ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মেনে নেয় এবং সাচ্চা দিলে ইয়াক্বীন ও বিশ্বাস করে তাহলে তার তাফসিলী ঈমানও প্রমাণিত হয়ে যায়। সে ব্যক্তি মুসলমান ও ইসলামের একজন সদস্য বলে গণ্য হবে। আমলের ত্রূটির কারণে তার এই ইসলাম ও ঈমান কখনো বরবাদ হয় না, বা সে কাফির বলে সাব্যস্ত হবে না। তবে ইসলামের জরুরী আমলের মধ্যে ত্রূটি-বিচ্যুতির ফলে সে ব্যক্তি অবশ্যই বে-আমল ও গোনাহগার বলে বিবেচিত হবে। তবে কাফির বলে পরিগণিত হবে না। হ্যাঁ, উল্লেখিত ঈমানী বিষয়গুলোকে যদি অস্বীকার করে বসে, তাহলে অবশ্যই সে কুফুরীর উপযুক্ত হবে।

১৬. মানুষের আমল যে পর্যায়ে হোক না কেনো, তা ছেড়ে দিলে কেউ কখনো কাফির হয় না। মুসলমানী থেকে খারিজ হবে না। কেবল ভণ্ড ফিরকা খাওয়ারিজ ও মুতাযিলারাই এমন কথা বলে যে, 'ফরয আমল তরক করলে অথবা কবীরা গুণাহ করে ফেললে মানুষ মু'মিন থাকে না। তার ঈমান চলে যায়।' এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা নয়।

১৭. ইলম হলো আল্লাহ তা'আলার সবচে বড় সিফাত বা গুণ। এ সিফাতটিকেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিঞ্চিৎ দান করেছেন।

১৮. একজন কামিল মুর্শিদ তাঁর মুরীদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখেন, যেরূপ সম্পর্ক রাখেন মাতা-পিতা তাদের সন্তানের প্রতি। মুরীদের ইসলাহ সাধনে কখনো কখনো শায়খের কষ্টও হয়ে থাকে। যেভাবে বাচ্চার মল-মূত্র পরিষ্কার করতে যেয়ে মাকে কষ্ট পেতে হয়।

১৯. বিনা বাধায় রীতিমতো জিকির করতে থাকুন। নফস ও ক্বলব নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যখনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা হবে তখনই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধ্যান-খিয়াল করে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

২০. তেরো তাসবিহ্র জিকির উচ্চস্বরে ক্বলবের মধ্যে 'জরব' বা ধাক্কা লাগিয়ে করা দরকার। তবে এতো বেশী সরবে করবেন না, যাতে অন্য কারোর ঘুম ভেঙ্গে যায়। পাস-আনফাস (দমের) জিকিরের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। সর্বদাই এই জিকির পড়তে হবে। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, শুয়ে-ঘুমিয়ে সর্বাবস্থায় খেয়ালের মাধ্যমে এই জিকির করতে থাকবেন।

আলহামদুলিল্লাহ! কুতবে আলম হযরত শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও সাধনার উপর এই আলোচনা থেকে আশাকরি আমার উপকৃত হবো। তাঁর সুযোগ্য বহু খলিফার মধ্যে একজন ছিলেন, দীর্ঘ ২৭ বছর সুহবত লাভের সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি ডাক্তার শায়খ আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁরই মাধ্যমে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আরেক বিশিষ্ট শাগরিদ ও ছাত্র, সাধক, যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি, মজযূব ইলাল্লাহ, কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খিলাফত লাভ করেন। আমাদের এই গবেষণামূলক গ্রন্থে আলোচ্য চিশতি সাজারার সর্বশেষ মহাত্মন তিনি। আমরা হযরতের জীবন ও সাধনার উপর বিস্তারিত আলোচনা পাঠকদের উপহার দেবো, ইনশাআল্লাহ। তবে প্রথমে শায়খ আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও সাধনার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করছি।

পরিচ্ছেদ ২

হযরত শায়খ ডাক্তার আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: ১৪ মার্চ ১৯৭২ ঈসায়ী, সমাধি: নূরগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ।)

তিনি ছিলেন কুতবে আলম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দীর্ঘদিনের খাদিম ও 'সেক্রেটারী'। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একনাগাড়ে প্রায় ২৭ বছর স্বীয় মুর্শিদের সুহবতে কাটিয়েছেন। অন্য কেউ এতো দীর্ঘদিন হযরতের সুহবত লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। এই মহাত্মন বুজুর্গের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আজো খুব একটা গবেষণা হয় নি। চিশতি মাশাইখের সাজারা মুবারকে হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তিনিই খিলাফত প্রদান করেছিলেন বলে উল্লেখিত আছে। আমরা অবশ্য এই গ্রন্থের শেষে কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনায় খিলাফত প্রদানের ঘটনা বর্ণনা করবো।

আমাদের জানামতে হযরত নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কোনো জীবনীগ্রন্থ এখনো প্রকাশ হয় নি। সুতরাং অত্যন্ত সীমিত তথ্যসূত্রে যাকিছু জানতে পেরেছি তা-ই এখানে তুলে ধরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অত্র গ্রন্থ লেখার এক পর্যায়ে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্মস্থান হবিগঞ্জ জিলার নবীগঞ্জের নূরগাঁও গিয়েছি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা "জামিয়া ইসলামিয়া রূহুল উলূম নূরগাঁও" এর বর্তমান মুহতামিম, হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ নূরী চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি স্বীয় ওয়ালিদে মুহতারাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনের উপর লিখিত সংক্ষিপ্ত একখানা পুস্তিকা দিলেন। হযরতের জীবন ও কর্মের উপর তথ্য বলতে যা-ই, তা এটুকুই। অবশ্য কিছু কিছু ব্যাপার মৌখিকভাবে অনেকে বর্ণনা করেছেন। এখনও তাঁর অনেক ভক্ত-মুরীদান জীবিত আছেন। আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ করে যাকিছু তথ্য উদ্ধার

করতে পেরেছি তার এক উল্লেখযোগ্য অংশও এখানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি।

বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা

হযরত ড. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্বে হবিগঞ্জের 'মাছলিয়া' গ্রামে জগমোহন গোস্বামী নামক এক সাধক পুরুষ বাস করতেন। তিনি 'গুরু সত্য ও নাম ব্রহ্ম' এর উপর বিশ্বাস রেখে নতুন এক ধর্মমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। রাঢ় দেশ থেকে আগত হবিগঞ্জের 'আগনার করিমপুরে' একটি ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন। হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে উত্তরকালে বৃহত্তর সিলেট বিভাগে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা দ্বীনি তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামপ্রচার শুরু হয়। ফলে সকল শ্রেণীর মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

করিমপুরের ব্রাহ্মণ পরিবারে 'মাখাই ঢাকুর' বা 'মেখাই ঢাকুর' নামে পরিচিত এক প্রভাবশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার আসল নাম ছিলো মহেন্দ্র চৌধুরী। তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং 'হাবীবুল্লাহ খান' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আর এই হাবীবুল্লাহ খানই ছিলেন হযরত ড. আলী আসগর নূরী চৌধুরীর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ।

হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩০১ বাংলায় (১৮৯৮ ঈসায়ী) আজকের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার নূরগাঁও নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো আমিন উদ্দীন চৌধুরী। একটি ধার্মিক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঐতিহ্য মুতাবিক প্রাথমিক শিক্ষা নিজের বাড়িতেই শুরু হয় নূরী সাহেবের। এরপর ১০-১১ বছর বয়সের সময় তাঁকে ভর্তি করা হলো পার্শ্ববর্তী 'সস্থিপুর প্রাইমারী স্কুলে'। মাদ্রাসা শিক্ষার্জন সে যুগে আজকের মতো তেমন সহজ-সাধ্য ছিলো না। সুতরাং ব্রিটিশ আমলের স্কুল-শিক্ষার প্রতিই অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তীতে যিনি হবেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ সাধক, সেই ড. আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও তাঁর

পরিবার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষাশেষে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মৌলভীবাজার সরকারী হাইস্কুলে। তখনকার মেট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর চলে গেলেন নিজের মামার বাড়ি দিরাই উপজেলার কুলঞ্জ গ্রামে।

কুলঞ্জে থাকাকালে তাঁর এক মামা চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর প্রাথমিক অধ্যয়ন করতে তাঁকে আগ্রহী করেন। সেমতে তিনি প্রাথমিক 'ডাক্তারী' কোর্স শেষ করে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ডাক্তার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন সুনামগঞ্জ জেলা শহরে।

উপমহাদেশে 'বৃটিশ খেদাও' আন্দোলনের অংশ হিসাবে **১৯১৯** সনে খেলাফত আন্দোলনের জন্ম হয়। তরুণ যুবক ড. নূরী চৌধুরী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য রাজনীতিতে তিনি আগে থেকেই জড়িত ছিলেন। সুনামগঞ্জের কৃতীসন্তান দেশ-বিখ্যাত বিপ্লবী সাংবাদিক মরহুম ফজলুল হক সেলবর্ষী সাহেবের সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করেন। **১৯৪৭** সালে দেশ-বিভাগ ও বৃটিশদের বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাজনীতির ময়দান ছাড়েন নি। অবশ্য ইতোমধ্যে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি, কুতবে আলম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর একান্ত খাদিম ও সেক্রেটারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আমরা একটু পরই সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি।

খিলাফত আন্দোলন **১৯২৪** সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। **১৯১৯** সনে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনে দেশ-বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গ প্রায় সকলেই জড়িয়ে পড়েন। হযরত আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও চাকুরী ছেড়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনীতিক কারণে সফর করেন। সাক্ষাৎ ঘটে সে যুগের স্বনামধন্য অনেক বিপ্লবী, আন্দোলনমূখর, মুক্তিকামী নেতাদের সঙ্গে।

হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ লাভ

হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নিজ গ্রাম নূরগাঁও-এ (কামারগাঁও) **১৯২১** ঈসায়ীর ২৯-৩০ জানুয়ারী একটি সম্মেলন করেন। পোস্টারে লিখা ছিলো,

"কামারগাঁও সম্মিলনী বিরাট খেলাফত সভা"। আরো লেখা ছিলো, "হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব মিলন"। গ্রামীণ পরিবেশে হলেও এই সম্মেলনে খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বেশ ক'জন নামকরা নেতা অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে আসাম প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী মৌলভী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বি.এল, আঞ্জুমানে উলামা'র সৈয়দ ইয়াওর বখত চৌধুরী, জনশক্তি পরিচালক বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব উকিল, মাওলানা আবদুল হক, মাওলানা আবদুল মুছাওয়ির, ডা. মর্তুজা চৌধুরী এবং শশী মোহন নাগ উকিল প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

কামারগাঁও সম্মেলনের এক বছর পর ১৯২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বৃটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মৌলভীবাজার শহরের মাছবাজারে। এই অনুষ্ঠানে হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী ভাষণ দান করেন। এই বক্তব্যের ফলে সরকার তাঁর উপর ক্ষেপে ওঠে ও গ্রেফতার করে। দীর্ঘ এক বছর কারাগারে বন্দী রেখে তাঁকে নির্যাতন করে। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯২৩ সালে খেলাফতের সংগ্রামী কর্মী হিসাবে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। সেদিকে তুরস্কের উসমানী খেলাফত ধ্বংসের আলামত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে খেলাফত আন্দোলনেজড়িত সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়। হযরত আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও মুক্তিলাভ করেন।

আমরা ইতোমধ্যে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনাকালে বলেছি, ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি সিলেট শহরের মানিক পীরের টিলার বিপরীতে 'খেলাফত বিল্ডিংয়ে' এসে দারস শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ ৫ বছর পর্যন্ত তিনি ইলমে ওহির নূর দ্বারা সিলেটভূমি আলোকিত করেছেন। এসময় হযরতের ভাবী বেশ ক'জন খলিফা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন। ডা. আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও শাইখুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। নিজের রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করার পর হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মায়ার দৃষ্টি তাঁর প্রতি পতিত হয়। ১৯২৮ সালে দেওবন্দে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদানের সময় শাইখুল

ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডা. নূরী সাহেবকে সাথে নিয়ে যান। এরপর দু'বার নিজ গ্রাম নূরগাঁওয়ে শাইখুল ইসলামকে দাওয়াত করে নেন। আমরা হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনায় উল্লেখ করেছি, নিজস্ব বাড়িতে নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জেগানা মসজিদের কথা। স্বীয় পীরের প্রতি ভক্তির এক অপূর্ব নিদর্শন এই মসজিদটি। হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নূরগাঁও সফরকালে এই মসজিদের স্থানে নামায আদায় করেছিলেন।

এক সূত্রে জানা গেছে, ১৯৪০ সালে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দোহালিয়ার চৌধুরী গোষ্ঠির হাতী চড়ে বানিয়াচংয়ের উসমান রাজার বাড়ি থেকে সৈয়দপুর গমন করেন। এটা ছিলো সুনামগঞ্জ জিলার জগন্নাথপুর উপজিলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম সৈয়দপুরে তাঁর দ্বিতীয় বারের সফর। এই সফরের সময় সৈয়দপুর গমনের পথে তখনকার কামারগাঁও গ্রামেও যাত্রাবিরতি করেন বলে উক্ত সূত্রে উল্লেখ আছে। কুতবে আলমের এই সফরকালে তাঁর সফরসঙ্গী হিসাবে নূরী সাহেবও ছিলেন। আর এ কারণেই কামারগাঁওয়ে যাত্রাবিরতি করেন। (সূত্র: সৈয়দ ওহিদ উদ্দীন আহমদ প্রণিত, “সৈয়দপুরের কিছু কথা”, মে ২০১২ ঈসায়ী, পৃ: ১০-১১)

উক্ত সূত্রে আরো জানা যায়, হযরত কুতবে আলম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৩৩ সালে প্রথমবারের মতো সৈয়দপুর গ্রামে আসেন। তাঁকে উসমানী নগরের গোয়ালা বাজার থেকে পাল্কিযোগে সৈয়দপুরের ঐতিহ্যবাহী বড় বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সম্ভবত এ সময়ই তিনি প্রথমবারের মতো কামারগাঁও পদার্পন করে থাকবেন। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, ড. নূরী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দু'বার তাঁর বাড়িতে দাওয়াত করে এনেছিলেন। কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সৈয়দপুরে সর্বশেষ সফর করেন ১৯৪৬ সালের হেমন্তে। এসময় তিনি জিপযোগে প্রথমে জগন্নাথপুর থানা শহরে আসেন। এখান থেকে তাঁকে পাল্কি দিয়ে সৈয়দপুরের বড় বাড়িতে নেওয়া হয়। (সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ: ১০-১১)

যা হোক, একান্ত ভক্ত, শাগরিদ, খাদিম ও রাজনীতিক সহযোগী হিসাবে হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাইখুল ইসলামের সঙ্গে দেওবন্দে থেকে যান। সেই থেকে দীর্ঘ ২৭ বছরব্যাপী একনাগাড়ে স্বীয় পীরের সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো থেকেছেন। সফর করেছেন পুরো ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র। উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট নূরী সাহেব যে বাংলাদেশের সন্তান তা অনেকে জানতেনই না। সবার নিকট তিনি শাইখুল ইসলামের 'সেক্রেটারী' হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ডা. নূরী চৌধুরী সাহেবকে একদা শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "তুমি আমাকে ইংরেজি শেখাবে আর আমি তোমাকে শেখাবো আরবি, কেমন?"। তবে ভাষাশিক্ষা ও রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই এই অপূর্ব সম্পর্ক সীমিত ছিলো না। পীর হিসাবে ইলমে তাসাওউফ তথা মা'রিফাতের গভীর জলে নিমজ্জিত হতে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে সর্বাধিক বেশী তাওয়াজ্জুহ প্রদান করেছিলেন। ফানা ফিশ্-শাইখের মাক্বামে থাকাকালে তিনি স্বীয় পীরের সুহবত থেকে বঞ্চিত থাকতে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। দীর্ঘদিনের মধ্যে তিনি নিজের বাড়িতে পর্যন্ত আসেন নি। গ্রামের মানুষ জানতেনই না, তিনি জীবিত আছেন, না মৃত। দীর্ঘদিন হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে থেকে মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করার পর এক পর্যায়ে তিনি তরীকতের খিলাফত লাভে ধন্য হন।

দেশে প্রত্যাবর্তন

দেশ বিভাগের পরও হযরত আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পীরের সুহবত থেকে বঞ্চিত হতে চান নি। অবশ্য শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন রাজনীতির মাঠ থেকে অনেকটা সরে পড়েছিলেন। তবে তাঁর দীনি-ইসলাহী সফর সর্বত্র অব্যাহত ছিলো। নূরী সাহেব পারতপক্ষে তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। এভাবে ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে হযরত শাইখুল ইসলামের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বীয় পীরের সঙ্গ ছাড়েন নি।

হযরত ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেশে প্রত্যাবর্তন করে বাকী জীবন দ্বীনি খিদমাত ও সাধনায় কাটিয়েছেন। অনেক মানুষ তাঁর হাতে

বাইআত গ্রহণ করে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। প্রায় ৫৫ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে তিনি প্রথম বিবাহ করেন কলকাতায়।

নূরগাঁও অঞ্চলের মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিজের বাড়িতে হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঈসায়ী ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দ্বীনি মাদ্রাসাটি এখনও পর্যন্ত ইলমে ওহির শিক্ষা ও প্রসারে খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

মা'রিফাতের উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত

নিজের বাড়িতে অবস্থানকালে এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। অনেকে সুলুকের উচ্চতর মাক্বামে হযরতের ওয়াসিলায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর জিকিরের হালত ছিলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের। একজন ভক্ত মুরীদ বলেন, কোনো কোনো সময় দেখা যেতো গভীর রাতে আমাদের বাড়িতে এসে তিনি হাজির হয়েছেন। উঠোনে সজোরে জিকির করছেন। জিকিরের শব্দে পুরো গ্রাম প্রকম্পিত হয়ে ওঠছে। জিকিরের সময় তাঁর সমগ্র দেহে নূরের প্রবাহ বইতো। পার্শ্ববর্তী এলাকা আলোকিত হয়ে ওঠতো। হযরতের সুপ্রসিদ্ধ খলিফা কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, "জিকির করার সময় হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শরীর থেকে চতুর্দিকে নূর ছড়িয়ে পড়তো।" অনেক সময় তাঁকে 'মযজূব' অবস্থায় দেখা যেতো।

জিকিরের অবস্থা দেখে একব্যক্তি মুরীদ হলেন: জগন্নাথপুর থানার কুবাজপুরের মরহুম শাহ মুহাম্মদ চৌধুরী কেনো নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করে মুরীদ হয়েছিলেন তার বর্ণনা স্বজনদের নিকট ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি বলেন, হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের বাড়িতে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে প্রায়ই আসতেন। তিনি সর্বদা জিকির করতেন। দেখা যেতো প্রায়ই বিভিন্ন সুরে 'জিকিরে জলি' [সশব্দে জিকির] করছেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে বিভিন্ন ধররের

আওয়াজ বেরিয়ে আসতো। আমি কৌতুহলী হয়ে জিকির শ্রবণ করতাম ও ভাবতাম, তিনি কেনো এভাবে জিকির করেন?

একরাতে তাহাজ্জুদের নামায শেষে অন্ধকার একটি কক্ষে বসে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিকির করছিলেন। আমি কক্ষের ভেরত দৃষ্টিপাত করে অবাক হলাম। লক্ষ্য করলাম হযরতের সমস্ত শরীর নূরে নূরে আলোকিত হয়ে ওঠেছে। এ আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কক্ষটিকে নূরান্বিত করে তুলেছে। বুঝতে পারলাম, হযরত কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই বিশিষ্ট খলিফা খুব উঁচু পর্যায়ের ওলি। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম ও মুরীদ হলাম।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন একটি ঘটনা: একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক পর্যায়ে জগন্নাথপুর উপজিলার কুশিয়ারা-তীরের ঐতিহ্যবাহী রাণীগঞ্জ বাজারে অগ্নি সংযোজন ও বিরাট হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখনো জীবিত। ঘটনার দিন তিনি নিজের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কোনো কারণ ছাড়াই হযরত উঠোনের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী শুরু করলেন। তাঁকে ভীষণ চিন্তাযুক্ত ও পেরেশান দেখা গেল। এরপর এদিন রাতেই রাণীগঞ্জ বাজারের অগ্নিকাণ্ড ও গণহত্যার ঘটনা ঘটে। হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক ভাতিজা ঘটনার সময় রাণীগঞ্জ বাজারে ছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েও তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

একটি কারামত

হযরত নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক আত্মীয়া ও মুরীদা অত্যাশ্চর্য এক কারামতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদা কোনো এক ব্যক্তি অতি অল্প কিছু হালুয়া [তুশা] শিরনী হযরতের সম্মুখে নিয়ে আসলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনেক লোক। এই অল্প হালুয়া সবাইকে পরিবেশন সম্ভব নয় ভেবে লোকটি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "সব তুশা শিরনীকে বরই বিচির মতো করে ছোট ছোট বলে পরিণত করো।" লোকটি তাই করলেন।

এরপর বললেন, "সবার হাতে একেকটি বল দাও।" সবার হতে এই অত্যল্প হালুয়া দেওয়ার পর তিনি বললেন, "আপনারা সকলে এক হাতের তালুতে এই বলটি নিয়ে অপর হাত দ্বারা ঢেকে দিন।" সবাই তা-ই করলেন। ক্ষণকাল পর বললেন, "এবার হালুয়া ভক্ষণ করুন!" সুবহানাল্লাহ! সবাই দেখলেন প্রতিটি বল বেশ বড় হয়ে হাত ভরে গেছে!

একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী মাওলানা শফিকুর রহমান সাহেব থেকে বর্ণনা করেন, "একদা কোনো এক বাড়িতে তাঁকে রাতের খাওয়ার জন্য দাওয়াত করা হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে ভুলে যান ও নিজের বাড়িতেই খাওয়া শেষে ঘুমের কক্ষে চলে গেলেন। এরপর হঠাৎ স্মরণ হওয়ায় কাউকে না বলেই সে বাড়িতে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর কিছুটা খেয়ে রাতে থেকে যান। তিনি পরদিন যখন বাড়িতে ফিরে আসলেন, পরিবারের সকলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথায় থেকে আসলেন?' তিনি বললেন 'অমুকের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি'। তারা সকলে আরো অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আমরা তো পরিষ্কার শুনেছি, আপনি গতরাতে তাহাজ্জুদের সময় সজোরে জিকির করছেন!"

নামাযের হালত: হযরতের এক মুরীদাহ ও আত্মীয়া বর্ণনা করেন, একদিন হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি যুহরের নামাযে দাঁড়ালেন। আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর সমগ্র শরীর [আল্লাহর ভয়ে] কম্পন করছে।

ইন্তিকাল

জীবনের শেষ একদিন আসেই- এটা মহাসত্য। তবে নৈকট্যশীল আল্লাহর বান্দারা পৃথিবীর মাটি থেকে বিদায় গ্রহণ করলে সমগ্র সৃষ্টিই আক্ষেপ-বিলাপ করে। এরা হচ্ছেন জগতের জন্য আশীর্বাদ। অসংখ্য মানুষ ও জিনজাতি আল্লাহর ওলিদের

সুহবত ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁদের ইহলৌকিক জীবনাবসান আর আমাদের মতো অধমদের মৃত্যু একই জিনিস কখনো নয়। তাঁদের মৃত্যু মানে বিরাট ক্ষয়। কিন্তু এই মৃত্যুর মাধ্যমেই তাঁরা স্বীয় মাহবুবের দরবারে চলে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। প্রেমিক প্রেমাস্পদের সঙ্গে চিরকাঙ্ক্ষিত মিলনের সুযোগ পান।

যুগের শায়খ হযরত ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দরবেশীর মধ্যে শেষ জীবন কাটিয়ে ১৯৭২ ঈসায়ীর ১৪ মার্চ ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাঁর মৃত্যুতে অসংখ্য ভক্ত-মুরীদান ও শুভাকাঙ্ক্ষী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। মৃত্যুকালে হযরতের বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৪ বছর। নূরগাঁও নিজের বাড়িতে তিনি সমাহিত আছেন।

মৃত্যুকালীন অবস্থা

হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা হোসাইন আহমদ নূরী চৌধুরী বর্ণনা করেন, ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্ব থেকেই তিনি বলতে থাকেন, আমার নামাযে জানাযা শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা আমীরে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পড়াবেন। অথচ সে যুগে নূরগাঁও থেকে বরুণা খবর পৌঁছানো সহজ ছিলো না। তবে আল্লাহ তাঁর প্রিয়জনদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে থাকেন। হযরত নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই শেষ ইচ্ছাও পূরণ হলো।

তাঁর ইন্তিকালের দিন কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা জগন্নাথপুরের কাতিয়ায় বার্ষিক জলসা ছিলো। এতে প্রধান ওয়ায়িজ হিসাবে উপস্থিত হন হযরত বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর কাতিয়া থেকে নূরগাঁও খুব একটা দূরে নয়। সুতরাং শায়খ আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামাযে জানাযায় ইমামতি করলেন বরুণার শায়খ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এতে উপস্থিত হন জলসায় আগত হাজার হাজার

মানুষ। আমরা এই মহাত্মন সাধকের মাক্বামাতকে আরো বুলন্দ করার জন্য মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু'আ করি।

হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মোট ক'জন খলিফা রেখে গিয়েছেন তার সঠিক হিসাব আমাদের জানা নেই। তবে তাঁরই মাধ্যমে কুতবে আলম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট শাগরিদ, শিষ্য ও ছাত্র কুতবেযামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে তরীকতের খিলাফত লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং আমরা এখন হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও হালতের উপর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরছি। চিশতি তরীকার সাজারা মুবারকের শাইখুল মাশাইখের জীবন ও সাধনার উপর রচিত এই দীর্ঘদিনের গবেষণামূলক গ্রন্থেরও সমাপ্তি হবে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনালোচনার মাধ্যমে। অবশ্য কয়েকটি পরিশিষ্টে আমরা চিশতিয়া তরীকা এবং তাসাওউফের উপর অতিরিক্ত তথ্যাদি তুলে ধরেছি সুহৃদ পাঠকদের সুবিধার্থে। আমরা আশা করি এতে সকলে উপকৃত হবেন।

পরিচ্ছেদ ৩

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(ওফাত: শুক্রবার জুমু'আতুল বিদা, ৩০ রামাদ্বান ১৪৩১ হিজরি, ২৬ ভাদ্র ১৪১৭ বাংলা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী, সমাধি: কাতিয়া মাদ্রাসা মাঠ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ)

তিনি ছিলেন এ যুগের 'মজযূব ইলাল্লাহ', দীর্ঘ জীবনের অধিকারী এক অনন্যসাধারণ ওলিআল্লাহ। তাঁর সুহবত ও সঙ্গলাভ ছিলো সৌভাগ্যের কারণ। কুতবে যামান হযরত মাওলানা শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাদানী পাগল' হিসাব সুপরিচিত ছিলেন। এই মহাত্মনের জীবন ও সাধনার উপর 'কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. জীবন ও সাধনা' শিরোনামে একটি গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশ হয়েছে। যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত বইটিতে বিভিন্ন গুণিজনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠার প্রথম অংশে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্মের উপর তথ্যভিত্তিত বর্ণনা এসেছে। এ অংশের লেখক আমি অধম।

'আওলিয়ায়ে চিশত' শিরোমানের এ গ্রন্থটি মূলত হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও হালতের ওপর আলোচনা পর্যন্ত সীমিত। এ বর্ণনা শেষে গ্রন্থের সমাপ্তি হবে। উপরোক্ত গ্রন্থের মূল 'জীবন ও সাধনা' অংশই হচ্ছে নিম্নোক্ত বর্ণনার সকল তথ্যসূত্র। অবশ্য এক'দুটো বর্ণানাও আছে যেগুলো উক্ত গ্রন্থে নেই। ইতোমধ্যে যাঁরা 'জীবন ও সাধনা' গ্রন্থটি পাঠ করেছেন তাদের নিকট পুরো লেখাটি পরিচিত বা আগেই শ্রবণ করেছেন বলে মনে হবে। আর এর কারণ তো জেনেই নিলেন। আমি আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করে শুরু করছি আমার প্রিয় শায়খের দীর্ঘ জীবনের উপর আলোচনা।

বংশ পরিচয় ও জন্ম

সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলাধীন জগন্নাথপুর উপজেলার 'পাইলগাঁও' ইউনিয়নের একটি ঐতিহ্যবাহী পুরাতন গ্রাম হলো 'কাতিয়া'। গ্রামটি সিলেট বিভাগের প্রধান একটি নদী 'কুশিয়ারার' উত্তর তীরে অবস্থিত। কিছুদিন পূর্বে স্থাপিত 'বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড' কাতিয়া গ্রাম থেকে মাত্র মাইল খানেক দক্ষিণে কুশিয়ারা নদীর অপরপারে হবিগঞ্জ জেলাধীন নবীগঞ্জে অবস্থিত। কারো করো মতে এই গ্রামে আজ থেকে অন্তত তিন শতাধিক বছর পূর্বে এ অঞ্চলে হযরতের পূর্বপুরুষরা বসতি স্থাপন করেন।

শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশের উপাধি হলো 'শেখ বংশ'। যেটুকু তথ্য উদ্ধার করেছি, তা থেকে এটা বলা যায়, 'শেখ বংশ' যেসব গোষ্ঠির উপাধি ছিলো তারা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। কেউ কেউ বলেন, আরবি শায়খ শব্দ থেকে এ শব্দটির উৎপত্তি। আগের যুগে আরবি-ফারসির ব্যবহার খুব প্রচলিত ছিলো। যারাই ধার্মিক-পরহেজগারীতে অগ্রগামী, পীর-মাশাইখ এবং আলিম-উলামা ছিলেন তাদেরকে শায়খ বা শেখ বলে সম্বোধন করতেন সাধারণ মানুষ। পরে অবশ্যই এই খেতাবটি বংশের পরিচিতি বহন করে এবং জায়গা-জমি ও তা'লুকে তা লিপিবদ্ধ হয়। হযরতের পুরাতন দলিল-দস্তাবেজে সবার নামের পূর্বে 'শেখ' শব্দটি লিখা আছে। অনেকে এটাও বলেছেন, 'আরব উপদ্বীপ থেকে আগত মুসলমানরা' শেখ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সুতরাং এদের মতে, হযরত শায়খে কাতিয়ার পূর্বপুরুষরা আরবের কোনো অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয়।

আমি (লেখক) ও হযরতের খলীফা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (দা.বা.) গত ৬-১০-১১ তারিখে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বপুরুষদের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য কাতিয়া গ্রামে যাই। গ্রামের এক বয়োবৃদ্ধ মুরুব্বি হাজী জহিরুল্লাহ সাহেব। আমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি জানালেন, কাতিয়া গ্রামের মোট তা'লুক (তালুকদারী) চারটি নামে। এগুলো হলো: ১. শেখ ফিদাই, ২. ইসমত নসর, ৩. শেখ বখতিয়ার ও ৪. শেখ হাজারী। প্রথমটি তথা শেখ

(ফিদাউর রহমান) ফিদাই তা'ল্লুকের বংশধর হলেন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ঈসায়ী ১৯১৪ সালের কোনো এক শুভলগ্নে যুগের কুতুব হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত 'কাতিয়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো, শেখ কনাই, দাদার নাম শেখ (উইদাউর রহমান) বিদাই এবং পরদাদার নাম শেখ (ফিদাউর রহমান) ফিদাই। হযরতের মাতার নাম ছিলো ফাতিমা বেগম। তিনি মরিয়ম ও হাজেরা নামেও পরিচিত ছিলেন। হযরতের মামার বাড়ি কাতিয়ার নিকটে 'জালালপুর' নামক গ্রামে। অতি অল্প বয়সের সময়ই তিনি তাঁর মাতাকে হারান। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বলেছেন, "আমার কিছুই মনে নেই। পরে অনেকে বলেছেন, আমার বয়স যখন মাত্র ২ কিংবা একটু বেশী, তখন আমাদের গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হলো। আমার আম্মা ও আমি কলেরায় আক্রান্ত হলাম। আম্মা সন্ধ্যেবেলা পুকুরে গিয়ে গোসল করে, ভেজা কাপড়ে সিজদায় পড়ে গেলেন। আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানালেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিয়ে যান, কিন্তু আমার আমীনুদ্দীনকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন'। আম্মার এই আবেদন আল্লাহ কবুল করলেন। তিনি মারা গেলেন এবং আমি সুস্থ হয়ে ওঠলাম।"

প্রাথমিক শিক্ষা

মাতাকে হারিয়ে শিশু আমীনুদ্দীন সৎ মাতার কোলে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। অল্প বয়সেই তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের নির্দেশে নিজেদের জমি-জমা চাষাবাদে লাগতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এতে তাঁর মন বসলো না। অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েও তিনি বার বার স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়ার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন।

অবশেষে প্রায় ৭ বছর বয়সে নিকটাত্মীয়ের পল্লীগাঁ জগন্নাথপুর উপজেলার ২ নং ইউনিয়ন সদর পাঠলী গ্রামে স্থাপিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি বছর তিনেক পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পাঠলী গ্রমের প্রাইমারী স্কুলে

মাওলানা আলাউদ্দীন শ্রীরামসী রাহ. শিক্ষকতা করতেন। দেওবন্দ ফারিগ এই আলীমের বাড়ি জগন্নাথপুর থানাধীন শ্রীরামসী গ্রামে। তিনিই ছিলেন হযরত কুতবে যামানের প্রথম শিক্ষক। হযরত যখন উচ্চতর লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে দেওবন্দে অবস্থান করছিলেন, তখন এই বুজুর্গ ইন্তিকাল করেন।

হযরতের গ্রামের বাড়ির অদূরে কুশিয়ারা নদীর অপরপারে ফেসির বাজারের বিপরীতে অবস্থিত দিঘলবাক গ্রামে ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিউ স্কীম' স্কুল। পাঠলী গ্রামে তিন বছর পর্যন্ত লেখাপড়া শেষে তিনি এখানে চলে আসেন এবং আরো তিন বছর লেখাপড়া করে পাঠশালা পাশ করেন।

এ সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো, তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রাণপুরুষ মুর্শিদ ও উস্তাদ কুতবে আলম হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ। হযরত নিজেই বলেন, "এ সময় আমি নিউ স্কীমে লেখাপড়া করছিলাম। আমার বয়স তখন ১০-১১ বছর হবে। একদা রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত কুতবে আলমের সুহবতে আছি। তিনি আমাকে কুরআন শরীফের দারস দিচ্ছেন। এরূপ স্বপ্ন দেখে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠলাম। এরপর শুনলাম মানিক পীরের টিলার বিপরীতে খেলাফত বিল্ডিংয়ে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবস্থান করছেন। তাই ছুটে গেলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়। এটাই ছিলো হযরতের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।"

আমরা ইতোমধ্যে একাধিকবার এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি, কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে সিলেট আগমন করেন। এ হিসাবে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্ভবত তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাতে যান তখন ১৯২৫ সালের কোনো এক সময় হবে। আর এ বছর ১০-১১ বছরের কিশোর ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় তিনি ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে আল্লাহ তাআ'লাই এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত।

নিউ স্কীম স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ বেড়ে গেল। সুতরাং প্রথমে তাঁকে সিলেট সদর উপজেলাধীন উসমানীনগর থানার

ইছামতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে খলীফায়ে শায়খে বরুণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত মাওলানা আবদুর রব শায়খে ইছামতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (এ লেখককে) বলেছেন, "হযরত শায়খে কাতিয়া যখন এ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন তখন আমি তাঁর সহপাঠী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি।" তবে এখানে তিনি বেশীদিন ছিলেন না। আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে তাঁকে ভর্তি করা হলো সিলেট শহরের অদূরে গোলাপগঞ্জের বাঘা মাদ্রাসায়।

বাঘা মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন প্রখ্যাত ওলিআল্লাহ, হযরত কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা হযরত মাওলানা বশির আহমদ শায়খে বাঘা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এখানে বেশ কয়েক বছর লেখাপড়া করেন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৯২৮ ঈসায়ী কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দে গমনের পর থেকে প্রায় প্রতি বছর সিলেটবাসী ভক্ত-মুরীদানের অনুরোধে পবিত্র রমজান মাসে তিনি নয়াসড়ক 'মাদানী মসজিদে' এসে ই'তিক্বাফ পালন করতেন। সিলেট শহরসহ আশপাশ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকেও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে ই'তিক্বাফে যোগ দিতেন। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাঘা থাকাকালে সর্বদা এসে তাঁর ভবিষ্যৎ তরীকতের মুর্শিদ ও উস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এসব সাক্ষাতের বিভিন্ন বর্ণনা তিনি নিজেই বলতেন। অধম লেখক নয়াসড়ক মসজিদে হযরতের সর্বশেষ ই'তিক্বাফে যোগ দিয়েছিলাম। এসময় তিনি কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে একটি ব্যাপার আমাদেরকে বললেন। এটি এখানে তুলে ধরছি।

সেদিন ছিলো ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী। আসরের নামাযের পূর্বে আমি নয়াসড়ক মসজিদে ই'তিক্বাফের নিয়তে এসে উপস্থিত হলাম। নামায শেষে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্য থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিছানা হিসাবে ছিলো একখানা খাট। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হঠাৎ রাগের সুরে বললেন, "এই পালঙ্ক কে এনেছে? কুতবে আলম (মাদানী রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি) ঠিক এখানে ই'তিক্বাফ করেছেন। আমি দেখেছি তাঁর বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরী। বালিশও ছিলো চামড়ার। আমি কোন্ সাহসে পালঙ্কে ঘুমিয়ে ই'তিক্বাফ করবো?" হযরতের এরূপ তেজোদ্দীপ্ত কথা শুনে সংশ্লিষ্টরা তাড়াহুড়ো করে পালঙ্কটি সরিয়ে ফেললেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে গমন

ঈসায়ী ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ সঙ্গত কারণেই বিদেশী ছাত্রদের মাদ্রাসায় অবস্থান সমীচিন মনে করেন নি। তাই সকল বিদেশী ও দূর-দূরান্তের ছাত্রকে যারতার দেশ ও বাড়িতে ফেরৎ পাঠানো হয়। (তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ - বঙ্গানুবাদ) সুতরাং ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তখনকার পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ থেকে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার্জনের প্রধান কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে অনেক ছাত্র গমন করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। তবে ঈসায়ী ১৯৪৩ সাল নাগাত অনেকেই দেওবন্দে গমনের সুযোগ পান। সেমতে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাঘা কওমী মাদ্রাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মাদ্রাসাশিক্ষা সমাপ্ত করে হযরত শায়খে বাঘা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরামর্শে দেওবন্দ গমন করেন উচ্চতর শিক্ষার্জনের আশায়। এসময় তাঁর সহপাঠী হিসাবে দেওবন্দে লেখাপড়ার জন্য গিয়েছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। কিছু কিছু সূত্রে জানা গেছে, হযরত মাওলানা বশির আহমদ শায়খে বাঘা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই তাঁদেরকে নিয়ে দেওবন্দ যান। স্বীয় মুর্শিদ কুতবে আলম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট উভয়কে সোপর্দ করেন।

হযরত কুতবে আলমের হাতে বাইআত গ্রহণ

দেওবন্দে এসেই কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তিনি

পারতপক্ষে মুর্শিদের সুহবত থেকে বঞ্চিত হতেন না। শীঘ্রই তিনি 'ফানাফিশ-শায়খ'র মাক্বামে উপনীত হন। এসময় থেকেই তিনি 'মাদানী পাগল' উপাধিতে ভূষিত হন। পীরের সুযোগ-সুবিধা, সুহবত, খিদমাত ইত্যাদি ছিলো তাঁর নিত্যদিনের চিন্তা-চেতনার মূল। তিনি একবার আমাকে (লেখককে) বললেন, "আমি দেওবন্দে লেখাপড়া করি নি! কুতবে আলমের খিদমাত করেছি- পা টিপিয়েছি, জুতা বহন করেছি। তাঁর সুনজর আমার উপর পতিত হয়েছিল। খুব মুহাব্বত করতেন।" আমি বললাম, "হযরত! এরপরও আপনি বিদায় ক্ষণে দু'টি পাগড়ি লাভ করেছিলেন। ঠিক না?" বললেন, "হ্যাঁ, একটা ছিলো দাওরায়ে হাদীসের ফজিলতের আর আরেকটি ছিলো, আমি কোনদিন ক্লাস বর্জন করি নি।"

দেওবন্দে থাকাকালীন হালত

দারুল উলূম দেওবন্দে থাকাকালে হযরতের হালতের নমুনা হিসাবে অনেক ঘটনা শুনা যায়। গোলাপগঞ্জের রাণাপিং মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহতামিম ও ঠিকরপাড়া মাদ্রাসার বর্তমান মুহতামিম কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ হযরত মাওলানা শায়খ সিকান্দার আলী (টিলার হুজুর) বর্ণনা করেন, "তখন হযরত শায়খে কাতিয়া 'মজযূব' অবস্থায় ছিলেন। দেখা গেল তিনি ঝুড়িভর্তি মাটি নিয়ে এক উস্তাদের দরজায় রেখে দিলেন। ঢেলা কুলুফ ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে তিনি এমনটি করেন। সম্ভবত ঐ উস্তাদ সাহেব মাটির ঢেলা কুলুফের প্রতি তেমন আগ্রহশীল ছিলেন না।"

খলীফায়ে কুতবে আলম মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল মু'মিন শায়খে ইমামবাড়ি দামাত বারাকাতুহুম বর্ণনা করেন, "হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন দেওবন্দে লেখাপড়া করেন আমিও তখন সেখানে ছিলাম। একদা কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারস দিচ্ছিলেন। দেখা গেলো শায়খে কাতিয়া উন্নতমানের এক টুকরো কম্বল নিয়ে এসেছেন। তিনি মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বসার স্থানে তা বিছিয়ে দিলেন। এই কম্বলটি লন্ডন থেকে তাঁর এক ভাই পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা ছিড়ে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য উস্তাদদেরকে দিয়ে দিলেন।"

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন দেওবন্দে লেখাপড়া করেন তখন মুহতামিম হিসাবে দায়িত্বশীল ছিলেন হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৮৯৭-১৯৮৩ ঈ)। স্বভাবতই উচ্চতর দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে মুহতামিম সাহেবের বিছানাপত্র উন্নতমানের ছিলো। সে তুলনায় উস্তাদদের বিছানাপত্র অনেকটা নিম্নমানের- তা-ই নিয়ম। কিন্তু যুবক হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটাও মানলেন না। তিনি দাবী তুললেন, মুহতামিম সাহেবের বিছানা আর প্রধান শিক্ষকের (অর্থাৎ কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির) বিছানায় পার্থক্য থাকবে কেনো? সুতরাং তাঁর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কুতবে আলমের বিছানা উন্নতমানের করা হলো।

অপর আরেক দিনের ঘটনা। হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোথাও সফরে যাবেন। হযরত শায়খে কাতিয়ার ইচ্ছা ছিলো খাদিম হিসাবে স্বীয় উস্তাদ ও মুর্শিদের সফরসঙ্গী হওয়া। কিছুটা বৃষ্টি হচ্ছিলো। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাতা ছাড়াই গাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত শায়খে কাতিয়া একটি ছাতা নিয়ে ছুটে গেলেন তাঁর নিকট। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “বছরের প্রথম বৃষ্টি গায়ে পড়া সুন্নাত”। হযরত শায়খে কাতিয়া জবাব দিলেন, “তা-তো কয়েক ফোটা বৃষ্টি ইতোমধ্যে আপনার গায়ে পড়ে গেছে- সুন্নাত আদায় হয়ে গেছে!” এরপর গাড়িতে ওঠার সময় আবদার করলেন, হযরত! ইচ্ছে ছিলো আপনার খাদিম হিসাবে সফরসঙ্গী হবো। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “না, না! তুমি মাদ্রাসায় থেকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হও।” শায়খে কাতিয়া মানলেন না। সঙ্গী হওয়ার জন্য বার বার আবদার করলেন। এক পর্যায়ে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “উস্তাদের নির্দেশ না মানা বে-আদবী!” শায়খে কাতিয়া বললেন, “সকল ক্ষেত্রে নয়!”। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “দলিল?” যুবক শায়খে কাতিয়া বললেন, “হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, নামায পড়াও! কিন্তু তিনি পড়ান নি!” মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “চলো- আমার সঙ্গে!”

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা হযরত মাওলানা মুহিবুর রহমান ফেসি সেওড়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "বৃহত্তর সিলেটের তালবারা দারুল উলূম দেওবন্দের ২৪ নং দ্বারে জাদীদ নামক একটি ভবনে থাকতেন। হযরত শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভায়রা-ভাই হযরত মাওলানা আপ্তাব উদ্দীন বর্ণনা করেন, 'আমরা দেখতাম প্রত্যহ বাদ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আদতে শরীফা ছিলো, পুরো মাদ্রাসার কক্ষগুলো ঘুরে দেখা। তবে সব সময় তিনি পরিদর্শন শেষে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সীটে যেয়ে বসতেন।' তিনি আরো বলেন, 'এ দৃশ্য দেখে আমরা ভাবতাম, মাওলানা আমীনুদ্দীনের সীটে বসার মধ্যে নিশ্চয় কোনো একটা বড় কারণ আছে, কিছু একটা আছে'।"

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই সহপাঠী ছাত্রদেরকে তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে ওঠাতেন। অনেকে বলেন, তিনি গভীর রাতে পা টিপে তালবাদের সজাগ করে বলতেন, ওঠো! ওঠো! তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। বর্ণিত আছে, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০ বছর বয়সে নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা শুরু করেন। যারা তাঁর সঙ্গে সফর করেছেন তাদের প্রায় সকলেই বলেছেন, মুসাফির অবস্থায়ও তিনি তাহাজ্জুদের নামায ছাড়তেন না। কোনো বিশেষ কারণবশত ছুটে গেলে কাজা আদায় করতেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বিদায়

দীর্ঘ ৭ বছর একনাগাড়ে দারুল উলূম দেওবন্দে থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ঈসায়ী ১৯৫০ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবে 'মাদানী পাগল' শায়খে কাতিয়া প্রথমে আসতে রাজী ছিলেন না। নিজের উস্তাদ ও পীরকে রেখে তিনি কোথাও যাবেন না। অবশেষে তিনি হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে শর্ত দিলেন, "আপনার পাগড়ি, লাঠি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সবকিছু আমাকে উপহার দিন!" হযরত মাদানী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাজী হয়ে গেলেন। হযরত শায়খে কাতিয়ার সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উভয়কে নিয়ে আসলেন রেল স্টেশনে। বিদায় ক্ষণে শায়খে কাতিয়া আবেগ-আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরলেন মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে। ট্রেন ছাড়ার সময় হলো। তিনি কিছুতেই ট্রেনে আরোহণ করতে চান না। মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই ট্রেনে ওঠে কয়েকটি স্টেশন দূর পর্যন্ত সাথে যাবেন বললেন।

এভাবে বিদায় নেওয়ার পর বাংলাদেশের সিলেটের এই দুই কৃতী সন্তান দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে আসরের নামাযের ওয়াক্ত নিকটবর্তী হলো। এ সময় ট্রেনটি একটি স্টেশনে থামছিলো মাত্র। দেখা গেলো স্টেশনে হিন্দুরা কী একটা গণ্ডগোল করছে। আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা ছিলো ক্ষেপা। নামায আদায়ের জন্য হযরত শায়খে কাতিয়া প্লাটফর্মে নেমে গেলেন। হঠাৎ পশ্চিমমুখী হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আযান শুরু করে দিলেন! এ দৃশ্য দেখে স্টেশনের অমুসলিমরা অবাক! এদিকে গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। ছুটে গেলেন মামার নিকট (কাতিয়ার শায়খ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক সম্পর্কে মামা ছিলেন)। বেশ পেরেশান হয়ে বললেন, “মামা! এ কী করছেন? আপনি এই গোলযোগপূর্ণ হিন্দু এলাকায় আযান দিচ্ছেন?” শায়খে কাতিয়া হেসে হেসে বললেন, “ভাগিনা, ভয় কিসের! আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন। এসো জাম’আতে নামায আদায় করবো!” এরপর সত্যিই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে উভয়ে জাম’আতে নামায আদায় করলেন। কেউ কিছু বলার সাহস করে নি।

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একদা প্রশ্ন করা হলো, আপনার জীবনের স্মরণীয় একটি ঘটনা বলুন? তিনি তখন উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। আমি (অধম লেখক) তখন তাঁর সামনে উপস্থিত থেকে তা শ্রবণ করেছি।

কাতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

দেওবন্দ থেকে ঈসায়ী ১৯৫০ সালে দেশে ফিরে প্রথমেই নিজের গ্রামে একটি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তৎপর হয়ে ওঠেন। এলাকার মুরুব্বিয়ান ও নওজোয়ানদের পরামর্শ নিতে একটি জনসভার আয়োজন হলো স্থানীয় খেলার মাঠে। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সঠিক দ্বীনদারীত্বের প্রয়োজনে অত্র এলাকায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জরুরত বুঝিয়ে বললেন। আলহামদুলিল্লাহ! সকলেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় একমত হলেন। এরপর শীঘ্রই দ্বিতীয় আরেকটি সভার আয়োজন করা হলো।

দ্বিতীয় জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিলেন, হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ের মরহুম মাওলানা গেদা মিয়া চৌধুরী। এ সভায় এলাকার প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার স্থান নির্ধারণের জন্য আলোচনা হলো। প্রধান অতিথি প্রস্তাব দিলেন বর্তমান মাঠে হবে। কিন্তু অনেকে মানলেন না। এরপর লটারী হলো। তিনবার লটারীতে ঐ মাঠের নামই উঠলো। সুতরাং চৌধুরী সাহেব ঘোষণা দিলেন, মাদ্রাসা হবে ঐ মাঠে। উল্লেখ্য এসময় মাদ্রাসার অতি নিকট দিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো কুশিয়ারা নদীটি। সে সময় নদীর নাব্যতাও ছিলো বেগবান। অনেকে আশঙ্কা করছিলেন অচিরেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জায়গাটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত শায়খে কাতিয়া ও অপর এক প্রসিদ্ধ ওলির দু'আর বরকতে তা রক্ষা পায়- আমরা একটু পরই সে বর্ণনা তুলে ধরছি।

গ্রামের মানুষ অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দিলেন। বেশ দূর-দূরান্ত থেকে বাঁশ ইত্যাদি নিয়ে আসা হলো। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সময় নিজেও সাধারণ শ্রমিকের মতো কাজ করেছিলেন। এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, কাতিয়া থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে উসমানীনগর থানাধীন 'উমরপুর' এলাকায় যেয়ে নিজের কাঁধে বহন করে বাঁশ এনেছিলেন মাদ্রাসার ঘর তৈরীর জন্য। তবে প্রথমে ৬ মাস পর্যন্ত মাদ্রাসার দারস একটি বড় মান্দার বৃক্ষের নীচে অনুষ্ঠিত হয়।

কাতিয়া মাদ্রাসার প্রথম ক'জন ছাত্রের মধ্যে শায়খ মাওলানা জমির উদ্দীন, শায়খ মাওলানা আবদুর রহীম বাদশাহ, শায়খ লুৎফুর রহমান ও মরহুম কাসিম উল্লাহ প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ৬ মাস পর ছাত্রসংখ্যা ১৫ জনে উন্নীত হয়। এসময় পর্যন্ত হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই দারসদান করেছেন। এরপর উস্তাদ হিসেবে যোগ দেন মাওলানা আবদুল আহাদ রেঙ্গা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও রাণাপিংয়ের এক হুজুর।

ঈসায়ী ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত হয় কাতিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় জলসা। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হযরত ড. শায়খ আলী আসগর নূরী চৌধুরী (কামারগাঁওর শেখ সাহেব) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জিঙ্গাবাড়ির হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আরো ছিলেন 'মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পত্রবাহক' নামে খ্যাত মুবারকপুরের মরহুম ড. মর্তুজা চৌধুরী। এরপর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পরের বছর। এতে উপস্থিত ছিলেন খলীফায়ে মাদানী হযরত মাওলানা বশির আহমদ শায়খে বাঘা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অনুষ্ঠানে বিপুল মানুষের সমাগম ঘটে। মায়মনসিংহের আমেরিকা প্রবাসী এক বক্তা ইংরেজী ভাষায় ওয়াজ করেন। তার বয়ান সাথে সাথে অনুবাদ করে শুনানো হয়।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বছর ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, জ্ঞানতাপস আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। দশ সহস্রাধিক মানুষের সমাগম ঘটে এই মহাসম্মেলনে। মাদ্রাসার জন্য চাঁদা ওঠানো শুরু হয়। প্রথম চাঁদাদাতাদের মধ্যে ছিলেন মুখলিসুর রহমান মুতাওয়াল্লি, তৈয়ব উল্লাহ সাহেব এবং গ্রামের অন্যান্যরা। এছাড়া সুনামগঞ্জ জিলার ভাটি অঞ্চলের মানুষ টাকা-পয়সা ও ধান-চাউল দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইতোমধ্যে পাঠকদেরকে বলেছিলাম, কুশিয়ারা নদীর প্রবল স্রোতে মাদ্রাসার ভিটা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দাঁড়ায়। তবে দু'জন বুজুর্গের দু'আর বরকতে তা রক্ষা পায়। এখন সেই দু'আর বর্ণনাটি তুলে ধরছি।

দু'আর বরকত

আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাতিয়ার মাদ্রাসায় প্রধান অতিথির বয়ান পেশ শেষে হযরত শায়খে কাতিয়ার অনুরোধে নদীর তীরে যেয়ে হাত উঠালেন। উদ্দেশ্য ছিলো নদীর ভাঙ্গন থেকে মাদ্রাসা রক্ষার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা। তাঁর সঙ্গে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও শরীক হলেন। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "হাত উঠিয়ে তিনি (মুশাহিদ সাহেব) যেনো অন্য জগতে চলে গেলেন। অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। তাঁর দু'আ শেষ হচ্ছিলো না। আমার হাতে ব্যথা অনুভব করছিলাম।"

সুবহানাল্লাহ! এই উভয় বুজুর্গের দু'আর বরকতে শুধু নদীর ভাঙ্গন থামে নি, মাদ্রাসার নিকট থেকে পুরো কুশিয়ারা নদী অন্তত মাইল-খানেক দক্ষিণে সরে গেলো মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই। নিজের বন্ধুদের আবদার আল্লাহ তা'আলা এভাবেই গ্রহণ করে থাকেন। মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দু'আর এক পর্যায়ে বলেছিলেন, 'হে প্রভু! তোমার রাসূলের বাগান, তুমি একে রক্ষার্থে কুশিয়ারা নদীকে দূরে সরে নাও।' (বর্ণনাকারী- কাতিয়ার বিশিষ্ট মুরুব্বি হাজী ওয়ারিদ উল্লাহ সাহেব)

আলহামদুলিল্লাহ! কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলূম অলৈতলী ও কাতিয়া মাদ্রাসা' ১৯৫০ ঈসায়ী থেকে আজোবধি ইলমে দ্বীনের খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর বেরিয়ে আসছেন অনেক আলিম ও হাফিযে কুরআন। বর্তমানে মহিলা মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাতিয়া মাদ্রাসায় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছেন। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের পর থেকে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা হাজী হাফিজ মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আমিনী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। এছাড়া মাদ্রাসার আর্থিক অর্থ যোগানসহ সার্বিক তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছেন হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বিতীয় সাহেবজাদা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্বারী হযরত মাওলানা হাফিজ উবায়দুল্লাহ আমিনী দামাত বারাকাতুহুম।

ইতোমধ্যে উল্লেখিত সিলেট বিভাগের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম ছাড়াও ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, খলীফায়ে কুতবে আলম মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি, খলীফায়ে কুতবে আলম মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল করিম শায়খে কৌড়িয়া, খলীফায়ে কুতবে আলম মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল হক শায়খে গাজিনগর, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের প্রাক্তন খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম, খলীফায়ে কুতবে আলম মাদানী হযরত মাওলানা শাহ আহমদ শফী চট্টগ্রামী, খলীফায়ে কুতবে আলম মাদানী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান পটিয়া, খলীফায়ে কুতবে আলম হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান শায়খে গুনই, খলীফায়ে কুতবে আলম মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল মু'মিন শায়খে ইমামবাড়ি, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস দামাত বারাকাতুহুম প্রমুখ বিশ্ব-বরেণ্য উলামা এবং ইসলামী চিšতাবিদরাও হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত কাতিয়া দারুল উলূমে পদার্পণ করেছেন।

আজো বাৎসরিক জলসা, খতমে বুখারী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বহু উলামা-মাশাইখ, নামকরা ওয়াইজ, ইসলামী মনীষা কাতিয়া মাদ্রাসায় এসে অত্র জনপদকে ইলমে দ্বীন ও সঠিক ইসলামী জীবন পালনের দিকনির্দেশনা দ্বারা নূরান্বিত করে যাচ্ছেন। এ ধারাবাহিকতা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকুক- আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাস দিলে এ প্রার্থনা করছি।

খিলাফত লাভ

হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন আমার মতে হযরত কুতবে আলম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আধ্যাত্মিক প্রধান উত্তরসূরী। কিন্তু বাহ্যিকভাবে জীবদ্দশায় তিনি তাঁর এই প্রিয় শাগরিদ ও মুরীদকে খিলাফত প্রদান করেন নি। এর কারণ হিসাবে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমার

ব্যক্তিগত মতামত হলো- বাহ্যিক খিলাফত প্রদান চেয়ে আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি নিযুক্তিকরণ অনেক বেশী গুরুত্ববহ। সত্যিকার খিলাফত প্রদানে মুর্শিদের যে তাওয়াজ্জুহ মুরীদের উপর পতিত হয়ে থাকে তার শক্তি ও প্রভাব বিরাট। মুরীদের তরীকতের স্তরের উপর নির্ভর করবে এই তাওয়াজ্জুর প্রতিক্রিয়া। সময় সময় এমনও হয়েছে যে, উচ্চ পর্যায়ে আরোহণকৃত মুরীদের অতি-স্পর্শকাতর ক্বলব ও আত্মা তাওয়াজ্জুর কারণে এতো অধিক প্রভাবান্বিত হয়েছে যে, ঐ মুরীদ শেষ পর্যন্ত হয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন না হয় বাকী জীবন সম্পূর্ণরূপে 'মজনু' অবস্থায় কাটিয়েছেন। সুতরাং সবাইকে তাওয়াজ্জুহ তথা উচ্চতর খিলাফত প্রদান সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

আমার দৃঢ়-বিশ্বাস হযরত শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যোগ্যতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছেন জেনেও কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সম্পূর্ণরূপে মজযূব অবস্থায় ফেলে দেওয়া থেকে রক্ষার খাতিরে তিনি বাহ্যিক খিলাফত প্রদান করেন নি। ঠিক যেমনি তাঁর সুযোগ্য সন্তান ফিদায়ে মিল্লাতকেও দেন নি। অথচ হযরত কুতবে আলম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করে কেউ কেউ কিছুদিন পরই খিলাফত লাভ করেছিলেন বলে অনেক প্রমাণ আছে। হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ ৭ বছর ছায়ার মতো কুতবে আলমের সঙ্গে থেকেছেন, তাঁর খিদমাত করেছেন, লাভ করেছেন অনেক ফায়িজ ও বরকত। যা হোক তিনি কিভাবে কার মাধ্যমে খিলাফত লাভ করেছিলেন তার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এখন তুলে ধরছি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী খিলাফত লাভের ব্যাপারটি আমার নিকট (লেখকের কাছে) বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন কাতিয়া নিবাসী হযরত কুতবে যামানের বিশিষ্ট মুরীদ হাজী ওয়ারিদ উল্লাহ সাহেব। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি ১৪ মে ২০০৫ তাঁরই নিজস্ব গ্রামের বাড়িতে। হযরত ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক খিলাফত প্রদানের বছর হাজী ওয়ারিদ উল্লাহ একান্ত ভক্ত হিসাবে হযরতের সঙ্গে রমযানের শেষ দশদিন ই'তিক্বাফ পলন করছিলেন। তিনি বলেন, হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র রামাদ্বানের শেষ দশদিন ই'তিক্বাফ পালন করছিলেন কাতিয়া মাদ্রাসা মসজিদে। গ্রামের অনেকেই তাঁর সঙ্গে

ই'তিক্বাফ পালনে শরীক হন। একদিন ভোরে ফযরের নামায শেষে একখানা চিঠি হাতে হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মিম্বরে বসে এ'লান করলেন: ভাই দুস্ত-বুজুর্গ! হযরত ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী [রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] এই পত্রযোগে কুতবে আলম ও তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আমাকে ইযাজত প্রদান করেছেন।"

হাজী ওয়ারিদ উল্লাহ আরো বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম ঘোষণা প্রদানের সময় শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেহারা নূরান্বিত হয়ে ওঠেছে। ঠিক কবে তিনি খিলাফত লাভ করেছিলেন তার সরাসরি কোন দলীল প্রমাণ মিলে নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে আমরা অন্তত খিলাফত লাভের সন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারি।

আমি যখন হাজী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করি তখন তিনি জানালেন, হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন ১৯৫৮ সালে। সুতরাং এসময় হযরত খিলাফত লাভ করে থাকবেন। কারণ ইযাজত ছাড়া মুরীদ করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। এছাড়া হযরত কুতবে আলম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। সাধারণত 'তাঁর পক্ষ থেকে' খিলাফত প্রদান স্বভাবতই ইন্তিকালের পরই দেওয়া হয়ে থাকবে। তা-ই আমাদের ধারণা হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে ইযাজত লাভ করেন ১৯৫৮ সালের শুরুতেই। তবে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যেতে পারে- এবং আমরা তা-ই আশা করি। সর্বজ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

প্রত্যক্ষদর্শী অনেকের মুখে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়। কিছু কিছু ঘটনার লিখিত তথ্যও আমাদের হাতে এসেছে। আমি (লেখক) নিজেও সফরসঙ্গী হিসাবে, বাড়িতে

মেহমান থাকাবস্থায় এবং অনুষ্ঠানাদিতে অনেক শিক্ষণীয়, তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও কারামত প্রত্যক্ষ করেছি। লেখালেখির প্রতি আগ্রহ থাকায় অধিকাংশ ঘটনা সাথে সাথেই রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

চিশতি মহাত্মন মাশাইখদের জীবনচরিতের উপর রচিত এই বিরাট গ্রন্থের সর্বশেষ মহান শায়খ কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর বর্ণাঢ্য, অনন্যসাধারণ ও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের অসংখ্য শিক্ষণীয় স্বাভাবিক, অতিস্বাভাবিক ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী থেকে ক'টি মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

১. সুনামগঞ্জের এক্সিবিশন ভাঙ্গন: ১৯৬৫ সালের কথা। হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামালগঞ্জ থানাধীন সুরমা তীরবর্তী সাচনা বাজারে অনুষ্ঠিত একটি ওয়াজ-মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিয়েছেন। এ সময় সুনামগঞ্জ শহরে একটি 'এক্সিবিশন' (ঊযরনরঃরড়হ) বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তখনকার মহকুমা সদর সুনামগঞ্জের এস.ডি.ও. সাহেবের অনুমতিও নেওয়া হয়েছিল এই অনৈসলামিক অনুষ্ঠানটির জন্য। এরূপ অনুষ্ঠানে সাধারণত মদ, জুয়া, নারীনৃত্ত ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত হয়ে থাকে। এরূপ একটি সমাজবিধ্বংসী অনুষ্ঠান কিভাবে বন্ধ করা যায় সে ব্যাপারে কথা বলতে একদল প্রতিনিধি আসলেন সুনামগঞ্জ থেকে কাতিয়া মাদ্রাসায়। হযরতকে বাড়িতে না পেয়ে তারা চলে গেলেন সাচনা বাজারে।

কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সব শ্রবণ করে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠলেন। শীঘ্র কয়েক হাজার সঙ্গীসহ সুনামগঞ্জ শহরে এসে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। প্রদর্শনীর সকল প্রস্তুতি তখন প্রায় শেষ। বিরাট বিরাট প্যান্ডেল তৈরী হয়েছে। প্রতিবাদে কোন কাজ হলো না। হযরত একখানা রুমাল বিছিয়ে বসে পড়লেন। হাতের গল্লাটি সামনে রেখে দু'আ করলেন আল্লাহর দরবারে। নির্দেশ দিলেন সকলকে- যাও! প্যান্ডেল ভেঙ্গে দাও! সবাই একযোগে হামলা চালালেন। এরপর প্রচণ্ড ঝড়-তুফান শুরু হলো। ফলে পুরো এক্সিবিশন ভুণ্ডুল হয়ে গেল। এই ঘটনার পর হযরতের সুনাম পুরো সিলেট বিভাগে (তখনকার জিলায়) ছড়িয়ে পড়লো।

এদিকে মহকুমা প্রশাসক (এস.ডি.ও.) হযরতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করলেন। হযরত ইতোমধ্যে একখানা মসজিদে 'ই'তিক্বাফের নিয়তে' প্রবেশ করলেন। সুতরাং পুলিশ তাঁকে আটক করার সুযোগই পেলো না। সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর থানার বহু মানুষ ছুটে গেলেন হযরতের নিকট। তারা সকলেই হযরতের সমর্থনে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানালেন।

ক'দিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর এক রাতে এস.ডি.ও সাহেব স্বপ্নে দেখলেন, বড়ো একটি অজগর তাকে আক্রমণ করছে। পরদিন রাতও একই স্বপ্ন দেখলেন- এরাত অনুরূপ স্বপ্ন তার স্ত্রীও দেখে ঘুম থেকে চিৎকার দিয়ে জেগে ওঠলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, নিশ্চয় হযরত শায়খে কাতিয়ার সঙ্গে বেআদবিপূর্ণ আচরণের ফলে এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখছেন তারা। সুতরাং কাল-বিলম্ব না করে উভয়ে হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি ডিসমিস করে দিলেন। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিদীর্ঘ ১ মাস ঐ এলাকায় অবস্থান করেন। তাঁর হাতে অসংখ্য মানুষ বাইআত গ্রহণ করেন। (তথ্যসূত্র: হাজী ওয়ারিদ উল্লাহ কাতিয়া, (হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ.-এরদামান্দ) মাওলানা রশীদ আহমদ কাতিয়া)

২. হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ: হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৭৭ সালে হজ্জের সফরে গিয়েছেন। এ বছর মিনার তাঁবুতে আগুন লাগলো। মোট ১১২টি তাঁবু জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল। হতাহত হলেন বহু হজ্জযাত্রী। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ১১৩ নং তাঁবুতে। এ বছর হজ্জের সফরে মুসলিম বিশ্বের স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন। তাঁর তাঁবুটি জ্বলে যায়।শোনা যায় হযরতের জুতো পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছিল।

হযরত শায়খে কাতিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ২২ জন সাথী ছুটে গেলেন শাইখুল হাদীস জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে। এ সময় জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অসুস্থ ছিলেন। কোমর থেকে পা পর্যন্ত স্ট্রোকে চেতনাহীন

হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, দীর্ঘ লাইন বেধে লোকজন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন। আমরা যখন লাইনে দাঁড়ালাম তখন ভাবলাম, না জানি কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে। কিন্তু দূরে বসা থাকাবস্থায় শাইখুল হাদীস সাহেব হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে চিনে ফেললেন। বলতে লাগলেন, "হযরতকে আগে আসতে দিন! হযরতকে আগে আসতে দিন!" সুতরাং আমারও শায়খে কাতিয়ার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম এবং মুসাফাহা করলাম যুগের এই শ্রেষ্ঠ বুজুর্গের সঙ্গে। হযরত জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব সম্মানের সাথে হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হাতে ধরে একেবারে কাছে নিয়ে বসালেন। এরপর উভয় বুজুর্গের সঙ্গে লোকজন অনেকক্ষণ মুসাফাহা করলেন। (তথ্যসূত্র: হাজী ওয়ারিদ উল্লাহ কাতিয়া, ১৯৭৭ সালে হযরত শায়খে কাতিয়ার হজ্জের সফরসঙ্গী)

৩. যাত্রাগান বন্ধের ঘটনা: জগন্নাথপুর উপজেলার অদূরে ইশাকপুর নামক একটি গ্রাম আছে। সেখানে একটি যাত্রাগানের আয়োজন করা হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত গত শতকের আশির দশকের শুরুর দিকের ঘটনা। হযরত তখন অবস্থান করছিলেন কয়েক মাইল পূর্বে জগন্নাথপুর-বিশ্বনাথ রাস্তায় স্থাপিত মিরপুর বাজারে। খবর পেয়ে তিনি একাই ছুটে গেলেন যাত্রাগান অনুষ্ঠানস্থলে। হাতের গল্লা দিয়ে অনেককে পেটালেন। যাত্রার মঞ্চ, প্যান্ডেল ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলেন। বন্ধ হয়ে গেল যাত্রাগান। এদিকে হযরতের গল্লার বাড়ি খেয়ে কিছুলোক ছুটে গেল নিকটস্থ গ্রামে। ইতোমধ্যে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি মসজিদে 'ই'তিক্বাফের' নিয়তে ঢুকে পড়লেন। লোকজন ক্ষেপে এলো তাঁর দিকে। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য ইসলামদরদী লোকজন এবং কিছু মহিলারাও তাঁর পক্ষ নিল। আসন্ন একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধতে পারে জেনে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন হস্তক্ষেপ করলো। ফলে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসলো। (বর্ণনাকারী: হাজী ওয়ারিদ উল্লাহ, কাতিয়া)

৪. কসবা গ্রামের লিপাই সাহেবের বাইআতের ঘটনা: কাতিয়ার অদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে কুশিয়ারা নদীর ওপারে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় কসবা গ্রামটি অবস্থিত। এ গ্রামে লিপাই নামক এক প্রভাবশীল ব্যক্তি বাস করতেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি যাত্রাগানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'রূপবান কন্যা রহিম বাদশা',

'বানেছা ভানু', 'সাত ভাই চম্মা' ইত্যাদি যাত্রাগানের প্রধান আয়োজক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। গ্রামাঞ্চলে এসব যাত্রাগান সারারাত প্যান্ডেল বেঁধে অনুষ্ঠিত হতো। অনেক অসামাজিক কার্যকলাপ এই যাত্রাগানকে ঘিরে সংগঠিত হতো বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিলো। স্বভাবতই আলিম-উলামা ও মাশাইখরা এসব সমাজবিধ্বংসী, চরম গোনাহের কাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে এসব কাজের শক্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে সবাই সাহস পেতেন না। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব অসামাজিক কার্যকলাপের শুধু ঘোর বিরোধী ছিলেন না, তিনি ডাইরেক্ট একশন নিতেন। সুনামগঞ্জ ও বৃহত্তর সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় তিনি এসব পাপকার্য রদ করেছেন। বহুবার তিনি প্যান্ডেল ভেঙ্গেছেন। লোকদেরকে লাঠিপেটা করেছেন। তাঁর এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কে না অবগত।

যা হোক, বহু বছর ধরে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিপাই সাহেব ও তার যাত্রাদলের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন। অবশেষে তিনি সফল হলেন। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিলেতে যেয়ে লিপাই সাহেবের ভাই উজির আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বিলেত থেকে দেশে ফিরে কাতিয়ার জলসায় উপস্থিত হয়ে হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। পরে একদিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিপাই সাহেবকে ডেকে বললেন, "দেখো, তোমার আপন ভাই এখন আমার মুরীদ। তিনি বাড়িতে এসে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। তিনি তোমার সমর্থন চেয়েছেন। আমাকে দিয়ে এই হাফিজী মাদ্রাসা উদ্বোধন করারও ইচ্ছা রাখেন উজির মিয়া।"

আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় শেষ পর্যন্ত লিপাই সাহেবের মনে লজ্জাবোধ হলো। মৃত্যুর ভয় ও আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির ভাবনা তার মনে ক্রিয়া করতে লাগলো। তিনি তাওবাহ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠলেন। এদিকে উজির সাহেব বাড়িতে এসে হাফিজী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন।

লিপাই সাহেবের মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে রমজান মাসে অসুস্থতা হেতু উভয় পা কাটা পড়ে। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে পড়লেন। একদিন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বললেন,

হযরত! অনুগ্রহ করে আমাকে মুরীদ করুন। সুতরাং কুতবে যামানের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে একজন মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তাওবার সৌভাগ্য প্রদান করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরতের হাতে হাত রেখে বাইআত (তাওবাহ) গ্রহণ করলেন। লিপাই সাহেবের এক ছেলে হাফিজে কুরআন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলিদের ওয়াসিলায় এভাবে অনেক মানুষকে হিদায়াতপ্রদান করে থাকেন।

৫. হযরতের উপর গুলিবর্ষণ: হযরতের এক মাঝির নাম আপ্তাব উদ্দীন। তার ঠিকানা হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে। তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো। বর্ষাকালে আপ্তাব উদ্দীন মাঝি হযরতকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। জগন্নাথপুর বাজারের নদীর একটি পুলের নীচ দিয়ে নৌকা চলছিলো উত্তরদিকে। হঠাৎ নৌকার উপর গুলিবর্ষণ শুরু হলো। নৌকার ছইয়ে বেশ ক'টি গুলি পড়লো। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছইয়ের ভেতর থেকে বাইরে চলে আসলেন। নৌকার খোলা জায়গায় চারজানু হয়ে বসে পড়লেন। জিকির-তাসবীহ পড়তে লাগলেন। ওদিকে আরো কয়েকটি গুলির আওয়াজ শোনা গেলো। এরপর থেমে যায়। গোলাবর্ষণের নির্দেশদাতা পাকিস্তানী সুবেদার বললেন, "গুলি বন্ধ করো! কোন ওলিআল্লাহ আসছেন!" নৌকা নদীর তীরে ভিড়ানোর পর সুবেদার এসে হযরতকে জড়িয়ে ধরলো, মাফ চাইলো এবং দু'আর দরখাস্ত করলো। (বর্ণনাকারী, মাওলানা মুহিবুর রহমান সেওড়া রাহ.)

৬. গ্রামে মহামারী ও তালাবা জায়গীর দেওয়ার ঘটনা: একবার কাতিয়া গ্রামের কিছু লোক তাদের বাড়ি থেকে জায়গীর থাকা তালাবাদের বিদায় করে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ওসব বাড়িতে গুটি বসন্ত দেখা দিল। সুতরাং তারা পুনরায় তালাবাদের জায়গীর দিলো। অনুরূপ আরেকবার তালাবা বিদায়ের পর দেখা দিল কলেরা মহামারী। এবারও লোকে ভাবলো, মাদ্রাসার তালাবাদের বিদায় করার ফলে আল্লাহর গজব নেমে এসেছে! তাই তারা তালাবাদের পুনরায় জায়গীর প্রদান করলো। অবশ্য তালাবাদের বিদায় করার সঙ্গে ওসব মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কহীন হতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লাহ ভালো জানেন। (বর্ণনাকারী: প্রাগুক্ত)

৭. জিকিরের অবস্থা: হযরতের মাদ্রাসার নিকটে ছোট্ট একটি কক্ষ ছিলো। এখানে বসে তিনি জিকির-আজকার করতেন। তাঁর সঙ্গে জিকির-আজকারে যোগ দিতেন কামার গাঁও এর শায়খ ডা. আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বর্ণনাকারী বলেন, “জিকিরের হালত দেখে ভয় পেতাম। উভয় বুজুর্গ খুব জলি জিকির করতেন। এক রাত উভয় শায়খ জিকির করছিলেন। দেখা গেল কামার গাঁওর শায়খ বাতাসের উপর ঘুরছেন। আর আমাদের শায়খ সাহেব এক কোণায় বসে মুরাক্বাবায় ধ্যানমগ্ন আছেন। আমি বাইর থেকে এ অবস্থা দেখছিলাম”। [বর্ণনাকারী: প্রাগুক্ত]

৮. সফর থেকে নিয়ে আসতেন পাগল-ছাগল: হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব বেশী সফর করতেন। দেখা যেতো তিনি সফর থেকে পাগল-ছাগল নিয়ে আসছেন। ওদের অনেকে কিছুদিন মাদ্রাসায় থেকে ভালো হয়ে চলে যেতো। কেউ কেউ ছাত্র হিসাবে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়াও করেছে। [বর্ণনাকারী: প্রাগুক্ত]

৯. খলীফার স্বপ্ন: হযরতের খলীফা মাওলানা মুহিবুর রহমান আমার নিকট (লেখকের কাছে) একটি স্বপ্নের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, “এরশাদ সরকারের আমলে আমার মনে আগ্রহ জাগলো (জনাব এরশাদ সাহেবের দলের) লাঙ্গল মার্কায় ভোট দেবো। আমি সে রাতেই স্বপ্নে দেখি, সমগ্র আসমান জুড়ে একটি প্যান্ডেল দেখাচ্ছে। খুব উঁচু একটি স্টেজও চোখে পড়লো। সেখানে একাই বসে আছেন হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার মাথায় সবুজ পাগড়ি, পরনে হলুদ রংয়ের বস্ত্র। চোখে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল চশমা- যেনো ঝলঝল করছে। তিনি আমার দিকে খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি বুঝতে পারলাম, লাঙ্গল মার্কায় ভোট দেওয়া আমার জন্য সঠিক হবে না।”

১০. একটি কারামত: হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা শাল্লার (সুনামগঞ্জের) ক্বারী শায়খ বিলাল আহমদ বর্ণনা করেন: “আনন্দপুর নামক গ্রাম থেকে একদা হযরতের সঙ্গে রওয়ানা দিলাম। তখন রাত ১১টা। আমরা যখন কাফাইল্সেও নামক বাজারের নিকটে আসলাম তখন হঠাৎ হযরত শায়খে কাতিয়া

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে গেলেন। নীরবে কি যেন ভাবতে লাগলেন। আমি জানতে চাইলাম, 'হযরত! আপনি দাঁড়ালেন কেন?' তিনি জবাব দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম। এবারও তিনি নীরব। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর বললেন, "শোন! অচিরেই বিধর্মীরা মুসলমানদের জান-মালের বিরাট ক্ষতি করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, সত্যিই এর কিছুদিন পর আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর আমেরিকা কর্তৃক হামলা শুরু হয়।"

১১. আরেকটি কারামত: হযরতের বড় সাহেবজাদা মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ৮ এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী রাত ১০ ঘটিকার সময় আমাকে (লেখককে) মোবাইল করে জানালেন: "গত ৭ এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী রাত ৯ ঘটিকার সময় সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে হযরতের এক অত্যাশ্চর্য কারামত প্রকাশ পেয়েছে। খাদীমুল কুরআন কর্তৃক আয়োজিত তিনদিনব্যাপী তাফসীর মাহফিলের শেষ দিন (শুক্রবারে) মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী তাফসীর পেশ করছিলেন। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠলো। শুরু হলো প্রচণ্ড বেগে ঝড়-তুফান ও বৃষ্টি। তিরপালের তৈরী বিরাট প্যান্ডেলটি লণ্ড-ভণ্ড হতে লাগলো। হাজার হাজার শ্রোতা প্যান্ডেল ছেড়ে ছুটতে লাগলেন চতুর্দিকে।

এরপর হঠাৎ ওলিপুরী সাহেবের হাত থেকে মাইক্রফোন নিয়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "বসো! সবাই বসো! আমার সাথে দু'আ পড়ো: আল্লাহুম্মা হাওয়া-ল্লাইনা লা আ'লাইনা" [اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا لَا عَلَيْنَا।- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ] মানুষ তাঁর সঙ্গে দু'আ পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ দু'আ পাঠের পর এক প্রচণ্ড ডাক দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলো। সুবহানাল্লাহ! এরপর রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী তাফসীর করলেন। তিনি এক পর্যায়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ওলির কারামত আপনারা আজ সকলে প্রত্যক্ষ করলেন।"

১২. জিনের মুর্শিদ: একবার আমি (লেখক) ১০ দিন স্থায়ী এক সফরে যাই হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম হিসাবে। সেদিন ছিলো ২৪ এপ্রিল ২০০৫ ঈসায়ী। আমি হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

দফতরে বসে তাঁর সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলাম। বড় থালায় আমাদের সঙ্গে আরো ৬ জন খাচ্ছিলেন। এক তাগড়া নওজোয়ান ছেলে কিছু আবুল-তাবুল বকছিলো। একদল লোক এ ছেলেকে নিয়ে এসেছেন জগন্নাথপুর থানার ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর গ্রাম থেকে। খাবার খেতে খেতে তারা জানালেন, ছেলেটি কবরস্থানে যেয়ে জিন সম্প্রদায়ের এক 'মহিলাকে' দেখেছে। এরপর থেকে সে আবুল-তাবুল বকছে। বার বার বলছিলো, 'আমাকে ঐ জিন মহিলা বলেছে, তুমি হযরত শায়খে কাতিয়ার নিকট চলে যাও। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের অনেকেই তাঁর মুরীদ।'

হযরত শায়খে কাতিয়া নীরবে তার কথাগুলো শ্রবণ করলেন। এরপর তাকে নির্দেশ দিলেন, "আজ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত তুমি মসজিদে অবস্থান করবে। কোন কথা বলতে পারবে না। নামায আদায় করবে, পাস-আনফাস ও তেরো তাসবীহ জিকির করবে।" ছেলেটি তাঁর কথা শ্রবণ করামাত্র নীরব হয়ে গেল। মনে হলো সে অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে।

১৩. হযরত শায়খে কাতিয়া ও মরহুম আবদুস সামাদ আজাদ সাহেব: মরহুম জনাব আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। উভয়ে ছিলেন একই জিলা ও থানার অধিবাসী। আবদুস সামাদ আজাদ সাহেবের গ্রামের বাড়ি ছিলো জগন্নাথপুর উপজেলাধীন বুরাখাইল গ্রামে। আবদুস সামাদ সাহেব প্রায়ই বলতেন, হযরত শায়খে কাতিয়া আমার মুর্শিদ। তার দাড়ি রাখার ঘটনাটি মশহুর।

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুনামগঞ্জের কোন এক জনসভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন, মরহুম আবদুস সামাদ আজাদ সাহেব। এক পর্যায়ে হযরত শায়খে কাতিয়া আবদুস সামাদ আজাদ সাহেবের গালে মৃদু থাপ্পড় মেরে বললেন, "একমুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। দাড়ি রাখুন!" এরপর সত্যিই আবদুস সামাদ সাহেব দাড়ি রাখলেন।

উল্লেখ্য মৃত্যুকালে মরহুম আবদুস সামাদ আজাদ সাহেব অসিয়ত করেন, 'আমার জানাযা যেনো হযরত শায়খে কাতিয়া পড়ান।' আমি (গ্রন্থকার) মরহুমের

জানাযার দিন হযরতের সফরসঙ্গী ছিলাম। আমরা তখন হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে। একটি টেলিফোন আসলো। জগন্নাথপুরে মরহুম আবদুস সামাদ আজাদ সাহেবের লাশ নিয়ে আসা হচ্ছিলো হেলিকপ্টারযোগে। এখানে তাঁর চতুর্থ জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে। হযরতকে আবদার করা হলো, দয়া করে উক্ত জানাযার নামাযে ইমামতি করুন। তিনি বললেন, আমি অনেক দূরে। আর ইতোমধ্যে তো (ঢাকায়) জানাযা হয়ে গেছে। অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, 'হযরত! মরহুম আবদুস সামাদ আজাদ সাহেব অসিয়ত করে গেছেন যাতে আপনি জানাযা পড়ান।' তিনি বললেন, আগে বললে আমি ঢাকায় যেয়ে জানাযার নামায পড়াতাম।

১৪. মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া ও শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: গত শতাব্দির সত্তুর দশকের শেষের দিকের কথা। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তখন সবেমাত্র 'চীফ মার্শাল ল এডমিনিসস্ট্রেটর' হিসাবে গদিনশীল হয়েছেন বাংলাদেশের মসনদে। সিলেট সফরের অংশ হিসাবে একদা তিনি অনেক সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার জিয়ারত করতে আসলেন। প্রত্যক্ষদর্শী (শহরের রায়নগরস্থ মসজিদের প্রাক্তন ইমাম- যার নামটি আমার (লেখকের) স্মরণ নেই) বলেন, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছিলেন। একই সময় মরহুম জিয়া ও কয়েক ডজেন সেনা সদস্য উপরের দিকে উঠছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মাজারের কাছে যেয়ে জিয়ারত করা।

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে তখন 'জযব'-এর হালত। তিনি জিয়াউর রহমানের ঠিক সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়ালেন। জিয়া সাহেবও দাঁড়িয়ে গেলেন, এ সঙ্গে তার সঙ্গী সকল সৈন্যরাও দাঁড়িয়ে গেলো। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন করলেন, "এ লোকটি কে?" একজন জবাব দিলেন, "তিনি বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান।" হযরত আবার জিয়াউর রহমান সাহেবের দিকে অঙ্গুলি ইশারা করে বললেন, "এ লোকটি ফাসিক!" এরপর তিনি হেঁটে চলে গেলেন নীচের দিকে। মরহুম জিয়াউর রহমান প্রথমে কিছু হতচকিত হয়ে অবাক দৃষ্টিতে নীচের দিকে চলন্ত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে তাকালেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কে

ছিলেন?" স্থানীয় এক ব্যক্তি জবাব দিলেন, "তিনি সিলেটের একজন বড় মাপের পীর সাহেব।" মরহুম জিয়াউর রহমান বললেন, "তিনি ঠিকই বলেছেন!" এরপর উপরের দিকে পা বাড়ালেন মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, যারা দাড়ি একমুষ্ঠি পরিমাণ রাখেন না বা সেভ করেন তাদেরকে শরীয়তের ভাষায় 'ফাসিক' বলে।

১৫. মরহুম ফারুক রশীদ চৌধুরী ও শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: হযরতের খলিফা মাওলানা আবদুল মতিন নবীগঞ্জী সাহেব একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "১৯৮৯ সালের কথা। তখন আমি খেলাফত বিল্ডিংয়ে নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করছিলাম। এ সময় কোন এক কারণবশত খেলাফত বিল্ডিং সম্বন্ধে একটি দ্বন্দ্বের জের ধরে প্রতিপক্ষরা হযরত শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামে একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন। এতে লিখা ছিলো, আগামী তিন দিনের মধ্যে খেলাফত বিল্ডিংয়ে আপনাদের উপস্থিতি, এখানে দারসদান, জিকির-আজকার ইত্যাদি পালনের বৈধতার প্রমাণ দিন অন্যথায় এখান থেকে আপনাদেরকে বের করে দিতে আমরা বাধ্য হবো।

এরূপ নোটিশ পাওয়ার পর দ্বিতীয় দিন রাত বারোটার সময় হঠাৎ হযরত আমাকে বললেন, চলো! আমরা প্রায় ৭-৮ জন হযরতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে ছিলেন হযরতের বড়ো দামান্দ বশির আহমদ, হাফিজ মনসুর প্রমুখ। হযরত কোথায় যাচ্ছিলেন তখনো আমরা জানি না। তবে ফাইলপত্র সম্বলিত আমার ব্যাগটি আমি সঙ্গে নিলাম। খেলাফত বিল্ডিং থেকে পায়ে হেঁটে চৌহাট্টা পয়েন্টে আসলাম। হযরত ডানে উত্তর দিকে ঘুরে দরগাহে হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র গেটের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। আমরা এক রকম দৌড়ে চললাম তাঁর পেছনে।

মরহুম ফারুক রশীদ চৌধুরী সাহেব তখন এরশাদ সরকারের প্রতিমন্ত্রী। দরগা গেটে তাঁর বাসার প্রধান ফটকের সামনে এসে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেমে গেলেন। পাহারাদারদের সামনে এসে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!'

বলে জোরে সুরে সালাম দিলেন। এতো রাতে একদল আলিমকে গেটের সামনে দেখে পুলিশ-পাহারাদাররা যেনো হতভম্ব হয়ে পড়লো। তারা কোন এক অদৃশ্য কারণে গেটের ভেতর প্রবেশ হতে কাউকে বাধাদান করলো না। প্রধান প্রবেশ দ্বারে যেয়ে কলিং বেলে টিপ দিলেন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ভেতরে ছিলেন এক নওজোয়ান বডিগার্ড। তিনি দরোজা খুলতেই হযরত পুনরায় তাকেও দীর্ঘ একটি সালাম জানালেন। মন্ত্রী সাহেব সম্ভবত বিছানায় ছিলেন। তিনিও কলিং বেল শোনে ছুটে আসলেন দরোজার সামনে। উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে তাকাতেই হযরত তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, "মন্ত্রী সাহেব! আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আপনাকে অবশ্যই চিনতে পেরেছি।" হযরত বললেন, "আপনার মন্ত্রীত্ব, থাকবে না যাবে- কও থাকবে না যাবে!" হযরতের এরূপ তেজোদ্দীপ্ত কথা শোনে ফারুক রশীদ সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন। আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যেয়ে বললেন, "হযরত! ব্যাপার কি বলুন?"

হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথমে হযরত শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা বর্ণনা করলেন, বললেন, "তিনি হচ্ছেন কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিল কদর খলীফা, তাঁর ইমাম, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশ'র আজীবন সভাপতি। তাঁর এবং আমার নামে এই নোটিশ এসেছে। আপনি এ ব্যাপারে কি করবেন বলুন? আমরা ঐতিহ্যবাহী খেলাফত বিল্ডিংয়ের খাদিম ছাড়া আর কিছু নয়।" প্রথমে ফারুক রশীদ চৌধুরী সাহেব কিছুই বুঝতে পারেন নি। এরপর আমি ঐ নোটিশটি তার হাতে দিলাম। তিনি তা পাঠ করে বললেন, "হযরত! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না। আমি এর একটি ব্যবস্থা করবো।" হযরত বললেন, "আপনি কী করবেন?" মন্ত্রী সাহেব বললেন, "আগামীকাল এডিসি সাহেব আপনার ওখানে আসবেন। এই নোটিশ বাতিল হবে। আপনারা উভয় পক্ষের মধ্যে যাতে সমঝোতা হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করবো।"

পরদিন এডিসি সাহেব আসলেন এবং সমঝোতার প্রস্তাব দিলেন। আর সত্যিই ঐ নোটিশ সম্পূর্ণ বাতিল ও অকার্যকর হয়ে গেল।

১৬. এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার: শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম উলুতুলী বলেন, "আমি তখন জগন্নাথপুর থানাধীন সৈয়দপুর মাদ্রাসার উস্তাদ। এসময় শায়খে ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর হামলার দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে। ফলে জগন্নাথপুর, বালাগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমাসহ বিভিন্ন এলাকার তাঁর অসংখ্য ভক্তবৃন্দ ও মুরীদান ক্ষেপে ওঠেন। অবস্থা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। কবে যে কি হবে। ঘটনার সঙ্গে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মোটেই কোন সংশ্লিষ্টতা ছিলো না। এরপরও রোষবশত কিছু মানুষ তাঁকে দোষারোপ করছিলেন। কুবাজপুরে হযরত ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক ভক্ত মুরীদ ছিলেন। তিনি এলাকার একজন প্রভাবশীল ব্যক্তি। ক্রোধে বশীভূত হয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, "কাতিয়ার শেখের খল্লাটা (মস্তক) যে আননিয়া (এনে) দিতে পারবো, তারে এখলাখ টেখা (টাকা) ফুরুস্কার দিমু!"

এই ঘোষণার পর দেশবাসী হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পরামর্শ দিল, হযরত! এ মুহূর্তে আপনি চলাফেরার সময় সতর্কতা অবলম্বন করবেন। হযরত তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "আমার জান আল্লাহর আতে (হাতে), আমি আল্লাহ ছাড়া খেউরে (কাউকে) ভয় খরিনা (করি না)।" তবে হযরত বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটি এমন রূপ ধারণ করছিলো যে, যে কোন মুহূর্তে খুন-খারাবি সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি এক অত্যাশ্চর্য ফন্দি আঁটলেন। এই ঘটনার পর সবাই বুঝতে সক্ষম হলো যে, কাতিয়ার শেখ সাহেব ফুলতলীর সাহেবকে আক্রমণের সঙ্গে মোটেই সম্পৃক্ত নন এবং তাঁর দূরদর্শিতার কারণে এলাকায় শান্তি ফিরে আসলো।

একদিন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুবাজপুরের ঐ ব্যক্তির বাড়ির ঘাটে তাঁর নৌকা ভিড়ালেন। কিছু মানুষ জড়োত হলো। তিনি বললেন, ঐ নেতা সাহেবকে গিয়ে জানাও, খাত্তিয়ার আমিনুদ্দীন আইছে (এসেছে)! তাইন (তিনি) ওখানে আইতা (আসেন)। ঐ ব্যক্তি এই সংবাদ পেয়ে হতবাক! শত্রুর নৌকা আমার ঘাটে! তিনি ধীরে ধীরে কাছে এসে হযরতের দিকে অবাক নেত্রে তাকালেন। নৌকার ভেতর থেকে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বের হয়ে আসলেন। সালাম জানিয়ে বললেন, "আমারে মারবার লাগি (জন্য) লাখ টেখা (টাকা) ফুরুস্কার দিতায়

(দিবেন) খেনে (কেনো)? আমিনুদ্দীন তো আফনার বাড়িতে আইছে! লাখ টেখা গরীব-মিছকিনদেরে দেলাউকা (দিয়ে দিন)!" হযরতের এরূপ সাহসিকতা ছিলো আল্লাহ-প্রদত্ত। বলাই বাহুল্য, এদিন থেকেই মানুষ বুঝতে সক্ষম হলো, মহাত্মন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো এতো বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেউ উক্ত দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকবেন, তা অসম্ভব ব্যাপার। তিনি হযরত ফুলতলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অসুস্থ অবস্থায় একাধিকবার দেখতে গিয়েছেন। ইন্তিকালের পর তাঁর জানাযায় শরীক হয়েছেন।

১৭. কলা খাওয়ানো ও মুরীদ হওয়ার ঘটনা: ২০০৫ ঈসায়ী সালের ২৫ নভেম্বর। এ তারিখে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নেত্রকোণা জেলার জারিয়া নামক শহরে প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন। আমি (লেখক) এই সফরে খাদিম হিসাবে হযরতের সঙ্গী ছিলাম। এদিন আসরের নামাযের পরে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছি। শতাধিক বছর পূর্বে ঠুটিয়া নামক গ্রামের বাসিন্দা হযরত মাওলানা লোকমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা দেরীতে পৌঁছায় আসরের নামায মাদ্রাসার উত্তরদিকের একটি কক্ষে হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের ইমামতিতে আদায় করে নিলাম। নামায শেষে অনেক লোক ছুটে আসলেন হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। উল্লেখ্য এই মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসায় ইতোমধ্যে অনেকদিন যাবৎ সিলেট থেকে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিতেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ঐ বছরই তিনি ইন্তিকাল করেন (২৬ এপ্রিল ২০০৫ ঈসায়ী)। ফলে জারিয়ার লোকজন তাঁর 'মামা' হযরত শায়খে কাতিয়াকে জলসায় নিয়ে আসতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। সুতরাং এ কারণেই হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুদূর জারিয়ায় আগমন।

আমরা সবাই বসে আছি। হযরতের সম্মুখে কিছু ফল-ফ্রুট দেওয়া হলো। সবাইকে নিয়ে তিনি খেতে লাগলেন। একজন লম্বা, স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক খুব মনোযোগসহ হযরতের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন, হযরত! আপনি ও আপনার সফরসঙ্গী সকলকে আমি অধমের বাড়িতে আজকের জন্য মেহমান হিসাবে থাকর অনুরোধ জানাচ্ছি। হযরত সম্মতি জানালেন। একটি

কলা হাতে নিয়ে বললেন, এই নিন, এটা ভক্ষণ করুন। হযরত কলাটি তার মুখে তুলে দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, কলা খাওয়ার সময় ঐ ভদ্রলোকের চোখ দু'টো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেছে। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না।

এদিন দিবাগত রাত মুজিবুর রহমান নামক ঐ ভদ্রলোকের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সারার পর তিনি আমাকে বললেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! আসুন একটু বাইরে যাই। রাত তখন ১১টা। বাজারের নিকটেই মুজিবুর রহমানের বাড়ি। আমরা পায়ে হেটে একটি চায়ের দোকানে যেয়ে বসলাম। মুজিবুর রহমানকে এক পর্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিশ্চয়ই, হযরত গহরপুরীর মুরীদ হবেন? তিনি জবাব দিলেন, “না ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! আমি কারো মুরীদ নই।” আমি অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বললেন, দীর্ঘ ১০ বছর হযরত গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাত করেছেন। আপনার বাড়িতে মেহমান হিসাবে রেখেছেন। আর তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন না? তিনি বললেন, “কেনো যেনো কোনদিনই মুরীদ হওয়ার ইচ্ছে হয় নি- হযরত গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও কোনদিন মুরীদ হতে বলেন নি।” আমি বললাম, “তাহলে এখনই মুরীদ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে। আপনার বাড়িতে যিনি মেহমান হয়েছেন তিনি এ যুগের কুতুব। মুরীদ হয়ে যান।”

আমার এই দাওয়াত পেয়ে তিনি একটু নীরব হলেন। এরপর হঠাৎ তাঁর চোখ দু'টো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। বললেন, “হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আমি অবশ্যই তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করবো- তাঁর মুরীদ হবো। আজ তিনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন তা আমি কখনো ভুলবো না। সে-ই ছোটবেলা আমার মরহুমা আম্মাজান আমাকে যেভাবে মুখে তুলে কলা খাওয়াতেন- ঠিক এভাবে আজ হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে কলা খাওয়ালেন। আমার প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম মুহাব্বত! তিনি যে বিরাট বড় ওলি- তা আমি বুঝতে পেরেছি।” মুজিবুর রহমানের দিল মোমের মতো গলে গেল। ক্রন্দনের সুরে বললেন, আজ রাত তাহাজ্জুদের সময় আমি মুরীদ হতে আসবো। আপনি একটু সহযোগিতা করবেন।

এরপর সত্যিই মুজিবুর রহমান সে রাতে হযরতের নিকট তাওবাহ করে মুরীদ হয়ে গেলেন। জনাব মুজিবুর রহমান ভাই কিছুদিন পূর্বে মারা গেছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অধিষ্ঠিত করুন।

১৮. হিথরো বিমানবন্দরে নামায আদায় ও অমুসলিমদের পক্ষ থেকে হাদিয়া: বিয়ানীবাজার উপজেলার টিকর পাড়া কওমী মাদ্রাসার এক উস্তাদ আমার নিকট বর্ণনা করেন: বেশ কয়েক বছর পূর্বের কথা। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিলেত থেকে দেশে ফেরার পথে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ওয়েটিং কক্ষে অপেক্ষারত ছিলেন। মাগরিবের নামায ঘনিয়ে আসলো। হযরত কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সজোরে আযান দেওয়া শুরু করলেন। কক্ষে অনেক অমুসলিম শ্বেতাঙ্গসহ বিভিন্ন দেশ ও ধর্মের লোক ছিলেন। সকলে অবাক হয়ে হযরতের দিকে তাকালেন। তিনি আযান শেষে বললেন, এসো! মুসলমান সবাই এসো! মাগরিবের নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করবো। মেঝের উপর চাদর ইত্যাদি বিছিয়ে নিজেই ইমামতি করে সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। এরপর মুসাল্লায় বসাবস্থায়ই অমুসলিম শ্বেতাঙ্গরা তাঁর নিকট এসে ‘হলি ম্যান! হলি ম্যান!’ বলতে বলতে আশীর্বাদ নিতে লাগলো। লোকজন পকেট থেকে পাউন্ড বের করে তাঁকে ‘হাদিয়া’ দিতে শুরু করলো। একখানা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হলো। বেশ কিছু পাউন্ড হাদিয়া হিসাবে জমা হয়ে গেলো।

১৯. উড়ন্ত বিমানে আযানসহ নামায: হযরতের সাহেবজাদা হাফিজ মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, “আমি কয়েক বছর পূর্বে আব্বা হুজুরের সঙ্গে বিলেত সফরে যাচ্ছিলাম। আমাদের এয়ার ইন্ডিয়া বিমানটি কলকাতার নেতাজি সুবাস বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর আসরের নামায ঘনিয়ে আসলো। আব্বা হুজুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে সজোরে আযান দিতে লাগলেন। যাত্রীদের অধিকাংশই ছিলেন অমুসলিম। সবাই অবাক হয়ে আব্বা হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিমানবালা বা অন্য কোন বিমান কর্তৃপক্ষ কিছুই বলতে সাহস করলেন না। হযরত আমাকে বললেন, দাঁড়াও! ইমামতি করো। এরপর আমরা উভয়ে নামায আদায় করে নিলাম।

২০. একটি কারামত: হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত শায়খ মৌলভী গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী বর্ণনা করেন, "আজ থেকে ১৫-১৬ বছর আগের কথা (১৯৯৫-৯৬ ঈসায়ী)। একদা আমি মনজুর নামক এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে কাতিয়া গ্রামে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিলো হযরতের সাথে সাক্ষাৎ ও দু'আ নিয়ে ফিরে আসা। যা হোক, সময়মতো পৌঁছে হযরতের সুহবতে বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম। এরপর বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে তিনি বললেন, "যাইবায়, যাইবায়, বসো!" আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আজমিরীগঞ্জগামী দিনের শেষ লঞ্চ ধরা। পৌনে দু'টো কিংবা দু'টোর সময় লাস্ট ট্রিপ। ঐ সময় কাতিয়া মাদ্রাসায় যুহরের নামাযও হতো পৌনে দু'টোয়। লঞ্চঘাট পর্যন্ত পায়ে হেটে যেতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং সোয়া একটার সময় কাতিয়া থেকে বিদায় হতে হবে। কিন্তু হযরত আমাদেরকে বিদায় হতে দিচ্ছিলেন না।

যা হোক, হযরতের নির্দেশ মুতাবিক বসে রইলাম। যুহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। ভাবলাম, আজ আর যাওয়া হবে না। থেকে যেতে হবে। পৌনে দু'টোয় যুহরের নামায আদায় করলাম মাদ্রাসা মসজিদে। সালাম ফেরানোর পরই হঠাৎ হযরত আমাকে ডেকে বললেন, "ওবা গোলাম ওয়াদুদ! তোমরা চলে যাও! লঞ্চে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে!" আমি কিছুটা অবাক হলাম। ভাবলাম, এখন তো লঞ্চ চলে যাওয়ার কথা। অথচ হযরত বলছেন, "লঞ্চে গিয়ে সুন্নাত পড়ো"। শুধু তাই নয়, তিনি আরো বললেন, "যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে যেয়ো!"। একজনকে নির্দেশ দিলেন, আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসতে।

হযরতের এই কথাগুলো আমার বুঝে আসছিলো না। ভাবলাম, হয়তো তাঁর স্মরণে নেই যে, শেষ লঞ্চ এখান থেকে পৌনে দু'টো কিংবা দু'টোয় ছাড়ে। যা হোক, তাঁর নির্দেশ মতো আমরা সুন্নাত আদায় না করেই মেহমানখানায় চলে গেলাম। আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হলো। খাওয়া শেষে দেখলাম পৌনে তিনটে বেজে গেছে। হযরতের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে কিছু বিরক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম ওখানে যেয়ে ফিরে আসবো। কারণ, লঞ্চ তো পাওয়ার কথা নয়। ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল তিনটে থেকেও বেশী হবে। একটু পর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম ফেচির বাজারের উত্তর পূর্বে ওপারের গ্রাম

দিঘলবাক ঘুরে কুশিয়ারা নদীর উপর দিয়ে লঞ্চ আসছে! আরোহণের পর পরিচিত লঞ্চ-চালক প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কোত্থেকে এই অসময়ে লঞ্চঘাটে আসলেন?'। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি লঞ্চ নিয়ে এতো দেরীতে আসলেন কেন?'। তিনি বললেন, 'আর বলুন না! শেরপুর গণ্ডগোল লেগে যায়। এতে আমাদের লঞ্চ ছাড়তে ঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দেরী হয়েছে!' হযরতের নির্দেশ মুতাবিক আমরা লঞ্চে উঠে যুহরের সুন্নাত অবশ্যই পড়ে নিয়েছিলাম।

২১. পায়ে-হাতে ধরে নামায পড়াই: হযরত মাওলানা আবদুল মতিন নবীগঞ্জী সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দরগাহে হজরত শাহজালাল মসজিদ কিংবা তৎসংলগ্ন কাসিমুল উলূম মাদ্রাসায় প্রায়ই আসতেন। ফযরের নামাযের পূর্বে এখানে এসে বাইরে ঘুমন্ত 'মাজার জিয়ারতকারীদেরকে' জাগিয়ে তুলতেন। সজোরে জিকির-আজকার, লাঠি দ্বারা মৃদু আঘাত কিংবা পা-হাত টিপে লোকদেরকে জাগিয়ে তুলে বলতেন, "যাও! তাড়াতাড়ি অযু সেরে নামাযে শরীক হও!" লোকজন এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলো। কাতিয়ার শেখ সাহেব দরগা মসজিদে আছেন কিংবা আসছেন শোনলেই তাদের কান খাড়া হয়ে যেতো। আমরা অন্য কোন বুজুর্গ রাস্তা-ঘাটে মানুষকে নামাযের জন্য তাঁর মতো আহ্বান করতে দেখি নি। ফযরের সময়ে বিভিন্ন মসজিদে যেতেন নামাযে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে তুলতেন এবং নামাযে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিতেন।

দরগাহের মসজিদের ইমাম হযরত মাওলানা হাফিজ আকবর আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মাঝে-মধ্যে মশকরা করে বলতেন, "আপনি এই মানুষগুলোকে নামায পড়াতে পারেন না। আমি পড়াই।" ইমাম সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিতেন, "আপনি বড়ো বুজুর্গ! আমি ছোট। বুড়ো হয়ে গেছি। এসব কাজ পারি না।" হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা আমাকে বললেন, "ওবা আবদুল মতিন! আমি মানুষকে পায়ে-হাতে ধরে নামায পড়াই। তুমিও পায়ে-হাতে ধরে নামায পড়াতে রাজী আছো কি না বলো?" বললাম, "জী হুজুর! রাজী আছি। অবশ্যই রাজী।"

২২. আরেকটি কারামত: হযরত মাওলানা আবদুল মতিন নবীগঞ্জী সাহেব হযরতের একটি কারামত প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন, ইন্তিকালের পূর্বে হযরতের শরীরে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তিনি তখন অসুস্থ অবস্থায় তাঁর বড় সাহেবজাদির বাসায়। আমরা খবর পেয়ে কাজিটুলা মসজিদে ইশার নামায আদায় করে তাঁকে দেখতে যাই। এই দলে আমরা মোট আটজন ছিলাম।

হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন বিছানার উপর ঘুমোচ্ছিলেন। আমাদের আগমনের কথা জানতে পেরে উঠে বসে গেলেন। সালাম-কালাম শেষে আমরা তাঁর হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। এরপর তিনি বললেন, খাবার আনো, খাবার আনো! দস্তারখান বিছিয়ে দাও! এসময় রাত সাড়ে ন'টা হবে।

হযরতের সাহেবজাদী আশ্চর্য হয়ে আমাদেরকে অবগত করলেন, আব্বা সাহেব তো খাচ্ছেন না। তিনি খেতে পারছেন না। এখন হঠাৎ খাবার চাচ্ছেন যে! খাবার তখনো পকানো হয় নি। এছাড়া আমরা আটজন লোকের খাবার সাথে সাথেই প্রস্তুত হয়ে যাবার কথাও নয়। এই মুহূর্তে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। হযরতের নাতি মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী এসে বললেন, নানা সাহেব! উপশহর থেকে আপনার এক ভক্ত বেশ কিছু খাবার নিয়ে এসেছেন। আপনি খেয়ে নিন। হযরত বললেন, আনো, আনো তাড়াতাড়ি আনো। এরপর আমরা সকলে হযরতের সঙ্গে খাবার খেতে বসে পড়লাম। সবাই পেট পুরে খেলাম, হযরত নিজেও আমাদের সাথে খেলেন। ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর ওলির ইচ্ছাকে পূর্ণ করলেন। ঘরে খাবার প্রস্তুত হয় নি, তথাপি অন্য লোক দ্বারা খাবার পাঠিয়ে তাঁকে ও তাঁর মেহমানদেরকে খাওয়ালেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

২৩. চিতল পিঠা ও শাক দ্বারা খাবার: একদা আমি (গ্রন্থকার) কাতিয়া মাদ্রাসায় হযরতের খাস কামরায় উপস্থিত ছিলাম। আরো আট দশজন লোক ছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "থালা আনো, খাবার আনো, সবাইকে নিয়ে খাবার খাবো।" একজন খাদিম বড়ো একটি থালা এনে দিলেন। হাত ধৌত করে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরও যখন খাবার আসলো না, হযরত বললেন, "ওহে! কি হলো? খাবার কোথায়- ভাত-তরকারি কোথায়?"

খাদিম ইশারা-ইঙ্গিতে জানালো, বাড়িতে কিংবা বোর্ডিংয়ে খাবার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। হযরত বুঝতে পেরে বললেন, "আচ্ছা, দেখি আল্লাহ তা'আলা কিছু পিঠা-শাকও দেন কি না!" তাঁর এ কথায় আমরা আশ্চর্য হলাম। পিঠা-শাক আসবে কোত্থেকে?

কী আশ্চর্য! মাত্র মিনিট খানেক পর এক ব্যক্তি এসে কক্ষে ঢুকলো। তার হাতে বেশ বড়ো একটি টিফিন ক্যারিয়ার। হযরত বললেন, কে? এটা কি? তিনি বললেন, হযরত! আমি অমুক দূরবর্তী গ্রাম থেকে এসেছি। আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ কিছু চিতল-পিঠা ও শাক নিয়ে এসেছি! আমরা সকলে একথা শোনে একেবারে থ! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ওলিদের মনের আকাঙ্ক্ষা তিনি কেমনে যে পূর্ণ করবেন, তা কেউ জানে না। অবশেষে সবাই মিলে পেটপুরে ঐ মজাদার চিতল-পিঠা ও শাক দ্বারা খেলাম।

২৪. গানের মাহফিলে জিকরুল্লাহর আওয়াজ: হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল কদর খলীফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দামাত বারাকাতুহুম বর্ণনা করেন, হযরতের এক বিশিষ্ট মুরীদ আমাকে একবার একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেন। "হবিগঞ্জ এলাকায় কোন এক গ্রামে তিনি মেহমান ছিলেন। রাত গভীর হওয়ার পর শোনা গেল গান-বাজনার আওয়াজ। বেশ দূরে এক বিরাট গানের আসর চলছিলো। মেজবান মনে মনে ভেবেছিলেন, এতো দূর থেকে আওয়াজ এখানে আসবে না। কিন্তু মাইকের আওয়াজ এসে গেছে তা শ্রবণ করে তিনি কিছুটা লজ্জাবোধ করছিলেন। হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের আওয়াজ? তিনি আমতা আমতা করে বললেন, হযরত! মাফ করুন, আমি মনে করি নি এত দূর থেকে আওয়াজ এখানে আসবে। যা হোক, সবাই ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। রাত আরো গভীর হলো। হযরত কাউকে না বলে, গল্লা হাতে বেরিয়ে পড়লেন। মাহফিলের অনেকেই পরে বলেছেন, তিনি ঐ বিরাট প্যান্ডেলের দিকে ছুটে গেলেন। সরাসরি স্টেজে উঠে মাইক্রফোন হাতে নিয়ে জিকির শুরু করলেন। ইতোমধ্যে লোকজন চতুর্দিকে ছুটে পালালো। তিনি সবাইকে বলতে লাগলেন, ও মিয়ারা! আও, জিকির পড়ো! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

উল্লেখ্য সেখানে হাজার হাজার শ্রোতা ছিলেন, পাহারাদার হিসাবে পুলিশ-বিডিআর ছিলো। গায়ক-বাদক সবাই হযরতকে দেখেই চতুর্দিকে ছুটে পালায়। ছুটে পালানোর সময় অনেকে আছাড় খেয়ে পায়ে ব্যথা পয়েছেন, কেউ কেউ হাঁটুতে আঘাত পেয়েছেন। কারো কারো রক্ত ঝরেছে। হযরতের আহ্বানে এদের কেউ কেউ প্যান্ডেলের ভেতর ফিরে আসলেন। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ব্যাপার কি? আপনারা শুধুমাত্র শেখ সাহেবকে দেখেই এতো ভয় পেলেন বুঝি! ছুটে পালানোর সময় আছাড়-বিছাড় খেলেন? সে বললো, আমরা দেখলাম হযরতের পেছনে হাজার হাজার মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসছেন! আমরা জীবন রক্ষার্থে পালিয়ে যাই। অথচ, আসলে তিনি একাই সেখানে গিয়েছিলেন।”

২০. রাসূলপ্রেম: কথিত আছে তিনি যুবক থাকতে কোন কোনসময় ঘুম থেকে জেগে উঠে দা হাতে নিয়ে চিৎকার দিয়ে বলতেন, “যারা আমার নবীর বিরোধিতা করবে, আমি তাদের সবাইকে কতল করে দেবো!”

২১. হাওরের পানি কমার জন্য দু’আ: হযরতের খলীফা শাল্লার ক্বারী বিলাল আহমদ বর্ণনা করেন, “ঈসায়ী ২০০২ সনের চৈত্র মাসের শেষ দিকে বন্যার পানিতে বোরো জমিনের ফসল তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ সময় আমার প্রিয় মুর্শিদ হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমিরীগঞ্জ সফরে এসেছিলেন। আমি তখন শাল্লা থানার মনুয়া গ্রামের জামে মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করছিলাম। মনুয়াবাসী হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে আসার জন্য আমাকে অনুরোধ জানালেন। তাদের ইচ্ছা ছিল, হযরতের মাধ্যমে বন্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দু’আ করানো। সুতরাং আমি আজমিরীগঞ্জ চলে গেলাম।

এখানে এসে তাঁকে আরজ করলাম, হুজুর! মনুয়াবাসীর পক্ষ থেকে আপনার নিকট সালাম পেশ করছি। একখানা দরখাস্ত - ঐ এলাকায় বন্যার পানি এসে বোরো জমিন তলিয়ে নিচ্ছে। তাদের ইচ্ছা আপনি আল্লাহর দরবারে দু’আ করবেন। তিনি আমাকে বললেন, “চলো! ঐ হাওরে যেতে হবে”। সুতরাং একখানা নৌকোযোগে তাঁকে নিয়ে চললাম মনুয়া ও সাহাদব পাশা গ্রামের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত বাজাইয়া

নামক বিলের দিকে। সেখানে পৌঁছার পর তিনি বললেন, “কারী বেলাল! আযান দাও”। আমি আযান দিলাম। এরপর বললেন, “সবাই অযু করে দুই রাকাআত নামায পড়ো”। নামায শেষে বিলের কিনারায় বসে আমার মুর্শিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অল্প কিছু পানি হাতে তুলে নিলেন। এরপর বললেন, “হে পানি! তুমি যেভাবে এসেছিলে, আল্লাহর ওয়াস্তে সেভাবে চলে যাও! মানুষকে কষ্ট দিও না”। সুবহানাল্লাহ! এর পরদিন থেকেই পানি এমনভাবে কমতে লাগলো যে, মানুষ নির্বিঘেœ ধান কেটে ঘরে তুলে নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত আর পানি আসলোই না।”

২২. ঝড়-বৃষ্টি থামানোর কারামত: ক্বারী বিলাল আহমদ বর্ণনা করেন, “জুন ২০০৯ ঈসায়ী সনের শেষের কথা। এ সময় আজমিরীগঞ্জ ঈদগাহ ময়দানে কুরআন তাফসীর সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন আমার প্রিয় মুর্শিদ কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইশার পর হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব তাফসীর পেশ করছিলেন। এমন সময় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে এক বিরাট মাত্রার ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হলো। প্যান্ডালের সামিয়ানা হালকা থাকায় বৃষ্টির পানি পড়তে লাগলো। শ্রোতারা উঠে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন। অনেকে চলে যাচ্ছিলেন।

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাইক্রফোন হাতে নিয়ে সবাইকে জোরেসুরে বললেন, “আপনারা কেউ উঠবেন না! সকলে দুনিয়ার চর্মচক্ষু বন্ধ করে আল্লাহ তা’আলার দরবারে দু’আ করুন”। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সকলে হাত উঠালেন। দু’আ শুরু হলো। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দু’আর মধ্যে বললেন, “হে আল্লাহ! আপনার পবিত্র কুরআনের তাফসীর শোনছেন এই মজলিসের সবাই। এমতাবস্থায় যদি আপনার মাখলুক গাইরুল্লাহর ঝড়-বৃষ্টির কারণে শ্রোতারা চলে যান, তাহলে তো আপনার কোন লাভ হবে না। অপরদিকে শ্রোতারা যদি শান্তিমতো তাফসীর শ্রবণ করেন তাহলেও আপনার কোন ক্ষতি নেই। ওগো আল্লাহ! তাহলে কেনো আপনি শ্রোতাদেরকে উঠিয়ে দেবেন? বরং আপনার ঝড়-বৃষ্টিকে দয়া করে সরিয়ে দেন যাতেকরে আমরা শান্তিমতো কুরআনের তাফসীর শোনতে সক্ষম হই”। আল্লাহর কী মেহেরবানী! তাঁর ওলির হাত ওঠানো থাকাবস্থায়ই ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলো।”

২৩. অপর একটি কারামত: হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান এডভোকেট বর্ণনা করেন, "হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারিগ হয়ে দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পর সুনামগঞ্জে প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। চতুর্দিকের ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ধানক্ষেত জ্বলে ছাই হওয়ার উপক্রম। মানুষের মধ্যে ভীষণ হাহাকার-আতঙ্ক। এমতাবস্থায় অনেক লোক হযরত শায়খে কাতিয়ার নিকট ছুটে গেলেন। অনুরোধ জানালেন, হযরত! আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি এসে হাত উঠালেন। সাথে সাথে দেখা গেল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। মুনাজাত শেষ হতে না হতেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি! হযরত মুনাজাত শেষ করে মসজিদের ভেতর গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিজে যাওয়া থেকে নিস্তার পান।"

২৪. লঞ্চের ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার ঘটনা: হযরতের খলীফা মাওলানা লুৎফুর রহমান এডভোকেট বর্ণনা করেন, "সম্ভবত ১৯৭৫ ঈসায়ী সালের কথা। সুরমা নদীপথে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লঞ্চযোগে কোথাও যাবেন। কিন্তু লঞ্চঘাটে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে লঞ্চ ছেড়ে চলে গেছে! তবে তখনো তা দেখাচ্ছিল। তিনি লঞ্চের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন। সাথে সাথে লঞ্চের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল! কিছুতেই তা আর স্টার্ট হচ্ছিলো না। নিরুপায় হয়ে লঞ্চখানা পুনরায় ঘাটে নিয়ে আসলেন চালক। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লঞ্চে আরোহণ করলেন। আল্লাহর কী কুদরত! সাথে সাথে লঞ্চের ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল!"

২৫. মসজিদ থেকে গায়েব: হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান এডভোকেট বলেন, "সুনামগঞ্জ শহরের মহিলা কলেজের নিকটে ১৯৮০ ঈসায়ী সালের দিকে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গান চলাকালে হঠাৎ হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে উপস্থিত হয়ে নির্ভীকচিত্তে প্যান্ডেল, মঞ্চ ইত্যাদি ভেঙ্গে তছনছ করে দিলেন। সিংহের মতো তাঁর গর্জনে লোকজন ভয়ে চতুর্দিকে পালাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর পুলিশ খবর পেয়ে নিকটস্থ মসজিদটি ঘেরাও করলো। হযরত কুতবে যামান তখন ঐ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। পুলিশ তাঁকে

গ্রেফতার করতে চেয়েছিল কিন্তু তারা ভেতরে ঢুকে দেখে তিনি সেখানে নেই! ইতোমধ্যে কখন যে পুলিশের সামন দিয়ে নির্বিঘেœ বের হয়ে চলে গেছেন তা তারা টেরই পায় নি। এমনকি কেউ তাঁকে দেখতেও পারলো না।”

২৬. অপূর্ব হিকমাত: মাওলানা সাইদুর রহমান সাহেবজাদায়ে বর্ণবী রাহমাতুল্লাহি বর্ণনা করেন, “সম্ভবত **১৯৭২** সালের কথা। সুনামগঞ্জ থেকে ই’তিক্বাফ পালন শেষে ঈদের দিন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও কুতবে দাওরান হযরত লুৎফুর রহমান বর্ণবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীপযোগে সিলেট যাচ্ছেন। পথিমধ্যে মহাসড়কের পাশেই উজানি গাঁও নামক একটি গ্রামের মাঠে চলছে ষাঁড়ের লড়াই। অসংখ্য দর্শক। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ড্রাইভারকে বললেন, গাড়ি থামাও! হযরত বর্ণবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে তাকিয়ে বললেন, হযরত! এই লড়াই বন্ধ করতে হবে! তিনি বললেন, কিভাবে করবেন? হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গাড়ি থেকে নেমে গল্লা উঁচিয়ে মাঠের দিকে তাকালেন। এরপর চিৎকার দিয়ে বললেন, “হে লোকসকল! আমার সাথে এই গাড়িতে বড়ো ডি.সি. সাহেব আছেন! লড়াই এক্ষুণি ভেঙ্গে দাও! না হয় বিরাট বিপদ হবে।” লোকজন একথা শোনে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ময়দান খালি!”

২৭. এক্সিবিশন ভাঙ্গন: হযরত শায়খে কাতিয়া একাধিকবার ‘এক্সিবিশনের’ নামে ইসলামের শিক্ষা বিরোধী অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করেছেন। ইতোমধ্যে আমরা সুনামগঞ্জ শহরে **১৯৬৫** সালে এক বিরাট এক্সিবিশন হযরত কর্তৃক ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছি। হযরতের খলীফা জনাব লুৎফুর রহমান এডভোকেট আরো একটি অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “সম্ভবত **১৯৬৮** ঈসায়ী সনের কথা। সুনামগঞ্জ শহরের বালুর মাঠে এক বিরাট এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়। হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ উলামায়ে কিরাম এর প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করেন। এতে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ নেন। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মঞ্চে উঠে বললেন, “ভাইসব! আপনারা কোনো

প্রকার ভয় করবেন না। আমাদের নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু করবেন না। আমি আমীনুদ্দীন সবার আগে থাকবো। গুলি চালালে আমার বুকে গুলি চালাবে।”

এদিকে পুলিশ এসে সভাস্থলের চতুর্দিক ঘেরাও করে নিয়েছে। শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে হাজার হাজার মুসলমান প্রস্তুতি নিয়েছে শাহাদাতবরণের। দাঙ্গা পুলিশের অবস্থান দেখে হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি সিংহের মতো গর্জে উঠলেন। মাইক হাতে নিয়ে ঘোষণা দিলেন, “এস.ডি.ও. সাহেব! সাহস থাকলে আপনার এক্সিবিশন প্যান্ডেলের নিকটে চলে আসুন! আমি আমিনুদ্দীন ঘোষণা দিচ্ছি এক্ষুণি আপনার এক্সিবিশন প্যান্ডেল উড়িয়ে দেওয়া হবে”। এই ঘোষণার সাথে সাথে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো “নারায়ে তাকবীর! আল্লাহু আকবার!” বজ্রধ্বনি। প্রকম্পিত হয়ে উঠলো সুনামগঞ্জের আকাশ-বাতাস। অবস্থা বেগতিক দেখে এস.ডি.ও. সাহেব কেঁপে গেলেন। তাঁর সবকিছু ব্যর্থ! সমস্ত পরিকল্পনা ভুণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু উপায় নেই। ছুটে আসলেন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে। করজোড়ে ওয়াদা করলেন, নিজের হাতে প্যান্ডেল ভেঙ্গে দেবেন। এই ওয়াদা শ্রবণ করার পর উপস্থিত জনতাকে শান্ত করে হযরত শায়খে কাতিয়া বললেন, আপনারা শান্ত হোন। এস.ডি.ও. সাহেব নিজেই ওয়াদা করেছেন এই এক্সিবিশন ভেঙ্গে দেবেন। পরে এদিনই নিজের হাতে এস.ডি.ও. সাহেব এক্সিবিশনের জন্য তৈরী প্যান্ডেল ভেঙ্গে দেন।”

২৮. ভণ্ড ব্যক্তির তওবাহ: গত ১৯ মার্চ ২০০৩ ঈসায়ীর কথা। বিকেল ৪টায় কুশিয়ারার তীরে বড় ফেচির বাজার লঞ্চঘাটে একখানা শেরপুরগামী লঞ্চে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আমি (লেখক) ও আরো দু’চারজন আরোহণ করলাম। উঠতেই ঘটে গেল এক মহাকাণ্ড! উচ্চপর্যায়ের হালের অবস্থায় ছিলেন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। লঞ্চে আরোহণের ক’টি ক্ষণ পরই তাস খেলারত চার যুবকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, “হে-ই, এদের ধরে আনো!”

চার জনের মধ্যে তিন জনই ভয়ে ছোটাছুটি করতে করতে গায়েব হয়ে গেল। এদের একজন নদীতে লাফ মেরে পড়ে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছে জান বাঁচালো। তবে পারলো না চতুর্থ এক অসহায় যুবক। দু'চারজন তাকে ধরে নিয়ে এলো। ততক্ষণে শেখ সাহেব লঞ্চের পেছনের 'নামাযের' স্থানে আরোহণ করে বসে পড়েছেন। আমিও তাঁর পাশে বসে পড়লাম। তাস-খেলোয়াড় ছেলেটি ভয়ে কাঁপছিলো। ইতোমধ্যে 'তামাশা' দেখার জন্য অনেকে এসে চতুর্দিকে ভিড় জমিয়েছেন। লঞ্চ তখন ছুটে চলছে শেরপুরের দিকে।

শায়খে কাতিয়া ছেলেটিকে ধমকের সুরে কাছে ডেকে আনলেন। যুবকটির হাঁটুতে ঈষৎ কম্পন শুরু হয়েছে। হযরত তাকে সজোরে কয়েকটি থাপ্পড় মারলেন। ৬-৭টি থাপ্পড় মারার পর বললেন, তাস কৈ? বের কর! সে পকেট থেকে একমুষ্ঠি তাস বের করলো। তিনি বললেন, এগুলো নদীতে ছুঁড়ে ফেল্! সে তাই করলো। বললেন, তাস খেলা ভালো নয়। বল্, আর কোনদিন তাস খেলবি না। সে কসম করে বললো, আর কখনও তাস খেলবে না। ছেলেটাকে ছেড়ে দিলেন। শেখ সাহেব আমার গায়ের চাদরখানার উপর আবার বসে পড়লেন। হালের অবস্থায় তিনিপ্রায়শঃ অনবরত কথা বলে থাকেন। এখনও তা-ই করছেন। প্রতিটি কথাই তাঁর মণি-মুক্তা তূল্য। সুন্নাতের পাবন্দী, ঈমান-আমল ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সবাইকে উপদেশদিয়ে থাকেন। সময় সময় কুরআন শরীফ ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উদ্ধৃতি এবং বিভিন্ন রিওয়ায়েত কথার সমর্থনে তুলে ধরেন।

কথা-বলার ফাঁকে হঠাৎ একব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, ও-বা পীরসাব! তোমার গলাত্ ইটা কি-তা? লোকটি চমকে উঠলো। তাকে 'পীরসাব' বলে সম্বোধনের কারণ হলো, সে 'লাল কোর্তা' পরিহিত 'কাট্টাচুল্লা' ফকীর। লোকটির গলায় একটি তামার বড় লকেট ঝুলছে। আমি লক্ষ্য করলাম এতে আজমীর শরীফ মাজারের ছবি খোদাই করা আছে। দু'হাতের কব্জায় একজোড়া ভারী 'বালা'ও শোভা পাচ্ছিল। সে হযরতের কথা শোনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লো। বুঝাই যাচ্ছে তার দিল কেঁপে উঠেছে। জবাবে বললো, হুজুর! আমি এটা বরকতের জন্য পরেছি। তিনি বললেন, আরে মিয়া, বরকত তো আল্লাহ্ দেবেন, এটা তা দিতে পারবে কি? আচ্ছা, এটি আমার হাতে দেওতো। সে তাই করলো। ভারী তামার লকেটটি হযরত হাতে

নিয়ে একটু ওলট-পালট করে এটিকে দেখলেন, তারপর তা নদীতে ছুঁড়ে মারলেন! আমি ভণ্ড এই পীরের দিকে খুব তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য, তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। সে ততক্ষণে ভয়ে দস্তুরমতো কাঁপছিলো।

হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো মুর্শিদ আছেন? জবাবে সে অপরিচিত একব্যক্তির নাম বললো। তিনি নাকি বিশ্বনাথের কোনো এক গ্রামের বাসিন্দা। হযরত বললেন, মনে রেখো- শরীয়তের ভিতরই পীরাকী ও মা'রিফাত নিহিত। নামায-রোযা পালন না করে, শরীয়তের কোন নির্দেশ অমান্য করে কেউ যদি শূন্যে উড়ে যেতেও সক্ষম হয়, তবুও মনে করিও সে ভণ্ড! সুতরাং ভণ্ডামি ছেড়ে দাও। লোকটি এবার সকাতরে বললো, হুজুর দয়াকরে আমাকে মুরীদ করুন! সে তখন হযরতের নিকট তাওবাহ ও বাইআতগ্রহণ করে ধন্য হলো। কী আশ্চর্য ব্যাপার! একটা আস্ত ভণ্ড লোক মাত্র ক'টি ক্ষণেরভেতর তাওবাহ করে হযরতের এক মুরীদে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এরূপ ঘটনা জগতে ক'জনের বেলা ঘটে থাকে, ভাবার বিষয় নিশ্চয়ই।

২৯. একটি ভবিষ্যদ্বাণী: ২০ মার্চ ২০০৩ ঈসায়ী। আমি (লেখক) হযরতের সফরসঙ্গী খাদিম হিসাবে তাঁর সঙ্গে হবিগঞ্জ জিলাধীন চাঁদপুর নামক একটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত এক মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় উপস্থিত ছিলাম। ভোর চারটায় তাহাজ্জুদের সময় শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জেগে উঠলেন। আমরা উভয়ে মাদ্রাসার একটি কক্ষে রাত্রিযাপন করছিলাম। ফযরের নামায সকাল ৬টায়। হযরত আমাকে দেখেই বললেন, "কামরান পাশ করেছে!"

আমি তাঁর এ মন্তব্যে অবাক! এদিন ছিলো বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ, ০৩ ঈসায়ী। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। অথচ হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব বদরুদ্দীন আহমদ কামরানকে এখনই বিজয়ী ঘোষণা করছেন! আশ্চর্য হবার বিষয় নয় কি? আমি আরজ করলাম, হুজুর! ইলেকশন তো এখনও হয় নি! তিনি আবার বললেন, "আমি দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি- কামরান বিপুল ভোটে পাশ করবে।" তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী পরদিনই সত্যে পরিণত হয়। ফিল্ড ভালো ছিলো না

বলে অনেকের ধারণা থাকলেও জনাব বদরুদ্দীন কামরান সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে (প্রায় ২৩ হাজার অতিরিক্ত বেশী ভোট পেয়ে) সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন।

৩০. এখন থেকে 'কওমী' না বলে 'বেসরকারী মাদ্রাসা' বলুন: ঈসায়ী ২০০৫ সালের ২৪ আগষ্ট বুধবার। এদিন বাদ আসর ঐতিহ্যবাহী 'জামিয়া কাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল' মাদ্রাসার বাৎসরিক 'খতমে বুখারী অনুষ্ঠান' হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগ দেওয়ার কথা। একই দিন বাদ যুহর থেকে 'ইসলামী সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সুলায়মানহলে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের একজন শাইখুল হাদীস। এছাড়া হযরত মাওলানা আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার কথা। আসরের পূর্বে হঠাৎ শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমন্ত্রিত অতিথি না হয়েও উক্ত সেমিনার কক্ষে যেয়ে উপস্থিত হলেন। এসময় মূল প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন মাওলানা আবদুল বাসিত সাহেবজাদায়ে শায়খে গাজিনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরতকে দেখে সকলেই তাকবীর দিতে দিতে মঞ্চে নিয়ে উপবিষ্ট করালেন। মূল প্রবন্ধ পাঠ শেষে মাইক্রোফন হাতে নিয়ে হযরত শায়খে কাতিয়া ঘোষণা দিলেন, "আজ থেকে সবাই ক্বওমী মাদ্রাসা না বলে বলবেন, 'বেসরকারী মাদ্রাসা'।" দলীল হিসাবে তিনি হযরত মাওলানা আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর সবাইকে দরগাহ মাদ্রাসায় 'খতমে বুখারী' অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলেন। [প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমি (লেখক) উপস্থিত ছিলাম]

৩১. ঘুষ খাবে না মিথ্যাও বলবে না: বিশিষ্ট আইনজীবি, ইনকামট্যাক্স বিশেষজ্ঞ, চৌকীদেখি নিবাসী মরহুম এডভোকেট আবদুল মতিন (কুটি মিয়া) সাহেব (লেখকের চাচাতো ভাই) বর্ণনা করেন, 'সত্তুর দশকের মাঝামাঝি সময়ে

ওকালতি সমাপ্ত করে রাজনীতিক কারণে একদা আমি ও আমার এক চাচা কবি আবুল বশর আনসারী (বনগাঁওর বশর মিয়া) সাহেব হযরত শায়খে কাতিয়ার গ্রামের বাড়ি যাই। হযরতের সঙ্গে আলাপকালে এক পর্যায়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওকালতি পাশ করেছো। খবরদার! ঘুষ খাবে না এবং মিথ্যাও বলবে না!" তাঁর এই কথাগুলো আমি কখনো ভুলি নি। (লেখকের নিকট বর্ণনাকাল: ২০০৮ ঈসায়ী)

৩২. দাওয়াতী কাজে কৌশল: দাওয়াতী কাজের জন্য হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পুরো সিলেট বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। পাকিস্তান আমলে একদা কুতবে দাওরান হযরত লুৎফুর রহমান শায়খে বর্নভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সফরসঙ্গী হিসাবে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানাধীন ঝিগলী গ্রামে এক 'বাহাসে' অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে চতুর্পাশ্বস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ অনেক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আট-গ্রামের বিচারক, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও কবি আবুল বশর আনসারী (জগন্নাথপুর থানাধীন বনগাঁওর বশর মিয়া) সাহেব ছিলেন 'বাহাসের' প্রধান বিচারক। তিনি এই লেখকের নিকট (২০১০ সালে) বর্ণনা করেন, "বাহাস শেষে হযরত শায়খে কাতিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের গ্রামে যেয়ে 'দাওয়াত' দেওয়া। তবে আমি তাঁকে দাওয়াত করলাম না। এক পর্যায়ে বললেন, আপনার পিতা মরহুম আমজদ আলী সারং সাহেবের কবরটি হযরত বরুণার সাহেব জিয়ারত করার ইচ্ছা রাখেন। আশাকরি তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আমি বললাম, আমার বাড়িতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। এরপর সত্যিই উভয় বুজুর্গ (মাইল দেড়েক দক্ষিণে অবস্থিত) বনগাঁওয়ে আমাদের পূর্ববাড়িতে আসলেন।"

উল্লেখ্য, সম্ভবত এ সময়ই বনগাঁও গ্রামের বিশিষ্ট মুরুব্বি মরহুম জনাব সালিম উল্লাহ সাহেব হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ণবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। আমি (লেখক) এই ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম অবগত হলাম, হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (একবার হলেও) অধমের জন্মস্থান 'বনগাঁও পূর্বের বাড়ি' তাশরিফ নিয়েছিলেন।

৩৩. ইয়াতীমের প্রতি দরদ: আমার (লেখকের) স্ত্রী মমতাজ বেগমের বড় বোনের ছেলে নূরুজ্জামান। তিনি তখন (১৯০৭ ঈসায়ী) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স-এ অধ্যয়নরত। কিছুদিন পূর্বে তার বাবা ও মা মৃত্যুবরণ করেছেন। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা আমার সুবিদ বাজারস্থ বাড়িতে মেহমান হলেন। নূরুজ্জামান তাঁকে দেখতে আসলেন। হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা কেমন আছেন, মা কেমন আছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমারা মা-বাবা উভয়ে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত সাথে সাথে খুব দুঃখভারাক্রান্ত সুরে উচ্চারণ করলেন, "আহ! সে ইয়াতীম! সে ইয়াতীম!" তিনি নুরুজ্জামানকে খুব আদর করলেন। কিছু হাদিয়া দিলেন।

ইয়াতীমের প্রতি দরদের আরেকটি উপমা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। কাতিয়া মাদ্রাসায় একবার আমি তিন দিনের জন্য অবস্থান করি। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন মাদ্রাসায়ই ছিলেন। তাঁর সুহবতে থাকার উদ্দেশ্যেই কাতিয়া গিয়েছিলাম। একদিন ভোরে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফযরের নামায শেষে দু'আর সময় অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। দু'আর মধ্যে তিনি আর কিছুই বললেন না- শুধু ক্রন্দন ছাড়া। মাদ্রাসার একজন শিক্ষক পরে মন্তব্য করলেন, "আমি হযরতকে দু'আর সময় এভাবে কাঁদতে কোনদিন দেখি নি।" অধম এই দু'আয় শরীক ছিলাম এবং চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নি। দু'আয় আরো শরীক ছিলেন ভাটির অঞ্চল থেকে আগত এক যুবক। তিনি তিনদিন যাবৎ অবস্থান করছিলেন মাদ্রসায়। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তার উদ্দেশ্য হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ। কিন্তু হযরত তাকে মুরীদ বানাতে চাচ্ছেন না। এক পর্যায়ে তাকে বললেন, "তোমাদের এলাকায় কি কোন মুর্শিদ নেই? যাও! সেখানকার কারো নিকট মুরীদ হও!"

এরপর ঐদিন ভোরে দু'আ শেষে হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও? যুবক বললেন, মুরীদ হতে চাই! তোমার মা-বাবা আছেন? জি না হুযুর। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, "ওহ! তুমি ইয়াতীম, ইয়াতীম। আচ্ছা বাবা, আসো তুমি তাওবা করো।" এরপর তাকে বাইআত করালেন।

৩৪. উত্তম মেজবান: হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মেহমানদের সেবার ক্ষেত্রে কিরূপ সতর্ক ছিলেন এবং কিভাবে মেহমানদারী করতেন তা সবার জানা। মেহমানদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিলো অনুসরণীয় আদর্শ স্বরূপ। ২০০৮ সালে আমি (লেখক) আমার অসুস্থ পিতা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে যাই কাতিয়া মাদ্রাসায়। সফরসঙ্গী হিসাবে আরো ছিলেন আমার স্ত্রীর বোনজির স্বামী হযরতের একজন ভক্ত মুরীদ জনাব আলী উসমান খান। তার বাড়ি নেত্রকোণা শহরের কাটলি নামক মহল্লায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, খান সাহেবের স্ত্রী নূরুন্নাহার বেগমও হযরতের মুরীদা। ২০০5 সালে তিনি হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন নিজের বাড়িতেই। নেত্রকোণা অঞ্চলে এক সফরে আমি হযরতের সাথে ছিলাম। নূরুন্নাহার বেগম বেশ আগে একদিন আমাকে টেলিফোনে জানালেন, “মামা! আমি স্বপ্নে দেখেছি, কাতিয়ার শেখ সাহেবকে নিয়ে আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন।” সফরের সময় কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। আমরা তখন আলী উসমান খানের বাড়ির বেশ নিকটেই ছিলাম। বাড়ির নিকটস্থ রাস্তা দিয়েই আমাদের লাইটেস গাড়ি যাবে। এটা জানতে পেরে আমি নূরুন্নাহার বেগমকে মোবাইলে বললাম, সম্ভবত আপনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করবে। আমি আশা করছি হযরত শায়খে কাতিয়াকে নিয়ে আপনাদের বাড়িতে উঠবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। এরপর আমি হযরতকে ঐ বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য ওঠার আবেদন জানালাম। প্রথমে তিনি রাজী হলেন না। আমি নূরুন্নাহার বেগমের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতেই বললেন, “চলো! স্বপ্নে দেখেছেন, চলো!” এরপর সত্যিই কয়েক মিনিটের জন্য খান সাহেবের বাড়িতে উঠলেন এবং নূরুন্নাহার বেগম হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। অবশ্য তার স্বামী খান সাহেব বেশ আগেই সিলেটে হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। যাক, ফিরে আসি সেদিনের কথায়।

যুহরের নামায শেষে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাতিয়া মসজিদের মিম্বরে বসে আমার আব্বার আগমনের কথা সবাইকে বললেন। এরপর তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করলেন সবাইকে নিয়ে। নামায শেষে আমাদেরকে নিয়ে

চলে গেলেন হিফজখানার দু'তলায়। হিফজে মশ্‌করত সকল ছাত্রদের নিয়ে আবার আমার আব্বার জন্য দু'আ করলেন। নিজের 'হুজরায়' যেয়ে উপস্থিত সকলকে নিয়ে তৃতীয়বার দু'আ শেষে চলে গেলেন স্বীয় বাড়ির বাংলা ঘরে। আমাদেরকে নিয়ে একই সাথে খাবার খেলেন। নেত্রকোণার খান সাহেবকে নিজের সঙ্গে একই থালায় বসে খেলেন এবং বারবার বললেন, "তিনি ঐ নেত্রকোণা থেকে এসেছেন! নেত্রকোণা থেকে এসেছেন!"

বিদায় বেলা চলে আসলেন আমাদের সঙ্গে মাইলখানেক পূর্বে ফেসির বাজার পর্যন্ত। এতো বড় বুজুর্গ, ওলিআল্লাহ হয়েও হযরতের এরূপ হৃদয়াকর্ষক ব্যবহারে আমার ভীষণ অসুস্থ আব্বা ও দূরের মেহমান আলী উসমান খান সাহেব সত্যিই সেদিন আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা অবাকও হয়েছেন হযরতের মুলায়িম এই ব্যবহারে। আমার আব্বাজানের সঙ্গে এটাই ছিলো হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শেষ দেখা। ঐ বছর রমজান মাসে আমার আব্বা হাজী আলী আসগর সাহেব ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। ৬ রমজান হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দরগা মসজিদে বাদ যুহর হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বেচ্ছায় জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। আমার ওয়ালিদ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট এক মুরীদ। আল্লাহ তা'আলা উভয় বুজুর্গকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

৩৫. সাহস ও হিকমাত: হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমাজ-বিধ্বংসী অনৈসলামিক কোন কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এগুলোর প্রতিরোধে তিনি সাহস ও হিকমাতের সাথে গর্জে ওঠতেন। আমরা ইতোমধ্যে বেশ ক'টি ঘটনার বর্ণনা করেছি। তিনি কিভাবে গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দনের বিরোধিতা করেছেন তার নমুনা অনেকটা ওসব ঘটনা থেকে ফুটে ওঠেছে। এখানে আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরছি। এ থেকেও তাঁর সাহসিকতা ও হিকমাতের মিছাল অনুভব করা যায়।

ঘটনা দু'টোর প্রত্যক্ষদর্শী দক্ষিণ সুনামগঞ্জের ডুংরিয়া নিবাসী মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব। হযরতের বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্ত এই মাওলানা সাহেব বলেন, “আমি তখন জামিয়া কাসিমুল উলূম (দরগাহে হযরত শাহজালাল) মাদ্রাসার ছাত্র। আলিয়া আউয়াল কাফিয়া জামাআতে পড়ি। আনুমানিক ১৯৭৭ সালের কথা। তখন মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেব দেশে মার্শাল ল জারী করেছেন। সিলেট শহরের স্টেডিয়াম মাঠে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এতে গান-বাজনা, নৃত্য ইত্যাদি অসামাজিক ও ইসলামের শিক্ষাবিরোধী কাজকর্ম চলছিলো। সিলেটের উলামায়ে কিরাম এবং তাওহিদী জনতা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জামিয়া কাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল রাহ. এর তখনকার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল হান্নান দিনারপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী চকরিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কামিসুল উলূম দরগাহ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস শায়খ ফজলুর রাহমান বানিয়াচংয়ী ও অন্যান্য।

আন্দোলনকে গতিশীল ও সফল করতে সিলেটের তাওহিদী ছাত্র-জনতা নিয়ে রেজিস্ট্রারী মাঠে এক প্রতিবাদসভার আয়োজন হলো। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সভা যাতে হয় না সেজন্য সিলেটের সেক্টর কমান্ডার, ডিসি এবং কর্তৃপক্ষ জারী করলেন রেজিস্টারী মাঠ এলাকায় ১৪৪ ধারা। এরপরও নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে মিছিলসহ রেজিস্ট্রারী মাঠে যেতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং চতুর্দিক থেকে অনেক লোক মাঠের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, লোহার গ্রিল লাগিয়ে রেজিস্ট্রারী মাঠের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মোতায়েন আছে অনেক পুলিশ-বিডিআর। সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মাঠে প্রবেশের সাহস করতে পারছিলেন না কেউ। এভাবে বেশ সময় কেটে গেল।

আমরা নিরাশ হয়ে গেলাম। কেউ কেউ ফিরে যেতে প্রস্তুতি নিলেন। এরপর হঠাৎ কোত্থেকে হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে উপস্থিত হলেন। জোরে সুরে সবাইকে বললেন, “কেউ যাবেন না! সকলে কও, হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়ানি'মান্ নাসির!” তিনি গেটের সামনে পায়চারি দিতে দিতে এই দু'আ পড়তে লাগলেন। আমরা সকলে

তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পড়তে লাগলাম। এরপর এক পর্যায়ে হঠাৎ খুব সজোরে গ্রিলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন! সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শত মানুষ হৈ-হুল্লুড় করে মাঠে ঢুকে গেলেন। পুলিশ-বিডিআর এই অবস্থায় কি করবে না বুঝতে পারছিলো না। তারা সরে দাঁড়ালো।

মাঠের ভেতর কোনো স্টেজ ছিলো না। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একখানা ভাঙ্গা ট্রাকের উপর আরোহণ করলেন। এটাকেই স্টেজ বানানো হলো। দ্রুত সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। একজন নেতা প্রদর্শনী বাতিলের দাবী সম্বলিত কয়েকটি প্রস্তাব পাঠ করে শুনালেন। কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসলেন স্বয়ং সেক্টর কমান্ডার সাহেব।

ভাঙ্গা ট্রাকে ওঠে তিনি সজোরে ঘোষণা দিলেন, “আপনারা দেশের আইন ভঙ্গ করেছেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছেন। এই মুহূর্তে মাঠ ছেড়ে চলে যান। অন্যথায় আমি গুলির ওর্ডার দিতে বাধ্য হবো!” তার কথা শেষ হতে না হতেই উপস্থিত জনতা চতুর্দিকে ছুটে পালালো! কেউ কেউ জুতা-ছাতা ফেলে প্রাণ বাঁচাতে মাঠ ছেড়ে উধাও হলেন! মাত্র মিনিট খানেকের মধ্যেই ময়দান খালি! আমি ও আরো ক’জন উলামা এবং মাদ্রাসা ছাত্র নেতৃবৃন্দের পাশে থেকে গেলাম। তাঁরা তখনো ভাঙ্গা ট্রাকের উপর ‘স্টেজে’ ছিলেন।

কমান্ডার এবার নেতাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, “এ কেমন কাজ হাযারাত? দেশের আইন মানা কি ইসলামে নেই? আপনারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছেন। দেশে এখন সামরিক আইন চলছে! আপনারা জানেন না?” প্রথমে কেউ কিছু বললেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের মধ্যে কে জবাব দিবেন?” হযরত শায়খে কাতিয়া এগিয়ে এসে বললেন, “আমি জবাব দেবো!” কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে?” তিনি বললেন, “আমি সমগ্র সু-নামগঞ্জ মহকুমার সকল মাদ্রাসার প্রেসিডেন্ট! বলুন, প্রেসিডেন্ট!”

হযরতের এরূপ তেজোদ্দীপ্ত কথা শ্রবণ করে কমান্ডার সাহেবও যেনো কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা আপনারা চলুন- অফিসে যাই। মাঠের পশ্চিমের

'পূর্ত ভবন' বিল্ডিংয়ের দু'তলায় সকলে চলে গেলেন। আমি ও আরো দু'একজন তাঁদের সাথী হলাম। কমান্ডার সাহেব বললেন, আপনারা কি চান? কেনো আপনারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেন? হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমরা দেশের আইনের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ইসলাম ও সমাজবিরোধী কাজ প্রকাশ্যে সংঘটিত হবে- তা আমরা কখনো বরদাশত করবো না। আপনি যেরূপ সরকারের নির্দেশ মেনে চলছেন, ঠিক তদ্রূপ আমাদেরকে সকল বাদশাহর বাদশাহ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আমাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে। ঠিক যেভাবে আপনার উপরও সরকারী শাস্তি পতিত হবে। আমরা আল্লাহর নির্দেশ মানতে যেয়ে শহীদ হবো, কিন্তু ঐ স্টেডিয়াম মাঠে অশ্লীল সমাজবিধ্বংসী অনৈসলামিক কাজ অব্যাহত থাকতে দেবো না!

কমান্ডার সাহেব তাঁর বক্তব্য শুনে ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে গেলেন। এরপর বললেন, ঠিক আছে হযরত! শুধুমাত্র পণ্যের প্রদর্শনী চলতে কি আপনাদের আপত্তি আছে? নেতৃবৃন্দ বললেন, না আপত্তি নেই। নাচ-গান, বাজনা-বাদ্য ইত্যাদি বন্ধ করে দিন- এতেই আমরা সন্তুষ্ট হবো। কমান্ডার সাহেব তা-ই করবেন বলে সবাইকে নিশ্চয়তা দান করলেন।"

মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব আরেকটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কিছুদিন পরের কথা। একদা চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেব সিলেটে এসেছেন। দরগাহে হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদের সামনে খোলা জায়গায় এক সভার আয়োজন হলো। প্রধান বক্তা জিয়াউর রহমান সাহেব। অনেকের মতো আমিও শ্রোতা। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো এক স্থানে বসে জিয়া সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করছিলেন। বক্তৃতাদানকালে মানুষ বার বার হাততালি দিচ্ছিলেন। হঠাৎ হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লাফ মেরে স্টেজে উঠে গেলেন! জোরে সুরে বলতে লাগলেন, "কেউ হাততালি দিবেন না! হাততালি দিবেন না! মুসলমানদের জন্য হাততালি দেওয়া শোভা পায় না। এটা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কাজ! হাততালি বন্ধ করুন!"

জিয়াউর রহমান সাহেব কথা থামিয়ে অবাক দৃষ্টিতে হযরতের দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, ঠিক আছে! আপনারা আর হাততালি দেবেন না। এরপর পুনরায় তিনি অনেক সময় বক্তৃতা অব্যাহত রাখলেন। শ্রোতাদের কেউ আর হাততালি দেওয়ার সাহস করেন নি।”

৩৬. একটি কারামত: ২০০৫ ঈসায়ী সনে একদা ৫ দিনের জন্য বেশ অসুস্থ অবস্থায় কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুবিদ বাজারস্থ আমার (লেখকের) বাসায় মেহমান হলেন। তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়লো। আমার বাসায় অসংখ্য লোকজন তাঁকে দেখতে আসছিলেন। একদিন দুপুরের খাবারের সময় হযরতসহ চার ব্যক্তি আমার ঘরে মেহমান ছিলেন। সে অনুপাতে আমার স্ত্রী চারজন মেহমানসহ মোট ৮-১০ জনের খাবার পাক করলেন। আমরা একখানা বড় থালায় খাবার পরিবেশন করলাম। হযরত চারজন মেহমানসহ খেতে বসলেন ঐ থালায়। কিছুক্ষণ পরই কক্ষে প্রবেশ করলেন হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী সাহেব- তাঁর সঙ্গে আরো চারজন মেহমান। খাওয়া পরিবেশনের সময় উপস্থিত হওয়ায় স্বভাবতই আমরা তাঁদেরকে আপ্যায়নের আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি বসে পড়লেন। তাঁর সাথে এসেছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ‘আল-মনসুর’ হজ্জ গ্রুপের সম্মানিত প্রোপ্রাইটার জনাব মনসুর আলী খান সাহেব। তিনিও খাবার খেতে একখানা বড় থালায় বসে পড়লেন। এরপর আরেকদল লোক এসে গেলেন। এভাবে মোট ২০ জনের মতো উপস্থিত হলেন ও খাবার খেলেন। এদিকে আমি ও আমার মরহুম আব্বা হাজী আলী আসগর সাহেব ভীষণ চিন্তাযুক্ত ছিলাম। চার জনের খাবারে এতো লোক খাবেন কি করে? কিন্তু সবাই খেলেন ঠিকই। এসাথে আমরা চার-পাঁচজন ‘মেজবানের’ খাবারও বাকী থেকে গেল। আমার স্ত্রী অবশ্য পাতিলের ঢাকনা সম্পূর্ণরূপে না তুলে লাউ-মৎসে মিশ্রিত তরকারী ও ভাত পাত্রে তুলে দিচ্ছিলেন। সুহবানাল্লাহ! হযরতের বরকতে ৮-১০ জনের জন্য পাক করা খাবার শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩০ জনে তৃপ্তিসহ খেলেন। খাওয়া শেষে হযরত নিজেই মন্তব্য করলেন, ‘সুবহানাল্লাহ! কতো লোক খেলেন, কতো লোক খেলেন!’

৩৭. ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রামহাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তেরো তাসবীহ জিকির: হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা আমার (লেখকের) এক নিকটাত্মীয়ের লন্ডনের বাড়িতে মেহমান হয়েছেন। খবর পেয়ে আমিও হযরতের খিদমতে উপস্থিত হলাম। রাতে তাঁর সঙ্গে একই বিছানায় থাকতে হলো। কিন্তু সারারাত এই ভয়ে আমার ঘুম আসলো না, যদি কোনো বে-আদবী হয়ে যায়! হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার ডান পাশে ডানদিকে কাত হয়ে ডানহাত গালের নীচে রেখে সুন্নাতী পদ্ধতিতে ঘুমালেন। আমি শুনতে পেলাম ঘুমের মধ্যেও তাঁর ক্বলব থেকে 'আল্লাহ-হু' জিকিরের আওয়াজ হচ্ছে। ঠিক ৩ ঘটিকার সময় লাফ মেরে উঠে গেলেন। বললেন, "ওঠো ওঠো! তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত হয়ে গেছে!" আমি তো এমনিতেই সজাগ। ভাবলাম, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তো গতকাল মাত্র বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।

লন্ডনের ঘড়ি দেশের তুলনায় ৬ ঘণ্টা পেছনে। তিনি কিভাবে জানলেন, ৩ ঘটিকার সময় তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত হয়ে গেছে? এছাড়া ঘুম থেকে তিনি এমনিতেই জেগে ওঠলেন! তাঁর হিসাবে তো বাংলাদেশে তখন সকাল (পরদিন) ৯ টা হয়ে গিয়েছিল। কে তাঁকে ঠিক সময় মতো সজাগ করে দিল?

তাহাজ্জুদের নামায শেষে তেরো তাসবীহ জিকির করলেন। আমি এই জিকির সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানতাম না। আমি তখনো হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করি নি। যা হোক, তাঁর সাথে জিকির করলাম। তিনি দীর্ঘ দু'আ করলেন। এতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য হলো। ভোর সাড়ে চারটায় আমাদের মেজবান সোহেল মিয়াসহ ৩ জনে মিলে তাঁরই ইমামতিতে ফযরের নামায আদায় করলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, "কাল কেজনোভ রোড মসজিদে মাদানী সাহেব আসবেন তাহাজ্জুদের সময়, তেরো তাসবীহ জিকির হবে, তুমিও এসো।" কেজনোভ রোড মসজিদ ছিলো উত্তর লন্ডনের স্টোকনিউয়িংটন নামক এলাকায়। আমি তখন সে এলাকায়ই বসবাস করতাম। ঐ মসজিদটি ছিলো আমাদের স্থানীয় জামে মসজিদ। আমি বললাম, "অবশ্যই আসবো হুজুর।"

আলহামদুলিল্লাহ! যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ ওলির সঙ্গে সেদিন তাহাজ্জুদের সময় তেরো তাসবীহ জিকিরে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য হলো। জিকিরের শেষ পর্যায়ে যখন ক্রন্দনের সুরে উভয় বুজুর্গসহ সকলে সজোরে 'আল্লাহ! আল্লাহ!' পাঠ করছিলেন তখন আমার শক্ত হৃদয়ও গলে যায়। চোখ বেয়ে ঝরতে থাকে অশ্রু। আমি সেই মুহূর্তটি কখনো ভুলবো না।

৩৮. তেরো তাসবীহ জিকিরের গুরুত্ব: হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনের সর্বশেষ ই'তিক্বাফ পালন করেন সিলেটের মানিক পীরের টিলার অদূরে নয়সড়ক 'মাদানী মসজিদে'। একদিন বাদ আসর প্রায় দেড়-শতাধিক ই'তিক্বাফ পালনকারীদের মধ্য থেকে সকল আলিমকে ডেকে পাঠালেন। সবাই মসজিদের নীচ তলায় তাঁকে ঘিরে বসে পড়লেন। তিনি জিকির-আজকারের গুরুত্ব সম্পর্কে দু'চার কথা বললেন। এরপর সবাইকে উপদেশ দিলেন, "আপনারা তেরো তাসবীহ জিকির করবেন। কিভাবে করতে হয় এখনই আমি ট্রেনিং দিচ্ছি।" সুতরাং সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণ তেরো তাসবীহ জিকির করলেন।

এর পরের দিন সকলকে তাঁর নিকট আসার আহ্বান জানালেন। বললেন, আলিম ও সাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল ই'তিক্বাফ পালনকারীকে আসতে বলো। সকলে যেয়ে জড়োত হওয়ার পর ঠিক আগের দিনের মতোই তেরো (বা বারো) তাসবীহ জিকিরের গুরুত্ব বয়ান করে সবাইকে নিয়ে তা'লিমী জিকির পড়লেন।

সম্ভবত চিশতিয়া তরীকার এই উচ্চ পর্যায়ের জিকিরের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জীবনের সর্বশেষ ই'তিক্বাফ পালনের সময় সকলকে উপদেশদান হিসাবে এরূপ করে থাকবেন।

৩৯. হয়তো আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে: এই অধম লেখক ঈসায়ী ২০০৫ সালের শেষের দিকে হযরতের সঙ্গে দশদিনের একটি সফরে যাই। বিভিন্ন মসজিদ ও অনুষ্ঠানে বয়ানকালে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বার বার একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে বলছিলেন, "হয়তো আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে!"

যে ব্যক্তি এই স্বপ্ন দেখেছেন বলে হযরত উক্ত মন্তব্যের প্রাক্কালে সবাইকে জানাচ্ছিলেন তিনি হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী সাহেব। তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছিলেন, একটি হেলিকপ্টার এসেছে হযরতকে নিয়ে যেতে। যাক, বার বার হযরতের মুখে 'আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী' কথাটি শুনে মনে মনে খুব চিন্তিত হচ্ছিলাম। কথাটি অন্তরের অন্তঃস্থলে যেনো বিষের ক্রিয়া করছিলো। তবে সাহস হচ্ছিলো না, 'হযরত! এরূপ বলবেন না! এতে মনে খুব ব্যথা অনুভব করছি!' ইত্যাদি বলে কথাটি বলতে তাঁকে বিরত রাখতে।

যাক, কিছুদিন পর একদা প্রিয় মুর্শিদ হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার সুবিদ বাজারস্থ বাসায় মেহমান হলেন। রাত্রিযাপন করলেন। ঐ রাতে আমি এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। দেখি, উজ্জ্বল সবুজ ঘাসে আবৃত একখণ্ড ভূমির উপর হযরযকে নিয়ে আমরা ক'জন বসে আছি। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি একখানা হেলিকপ্টার এসে সামনেই অবতরণ করলো। ভেতর থেকে অপূর্ব উজ্জ্বল চেহারাসম্পন্ন, সবুজ লেবাস ও পাগড়ী পরে দু'ব্যক্তি নেমে আসলেন। আমরা সবাই পাশ্ববর্তী একটি সুন্দর কক্ষে প্রবেশ করলাম। আগন্তুক ব্যক্তিদের একজন বার বার হযরতকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "হযরত! আপনি পরে কে? আপনি পরে কে?" আমি বুঝতে পারলাম, তাঁরা হযরতকে কোথাও নিয়ে যেতে এসেছেন। এগিয়ে এসে বললাম, "না! হযরত এখন যাবেন না! তাঁর যাওয়ার সময় হয় নি। আমরা তাঁকে যেতে দেবো না।" একথা শুনো একজন জবাব দিলেন, "তাহলে? আমরা কেন আসলাম?" আমি বললাম, "এসেছেন যখন খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন।" সুতরাং সত্যিই তাঁদেরকে আমরা উত্তম কিছু খাবর পরিবেশন করলাম। এরপর তারা ঐ হেলিকপ্টারে উঠে আবার উড়ে চলে গেলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পরদিন বাদ-ফযর উক্ত স্বপ্নের কথা হযরতকে বলার প্রয়োজন বোধ করলাম। কিন্তু নিজে এভাবে স্বপ্ন দেখেছি বলাটা আমার কাছে কিছুটা বে-আদবীপূর্ণ মনে হলো। তাই একটি ফন্দি আঁটলাম, স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুরুর পূর্বে বললাম, 'হযরত! আপনার এক মুরীদ স্বপ্নে দেখেছেন ...'। ব্যাস! স্বপ্নটি শ্রবণ করার পর "হয়তো

আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে", এ কথাটি তাঁর মুখ থেকে আর বেরিয়ে আসে নি। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি আরো ৫ বছর জীবিত ছিলেন।

৪০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার নসিব: হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেট তথা পুরো বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন, হযরত কুতবে আলম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা, ক্বাইদুল উলামা হযরত মাওলানা আবদুল করিম শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উচ্চ মর্যাদা তুলে ধরতে একটি স্বপের কথা প্রায়ই বর্ণনা করতেন। লক্ষ্যণীয় যে, এই স্বপ্নটি দ্বারা হযরত কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উচ্চ মর্যাদা যেভাবে ফুটে ওঠেছে, সেভাবে কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার নসিবের প্রমাণও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। স্বপ্নটি এই।

হযরত শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবদ্দশায় একদা হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেট শহরের চৌকিদেখিস্থ তাঁর (কৌড়িয়ার সাহেবের) বাসায় মেহমান হলেন। সেদিন কৌড়িয়ার সাহেব সফরে ছিলেন। শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শায়খে কৌড়িয়ার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন। হযরত শায়খে কাতিয়াকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমার আবদুল করিম কোথায়?" তিনি উত্তর দিলেন, তিনি সফরে গিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "আমি প্রতিদিন এসে আমার আবদুল করিমকে দেখে যাই!"

৪১. সাহেবে কাশফ: হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট ভক্ত ও খলিফায়ে মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট মুরীদ, জগন্নাথপুর থানাধীন শ্রীধরপাশা গ্রামের শাহ আলতাফুর রহমান একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "হযরত গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের দিন আমি জগন্নাথপুর বাজারে কোনো এক কাজে যাই। বাজারে পৌঁছে জানতে পারলাম, হযরত শায়খে কাতিয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পাঠাগারে' অবস্থান করছেন। সুতরাং দেখা করতে চলে গেলাম সেখানে।

হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদল তাবলীগী ভাইদের নিয়ে পাঠাগার মসজিদের বারান্দায় বসে আলাপ করছিলেন। তাবলীগী এই জামাআতটি এসেছে খোদ কাকরাইল মসজিদ ঢাকা থেকে। সদস্যদের সকলেই ছিলেন 'অসিলেটি'। আমাকে দেখে তিনি খুশী হলেন। বললেন, আলতাফুর রহমান! কি খাওয়াবে?যাও, একটা কাটাল নিয়ে এসো। আমি বাজারে যেয়ে একটি কাটাল নিয়ে আসলাম। তিনি সবাইকে নিয়ে কাটাল খেতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, চোখ বন্ধ করলেন। তারপর বললেন, "ইসলামের এক বাতি নিভে গেছে, ইসলামের এক বাতি নিভে গেছে!" উপস্থিত আমরা কেউই এ কথাটির মর্ম বুঝতে পারি নি। এরপর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর টেলিফোন আসলো, যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নূরউদ্দীন গহরপুরী সাহেব ইন্তিকাল করেছেন।"

৪২. অন্য আরেক ঘটনা যা সাহেবে কাশফ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে গণ্য: হযরত শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা হযরত মাওলানা মাসউদ আহমদ (বাঘার হুজুর) বর্ণনা করেন, একদা হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বয়স্ক এক রিকশা ড্রাইভারকে নিয়ে সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানে যান। সারাদিন এভাবে তার রিকশায় চড়ে ঘুরাফেরা করেন। মানুষ হযরতকে অনেক টাকা হাদিয়া দেয়। এরপর ঐ ড্রাইভারকে ছেড়ে দেওয়ার সময় পকেট থেকে সব টাকা বের করে তাকে প্রদান করলেন। ড্রাইভার আশ্চর্য হয়ে গেল। সে টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললো, হুজুর! আমাকে এতো টাকা দিচ্ছেন কেন? ভাড়া তো অনেক কম। তিনি বললেন, "আরে মিয়া নিয়ে নাও! এ মুহূর্তে তোমারই তো টাকার প্রয়োজন বেশী!" সুতরাং সে বাধ্য হয়ে টাকা গ্রহণ করলো। পরে হযরতের সফরসঙ্গীদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার টাকার কোনো সমস্যা আছে কি?" সে বললো, "জী হুজুর! আমি আমার মেয়েকে বিবাহ দেবো, কিন্তু টাকার ভীষণ অভাবহেতু চিন্তিত ছিলাম। এখন দেখছি এই টাকাই বিয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।" টাকার পরিমাণ প্রায় তিন হাজার ছিলো।

৪৩. বাসের ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার ঘটনা: বেশ আগের কথা। একদা হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একখানা বাসে চড়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিলেন। বাসের ড্রাইভার ট্যাপে গান বাজাতে শুরু করলো। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্দেশের সুরে বললেন, “ওহ মিয়া! ট্যাপ বন্ধ করো!” ড্রাইভার হযরতকে চিনতো না। সে তাঁর নির্দেশে পাত্তা দিলো না। একাধিকবার নির্দেশ দেওয়ার পরও যখন ট্যাপের গান বন্ধ হলো না, কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “আরে মিয়া! গান যখন বন্ধ করবে না, তাহলে আমাকে বাস থেকে নামিয়ে দাও!” ড্রাইভার রাজী হয়ে গেল। বাসের অন্যান্য আরোহীরাও প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেন নি। তাঁকে রাস্তায় নামিয়ে দিল ড্রাইভার। বর্ণনাকারী বলেন, আমার দিল কাঁপছিলো, ঐ ড্রাইভার ব্যাটার অবস্থা কি হয়- আল্লাহ মা’লুম!

কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ বাসের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বার বার চেষ্টা করার পরও ইঞ্জিন স্টার্ট হলো না। বাসের প্যাসেঞ্জাররা নেমে পড়লেন। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে তাকিয়ে এক দু’জন তাঁকে চিনতে সক্ষম হলেন। তারা ড্রাইভারের নিকট যেয়ে বললেন, সর্বনাশ! তুমি কার সাথে বে-আদবী করেছো- জানো? উনি তো কাতিয়ার শেখ সাহেব! যাও এক্ষুণি যেয়ে তাঁর পায়ে পড়ো। মাফ চাও!

ড্রাইভার ছুটে এলো হযরতের নিকট। সত্যিই সে পায়ে পড়লো। মাফ চাইলো। তিনি বললেন, আর ট্যাপ বাজাবে না? সে জবাব দিল, না জুহুর না, আর বাজাবো না। তিনি বললেন, মাথায় টুপি দেবে? সে বললো, এক্ষুণি দিচ্ছি। এরপর হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “তাহলে চলো!” গাড়িতে আরোহণ করে ড্রাইভারকে বললেন, “বিসমিল্লাহ, বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দাও!” আশ্চর্যের ব্যাপার, সাথে সাথে ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল। এরপর মৌলভীবাজার পৌঁছা পর্যন্ত গাড়ির ইঞ্জিন আর একবারও বন্ধ হয় নি। (সূত্র: কাতিয়ার এক ব্যক্তি আমার (লেখকের) নিকট বর্ণনা করেছেন যার নামটি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না।)

জীবন নয় চিরন্তন

প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্সালাম থেকে আজ পর্যন্ত কতো লক্ষ কোটি মানুষ এই ধরার কোলে বিচরণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এদের মধ্যে আজ যে মানবগোষ্ঠি জীবন্ত আছেন তার সংখ্যা ৬০০ কোটি কিংবা এর একটু বেশী হবে। এই শতবছর পূর্বেও পৃথিবীর জমিনে বিচরণশীল মানুষের প্রায় কেউই এখন আর জীবিত নেই। সুতরাং এখানে আসা যাওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে সেই আদি যুগ থেকে এবং তা চলবে কিয়ামত দিবস সংগঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আমাদের আলোচিত মহান ব্যক্তির জীবনেরও ইতি ঘটেছে। প্রায় ৯৬ বছরের এক সফল দীর্ঘজীবন অতিক্রম করে তিনি মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন চিরসুখের জান্নাতে। আল্লাহর খাস অনুগ্রহে এবং হযরতের একান্ত আপনজন ও ক'জন খুলাফায়ে কিরামের সহযোগিতায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর ইন্তিকালের বিশদ বর্ণনাসহ একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করি। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার ফলে হযরতের অসংখ্য ভক্ত, মুরীদান ও শুভাকাঙ্ক্ষী উপকৃত হয়েছেন। অনেকে বলেছেন, 'জীবনের শেষ ক'টি দিন ও অমৃত বাণী' শিরোনামে প্রণীত গ্রন্থখানা পাঠ করে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন। আবেগ-আপ্লুত হয়ে আমার শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনের শেষ ক'টি দিনের চিত্র গ্রন্থস্থ করেছি। সময় সময় অনেক কথা এসে গেছে যা সাধারণত কেউ লিখেন না। যা হোক এই গ্রন্থ থেকেই পাঠকবর্গকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উপহার দিচ্ছি।

অসুস্থতা ও আলী সেন্টারের মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে আগমন

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকালের বছর (২০১০ ঈসায়ী) রমজান মাসের (১৪৩১ হিজরি) শুরুতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরতের জলিলুল কদর খলীফা মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জীর সঙ্গে হযরতের অসুস্থতা সম্পর্কে পরামর্শ করলাম। তিনি পরদিনই হযরতকে দেখতে যান। হযরতের শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তাঁকে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে কাতিয়ায় রাখা হবেঅত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এছাড়া সেখানে সঠিক মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মিলানো দুষ্কর। জকিগঞ্জী সাহেব সবাইকে বুঝিয়ে হযরতকে সিলেটে নিয়ে আসার

ব্যবস্থা করলেন। হযরতের বড় সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব হযরতকে তাঁদের নিজস্ব নৌকাযোগে উসমানীনগর থানাধীন উমরপুরের নিকটে হুইদপুরে নিয়ে আসার পর, সেখান থেকে লাইটেসে সিলেট আসবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতোমধ্যে আমার (লেখকের মালিকানাধীন) সিলেট শহরের সুবিদ বাজার পয়েন্টে স্থাপিত 'আলী সেন্টার' মার্কেটের বিপরীতে 'কর্নার ভিউ' বহুতল ইমারতে বসবাসরত সুনামগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ মরহুম মুহাম্মদ আবুল কালাম সাহেব ও আমি হযরতকে আমার মার্কেটের দ্বিতীয়-তৃতীয় তলায় স্থাপিত 'মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে' নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইন্তিজামিয়া কাজে নিয়োজিত হলাম।

কাতিয়া থেকে সিলেটে আগমন

সিলেট থেকে ভোরে হযরতকে নিয়ে আসার জন্য একখানা লাইটেস গাড়ি হুইদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। হযরতকে নিয়ে আসার জন্য এ যাত্রায় যারা ছিলেন তরা হলেন: মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, হযরতের নাতি মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী ও হযরতের মুরীদ উমরপুরের হুসাইন আহমদ সাহেব। দুপুর ১২টায় হযরতকে নিয়ে নৌকাখানা হুইদপুর পৌঁছলো। বাড়ি থেকে যারা হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সার্বক্ষণিক খিদমাতের জন্য নৌকাযোগে সফরসঙ্গী হয়ে এসেছিলেন তারা হলেন: সাহেবজাদা হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আমিনী, হযরতের নাতি নুমান আহমদ, হাফিজ তাইয়্যিব এবং হযরতের খলীফা কারী শায়খ বিলাল আহমদ শাল্লাবী এর পুত্র মুবাশ্শির আহমদ। জকিগঞ্জী সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত যখন নৌকাযোগে হুইদপুর পৌঁছলেন তখন তিনি নৌকায় উঠে হযরতের সঙ্গে মুসাহাফা করেন। তখন হযরত এক অপূর্ব মুচকি হাসি দিলেন। যা কোনদিন ভুলবার নয়।

উমরপুরে এসে যুহরের নামায আদায় করা হলো। হযরতের বড় সাহেবজাদার ইচ্ছানুযায়ী হযরতকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হলো রায়নগর রাজবাড়িস্থ হযরতের বড় সাহেবজাদী খাদিজা খানমের বাসায়। উল্লেখ্য হযরতের অসুস্থ স্ত্রী মাজিদা খানম সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করছিলেন। এখানে ৩.৩০ মিনিট থেকে ইফতার

পর্যন্ত হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে হযরতের দায়িমী ডাক্তার মুয়াজ্জম হুসাইন খান প্রাথমিকভাবে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত দেন যে, সবদিক থেকে সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি স্থানীয় ক্লিনিকে হযরতকে তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করা হোক।

এক পর্যায়ে রায়নগর থাকা কালেই সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব আমাকে ফোন করলেন। তিনি হযরতকে আমাদের ক্লিনিকে নিয়ে আসার ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ! আপনার ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। আব্বাকে ইফতার পরে আমরা নিয়ে আসছি।” আমি এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়লাম। কিভাবে, কোন্ উপায়ে আমার প্রিয় মুর্শিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায় সে ফিকিরে লেগে গেলাম। আমি আবারো হাসপাতালের ১নংভিআইপি কক্ষটি পরিদর্শন করলাম। দেখে খুশী হলাম যে, ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।

সিদ্ধান্ত মুতাবিক আমি ও মরহুম মুহাম্মদ আবুল কালাম সাহেব রাস্তায় যেয়ে হযরতের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুতরাং সোমবার ১২ রমজান, ২০ আগস্ট ২০১০ ঈসায়ী, বিকাল ৭.৩০ মিনিটের সময়, প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সিলেট শহরের সুবিদ বাজারে অবস্থিত আমার 'আলী সেন্টার' মার্কেটের উপরে প্রতিষ্ঠিত মডার্ণ জেনারেল হসপিটালে তাঁকে নিয়ে আসা হলো। হযরতকে ১ নং ভিআইপি কেবিনের একটি বেডে স্ট্রেচারের মাধ্যমে তুলে আনা হলো। সাথে সাথেই কর্তব্যরত ডাক্তার এসে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করলেন।

অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসা প্রদান

নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার মতিউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে অচিরেই বেশ ক'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের টীম গড়ে উঠলো। অনেকদিন যাবৎ বিনিময় ছাড়া চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানকারী হযরতের দায়িমী ডাক্তার মুয়াজ্জম হুসাইন খান সাহেবও এই টীমের সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি হযরত মাওলানা ফজলুল করীম পীরসাহেব চরমোনাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরও প্রধান চিকিৎসক

ছিলেন। হাসপাতালের পক্ষে দায়িত্ব নিলেন মডার্ণের ডাইরেক্টরদের একজন, ডাক্তার সাব্বির হুসাইন মুকুল সাহেব। সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে হযরতের মেডিক্যাল কেয়ারের কাজে রত হলেন। হাসপাতালের এমডি নূরুল আমিন বাবুল সাহেব, ডাইরেক্টর সেলিম সাহেব, ম্যানেজার তোফায়েল আহমদ চৌধুরী ফয়সল সাহেব, এসিসট্যান্ট ম্যানেজার ইকবাল হুসাইন তফাদার এবং নার্সিং স্টাফের সবাই হযরতের চিকিৎসা, সার্বিক সুযোগ-সুবিধা এবং তাঁকে দেখার জন্য আসা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ যাবতীয় ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। চিকিৎসা ও সেবার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ত্রুটি হয় নি। আমরা এতে সবার নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সবাইকে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন- এটাই কামনা।

হাসপাতালে হাজার হাজার মানুষের ভিড়

হযরতের অসুস্থতার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় তারাবীহ নামায শেষে হসপিটালে মানুষের ভিড় জমতে লাগলো। আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের জনতা তাঁকে দেখার জন্য ছুটে আসতে লাগলেন। দীর্ঘ ১৯ দিন তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইতোমধ্যে অন্তত ২০ থেকে ২৫ হাজার লোক তাঁকে দেখার জন্য এসেছেন।

তাঁকে একনজর দেখার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যারা ব্যকুল হয়ে মডার্ণে এসেছিলেন তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে যাদের নাম লিপিবদ্ধ করা উল্লেখযোগ্য মনে করছি তারা হলেন: হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান চট্টগ্রামী ও হযরত মাওলানা আব্দুল মু'মিন শায়খে ইমামবাড়ি। এ উভয় বুজুর্গ কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা; ফিদায়ে মিল্লাত আল্লামা হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফায়জুল বারী মহেশপুরী, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লিম বাংলাদেশের সভাপতি শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ বারোকুটী, আমীরে হিফাজতে ইসলাম হযরত মাওলানা শায়খ খলীলুর রাহমান বর্ণভী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাস্সীরে কুরআন হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লিম

বাংলাদেশের স্বনামধন্য সেক্রেটারী হযরত মাওলানা আব্দুল বাসিত বরকতপুরী, হযরত মাওলানা শফিকুল হক আমকুনী, প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান কাজিরবাজারী, হযরত মুফতী রশীদুর রাহমান ফারুক বর্ণভী, হযরত মাওলানা হুসামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী, সাবেক এমপি ফরিদুদ্দীন চৌধুরী, সাবেক এমপি মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী এবং শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ ভক্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের [তখনকার] সম্মানিত মেয়র জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কামরান প্রমুখ।

নিবেদিতপ্রাণ একদল খাদিম কর্তৃক সেবা দান

বেশ ক'জন নিবেদিতপ্রাণ খাদিম তাঁকে সার্বক্ষণিক সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন। এদের মধ্যে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন: হযরতের ছোট সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক আমিনী, হযরতের নাতি মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী, হযরতের নাতি হাফিজ ফরহাদ আহমদ আমিনী, হযরতের নাতি মুহাম্মদ নুমান, বিশ্বনাথ থানাধীন দেওকলস ইউনিয়নের কুনারাই গ্রামের হযরতের মুরীদ মিজানুর রাহমান লায়েক, হাফিজ তাইয়্যিব, নবীগঞ্জের গুলডুবার হাফিজ আব্দুল হাফিজ, হযরতের খলীফা কারী বিলাল সাহেবের ছেলে মুবাশ্শির আহমদ, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ও এমরান আহমদ।

অসুস্থ অবস্থায় জিকির

কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অসুস্থ থাকাবস্থায়ও জিকির করেছেন। প্রথম ক'দিন তিনি 'নফী-ইসবাত' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও পরবর্তীতে 'পাস-আনফাস' (দমের) জিকিরে নিমগ্ন হন। নফী-ইসবাতের সময় তিনি মাথা ডানদিকে ঘুরিয়ে আবার ক্বলবের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পাস-আনফাসের সময় দম বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর খুব দ্রুত 'আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির করছিলেন। অধিকাংশ সময় তাঁর চোখ দু'টো বন্ধ ছিলো। তিনি পারতপক্ষে কিছু বলতে চেষ্টা করেন নি। তবে সালাম জানালে ঠোঁট নেড়ে জবাব দিয়েছেন। সময় সময় হাত নেড়ে ইশারায় কিছু বুঝাতে চেয়েছেন। এমনকি একদিন তিনি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে ইশারা দিলেন

যার অর্থ ছিলো, আগত মেহমানদেরকে বসাও! ডাক্তার সাব্বির হুসাইন বলেন, একদিন রাতে তিনি তাঁর মাথা বুলিয়েও দিয়েছেন। আরেকদিন তারাবীহ্ নামায পরে মেহমানদারী করার জন্য খাদিমদেরকে ইশারায় ইঙ্গিতও করেছেন।

ভর্তির পরবর্তী শুক্রবার তিনি জুমু'আর পূর্বে প্রায় বিশ মিনিট সময়ব্যাপী সম্পূর্ণ জ্ঞাত অবস্থায় ছিলেন। এমনকি এদিন যে শুক্রবার তা বুঝতে পেরে জুমু'আর নামায আদায়ের কথাও বলেছেন। সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনীও এ এসময় উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে কথাবার্তা বলেছেন।

খতমে কুরআন ও খতমে বুখারী

হযরতের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বশীলদের মধ্যে তাঁর খলীফা মাওলানা আব্দুল মতিন নবীগঞ্জী সাহেব এক পর্যায়ে বলে উঠলেন, আমাদের কী কিছু করণীয় নেই? উপস্থিত উলামায়ে কিরাম জবাব দিলেন, আমরা এখন কি করতে পারি? তখন নবীগঞ্জী সাহেব বললেন, আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমু'আ হযরতের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক খেলাফত বিল্ডিংয়ে খতমে বুখারী ও খতমে কুরআনের ব্যবস্থা করা হোক। এসময় উপস্থিত উলামাদের মধ্যে মাওলানা রিজাউল করীম কাসিমী সাহেবসহ সবাই এতে সম্মত হলেন। সুতরাং পরদিন শুক্রবার বাদ জুমু'আ প্রায় ৫০ জন মুহাদ্দীসিনে কিরামের অংশগ্রহণে হযরতের রোগমুক্তি ও হায়াতে তাইয়্যিবাহ কামনা করে খতমে কুরআন ও খতমে বুখারী সম্পন্ন হয়। উভয় খতম শেষে দু'আ পরিচালনা করেন, কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান চট্টগ্রামী দামাত বারাকাতুহুম।

পারিবারিক তত্ত্বাবধান

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ৫ সাহেবজাদা ও ৪ সাহেবজাদী ইতোমধ্যে সিলেটে এসে একত্রিত হয়েছেন। তাঁরাও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে লিপ্ত হলেন। উপরে তালিকাভুক্ত খাদিমদের ছাড়াও সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে এ পর্যায়ে সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন দ্বিতীয়

সাহেবজাদা লন্ডন প্রবাসী কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী, কানাডা প্রবাসী সাহেবজাদা মাওলানা ইউসুফ আমিনী, সাহেবজাদা মাওলানা ইসমাঈল আমিনী, সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক আমিনী।

তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন হযরতের খলীফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী, হযরতের খলীফা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, হযরতের খলীফা শায়খ আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী, সুনামগঞ্জের ব্যবসায়ী মরহুম মুহাম্মদ আবুল কালাম, উমরপুরের মুহাম্মদ হুসাইন (পরে তিনি ই'তিকাফ পালনে চলে যান) ও ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী (অত্র গ্রন্থের লেখক)।

শুক্রবার কাতিয়ায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

প্রথমে বৃহস্পতিবার ২৯ রমজান হযরতকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। পরদিন শুক্রবার হয়তো ঈদ হবে। ইতোমধ্যে আগের দিন হযরতের অসুস্থ স্ত্রীকেও সিলেট থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি কারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সবাই মিলে তাঁদের পিতা-মাতাকে নিয়ে ঈদুল ফিতর গ্রামের বাড়িতে পালনের উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পরদিন শুক্রবার ঈদ হওয়ার সম্ভাবনাই ছিলো, এদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তাঁকে নেওয়ার ইচ্ছা। কিন্তু শুক্রবার ঈদ হলো না। কারী সাহেব বাড়িতে নেওয়ার তারিখ বদলে দিলেন। বললেন, "আব্বাকে আমরা শুক্রবার বাদ জুমু'আ নিয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ!"।

রাতে তেরো তাসবীহ জিকির

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার সময় হযরতের কক্ষেই এক অপূর্ব 'তেরো তাসবীহ' জিকিরের আয়োজন করা হলো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুরীদান ও ভক্তদেরকে চিশতিয়া তরীকার এই উচ্চপর্যায়ের জিকিরের 'মশক' করাতেন। আমি দেখেছি, এই প্রবীণ নব্বুই ঊর্ধ্ব বয়সেও তিনি

যখন চিৎকার করে জিকিরের বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন তখন উপস্থিত সবার অন্তর কেঁপে ওঠতো।

জিকির শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে আমি বাসায় চলে আসলাম। আমি জানতাম না এরূপ কোনো জিকির হবে। তবে আমার মানসিক অবস্থা ভালো ছিলো না। দু'দিন পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখার পর আমি অস্থির হয়ে উঠছিলাম। আমি জানতাম, খুব শীঘ্রই হয়তো একটা কিছু ঘটে যাবে। পরদিন জুমু'আতুল বিদা, এর পরদিন বিভাগীয় সর্ববৃহৎ ঈদের নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হবে শাহী ঈদগাহ মাঠে। সবকিছু যেনো তার স্ব-স্ব স্থানে ফিট-ফাট হয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের আশা হযরতকে নিয়ে যাবো কাতিয়া গ্রামে জীবিতাবস্থায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রিয় মাদ্রাসায়।

ইলমে তাসাওউফের পথপ্রদর্শক, আধ্যাত্মিক জগতের কুতুব হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়াকে নিয়ে তেরো তাসবীহের এই শেষ জিকিরে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন: হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী, হযরতের ছোট সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক আমিনী, হযরতের খলীফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী, হযরতের খলীফা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, হযরতের নাতী মুফতী মনজুর রশীদ আমিনী, হযরতের নাতি নুমান আহমদ, হযরত মাওলানা বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা মাওলানা রশীদ আহমদ, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, হাফিজ আব্দুল হাফিজ, মুহাম্মদ মুবাশ্শির আহমদ, মিজানুর রহমান লায়েক ও ক্লিনিকের কর্মকর্তা শহীদ।

জিকিরের প্রাবল্য যখন তুঙ্গে তখন এক পর্যায়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সজোরে "আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!" বলে উঠলেন। জিকির শেষে কক্ষের সকল জাকিরীন এক হৃদয় নিংড়ানো দু'আ করেন। সমগ্র কক্ষটিতে ছিলো কান্নার রোল। সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে হযরতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে হায়াতে তায়্যিবাহ ভিক্ষা চাইলেন। পরবর্তীতে জকিগঞ্জী সাহেব বলেন, দু'আর সময় তিনি এই বলে আল্লাহর পবিত্র দরবারে আকুল আবেদন

জানান: "হে আল্লাহ! আমার হায়াত থেকে কিছু নিয়ে হলেও হযরতের হায়াতে তায়্যিবাহ দীর্ঘ করুণ"।

ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে আসলো

৩০ রামাদ্বান শুক্রবার ১৪৩১ হিজরি (১০/৯/১০ ঈসায়ী)। বেশ ভোরে উঠে আমি গোসল সেরে নিলাম। এদিন ছিলো জুমু'আতুল বিদা। কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রামের বাড়িতে ঈদ উপলক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে। এই সফরে আমিও তাঁর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা রাখি, তাই সকাল ১১টার সময় বাসা থেকে বিদায় হলাম। হসপিটালে যেয়ে হযরতকে একনজর দেখে চলে গেলাম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মসজিদে। উল্লেখ্য মডার্ণ জেনারেল হসপিটাল ও আমার বাসা মূলত একই বিল্ডিং। এতো কাছে থাকার ফলে দৈনিক অনেকবার হযরতকে দেখার সুযোগ পাচ্ছিলাম। নামায শেষেই আমি ১:৪৫ মিনিটের সময় হসপিটালে ফিরে আসলাম। এরপর আরেকবার তাঁকে দেখে উত্তরের পার্শ্ববর্তী কক্ষে ঢুকে হযরতের গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্নের অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতোমধ্যে একটি লাইটেস গাড়ি এসে পৌঁছে যায়।

আমি যে কক্ষে অপেক্ষারত ছিলাম সেখানে আসলেন হযরতের দু'জন খলীফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী এবং শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী।আরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরতের মুরীদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে তাহাজ্জুদের সময় একান্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় জিকির আজকার ও মুরাকাবা করতেন এসব কথা আলোচনা করছিলাম। এক পর্যায়ে আমি বললাম, তিনি প্রায়ই অশ্রুভরা চোখে একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন:

নিকল যায়ে দম তেরে কদমওকে নীচে
এহি দিলকি তামান্না, এহি আরজুহে।
নিকল্ যায়ে দম তেরে সাজিদা মে
নিকল্ যায়ে দম তেরে নামায মে

নিকল্ যায়ে দম তেরে তিলাওয়াত মে
নিকল্ যায়ে দম তেরে ইয়াদ মে
এহি দিলকি তামান্না, এহি আরজুহে।

আমি নিজে তাঁর পেছনে বসে উক্ত কবিতাটি শ্রবণ করেছি। নিকল্ শব্দের অর্থ নিয়ে কথাবার্তা হলো। সবাই একমত হলাম, এর অর্থ 'নিয়ে যাওয়া' বা 'বের করা'। কথাগুলো শেষ হতে না হতেই কক্ষের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মিজানুর রাহমান লায়েক মোবাইল সেট নিয়ে ছুটোছুটি করছেন। আমাদের বুঝতে বাকী রইলো না যে, একটা কিছু ঘটেছে! আমরা সবাই ছুটে গেলাম হযরতের শয্যাপাশে।

হযরতের ইন্তিকাল

আমরা সেখানে যেয়ে দেখি তিনি নড়াচড়া করছেন না! সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। আমি মাথা ও শরীরে হাত দিয়ে দেখি তাঁর দেহখানা তখনও উষ্ণ। কিন্তু হৃদযন্ত্রের স্পন্দন অনুপস্থিত। আমি বুঝতে পারলাম হযরত বিদায় হয়ে গেছেন। কিন্তু সবাই বলতে লাগলো, তাঁর হার্ট এটাক হয়েছে! ডাক্তারকে নিয়ে আসো! ইত্যাদি। এরপর জকিগঞ্জী সাহেব ক্লিনিকের এসিসট্যান্ট ম্যানেজারকে দিয়ে হযরতের প্রধান ডাক্তার প্রফেসর মতিউর রহমান সাহেবকে ক্লিনিকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। আমি একরূপ অস্থির হয়ে ফ্লোরের উপর পড়ে গেলাম। দশ-পনর মিনিট পরই প্রফেসর মতিউর রহমান সাহেব এসে হাজির হলেন। পরীক্ষা করে তিনি আমাকে ইশারায় নিশ্চিত করলেন যে, আমার প্রিয় মুর্শিদ কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া এই ক'মিনিট পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

-"নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" (২ : ১৫৬)

তাঁর পবিত্র রূহ মাহবুবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে ঊর্ধ্বজগতের ইল্লিয়্যীনে- আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। আর অপূর্ব নূরোজ্জ্বল মটির দেহখানা পড়ে আছে নিষ্প্রাণ, নির্জীব অবস্থায়।

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী, ২৬ ভাদ্র ১৪১৭ বাংলা, মুতাবিক ৩০ রমজান ১৪৩১ হিজরির শুক্রবার দিন বিকেল ২.১৫ মিনিটের সময় এই মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

ইন্তিকালের মুহূর্তগুলো সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা মিললো তাঁর খাদিম মিজানুর রহমান লায়েকের নিকট থেকে। হযরতের অপর খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজ মাত্র পনেরো মিনিট পূর্বে বড়ো ইস্তিঞ্জা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর মৃত্যু মুহূর্তের মাত্র ৫ মিনিট পূর্বে হযরতকে (নাকের নলের মাধ্যমে) খাবার পরিবেশন করেন। তিনি শান্তভাবে যেনো ঘুমিয়ে গেলেন। কোনো ধরনের শ্বাসকষ্ট পরিলক্ষিত হলো না। এদিন ভোর থেকেই তাঁকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছিল। হাফিজ আব্দুল হাফিজ সকালেই তাঁর গোঁফ ছেঁটে সুন্দর করে দিয়েছিলেন। তিনি ইশারায় তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছেন।

ইন্তিকালের কিছুক্ষণ পূর্বে হাফিজ আব্দুল হাফিজ কক্ষের দরজার সামনে গিয়ে কারো সাথে ফোনে কথা বলছিলেন। সাহেবজাদা ইসহাক আমিনী কক্ষের অপর বেডে বসে আছেন। মিজানুর রহমান লায়েক হযরতের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। উভয়ে লক্ষ্য করলেন হযরত ঠোঁট নড়াচড়া করছেন। এরপরই সব নীরব। তিনি তাঁর প্রভুর দরবারে চলে গেছেন! নীরবতা লক্ষ্য করে তারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তবে বিশ্বাস করতে পারলেন না যে তিনি এভাবে নীরবে ঘুমন্ত অবস্থায় সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে বিদায় গ্রহণ করবেন। এরপরই আমরা কক্ষে ঢুকে যাই। হযরতের অন্যান্য সাহেবজাদাদের প্রায় সকলেই কাতিয়া চলে গিয়েছিলেন। মাওলানা ইসহাক আমিনী মৃত্যুর সময় কাছেই ছিলেন। তবে কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী রায়নগরস্থ বাসায় থাকায় প্রায় ১৫ মিনিট পরে এসে উপস্থিত হলেন। কক্ষে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

ইন্তিকালের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের কিছুক্ষণের মধ্যেই সিলেটের মেয়র জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কারমার এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এতো দ্রুত এসেছেন দেখে অবাক হয়ে যাই। পরে জানতে পারলাম, হযরতকে যে আজ তাঁর গ্রামের বাড়িতে ঈদ উপলক্ষে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে সংবাদ জেনে তিনি তাঁকে দেখতে এসেছেন। বিদ্যুৎ বেগে হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকজন এসে ভিড় জমালো আলী সেন্টারের মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই এলাকায় হাজার হাজার মানুষের আগমন ঘটলো। সবাই শান্ত পরিবেশে অশ্রুভরা চোখে হযরতকে এক নজর দেখতে লাগলেন লাইন বেঁধে। মানুষের মৃদু কান্নার করুণ সুরে পুরো এলাকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠলো। কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, কাতিয়ার শেখ সাহেব এই মায়াবী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন- আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। আর কোনদিন হাতের গল্লা দিয়ে কাউকে হিদায়াতের আঘাত হানবেন না। আর কোনদিন বলবেন না, বিশ্বমুসলিম এক করো ... নেক করো ...।

হযরতের নামাযে জানাযা ও সমাহিত করার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

শহরের আলিম-উলামা, বিভিন্ন পেশাজীবী, রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ছুটে আসলেন তাঁকে এক নজর দেখার উদ্দেশ্যে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন অনেকেই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা হলেন: হযরতের একান্ত ভক্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান; কাসিমুল উলূম দরগাহ মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া, শিক্ষা সচিব মাওলানা মুফতি মুহিবুল হক গাছবাড়ীর হুজুর; মাওলানা আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন, হযরত বাঘার সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা শিল্পপতি মাওলানা রেজাউল করীম কাসিমী; সাবেক এমপি ফরিদুদ্দীন চৌধুরী,

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ উদ্দীন সিরাজ, সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নাসিম হুসাইন; আলিম-উলামা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

হযরত যে কক্ষে ছিলেন সেখানে থাকাকালেই আমি মেয়র সাহেবকে অনুরোধ জানালাম, আপনি অনুগ্রহ করে হযরতের জানাযা নামাযসহ বাকী কাজগুলো কিভাবে সম্পন্ন করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ সভা করুন। শাহী ঈদগাহে তাঁর জানাযা নামাযের জন্য প্রথমেই আমি তার নিকট প্রস্তাব দিলাম। একটু পরই এমডি সাহেবের অফিস কক্ষে সবাই উপস্থিত হলেন। হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন সাহেব এ সময় দেওবন্দে অবস্থানরত হযরত আর্শাদ মাদানী (দা:বা:) এবং হযরত আসজাদ মাদানী (দা:বা:) এর সঙ্গে কথা বললেন। হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে তাঁরা উভয়ে মর্মাহত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দু'আ করলেন।

জরুরী পরামর্শসভা

সবাই এমডি সাহেবের অফিসকক্ষে একত্রিত হওয়ার পর সেখানে এক জরুরী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপরোক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন: হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা ক্বারী উবাইদুল্লাহ আমিনী, বিল্ডিংয়ের মালিক ও একান্ত ভক্ত-মুরীদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী (লেখক), হযরতেরখলীফা মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, মাওলানা আবদুল মালিক চৌধুরী, মডার্ণ হাসপাতালের ডাইরেক্টর সেলিম সাহেব ও অন্যান্যরা। পরামর্শ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কারী উবাইদুল্লাহ আমিনীকে হযরতের জানাযার নামায ও সমাহিত করার ক্ষেত্রে যাবতীয় তত্ত্বাবধানে নেতৃত্ব প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। তিনি কাতিয়া গ্রামে জানাযা অনুষ্ঠানের দাবী জানালেন।

এদিকে মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান সাহেবসহ সিলেটের নেতৃস্থানীয় সবাই দাবী জানালেন, "হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধু কাতিয়া ও সুনামগঞ্জের ব্যক্তিত্ব হিসাবে জীবন কাটান নি- তিনি ছিলেন সিলেট বিভাগের তথা সারা দেশের এক বরেণ্য আলীম ও রূহানী চিকিৎসক। সুতরাং আমরা চাই,

আগামীকাল শাহী ঈদগাহ ময়দানে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হোক।” কিন্তু কারী সাহেব বললেন, আমি আমার ভাইদেরকে নিয়ে কাতিয়ায়ই আব্বার জানাযার নামায সম্পাদন করে তাঁকে সেখানে সমাহিত করতে চাই। সিলেটবাসীর দাবী অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত শাহী ঈদগাহে ঈদের নামাযের পরই জানাযার নামাযের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং এ ব্যাপারে মাইকিংসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বয়ং মেয়র সাহেব গ্রহণ করলেন। তাঁকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন মাওলানা আবদুল মালিক চৌধুরী সাহেব। এছাড়া ভক্ত-মুরীদান ও সর্বস্তরের মানুষ যাতে তাঁদের এই প্রিয় বর্ষীয়ান মুরুব্বী ও আপনজন ‘কাতিয়ার শেখ সাহেবকে’ শেষবারের মতো একনজর দেখতে পারে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

হযরতের প্রিয় খদ্দরের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো

হযরতের বড় সাহেবজাদী খাদিজা খানমের বাসায় গোসল শেষে কাফন পরানো হয়। কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর পূর্বেই নিজের হাতে কাফনের কাপড় ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানলাম হযরতের দায়িমী খাদিম হাফিজআব্দুল হাফিজের নিকট থেকে। আমাকে যখন এই তথ্যাদি তিনি প্রদান করেন তখন তিনি কাতিয়া মাদ্রাসা মাঠে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধির নিকট উপস্থিত থেকে কুরআন পাকের খতম শেষ করছিলেন।

তনি কেঁদে কেঁদে বললেন, “আজ থেকে ৬ মাস পূর্বে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন, ২৪ গজ খদ্দরের কাপড় কিনে নিয়ে আসো। আমি তা-ই করলাম। এরপর আমি দেওবন্দ যাওয়ার পূর্বে বিদায় নিতে আসলাম। আমাকে বললেন, তুমি আমাকে সাথে নিবে না? আমি বললাম, আপনি এখন অসুস্থ আছেন-পরে নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। তাঁর জন্য দেওবন্দ থেকে কি কি হাদিয়া আনবো জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, তোমার যা ভালো লাগে নিয়ে এসো।

আমাকে আরো বললেন, মাকবারায়ে কাসিমী গোরস্তানে যেয়ে আমার নাম ধরে কুতবে আলমের (শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহ.) সমাধিতে আমার সালাম পৌঁছিও। আমি দেওবন্দ যেয়ে তাঁর এই সালাম পৌঁছিয়েছি। আমি হযরতের জন্য দেওবন্দ থেকে বেশ কিছু হাদিয়া আনলাম। এগুলোর মধ্যে ছিলো ৫ হাজার রুপির বিনিময়ে ক্রয়কৃত ‘উদ আতর। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাফনেআমি তা লাগিয়ে দিয়েছি। আরো ছিলো কাশ্মীরী সাল, খদ্দরের কাপড়, মুজা ও মিসওয়াক। ‘উদ আতর তাঁর হাতে প্রদানের সময় বললেন, এটা রাখো- ভালো অনুষ্ঠানে তা আমার গায়ে লাগিয়ে দেবে। দেওবন্দ থেকে নিয়ে আসা খদ্দর দিয়ে আমি দুই সেট জামা তৈরীর ব্যবস্থা করলাম। মাদানী কাট পাঞ্জাবী ও পাজামা বানালাম। এর একটি তিনি পরে নিলেন ও বললেন, অপরটি এখন রাখো- ঈদের জামাআতে তা পরবো। আমি জানতাম না তিনি আগে থেকেই কাফনের কাপড় নিজের হাতে ক্রয় করে রেখেছিলেন। দেওবন্দের কাপড় দ্বারা কাফন হবে ভেবেছিলাম কিন্তু দেখলাম, তাঁর নিজের হাতের ক্রয়কৃত খদ্দরের কাপড় দ্বারাই শেষ পর্যন্ত কাফন দেওয়া হলো।” সুবহানাল্লাহ!

নয়াসড়ক মাদ্রাসায়

রাতের বেলা মাদানী মসজিদের অদূরে শহরের নয়াসড়ক মাদ্রাসার পশ্চিম দিকের বিল্ডিংয়ের বারান্দায় হযরতকে রাখা হলো একখানা খাটের উপর। মানুষ প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে তাঁকে দেখে আবার ঘুরে বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সিলেট শহর ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত কয়েক হাজার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আমি লক্ষ্য করলাম বারান্দার একপ্রান্তে বেশ কিছু লোক একজন আলিমের নেতৃত্বে মরদেহ বহনের একটি বাক্স প্রস্তুত করছেন। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেনো প্রস্তুত হচ্ছে? ঐ আলিম বললেন, হযরতকে এতে করে বহন করা হবে। তারা বাক্সের মধ্যে বরফ ঢুকাবেন। আমি এতে বাধাদান করলাম। বললাম, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটা পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না। তাঁকে আমরা মাত্র ২৪-২৫ ঘণ্টার ভেতরই সমাহিত করবো ইনশাআল্লাহ। এরই মধ্যে তাঁর শরীরে কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দেবে না। তাছাড়া আমি মনে করি তাঁর দেহখানা খোলা থাকলে বহনের সময় সবাই

দেখতে পারবে এবং সর্বোপরি আসমানের ফিরিশতারাও তাঁকে দেখবে। কিন্তু আমার এসব কথায় তারা কান দিলেন না। যা হোক আমি বললাম, আমি আমার মতামত ব্যক্ত করলাম। ফাইনাল সিদ্ধান্ত দেবেন কারী সাহেব। পরে নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে এই কফিনে ঢুকিয়ে বাক্সবন্দী করতে সবাই একমত হলেন, কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি নি।

ঈদের দিন ভোরে শাহী ঈদগাহে গমন

সব আয়োজন শেষ। শেষ গোসল, কাফন পরিধান, ভক্ত-মুরীদানদের শেষ দেখা, মেয়ের বাসায় সর্বশেষ রাত্রিযাপন- সব শেষ। ভোরের আগমনের সাথে সাথেই হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে যেতে হবে শাহী ঈদগাহ হয়ে কাতিয়া গ্রাম পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোর সাড়ে ৬টায় আমরা শাহী ঈদগাহে পৌঁছলাম। এ পর্যায়ে হযরতকে বহনকারী কফিনের পুরো দায়িত্ব কারী সাহেব আমাকেই প্রদান করলেন। তবে আমার সঙ্গে আরো ছিলেন জকিগঞ্জী সাহেব, আজমিরিগঞ্জী সাহেব, নবীগঞ্জী সাহেব, হাফিজ আব্দুল হাফিজ, হাফিজ তাইয়্যিব, হাফিজ ফরহাদ আহমদ ও অন্যান্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানাযার নামাযে শরীক হলাম না। আমরা পরে কাতিয়ায় অনুষ্ঠিত জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেছি।

অজানা আরেক লাশ

আমরা হযরতের বাক্সটি উপরে তুলে লক্ষ্য করলাম সেখানে একটি লাশ চাদরে ঢাকা অবস্থায় খাটের মধ্যে আছে। একমাত্র ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য আমরা নীচে ডান পার্শ্বস্থ পাকা মাঠে যাই। বাকী পুরো সময়ই হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কফিনের নিকট কাটিয়েছি। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উক্ত মৃতের কোন আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎ মিললো না। এমনকি এই ঈদের দিনে জানাযা হওয়ার মতো সৌভাগ্যবান এই ব্যক্তিকে কেউ এক নজর দেখতেও আসলো না। আমি ভাবলাম, মৃত ব্যক্তি কোনো মহিলা হবেন- এ কারণেই কেউ দেখতে আসছেন না। যা হোক, এই মৃত ব্যক্তি কে ছিলেন তার সঠিক খবর

একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। অবশ্য জানাযা শেষে তাঁকে একদল মানুষ নিয়ে যেতে দেখেছি কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ মিলে নি।

কয়েক লক্ষাধিক মানুষের আগমন

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শাহী ঈদগাহ ময়দানে সাধারণত লক্ষাধিক মানুষ জমায়েত হয়ে থাকেন। কিন্তু স্বভাবতই কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামাযে জানাযায় শরীক হতে সিলেট সিটিসহ দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ আগমন করেন। এতে বিশাল এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। যেদিকে আমরা তাকিয়েছি সেদিকেই শুধু মানুষ আর মানুষ! অনেকের পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী থাকায় পুরো এলাকা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সবার মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের প্রশান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। আমি বার বার এই দৃশ্যটি অবলোকন করেছি। মানুষের সংখ্যা কেমন ছিলো তার একটি ধারণার জন্য বলছি, অনেকেই পরে বলেছেন, ডানদিকে রাস্তায় মানুষের লাইন সুদূর এমসি-কলেজ তথা টিলাগড়ের নিকটে যেয়ে পৌঁছে। অপরদিকে নাইওরপুল, নয়াসড়ক, সুবহানী ঘাট ইত্যাদি এলাকায় দাঁড়িয়ে মানুষ ঈদ ও জানাযার নামাযে শরীক হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করলাম, জানাযার সময় হাজার হাজার মানুষ ইমামের লাইনের সামনে অবস্থান করে নামাজে শরীক হয়েছেন! এতো বড় জানাযার নামায মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী এবং বিশ্ব ইজতিমার মাঠ ছাড়া আর কোথাও আমার জীবনে দেখি নি। তবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সঠিক কি ছিলো তা বলতে পারবো না- একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।

সিলেটবাসীর শেষ দেখা

ঈদের জামাআত শুরুর আগ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ লাইন বেঁধে সুশৃঙ্খলভাবে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে শেষবারের মতো এক নজর দেখেন। আমার মনে আছে অনেক পরিচিত মুখ হযরতের চেহারা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এদের মধ্যে ঢাকা আজরাবাদ মাদ্রাসার সম্মানিত মুহতামিম কারী সাহেবকে দেখতে পেলাম। তিনি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন। জামাআত শুরুর পনর মিনিট পূর্বে

মানুষের ভিড় অত্যন্ত বেশী বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ আর কাউকে সামনের দিকে ঢুকতে দেন নি।

ঈদের নামাযের পূর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য

ঈদের জামাআতের পূর্বে যারা বয়ান পেশ করেন তারা হলেন, সিলেটস্থ বন্দরবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুশতাক আহমদ খান এবং ইমাম মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব; অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কামরান। সকলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, আজ পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন। আমাদের সিলেটবাসীর জন্য একটি শোকের দিন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, সিলেটের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুজুর্গ, প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন সিলেটের গর্ব আল্লামা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) চিরবিদায় নিয়ে আমাদেরকে অভিভাবকহীন করে চলে গেছেন। ঈদের নামায শেষেই আমরা তাঁর জানাযার নামায আদায় করবো।

মুফতী মনজুর রশীদ আমিনীর ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত

ঈদুল ফিতরের জামাআত ঠিক ৯ ঘটিকার সময় শুরু হলো। নামায শেষেই পূর্ব সিন্ধান্ত অনুযায়ী আমি, আজমিরিগঞ্জী সাহেব, নবীগঞ্জী সাহেব, জকিগঞ্জী সাহেব, হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজ ও মিজানুর রহমান লায়েক প্রমুখ তাড়াতাড়ি হযরতের কফিনের নিকট চলে গেলাম। আমরা এখানে জানাযার নামায পড়ি নি। ঈদের নামায শেষে খুতবা ও দু'আ হলো। এরপর হযরতের নাতি মুফতী মনজুর রশীদ আমিনীর ইমামতিতে বিশাল জনতার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো স্মরণকালের বৃহত্তম নামাযে জানাযা। নামায শুরুর পূর্ব মুহূর্তে মুফতী মনজুর রশীদ আমিনী জানতে চাইলেন অপর মৃত ব্যক্তি পুরুষ না মহিলা। আমি বললাম, আমরা তো তার কোনো ওয়ারিশকে এখানে পাই নি।সম্ভবত মহিলা হবেন। সেমতে তিনি প্রথমে এ'লান করলেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলার জানাযা হবে। এসময় কে বা কারা পেছন থেকে চিৎকার দিলো- ঐ মৃত

ব্যক্তি পুরুষ। সুতরাং মুফতী সাহেব পুনরায় বললেন, আসলে দু'জন পুরুষের জানাযা হবে।

ফিরে এলেন হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর হাতেগড়া কাতিয়া মাদ্রাসায়

হযরতের কফিন নিয়ে আমরা সময়মতো তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাতিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম। তখন দুপুর সাড়ে বারোটা। আমার সঙ্গে হযরতের দু'জন খলীফা সর্বদাই ছিলেন। এরা হলেন হযরত শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী এবং হযরত শায়খ আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী। প্রথমে আমরা হিফজখানার বিল্ডিংয়ের নীচে হযরতের হুজরাখানার পার্শ্ববর্তী কক্ষে যুহরের নামায আদায় করে নিলাম। ইতোমধ্যে হযরতের কফিনটি প্রথমে মাদ্রাসার অতি নিকটেই দক্ষিণের বড়ো দিঘির পশ্চিম পারে স্থাপিত তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে হযরতের অসংখ্য নিকটাত্মীয়রা তাঁকে একনজর দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পরে কফিনটি মাদ্রাসা মাঠে নিয়ে আসা হলো সর্বস্তরের জনতার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

আমি হিফজখানার উপর তলা থেকে লক্ষ্য করলাম, হযরতের কফিনটি মাঠের অপরপ্রান্তে বার্ষিক জলসা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত পাকা স্টেজের উপর রাখা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বেহুঁশ-বেকরার হয়ে তাদের প্রিয় শেখ সাহেবকে একনজর দেখার জন্য ধাক্কা-ঠেলার শিকার হয়েও প্লাটফর্মে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। যারা উঠতে সক্ষম হচ্ছিলেন তাদের কণ্ঠে ক্রন্দনের হাউমাউ আওয়াজে পুরো এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছিলো।

হিফজখানার সামনেই হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আলমে-বরযখের ঠিকানা, মাটির ঘর সেই কবরটি তখনো খনন করা হচ্ছিলো। চতুর্দিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক লোক এখানেও ভিড় জমিয়েছেন। জানাযা শুরুর তখনও বেশ বাকী।

কাতিয়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জানাযার নামায

কাতিয়ায় অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে আমি হিফজখানার দ্বিতীয় তলা থেকে পূর্বের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফেসির বাজার এবং এর আরোও পূর্ব পর্যন্ত রাস্তায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এরা ভীড়ের কারণে সামনে অগ্রসর হতে পারেন নি। জানাযার নামাযের পূর্বে অনেকেই বক্তব্য প্রদান করেন। এদের মধ্যে শাইখুল হাদীস মাওলানা হুসাইন আহমদ বারোকুটী, শাইখুল হাদীস মাওলানা নূরুল ইসলাম খান, মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবে রব্বানী, শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুশ শহীদ গলমুকাপনী, সাবেক এমপি মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী এবং হযরতের সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেবের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। বিকেল তিন ঘটিকার সময় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বড়ো সাহেবজাদা মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী।

সমাহিত হলেন তাঁর প্রিয় ইলমে দ্বীনের বাগানে

কাতিয়া এলাকার মানুষের নিকট হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধু একজন বড়ো আলিম ও তরীকতের মুর্শিদ ছিলেন না- তিনি ছিলেন তাদের একান্ত আপনজন। তাদের অভিভাবক মুরুব্বী। বিচারে-আচারে, বিপদে-আপদে সর্বদাই তারা হযরতকে একান্ত আপনজন হিসাবে কাছে পেয়েছেন। গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে ছুটে এসেছেন শেখ সাহেবের নিকট। এলাকায় সঠিক ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন। কোথাও কোনো ইসলামবিরোধী সামাজিক কর্ম তিনি বরদাশত করেন নি- প্রতিবাদের দৃঢ়কন্ঠে গর্জে উঠেছেন এগুলোর বিরুদ্ধে। পুরো এলাকায় সঠিক দ্বীনিয়্যাত প্রতিষ্ঠায় হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় তো বটেই, অত্র এলাকার মানুষের মুখে মুখে দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্চারিত হতে থাকবে। এছাড়া হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় বাড়ির নিকটে যে বিরাট কুরআন-হাদীসের ইলমের বাগান তৈরী করে গেছেন, তা-ও এলাকাবাসীর জন্য এক

অফুরন্ত নিয়ামত হিসাবে মনে করতে হবে। আর এটা তারা কায়মনোবাক্যে স্বীকারও করেন।

দীর্ঘ ৬১ বছর ধরে কাতিয়া মাদ্রাসা থেকে এলাকায় সৃষ্টি হয়েছেন অনেক আলিম-উলামা, হাফিজে কুরআন, মুফতী ও দ্বীনদার ব্যক্তি। হযরতের পরিচিতি ছিলো বিশ্বব্যাপী এবং সবাই তাঁকে সম্বোধন করতো 'কাতিয়ার শেখ সাহেব' হিসাবে। সুতরাং তাঁরই ওয়াসিলায় সুনামগঞ্জ জিলার জগন্নাথপুর উপজিলার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী এই নিভৃত পল্লীর সুপরিচিতি গোটা বাংলা-ভারত ও পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তাই এলাকার অসংখ্য মানুষ এই মহান ব্যক্তি, অথচ তাদের প্রিয় আপনজনকে হারিয়ে আজ স্বভাবতই সর্বাপেক্ষা বেশী শোকাহত হয়েছেন। মৃত্যু একটি মহাসত্য। একথা সবার জানা। কিন্তু আজ, এই সত্যের কথা মানুষ ভুলে গেছে। তারা মানতে পারছেন না যে, সবার প্রিয় এই মহাত্মন তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। মানুষ পাগলপ্রায় অবস্থায় তাঁকে সমাহিত করতে এগিয়ে চললো।

আমি হিফজখানার দু'তলায় ছিলাম। আমার সাথে ছিলেন হযরতের খলীফা মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী ও মাওলানা আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী সাহেবদ্বয়। হযরতের কবরের চতুর্দিকে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় দেখে আমি চিন্তিত হয়ে ওঠলাম। মনের মধ্যে এক অপূর্ব আবেগ অনুভব করে নেমে আসলাম দু'তলা থেকে কবরের নিকট। তখনও হযরতের কফিনটি সমাধির নিকটে এসে পৌঁছায় নি।

আমি কবরের পাশে দেখতে পেলাম হযরতের সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহকে। কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন। মানুষের কান্নার রোল, চিৎকার, হাউমাউ শব্দে বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেছে সমগ্র এলাকা। এক বিভীষিকাময় দৃশ্যের অবতারণা হলো কবরের চতুর্দিকে। আমি সেখানে প্রথমে কথা বললাম হযরতের খলীফা শায়খ আব্দুন নূর অলৈতলী সাহেবের সাথে। তাঁর চোখ দু'টো অশ্রুতে সিক্ত। মুখখানা বেদনা-আবেগ-আপ্লুত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত। আমি বললাম, হযরতকে যে কোনো উপায়ে সঠিকভাবে দাফন করতে হবে। কিন্তু কেউ তো কারো কথা শুনছেন না! আমার মন বলছে কবরের উপরের সিঁড়িতে নেমে যাবো। তিনি বললেন, জুতো এখানে রেখে নেমে যান।

ইতোমধ্যে কফিনটি কবরের পশ্চিম পারে এসে গেল, অনেকে তা বহন করছিলেন। আমি ইশারায় বললাম এটিকে কোন্ দিকে ঘুরাতে হবে। আমি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললাম, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আপনারা যা করছেন তা নিশ্চয় পছন্দ করতেন না- তিনি চলে গেছেন, আমরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখি না- শান্তভাবে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। আমার কথায় কিছুটা কাজ হলো। এদিকে কফিনটি সিঁড়িতে না নামিয়ে আমি বললাম উপরেই (কবরের পশ্চিম পারে) রাখুন। সবাই তাই করলেন, কিন্তু মস্তকের দিকের কিছু অংশ আমার হাঁটু দ্বারা উঠিয়ে রাখতে হলো। এরপর বললাম, বাক্স খুলুন।

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দেহখানা বাক্সের ভেতরথাকার কারণে কেমন যেনো ভেজা ভেজা লাগলো। বাক্সের ভেতর ছোট ছোট বেশ কতগুলো ব্যাগের ভেতর চা-পাতা বা অনুরূপ কিছু দেখতে পেলাম। বললাম, এগুলো ঐ দিকে ফেলে দিন। কয়েকজন তাই করলেন। বাক্সের নীচে ছিলো বরফ। হযরতের দেহখানা দেখামাত্রই উপস্থিত হাজারেরও অধিক মানুষের মধ্যে আবার উত্তেজনা শুরু হলো। হাউমাউ ও ক্রন্দনের শব্দে সবকিছু ভারী হয়ে উঠলো। কেউই যেনো হযরতকে সমাহিত করতে চায় না! আমি আল্লাহর দিকে মনকে রুজু করে চিৎকার দিয়ে বললাম, নীচে তিনজন নামুন! আমার সাথে ধাইরে (কবরের সিঁড়িতে) আরো দু'জন আসুন। এরপর দ্রুত হযরতের দেহখানাকে আমরা তুলে আনলাম। আমার হাত ছিলো তাঁর মাথার দিকে। আমি সজোরে পাঠ করতে লাগলাম:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ

"বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ।"

আমরা ধাইরের তিনজনে হযরতের দেহকে কবরের ভেতর হাত প্রসারিত করে দাঁড়ানো অপর তিন জনের নিকট পৌঁছালাম। তারা কবরের ভেতর কুতবে যামান, যুগের মহান রূহানী রাহবার, আমাদের প্রাণপ্রিয় মুরুব্বি ও মুর্শিদ হযরত শায়খে

কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কবরের ভেতর মাটির বিছানায় শোয়ায়ে উঠে আসলেন। চতুর্দিক থেকে মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন লোকজন। একজন চিৎকার দিয়ে বললো বাঁশ ও দাড়া (চাটাই) বিছানোর পর মাটি দিন।

আমি চিৎকার দিয়ে বললাম, তাড়াতাড়ি বাঁশ দিন। আমার হাতে একব্যক্তি একটি বাঁশ দিল। আমি উত্তর দিক থেকে বাঁশ বসাতে লাগলাম। আমার সঙ্গে আরো দু'তিন জন বাঁশ বসাতে যোগ দিলেন। আমরা মিনিট খানেকের ভেতরই বাঁশ বিছিয়ে চাটাইও বিছিয়ে ফেললাম। চোখে পড়লো পূর্ব পারে হযরতের সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ সাহেব ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন। প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিক থেকে মাটি ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন লোকজন।

আমি তখনো কবরের উপরে। প্রিয় মুর্শিদকে মাটির গর্ভে রেখে দিয়েছি- উপরে চাটাই, এখন দ্রুত মাটি দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ আমি অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাট আঘাত অনুভব করলাম। বুকটা ধুরু ধুরু করে উঠলো। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। আমি পড়ে গেলাম হযরতের কবরের উপর। আমার জ্ঞান প্রায় লোপ পেল। বেশ কয়েকজন এসে আমাকে ধরে শূন্যে উঠিয়ে মাঠের অপরপ্রান্তে নিয়ে টিউব ওয়েলের ঠাণ্ডা পানি ঢাললেন আমার মাথায়। আমার হুঁশ ফিরে আসলো, কিন্তু তখনও খুব-দ্রুত শ্বাস নিচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমি ঠিক আছি। তারা আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে বসালেন। খাবার পানি দিলো। হাতের পাখা দিয়ে বাতাস করলো। আমি নগ্ন পায়ে সমাধির দিকে ছুটে আসলাম। কবরের মাটিতে আমার গায়ের পাঞ্জাবিতে দাগ লেগে গেছে। পূর্বদিকে হিফজখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন হযরতের সকল সাহেবজাদা। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিয়ারতে শরীক হলাম। আমি করুণ দৃষ্টিতে তাঁদের সবার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, হায়! আজ তারা সবাই ইয়াতীম হয়ে গেলেন।

ইন্তিকালের সময়ের কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী

আল্লাহর ওলিদের ইন্তিকালের সময় কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী ও কারামত প্রকাশ হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বিভিন্ন তাসাওউফের কিতাবে ওলিদের

জীবনালোচনায় আমরা এর প্রমাণ পাই। অত্র গ্রন্থে বর্ণিত পূর্ব যুগের চিশতি শায়খদের কারো কারো জীনবসায়াহ্নে কিছু অলৌকিক ঘটনার কথাও আমার তুলে ধরেছি।

কুতবে যামান, মুর্শিদুল আমীন, যুগের রূহানী চিকিৎসক, মযজুব ইলাল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনভর অনুসরণকারী, নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিদায়ের সময়েও কিছু নৈসর্গিক ঘটনা ও কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি স্বয়ং নিজেই ছিলেন 'কারামাতুল্লাহ'। তিনি ছিলেন 'ছাহেবে কাশফ'। তাঁর জীবনে অসংখ্য ছোট-বড় কারামত প্রকাশ পেয়েছে। পাঠকদের অনেকেই হয়তো এ ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল বা এমনকি প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ইন্তিকালের সময়ের কিছু তথ্যভিত্তিক বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. প্রকম্পিত হলো কাতিয়ার মাটি: হযরতকে ১২ রমজান সোমবার দিন ভোরে কাতিয়া থেকে সিলেটের আলী সেন্টারস্থ মডার্ণ জেনারেল হসপিটালে নিয়ে আসা হয়। এর আগের দিন দিবাগত রাত তিনি তখনও কাতিয়ায় ছিলেন। রাতের বেলা কাতিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোট ৫ বার মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। অনেকে এই ভূমিকম্প হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি কাতিয়ার মাটিতে আর জীবিত অবস্থায় ফিরে যান নি।

২. বহু মানুষের স্বপ্ন: আমি অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ করেছি যারা হযরত সম্বন্ধে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখেছেন যাতে পরিষ্কার বুঝাচ্ছিল যে, তাঁর ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী। এরূপ দু'টি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন আমি নিজেও দেখেছি।

৩. কাফন ক্রয়: কাউকে না জানিয়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রমজানের পূর্বেই নিজের হাতে খদ্দরের কাপড় ক্রয় করে রেখেছিলেন। আর ঈদগাহ মাঠে এটা তার গায়ে পরানো হবে এরূপ ইঙ্গিত করেন তাঁর খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজের নিকট।

৪. সিলেট ছাড়া দেশব্যাপী ভূমিকম্প: ইন্তিকালের আগের রাত থেকে শনিবার সাড়ে চরটায় কাতিয়ার মাদ্রাসা মাঠে হযরতকে সমাহিত করার পূর্ব পর্যন্ত পুরো বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়েছে- তবে হয় নি শুধু বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে।

৫. সমাধি থেকে মিশক-আম্বরের খুশবো: প্রথম দিন থেকেই হযরতের সমাধি থেকে বেরিয়ে আসছিলো মিশক-আম্বর ও ফুলের সুঘ্রান। এ ঘ্রাণ অনেকে পেয়েছেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ দিবাগত রাত রায়নগরস্থ বাসায় হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ সাহেব নিজেই আমার নিকট এ ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ হাফিজ আব্দুল হাফিজ কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোনে আমাকে বললেন, অপূর্ব ঘ্রান বেরিয়ে আসছে কবর থেকে। এই ঘ্রাণ অনেকদিন স্থায়ী ছিলো। সাধারণত তাহাজ্জুদের সময় এই ঘ্রাণ বেশী পাওয়া যেতো।

৬. অজ্ঞাত লোকদের জিয়ারত: শনিবার (ঈদের দিন) দিবাগত রাত এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। একদল লোক কাতিয়া মসজিদের বারান্দায় রাত্রি যাপন করছিলেন। জানাযা শেষে এরা নৌকাযোগে স্ব-স্ব বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় নৌকাখানা কুশিয়ারায় ডুবে যায়। অবশ্য সবাই বেঁচে যান। তবে দূর-দূরান্তের এসব মেহমান সেদিন আর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারেন নি। তারা কাতিয়া এসেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। গভীর রাতে তাদের অনেকেই লক্ষ্য করলেন, মাঠের অপর প্রান্তে হিফজখানার সামনে হযরতের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বেশ বড় একদল লোক জিয়ারত করছেন। তারা ভাবলেন, পরিবারের সকল সদস্যগণ বুঝি একত্রে জিয়ারতে এসেছেন। হযরতের সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী বর্ণনা করেন, আমি এই সংবাদ জেনে বললাম, না-তো। আমরা কেউ রাতের গভীরে আব্বার সমাধি জিয়ারত করি নি। এখন প্রশ্ন হলো, এরা কারা ছিলো? একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল আছেন।

৭. সমাধি থেকে মাটি নেওয়া: বেশ কিছু মানুষ সুঘ্রান পেয়ে হযরতের সমাধি থেকে মাটি নিয়েছেন। তবে হযরতের সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ সাহেব এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এভাবে মাটি নেওয়া শরীয়ত বিরোধী কাজ। তিনি দু'জন পাহারাদার রেখে মাটি নেওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখেন।

৮. জানাযার নামাযে মানুষের সংখ্যা: একে তো ঈদুল ফিতর- তার উপর সবার পরিচিত ওলিয়ে কামীল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জানাযার নামায। সুতরাং স্বভাবতই উভয় জানাযায় মানুষের ঢল নেমে গিয়েছিল। তবে আমরা সঠিক সংখ্যা বলতে পারবো না। শাহী ঈদগাহে ৩ থেকে ৫ লক্ষ মানুষ ছিলেন বলে বেশ কিছু পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে। আর কাতিয়ায় আরো লক্ষাধিক বলা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো উভয়টিই ছিলো স্মরণকালের বৃহত্তম জানাযার নামায।

৯. মডার্ণ হাসপাতালে রোগীদের ভিড়: আলী সেন্টারের মডার্ণ জেনারেল হাসপাতাল সাধারণত রোগীদের অভাবে ঈদ উপলক্ষে দু-চার দিন বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম হয়েছে। রোগীদের সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ঈদের সময়ও হাসপাতাল খোলা রেখেছেন। এটা যে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতে হয়েছে তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না।

১০. জানাযার ময়দান ছাড়া অন্যত্র বৃষ্টি: শাহী ঈদগাহ মাঠে জানাযা চলাকালে সিলেটের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু হয়নি শুধু ঈদগাহ এলাকায়।

১১. অপূর্ব তারিখ ও সময়ে ইন্তিকাল: সবশেষে এখানে ইন্তিকালের তারিখ ও সময়ের উপর কিছু বলা যায়। এটা যে এক অপূর্ব তারিখ ছিলো তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না। হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিকিরের মধ্যে থেকে তাঁর মাহবুব আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে গেছেন: রমজান মাসের ৩০ তারিখ, জুমু'আতুল বিদার দিন, জুমু'আ নামাযের পর। লন্ডন আমেরিকায় এদিন ছিলো ঈদের দিন; বাংলাদেশে ছিলো রমজান, জানাযা হয়েছে শাহী ঈদগাহে, ঈদুল ফিতরের দিন। এরূপ সবদিক থেকে উত্তম মৃত্যু সবার ভাগ্যে জুটে না। এমনকি রমজান মাসে ৫টি শুক্রবার পাওয়াও দুষ্কর ব্যাপার।

হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুলাফাবৃন্দ

নিম্নোক্ত তালিকাটি হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি হাফিজ ফরহাদ আহমদ প্রদত্ত একখানা 'ডাইরীতে' লিপিবদ্ধ আছে। এটাই নিম্নের তালিকার মূল সূত্র।

১. শায়খ হাফিজ মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ কাতিয়া, মুহতামিম, দারুল উলূম অলৈতলী ও কাতিয়া, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
২. শায়খ মাওলানা আবদুল মতিন মকরমপুর, হবিগঞ্জ।
৩. শায়খুল হাদীস মনিরুদ্দীন সাহেব শায়খে বাহুবলী, হবিগঞ্জ।
৪. শায়খ মাওলানা ওয়ারিস উদ্দীন, প্রাক্তন মুহাদ্দিস ও নাজিমে তা'লিমাত, জাউয়া মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ।
৫. শায়খ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, মুহতামিম তেঘরিয়া মাদ্রাসা ও আমীরে তাবলীগ, সুনামগঞ্জ।
৬. শায়খ মাওলানা আব্দুস শহীদ, জামলাবাজ, সুনামগঞ্জ।
৭. শায়খ মাওলানা গোলাম নবী, মুহতামিম রামনগর মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ।
৮. শায়খ মাওলানা আবুল কাসিম, ইমাম, কোর্ট মসজিদ, সিলেট।
৯. শায়খ মাওলানা শরীফুদ্দীন, মুহাদ্দিস মেউয়া মাদ্রাসা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
১০. শায়খ মৌলভী গোলাম ওয়াদুদ, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
১১. মরহুম শায়খ মাওলানা আব্দুর রউফ- সাবেক মুহতামিম, নারিকেলতলা মাদ্রাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
১২. শায়খ মাওলানা ইজ্জত উল্লাহ কাতিয়া, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
১৩. শায়খ ক্বারী বিলাল আহমদ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ।
১৪. শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল, পারকুল, কানাইঘাট, সিলেট।
১৫. শায়খ আব্দুন নূর, অলৈতলী, কাতিয়া, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
১৬. শায়খ মাওলানা নূরুল ইসলাম খান- শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম দরগাপুর মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ।
১৭. শায়খ মাওলানা আব্দুল হাফিজ, সজনশ্রী, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।
১৮. শায়খ মাওলানা হাবীবে রাব্বানী, তালবাড়ি, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

১৯. শায়খ মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, মুহতামিম জামেয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ, সিলেট।

২০. শায়খ মাওলানা মাশুকুর রহমান, মুহাদ্দিস, দারুস-সালাম মাদ্রাসা, খাসদবীর সিলেট।

২১. শায়খ ক্বারী মুহাম্মদ রশীদ আহমদ, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

২২. শায়খ গিয়াস আলী চৌধুরী, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

২৩. শায়খ হাফিজ মুহাম্মদ আলী, ইমাম, নয়াসড়ক মসজিদ, সিলেট।

২৪. শায়খ মাওলানা আব্দুল মতিন নবীগঞ্জী, মুহতামিম, মাদ্রাসা ইসলাহুল মুসলিমীন, হাতুরা, খাদিম নগর, সিলেট।

২৫. শায়খ মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মুহতামিম, শাহসুন্দর মাদ্রাসা, পীরের বাজার, সিলেট।

২৬. শায়খ মুফতী মুজির উদ্দীন, ইমাম, কদমতলি জামে মসজিদ, সিলেট।

২৭. শায়খ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, মুহতামিম, দেউল গ্রাম মাদ্রাসা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

২৮. শায়খ মাওলানা শফীকুর রহমান, কেস্রী, জকিগঞ্জ, সিলেট।

২৯. শায়খ মাওলানা মাসউদ আহমদ, উস্তাদ দেউলগ্রাম মাদ্রাসা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

৩০. শায়খ মাওলানা আব্দুল গফুর, আনন্দপুর, জকিগঞ্জ, সিলেট।

৩১. শায়খ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৩২. শায়খ মইনুল ইসলাম খান, ধুলিয়াখাল, হবিগঞ্জ।

৩৩. শায়খ মাওলানা ছমির উদ্দীন, সেওড়া, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৩৪. শায়খ মাওলানা মুজিবুর রহমান, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

৩৫. শায়খ মাওলানা সালিকুর রহমান, বেতাউকা, সুনামগঞ্জ।

৩৬. শায়খ মাওলানা ফরীদ মূসা, তেলিয়া, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

৩৭. শায়খ মাওলানা শামসুল ইসলাম খান, তিলক, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৩৮. শায়খ মাওলানা আবুল কাসিম, পাথারিয়া, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ।

৩৯. শায়খ মাওলানা শফীকুল হক, রামাপতিপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৪০. শায়খ মাওলানা ফজলুল করীম, দোহালিয়া, সুনামগঞ্জ।

৪১. শায়খ মাওলানা শামসুল ইসলাম, সুনামগঞ্জ।

৪২. শায়খ মাওলানা মুশতাক আহমদ, রসুলপুর, বি.বাড়িয়া।

৪৩. শায়খ মাওলানা উবায়দুল্লাহ, কান্দিউরা, মায়মনসিংহ।

৪৪. শায়খ মাওলানা নাজমুদ্দীন কাসিমী, ইমাম নাইওরপুল মসজিদ, সিলেট।

৪৫. মরহুম শায়খ মাওলানা মুহিবুর রহমান, সেওড়া, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৪৬. মরহুম মাওলানা আসগর আলী সাহেব, নগদিপুর, দিরাই, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৪৭. শায়খ মাওলানা আবদুর রব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

৪৮. শায়খ মাওলানা মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী, খাসিকাপন, উসমানী নগর, বালাগঞ্জ, উস্তাজুল হাদীস, রাণাপিং মাদ্রাসা, সিলেট।

৪৯. শায়খ মাওলানা লুৎফুর রহমান এডভোকেট, সুনামগঞ্জ।

৫০. শায়খ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, জামালপুর দাওরাই, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৫১. শায়খ মাওলানা মাশুক আহমদ, মৌলভীবাজার, ইমাম, বারুতখানা মসজিদ, সিলেট।

৫২. শায়খ মাওলানা আবদুল বারী, মুহতামিম, সাদারাই মাদ্রাসা, দিরাই।

৫৩. শায়খ মাওলানা আকবর আলী, কামরূপ উদলং মাদ্রাসা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ।

৫৪. শায়খ মাওলানা আবদুর রউফ, ইমাম জামলাবাজ, ইমামকান্দি, সুনামগঞ্জ।

৫৫. শায়খ মাওলানা আবদুল কাদির খান, ইসগাঁও, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

৫৬. শায়খ মাওলানা সাজ্জাদুর রহমান।

৫৭. শায়খ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মুহাদ্দিস, শ্রীরামপুর মাদ্রাসা, হরিপুর, কানাইঘাট, সিলেট।

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আলে-আওলাদ

হযরত রামাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যকালে স্ত্রী-সন্তানাদি, নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তিনি একবারই মাত্র বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মুছাম্মত মাজিদা খাতুন। তিনি হবিগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী বানিংয়াচং গ্রামের এক নামকরা মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মোট ৯ জন সন্তানের জনক। তারা হলেন:

১. মুছাম্মত খাদিজা খাতুন, স্বামী: হাজী বশীর উদ্দীন আহমদ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট। সন্তানাদি: ছেলেসন্তান: ১. মরহুম সালেহ আহমদ ও ২. ক্বারী হাজী নোমান আহমদ।
মেয়েসন্তান: ১. মুছাম্মত জুমা খাতুন (যুক্তরাজ্য প্রবাসী), ২. মুছাম্মত নাসিমা খাতুন (স্বামী: মাওলানা রেজাউল করীম কাসিমী, সাহেবজাদায়ে হযরত মাওলানা বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ৩. মুছাম্মত বুশরা খাতুন (যুক্তরাজ্য প্রবাসী), ৪. মুছাম্মত ফাহিমা খাতুন (যুক্তরাজ্য প্রবাসী), ৫. মুছাম্মত তাসলিমা খাতুন (যুক্তরাজ্য প্রবাসী) ও ৬. মরহুমা মুছাম্মত মুসলিমা খাতুন।

২. মুছাম্মত সুফিয়া খাতুন, স্বামী: হাফিজ মাওলানা রশীদ আহমদ, গ্রাম: কাসিকাপন, পো: ব্রাহ্মণ শাসন, উসমানী নগর, সিলেট।
সন্তানাদি: ছেলেসন্তান: হাফিজ ক্বারী ফরহাদ আহমদ, ২. মুফতী মনজুর রশীদ আমিনী, ৩. হাফিজ ক্বারী মনসুর আহমদ ও ৪. ক্বারী মুহাম্মদ মারুফ আহমদ।
মেয়েসন্তান: ১. ক্বারীয়া মুছাম্মত মাশহূদা খাতুন (যুক্তরাজ্য প্রবাসী), ২. ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত হাবীবা খাতুন (যুক্তরাজ্য প্রবাসী), ৩. ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত মাওলুদা খাতুন (স্বামী: মাওলানা রফি উদ্দীন, উস্তাদ খাসদবীর মহিলা মাদ্রাসা, সিলেট।), ৪. ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত মাসুমা খাতুন ও ৫. ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত মাশকুরা খাতুন।

৩. মুছাম্মত হাফসা খাতুন (যুক্তরাজ্য প্রবাসী), স্বামী: মরহুম আবদুল মুকিত, আবশপুর, উসমানী নগর, সিলেট।
সন্তানাদি (সকলেই যুক্তরাজ্য প্রবাসী): ছেলেসন্তান: ১. মুহাম্মদ ইলিয়াস হুসাইন, ২. মুহাম্মদ জাকারিয়া হুসাইন, ৩. মুহাম্মদ এনামুল হাসান, ৪. মুহাম্মদ আহমদ হুসাইন, ৫. মুহাম্মদ ইব্রাহীম হুসাইন ও ৬. মুহাম্মদ জুবায়ের হুসাইন।
মেয়েসন্তান: ১. মুছাম্মত আমীনা খাতুন, ২. মুছাম্মত হালিমা খাতুন ও ৩. মুছাম্মত রহীমা খাতুন।

৪. হাজী মাওলানা হাফিজ ইমদাদুল্লাহ আমিনী, মুহতামিম দারুল উলূম অলৈতলী ও কাতিয়া। খলীফা: ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
সন্তানাদি: ছেলেসন্তান: ১. হাফিজ কিফায়েতুল্লাহ মুবাশ্শির, ২. হাফিজ আতাউল্লাহ মুসাদ্দিক, ৩. হাফিজ হিদায়েতুল্লাহ রায়হান ও ৪. হাফিজ মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ।
মেয়েসন্তান: ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত আয়শা সিদ্দীকা, ২. ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত সালমা খাতুন, ৩. মুছাম্মত আসমা খাতুন ও ৪. মুছাম্মত হুসনা খাতুন।

৫. হাফিজ ক্বারী হাজী উবাইদুল্লাহ আমিনী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্বারী ও বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী।
সন্তানাদি (সকলেই যুক্তরাজ্য প্রবাসী): প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেন দু'জন মেয়েসন্তান: ১. মুছাম্মত লিমা খাতুন ও ২. মুছাম্মত রিমা খাতুন।
দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেন তিন জন ছেলেসন্তান: ১. ওলিউল্লাহ, ২. আরিফ বিল্লাহ ও ৩. রায়হান এবং তিন জন মেয়েসন্তান: ১. মুছাম্মত রাক্বিয়া, ২. মুছাম্মত আমারাহ ও ৩. মুছাম্মত নাবা।

৬. হাজী ক্বারী ইউসুফ আমিনী, খতীব, টরেন্টো বাইতুল মুকারম মারকাজিমসজিদ, কানাডা।
সন্তানাদি: ছেলেসন্তান: ১. মুহাম্মদ ইব্রাহীম।
মেয়েসন্তান: ১. মুছাম্মত উমামা খাতুন।

৭. হাজী ঈসমাইল আমিনী।
সন্তানাদি: ছেলেসন্তান: ১. ক্বারী দিলওয়ার, ২. ইমরান আহমদ ও ৩. ইহসান আহমদ।
মেয়েসন্তান: ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত সাদিকা খাতুন, ২. মুছাম্মত কুলসুমা খাতুন, ৩. মুছাম্মত আবিদা খাতুন, ৪. মরহুমা মুছাম্মত জুবেদা খাতুন, ৫. মুছাম্মত রায়হানা খাতুন ও ৬. মুছাম্মত শাপলা খাতুন।

৮. মুছাম্মত হাসিনা খাতুন (জুলায়খা), স্বামী: হাফিজ মাওলানা কুতুবউদ্দীন, উস্তাদ দারুল উলূম অলৈতলী ও কাতিয়া। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আপন ভাতিজা।
সন্তানাদি: ছেলেসন্তান: ক্বারী নূরুল আমীন, ২. আল-আমীন, ৩. নূর আলম, ৪. শাহ আলম ও ৫. নাজমুল আলম।
মেয়েসন্তান: ১. ক্বারীয়া আলিমা মুছাম্মত নূরজাহান খাতুন (বর্তমানে দারুল উলূম অলৈতলী ও কাতিয়া মাদ্রাসার বানাত শাখায় শিক্ষিকা হিসাবে কর্মরত) ও ২. মুছাম্মত সামিয়া খাতুন।

৯. মাওলানা ইসহাক আমিনী।
সন্তানাদি: ছেলেসন্তান: ১. মুহাম্মদ আমীন রাজ।
মেয়েসন্তান: ১. মুছাম্মত মেহেদী খাতুন ও ২. মুছাম্মত মোহিনী খাতুন।

হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মহামূল্যবান কিছু উপদেশবাণী

১. তুমি বনো আল্লাহর, সারা দুনিয়া তোমার।
(খালাক্বাকুম মা-ফিস্সামাওয়াতি ওয়াল আরদ)

২. তুমি করো আল্লাহর জিকির, আল্লাহ করবেন তোমার ফিকির। (ফাযকুরুনি আজকুরুকুম)

৩. জিকিরে খোদা বান্দার কাম, ফিকিরে বান্দাহ আল্লাহর কাম।

৪. যে পড়ে তাহাজ্জুদ তার ঈমান হয় মজবুত, এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অলী না বানিয়ে মউত দিবেন না। অবশ্যই তাকে অলী বানাবেন। তাহাজ্জুদ ছাড়া কোনো মানুষকে আল্লাহ তার অলী বানান নি।

৫. দশটার সময় ঘুম, (রাত) চারটার সময় কুম (ওঠা)।
(তাতাজ্বাফা জুনুবাহুম)

৬. মকছুদে (উদ্দেশ্য) দুনিয়া ঈমান আমল, ঈমান আমল মতলূব (চেষ্টা), জরুরতে দুনিয়া মাওউদ (ওয়াদা করা)।

৭. একটা ট্যাংকে যদি দশ লিটার পানি থাকে, তাহলে ১টা ট্যাপ লাগালে যেটুকু পানি আসবে ১০টা লাগালেও সেই সমান পানিই আসবে। ব্যাখ্যা: মানুষের রিজিক যা আছে তা-ই আসবে, চেষ্টা করলে বাড়বেও না কমবেও না। অপরদিকে চেষ্টা ছাড়া ঈমান-আমল মিলে না- এরজন্য সাধনা দরকার।

৮. ঢেলা-কুলুফকে মেথর বানাও, নিজের হাতকে মেথর বানিয়ো না।

৯. ইশরাকের সময় যেভাবে সমগ্র দুনিয়াজুড়ে সূর্যের আলো পৌঁছে যায়, তদ্রূপ ইশরাকের নামায দ্বারা অন্তর ঈমানী নূরে আলোকিত হয়ে ওঠে।

১০. প্রত্যেকটি শ্বাস মাউতের সিগনাল, সুফিয়ায়ে কিরামে বলেন, ঘণ্টায় মানুষ ১০০০ বার শ্বাস ছাড়ে এবং গ্রহণ করে। ২৪ ঘণ্টায় হলো ২৪ হাজার বার। প্রত্যেকটি শ্বাস নিতে 'আল্লাহ' ও ছাড়তে 'হু' ঠোঁট-মুখ-জিহ্বা বন্ধ। (এটাকেই বলে, পাস-আনফাস জিকির)

১১. একটা শ্বাসও যদি আল্লাহর জিকির ছাড়া বের হয় তাহলে সেটা কুফরীর মধ্যে (কাফিরদের মতো আল্লাহর স্মরণ ছাড়া) বের হলো।

১২. সুন্নাতের দ্বারা ফতেহ (বিজয়) এবং কামিয়াবী (হাসিল হয়)। এক সুন্নাতের দ্বারা সারা সিলেট জিলা ফতেহ হয়েছে- এই সুন্নাতের নাম আক্বীকা। কার হকদা খাওগো বেটি, ঠাকুর চিনো না।

১৩. আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে বে-আদবী করলে সরকারবাদী কেইস হয়। (ব্যাখ্যা: অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন)
ওলি-আল্লাহদের সঙ্গে বে-আদবী করলে আল্লাহ তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৪. মাদারিসে কওমী প্রতিষ্ঠা করা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌র জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদা করেছেন- তোমরাও করিও। কিন্তু বেইজ্জতি চাঁদা করিও না।

১৫. যে ঘরে ঢেলা থাকে জিন্নাত-ভুত-প্রেত সে ঘরে আসে না।

১৬. জিকির পড়তে পড়তে ভেতরের একটি চোখ খুলে যায়। এই চোখ দ্বারা ছবির মতো সবকিছু দেখা যায়- এটার নামই 'কাশফ'।

১৭. ওয়াজ হলো আল্লাহর বাতচিত-রাসূলের কথা। আমার গলা মাইকের চোঙ্গা মাত্র।

১৮. পরকালের রাস্তার মধ্যে আছে কয়েকটি স্টেশন। এর মধ্যে প্রথমটি হলো আলমে আরওয়াহ (রূহের জগত)। দুই নম্বর স্টেশন মায়ের পেট। তিন নম্বর হলো দুনিয়ার পেট। চার নম্বর হলো আলমে বরযখ (কবরের জিন্দেগী) আর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে হাশরের মাঠ। ছয় নম্বর হলো শেষ গন্তব্যস্থান- যদি আমল ভালো হয় তাহলে বেহেশত অন্যথায় (আমল খারাপ হলে) দোযখ।

১৯. ইসলামী শিক্ষার লাইন দু'টি। একটি বসে বসে মাদ্রাসায় [লেখাপড়ার মাধ্যমে]। আর অপরটি শুনে শুনে [অর্থাৎ তাবলীগ ও মুসাফিরী বেশে]। ওয়াজও দু'প্রকার। একটি আ'মলী ওয়াজ আর আরেকটি দেখাদেখি।

২০. একদা কুতবে আলম (হযরত মাদানী রাহঃ) দারসে হাদীসের সবক বন্ধ করে বললেন, বুজুর্গানে দ্বীনে স্বপ্নে দেখেছেন, শয়তানের মুখে বিড়ি! ইয়াদ রাখবেন, বিড়ি খাওয়া সাফ হারাম!

২১. অযুতে বাইর আর তাওবাহতে ভিতর পাক হয়।

২২ সময় সর্ট অজুও সর্ট, সময় লং অজুও লং। (ব্যাখ্যা: নামাযের জামাআত শুরু অত্যাসন্ন হলে অযুর ফরযগুলো শুধু আদায় করে তাড়াতাড়ি নামাযে শরীক হওয়া উচিত। অপরদিকে বেশী সময় থাকলে অযুর সকল সুন্নাতসহ ভালোভাবে অযু করে নিতে হবে।)

২৩. মসজিদে যাওয়ার সময় যদি কোনো মুসলমান ভাইকে নামাযে যাচ্ছে না দেখে তোমার কলিজায় আগুন লেগে যায়, তবেই মনে করবে তোমার নামায কামিল হয়েছে।

২৪. কুতবে আলম মাদানী (রাহঃ) বলতেন- আমার আমীনুদ্দীন মুরীদ নয় বরং আমার মুরাদ ও মজনুন। মুরাদের অর্থ পীরের মকসুদ ও উদ্দেশ্য। যেমন ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম আল্লাহর খলীল ছিলেন আর আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মুরাদ ছিলেন।

২৫. তাসাওউফের উসুল চারটি: অল্প খাওয়া, অল্প ঘুমানো, অল্প কথা বলা ও মানুষের সাথে অল্প মেলামেশা।

২৬. শরীরের ড্রাইভার আল্লাহ আর আমি হলাম হেল্ডুলম্যান এবং এই শরীর হল পিঞ্জিরা।

২৭. নামায যত জানদার হবে জীবন ততো শানদার হবে।

২৮. নামায পড়া সহজ কিন্তু নামাযী বনা কঠিন। হজ্জ করা সহজ কিন্তু হাজী বনা কঠিন। ঈমান আনা সহজ, মু'মিন হওয়া বড় কঠিন।

২৯. নামায কামিল ঈমান কামিল, নামায নাকিছ বা অসম্পূর্ণ ঈমান নাকিছ।

৩০. নামায থেকে ফারিগ হতে অন্তরে না চাইলেই বুঝতে হবে নামায কামিল হয়েছে।

৩১. হায়! হায়! নামাযী কৃষক, নামাযী মাঝি, নামাযী গাড়ির ড্রাইভার এবং নামাযী মুসলমানের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

৩২. প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতা ও আমীর হবে পুরুষ, যে দেশের নেতা নারী সে দেশের পুরুষরা বাঁচা থেকে মরণ ভালো!

৩৩. হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন, "কুরআন বলে আমরা পুরুষরা নেতা, আল্লাহ বলেন আমরা অইতাম নেতা, আর আইজ আমরা অইছি ছিড়া খেতা!"।

৩৪. হায়রে! আমরা খালি হাতে রওয়ানা দিয়েছি। যার দরবারে যাচ্ছি সেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- মৃত্যু হল উপভোগের বস্তু, স্বাদের বস্তু। আর তাকে তিক্ত মনে করো।

৩৪. হে আল্লাহ! আমি আপনার গোলাম। গোলামে যদি মালিকের ঘর (বাইতুল্লাহ শরীফ) না দেখে তাহলে তার মন শান্তি হবে কি করে? আমার মনকে আমি বুঝাবো কিভাবে? হে কাবাওয়ালা! কাবাতে ডাকো। হে মক্কাওয়ালা! মক্কাতে ডাকো। আপনার পাগল আর দিওয়ানা বানিয়ে কাবাতে ডাকো। আপনার ঘরে ডাকো।

৩৫. কালেমা ও তাছবীহাত পড়ে ওজুর সাথে ঘুমানো উচিত, কারণ ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই। এভাবে ঘুমের মধ্যে মরে গেলেও অন্তত অজু ও কালেমার সাথে মউত হল।

৩৬. তামাম দুনিয়া আমরার, আমরা বনো আল্লাহর- ঈমান আমলে।

৩৭. 'কান্দে পুতে বুনি খায়'- মু'মিনের গুণ হলো কম হাসা ও বেশী কাঁদা।

৩৮. যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাও তাহলে তোমার ঈমান নাই। কারণ ঈমানই হল, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না পাওয়ার নাম।

৩৯. এক হয়ে যাও! নেক হয়ে যাও! কামিয়াব হয়ে যাও!

৪০. মানুষের স্টেশন ছয়টি: (১) রূহজগৎ (২) পেটজগৎ (৩) পৃথিবী জগৎ (৪) কবর জগৎ (৫) হাশর জগৎ (৬) বেহেশত বা দোযখ জগৎ (আখিরাত জগৎ)।

৪১. আমি আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! আমার মনের মাঝে একথা ঢেলে দাও যে, আমি আপনার কাছে পিপীলিকা থেকেও ছোট্ট, এমনকি অস্তিত্বহীন। আর মানুষের মনে ঢেলে দাও যে, আমি একজন বীর বাহাদুর সিংহপুরুষ বরং এরচেয়েও আরো বাহাদুর।

৪২. আপনারা কোনো কামিল পীর সাহেবের সঙ্গ ও সাহচর্য অর্জন করে নিজেকে কামিল বানানোর চেষ্টা করুন। মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“দরকফে জামে শরীয়ত
দরকফে পছন্দানে ইশক
খোদ বখোদ কামিল না শুদ মুল্লায়ে রুম
তা গোলামে শামসে তিবরিযি না শুদ”

অর্থাৎ: “মুল্লা রুমী নিজে নিজে কামিল হয় নি
যতক্ষণ না সে তার মুর্শিদ শামসে তাবরিজির গোলাম হয় নি।”

হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালে বিভিন্ন গুণিজনের প্রতিক্রিয়া

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সংবাদে দেশ-বিদেশের সকল আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ এবং ভক্ত-মুরীদান স্বভাবতই অত্যন্ত শোকাহত হয়েছেন। আমরা নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকজন দেশ বরেণ্য উলামার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করলাম।

কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার সম্মানিত মহাপরিচালক হযরত মাওলানা আহমদ শফী (দা:বা:): "আমি হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন পাঠ করেছি। ই'তিকাফে থাকাবস্থায় সংবাদ পেয়েছিলাম তাই সবাইকে নিয়ে তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছি এবং স্বভাবতই এই সংবাদে বিশেষভাবে শোকাহত হয়েছি।"

কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান চট্টগ্রামী (দা:বা:): "হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি এই মহান ব্যক্তিকে তিনি যেনো জান্নাতের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমীন।"

কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান শায়খে গুনই (দা:বা:): তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সংবাদ শোনামাত্র, ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন পাঠ করে আর কথা বলতে পারেন নি। আমরা মনে করেছি, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেছেন।" উল্লেখ্য তিনি এসময় মসজিদে ই'তিকাফ পালন অবস্থায় ছিলেন।

কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল মুমীন শায়খে ইমামবাড়ি (দা:বা:): "মনের মধ্যে কী এসেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি ছিলেন আল্লাহর খাস বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ায় থাকাবস্থায় তাঁকে সাহায্য করেছেন। আর ইন্তিকালের পরে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছাবেন। আমি কী মানুষ! আমার অন্তরে আর কী-ই বা আসবে? আপনারা আমার জন্য দুআ করবেন।"

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মাসিক মদীনা সম্পাদক, হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা:বা:): "আমার কষ্ট লাগছে এজন্য যে, খুব ইচ্ছে ছিলো হাসপাতালে যেয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে, কিন্তু অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমার দৃষ্টিতে তিনি বাংলার কুতুব ছিলেন- সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন তাই অনেকে তাঁকে চিনতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিদায়াতের, তাসাওউফের এবং একই সাথে রাজনীতির যে ধারা বিস্তার করেছিলেন, তার সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য লোক ছিলেন কাতিয়ার শেখ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন আমাদের মুরুব্বি, গুরু, পথপ্রদর্শক, নেতা, বন্ধু যাই বলেন ... কী আর বলবো? তাঁকে আমরা হারিয়ে ফেললাম, আহ! তিনি আমাকে খুব বেশী মুহাব্বত করতেন।"

প্রাক্তন এমপি, মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস (দা:বা:): তিনি তখন ঢাকাস্থ বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। হার্ট এটাক পরে তাঁর বাইপাস অপারেশন হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা শিফা দান করুন। হযরত শায়খে কাতিয়ার ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হোন।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী (দা:বা:): "আসমান ভেঙ্গে মাথায় পড়ে গেছে! সারা জমিন অন্ধকার হয়ে গেছে। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি ছিলেন বাতিলের আতঙ্ক এবং নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ। সারাজীবন মোটা সুতার কাপড় (খদ্দর) পরেছেন এবং এই কাপড় পরিধান করেই কবরে গেলেন।"

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুক্বাদ্দাস আলী (দা:বা:): "কুতবে আলম শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যে কয়েকজন নেকবান্দাহ ও ওলিআল্লাদেরকে রূহানী ফায়িজ দ্বারা শক্তিশালী করে রেখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে চলে গেছেন। এখন হযরত কাতিয়ার ছাহেবও বিদায় নিলেন। আমরা দিনদিন সবাইকে হারিয়ে ফেলছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাত নসীব করুন।"

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা ফায়জুল বারী মহেশপুরী (দা:বা:): তিনি তখন সিলেটের নয়াসড়ক মসজিদে ই'তিকাফ পালন করছিলেন। হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। কিছু না বলেন অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকেন। তাঁর চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় পনি ঝরছিল।

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম এলএলবি (দা:বা:): "তিনি বাতিলের মুকাবিলায় অত্যন্ত মজবুত ছিলেন। সুনামগঞ্জ জিলায় গান-বাজনা ও অনুরূপ সকল গোনাহের কাজে যাতে মানুষ লিপ্ত হয় না- তার জন্য তিনি শুধু সোচ্চার ছিলেন না বরং এগুলো উৎখাত করার ক্ষেত্রে অনেক কুরবানী করেছেন। তিনি তাবলীগ জামাআতকে শুধু সমর্থন করতেন না, হরমুজুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আমীরত্বে তিনি তাবলীগ জামাআতেও গিয়েছেন। তাঁর খানক্বায়ী নিযাম প্রতিষ্ঠা এবং খেলাফত বিল্ডিংয়ে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঐতিহ্য রক্ষার্থে দারসে হাদীসের ব্যবস্থা আবার শুরু করে দিয়ে গেছেন- এ দু'টো কাজ হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। বাতিল শক্তি তাঁর মতো আর কাউকে ভয় করতো না- এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হবে আমাদের জন্য বড় কঠিন কাজ।"

হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কয়েকজন খলীফার প্রতিক্রিয়া

শায়খ মৌলবী গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী (দা:বা:): "আমি শেখ সাহেবকে কোনদিন দেখি নি সুন্নাতের খেলাপ কোন কাজ করতে। তিনি জীবনভর সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়। তিনি কোন দিন বেহুদা কথা বলতেন না। সব সময় বুঝা যেতো তাঁর অন্তরটি কাঁদছে। আল্লাহর ভয়ে তিনি সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ছিলো অঢেল। তাঁর নিকট কেউ পেরেশান হয়ে আসলে, তিনি নিজেই সেই পেরেশানীর অংশীদার হয়ে যেতেন। কিভাবে তার পেরেশানী দূর হয় সে চেষ্টায় লেগে যেতেন। আহ! আমি আর কি বলবো? ... তার জীবনে তাহাজ্জুদ ছুটতে আমি দেখি নি। আখিরাতের ফিকিরেই তিনি নিমগ্ন থাকতেন। মেহমানদারী, মুহাব্বত, অপরের প্রতি দরদ, মানুষকে সর্বাবস্থায় সান্ত্বনাদান ইত্যাদি গুণাবলী তাঁর মধ্যে আমি সবসময় দেখেছি।"

হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী (দা:বা:): "আজ থেকে আমরা আর কার কাছে দু'আ চাইবো? আধ্যাত্মিক রাজধানীর সিলেট বিভাগের স্বনামধন্য রূহানী রাহবার কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের সবার প্রিয় মুরুব্বি, মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শক কাতিয়ার শেখ সাহেবকে হারিয়ে আমরা এতিম হয়ে গেছি।"

হযরত মাওলানা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (দা:বা:): "আমার মতে তিনি শুধু কুতবে যামান ছিলেন না, সমগ্র আলমের কুতুব ছিলেন। আমাকে হাসান বসরীর (রাহ.) মতো ওলি বানানোর জন্য আল্লাহর দরবারে কে আর দু'আ করবে? এখন কাকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হক্বের ঝাণ্ডাসহ ফতেহ করবো?"

শায়খ মুফতী মুজির উদ্দীন কাসিমী সিংপুর, হেতিমগঞ্জী (দা:বা:): "আমি তখন ই'তিকাফে। হযরত শায়খের ইন্তিকালের সংবাদ শোনে মসজিদে থাকাবস্থায় আমার মনের প্রতিক্রিয়া এমন হলো যে, যা নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার আমার অভিভাবককে হারিয়ে আমি ইয়াতীমতূল্য নির্বাক হয়ে গেলাম। সেদিন আসরের নামায শেষে মুসল্লিদের নিয়ে দু'আ যখন শুরু করি, তখন কান্না থামাতে পারি নি- সাথে সাথে মুসল্লিদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী ওয়ে ওঠে। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর আদর্শের উপর চলার তাওফিক দিন।"

শায়খ নাজমুদ্দীন কাসিমী জকিগঞ্জী (দা:বা:): "নির্ভীক রাহবার আমরা হারিয়ে ফেলেছি! এমন নির্ভীক রাহবার আর কোথায় পাবো?"

শায়খ গয়াস আলী চৌধুরী মোহনগঞ্জী (দা:বা:): "হযরতকে আল্লাহ তা'আলা এমন একটা দিনে (জুমু'আতুল বিদায়) পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন, যা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে নসীব হয়। প্রাথমিকভাবে হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে একদিকে যেমন ব্যথাতুর হয়েছি- অপরদিকে এই সুন্দর সবদিক থেকে উত্তম একটি দিনে মৃত্যু হওয়ায় অন্তরে আনন্দবোধও করলাম। আমার অনুভূতিতে এই বেদনা-আনন্দের এক মিলন ঘটলো এই কারণে যে, তিনি পুরো রমজান তো পেয়েই

গেলেন, তার উপর শুক্রবার রমজানের শেষ দিন ইন্তিকাল করলেন, শাহী ঈদগাহ ময়দানে এতো বিরাট জনসমুদ্রে জানাযার নামায হলো। এরূপ মৃত্যু ক'জনের হয়?"

শায়খ কারী আব্দুর রশীদ মোহনগঞ্জী (দা:বা:): "রামাদ্বানের ২৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শক কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধি, মদীনা মুনুওয়ারায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারের নিকটে দেখা যাচ্ছে। এই অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখার পর আমি বুঝতে পারলাম হযরতের ইন্তিকালের মুহূর্ত নিকটবর্তী। আর পরদিনই আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি বিদায় হয়ে চলে গেলেন মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দারাজাতকে বুলন্দ করুন।"

আলহামদুলিল্লাহ্! আমার শায়খ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তরীকায়ে চিশতিয়ার ৪২ জন মহান ব্যক্তির জীবন ও হালতের উপর চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থের মূল লেখাটি সমাপ্ত হয়েছে। সুকঠিন এ কাজ আঞ্জাম দেওয়া কখনো আমার পক্ষে সম্ভব হতো না যদি না মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে সাহায্য করতেন। আমি আবারো তাঁর পবিত্র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সেসাথে গণনাতীত দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, রাহমাতুল্লিল আলামীন, পেয়ারে নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মহাত্মন আসহাবে কিরামের প্রতি।

*** لولاكم ما عرفنا الهوى ولولا الهوى ما عرفناكم ***

তুমি না থাকলে, না জানতাম মোরা প্রেমকে
প্রেম না থাকলে, না জানতাম মোরা তোমাকে ।।

** সমাপ্ত **

পরিশিষ্ট ১

তাসাওউফ পরিভাষাকোষ

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম ফজল ও করমে হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তৃতীয় খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ চিশতিয়া তরীকাভুক্ত আমাদের শাজারার ৪২ জন যুগশ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখের জীবন, কর্ম ও তরীকাতের সাধনার উপর রচিত এ গ্রন্থখানা সমাপ্ত হয়েছে। আমি আশা করছি পাঠকরা এ থেকে তৃপ্তি ও উপকার লাভে ধন্য হবেন।

ইলমে তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধির জ্ঞান একটি চরিত্র দর্শনের নাম। তবে তাসাওউফের ব্যাপ্তি আরো গভীর। যেখানে দর্শন আলোচনা-গবেষণা-অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে তাসাওউফ চরিত্র-দর্শনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা এবং বিশেষ কিছু সুচিন্তিত, প্রণালীবদ্ধ আমল বা বাস্তব কর্মও বটে। সচরাচর দর্শন ও তাসাওউফ তথা সুফিতত্ত্বের মধ্যে এখানেই মূল পার্থক্য। চরিত্র দর্শনের উপর সুন্দর-সুন্দর বাক্য লিখা ও বলা এক জিনিস। আর এই দর্শনের উপর আমল আরেক জিনিস। অন্য কথায় জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়, জ্ঞানের আলোকে আমল দ্বারা চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হতে পারাই হলো মানবজীবনের কামিয়াবী।

চিশতিয়া তরীকার মাশাইখে কিরামের জীবনাদর্শ থেকে আমরা অবশ্যই লাভবান হতে পারি। তাঁদের রাস্তা বা তরীকা সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন থেকেও বিশেষভাবে উপকৃত হবো নিশ্চয়ই। তাসাওউফ ও তরীকাতপন্থী সুফি-দরবেশ-মাশাইখ প্রাথমিক যুগ থেকেই কিছু বিশেষ শব্দাবলী ব্যবহার করে আসছেন। এসব শব্দের একটি পরিভাষাকোষ সবার জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ সন্নিবেশিত করলাম। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাওফিক দানকারী।

আ

الابدال -**আবদাল**: শাব্দিক অর্থ, 'বিকল্প'। পারিভাষিক অর্থ, উচ্চ স্তরের সুফি অলিআল্লাহ, যাদের মৃত্যু হলে অন্যদের দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয়। বলা হয়ে থাকে, আবদাল একই সময় বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা রাখেন।

عابد - **'আবিদ**: বহুবচনে 'উব্বাদ'। অর্থ, আল্লাহর [একান্ত আন্তরিক] উপাসনাকারী।

الأدب - **আদাব**: [আল্লাহর কিংবা অপর ব্যক্তির সম্মুখে ও সাথে] ভালো আচরণ।

الاخرة - **আখিরাহ**: পরজীবন [ইহজীবন বা 'দুনিয়া'র বিপরীত]।

الاخلاق - **আখলাক্ব**: ব্যক্তির চরিত্র, বিশেষ করে তার আচরণ ও নীতি-নৈতিকতা।

أخلاق حميدة - **আখলাকে হামীদাহ**: উত্তম চরিত্র।

أخلاق رازيلة - **আখলাকে রাযীলাহ**: মন্দ চরিত্র।

العارف - **আ'রিফ [বিল্লাহ]**: শাব্দিক অর্থ, 'যে আল্লাহকে চিনে'। পারিভাষিক অর্থ, মা'রিফাতপন্থী; উঁচু স্তরের সুফি শায়খ।

الاسباب - **আসবাব**: একবচনে, সাবাব: বেঁচে থাকার রসদপত্র যা সুফিকে আল্লাহর [পছন্দসই] উপাসনা ও সাধনায় বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।

الاوب - **আউওয়াবা**: 'তাওবাহ' শব্দের বিকল্প শব্দ। এর অর্থ, 'আল্লাহর সম্মুখেঅনুশোচনা প্রকাশ করে তাঁরই নিকট ফিরে যাওয়া'; তাওবাহর সর্বোচ্চ স্তর।

الأولياء - **আউলিয়া**: একবচনে, الولي - ওয়ালি: 'আল্লাহর বন্ধুজন' বা 'আল্লাহর আপনজন'; উচ্চ পর্যায়ের সুফি শায়খ।

عين اليقين - **'আইনুল ইয়াক্বীন**: নিশ্চয়তার নির্যাস; নিশ্চিত জ্ঞানের মূল; সুফিদেরএকটি স্তর যেখানে উপনীত হলে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

أفات لسان - **আফাতে লিসানী**: যবানের অন্যায় / বিপদসমূহ; মুখে উচ্চারিত খারাপ, বিবেকহীন, দ্বীন-ইসলাম বিরোধী, কুফরী কালাম, গ্বীবত ইত্যাদি বক্তব্য।

اهل الله - **আহলুল্লাহ**: আল্লাহওয়ালার দল; আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিরা; আউলিয়ায়ে কিরাম।

عمل صالح - **আমলে সালিহা**: সৎকর্ম সম্পাদন; উপকারী আমল বা কর্ম।

الأركان - **আরকান**: ভিত্তিমূল; খুঁটি; স্তম্ভ।

العزم - **আযম**: কল্পনা মুতাবিক কাজের প্রতি আগ্রহ, দৃঢ়তা ও তা কার্যে পরিণত করা।

ই

الاعجاب - **ই’জাব**: আত্মপ্রসাদ, আত্মতৃপ্তি; আত্ম-গর্ব, নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা। সালিককে এসব ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

الإخلاص - **ইখলাস**: আল্লাহর সম্মুখে (সর্বক্ষেত্রে) আন্তরিক হওয়া; তরীকতের রাস্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ ব্যাপার এটি।

الاختيار - **ইখতিয়ার**: নির্বাচন, বাছাই বা পছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা; একাধিক অপশন থেকে যে কোনোটি পছন্দ করার ক্ষমতা।

الإلهم - **ইলহাম**: ঐশী জ্ঞান; খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান। আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে ভালো খাতির বা জ্ঞান। মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের আক্বীদার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

علم اليقين - **‘ইলমুল ইয়াক্বীন**: নিশ্চিত জ্ঞান। দেখুন, হাক্কুল ইয়াক্বীন ও ’আইনুল ইয়াক্বীন

الإيمان - **ঈমান:** ধর্মবিশ্বাস। তাসাওউফপন্থীরা বলেন: তিন জিনিষ অর্জনই হলো এ রাস্তার মূল: ১. ইসলাম - বাহ্যিকভাবে আল্লাহর নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ, ২. ঈমান - ধর্মবিশ্বাসকে আন্তরিককরণ ও ৩. ইহসান - আল্লাহর উপাসনা এমনভাবে করা যেনো আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন; যদি না পারেন তাহলে এটা অন্তরে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা যে, তিনি আপনাকে দেখছেন; অন্যকথায়, আল্লাহর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থেকে একমাত্র আল্লাহ-প্রাপ্তির আশায় তাঁর নির্দেশিত পথে চলা ও ইবাদত করা। সুফিরা বলেন, ইহসানের স্তরে উন্নত হওয়ার জন্যই তাসাওউফ তথা পীর-মুরীদী। এ রাস্তা ছাড়া সঠিক ‘ইহসান’ অর্জন খুব সুকঠিন কাজ বটে।

الإنابة - **ইনাবা**: তাওবাহর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া; আসলে এটা তাওবাহ্র উন্নততর স্তর।

الإرادة - **ইরাদা**: [আল্লাহ-প্রাপ্তির] আকাঙ্ক্ষা; আল্লাহর দিকে ফিরা ও তাঁকে প্রাপ্তির রাস্তায় প্রবেশ করা (মুরীদ হওয়া)।

الإشارة - **ইশারা**: পরোক্ষ ইঙ্গিত। এর বিপরীত শব্দটি হলো, ’ইবারা।

العشق - **’ইশ্ক**: আল্লাহর জন্য মা’রিফাতপন্থীর ভীষণ প্রেমাসক্তি; আল্লাহপ্রেম।

الاستقامة - **ইস্তিক্বামা**: সরলতা; ঋজুতা; নৈতিক সাধুতা।

الإثبات - **ইসবাত**: দৃঢ়তালাভ, অস্তিত্বলাভ; মাহু বা নফি (বিলুপ্তি) এর বিপরীত শব্দ। দেখুন, মাহু। শায়খরা তরীকতের সালিক (বা মুরীদকে) নফি-ইসবাতের জিকির করিয়ে থাকেন। এই জিকির হলো ‘লা-ইলাহা’ (নফি বা মাহু অংশ) এবং ‘ইল্লাল্লাহ্’ (ইসবাত অংশ)। ‘লা-ইলাহা’ বলার সময় নিজেকে অস্তিত্বহীন ভাবতে হবে এবং ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় ভাবতে হবে সবকিছু পুনরায় অস্তিত্বলাভ করেছে।

اليقين - **ইয়াক্বীন**: আল্লাহ সম্পর্কে নিশ্চিত, চিরন্তন স্থায়ী জ্ঞান ও তাঁর উপর আশ্বস্ত; দেখুন, আ'ইনুল ইয়াক্বীন ও হাক্কুল ইয়াক্বীন।
الإصلاح - **ইসলাহ**: সংশোধন; আত্মার সংশোধন (ইসলাহুন-নাফস)।
اسم ذات - **ইসমে যাত**: 'আল্লাহ্' নাম। এটা আল্লাহর খাস নাম।
اسم صفات - **ইসমে সিফাত**: আল্লাহর ৯৯ গুণবাচক নাম।
الأجمالي - **ইজমালী**: সমষ্টিগত।
الإطمئنان - **ইতমি'নান**: প্রশান্ত; তুষ্টি; শান্তিমতো কাজ করা।
إيصال ثواب - **ইসালে সাওয়াব**: আমলের প্রতিদান (মৃতের প্রতি) পৌঁছানো।

উ

العبودية - **'উবূদিয়্যাহ**: প্রভুর সম্মুখে গোলামীর অবস্থা বা স্তর; আল্লাহর ইবাদাত করা; আল্লাহর দাসত্ব; বিশেষ করে ফরয-ওয়াজিব সঠিকমতো আদায় করা যা আল্লাহর হাক্ব বা প্রাপ্য।
العجب - **'উয্ব**: আত্মপ্রসাদ; অতিমাত্রায় আত্মগর্ব।
الأنس - **উন্স**: আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গ; প্রশান্তি; 'হাইবা' বা তাঁর সম্মুখে ভীতির বিপরীতার্থে।
العزلة - **'উজলাহ**: একাকীত্ব; মানব সংস্পর্শ থেকে আলাদা থাকা; সুফিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল।
الولاية - **উইলায়াহ** (বিলায়াত): আল্লাহর ওলি বা বন্ধুজন হওয়া; আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তি; দেখুন, আওলিয়া।
الورد - **উইরদ্ (বহুবচন, আওয়ারদ্)**: প্রার্থনা; উপাসনা; নিয়মিত জিকির-আজকার, দু'আ-দরূদ ও নফল ইবাদত।
الوجود - **উজূদ**: সালিক কর্তৃক 'আল্লাহপ্রাপ্তির' কর্ম বা আমল, যা তাকে আধ্যাত্মিকআনন্দ কিংবা আত্মবিলুপ্তির মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

ও

الوجد - **ওয়াজ্দ**: সালিকের সম্মুখে যখন ঐশী হাক্বিক্বাতের স্বরূপ উন্মোচন হয় তখন তার মধ্যে এক ধরনের পরমানন্দমূলক মগ্নতার উদ্ভব ঘটে। এটাই হলো ওয়াজ্দ। দেখুন, উজূদ।
الوحدة - **ওয়াহদাহ**: একত্ব / আল্লাহর একত্ব।
الولي - **ওয়ালী (বহুবচনে আউলিয়া)**: আল্লাহর বন্ধুজন; আল্লাহর একান্ত প্রিয় ব্যক্তি।

الواقع - **ওয়াক্বি’আ**: আধ্যাত্মিক ঘটনা / অবস্থা।

الوقت - **ওয়াক্ত**: সময়; আধ্যাত্মিক ‘ক্ষণ’; সুফিদের ভাষায় অনন্তকাল-স্থায়ী ‘এখানে-এবং-এখন”।

الورع - **ওয়ারা’**: শরীয়তে হালাল ও হারামের পার্থক্য নির্ণয়ের বিবেকদর্শিতা।

الوارد - **ওয়ারিদ**: ঘটনা; ঐশী আত্মপ্রকাশ।

الوصية للمريدين - **ওয়াসায়াতু লিলমুরীদীন (একবচনে ওয়াসিয়্যাত)**: মুরীদের প্রতি শায়খ কর্তৃক আধ্যাত্মিক পরামর্শ; মৃদু ইতিবাচক তিরস্কার।

الوسوسة - **ওয়াসওয়াসাহ (বহুবচনে ওয়াসাওয়িস)**: শয়তানের কুমন্ত্রণামূলক কানকথা; গোপন চিন্তা-ভাবনা যা সালিককে পথভ্রষ্ট করতে পারে; দেখুন, খাওয়াতির।

الوظيفه - **ওয়াযীফাহ:** [মুর্শিদ কর্তৃক নির্দেশিত] নিয়মিত দু’আ, দরূদ, ইস্তিগফার ও যিকিরের ছবক।

ক

القبض - **ক্বাব্দ্ব**: সংকোচন; মর্মপীড়া ও বেদনাতুর একটি অবস্থা যা সালিককে সময় সময় আক্রমণ করে থাকে; এর বিপরীত হলো বাস্ত। বাস্ত অর্থ স্ফীতি। এটা ইতিবাচক অবস্থা।

القضاء - **ক্বাদ্বা**: খোদায়ী হুকুম; নিয়তি।

القلب - **ক্বাল্ব**: শাব্দিক অর্থ ‘হৃদযন্ত্র’। তাসাওউফের পরিভাষায় একটি নির্দিষ্ট ‘পরিচিতির’ স্থান। এটাই সালিক ও প্রভুর মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম। নাফস-ক্বাল্ব-রূহ, এই তিনটি সূক্ষ্ম মানবিক লতীফার মধ্যে ক্বাল্ব মাধ্যমিক অবস্থানে আছে।

القناعة - **ক্বানা’আহ**: নিজের নিয়তি ও আল্লাহর যে কোন সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকা; অল্পেতুষ্টি।

القرب - **কুর্ব**: আল্লাহর নৈকট্য; এর বিপরীত হলো বু’দ- দূরত্ব।

القوم - **ক্বাওম**: শাব্দিক অর্থ ‘গোষ্ঠি’ বা ‘জাতি’। সুফিদের পরিভাষায় ‘সুফি-দরবেশের দল’।

الكبر - **কিবর / তাকাব্বুর**: গর্ব; দর্প; বড়াই, ঔদ্ধত্য; অহঙ্কার; অভিমান (খুশুও তাওয়াদ্বু এর বিপরীত)।

كرامات الأولياء - **কারামাতুল আউলিয়া**: ওলিদের কর্তৃক আল্লাহ-প্রদত্ত অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ। নবীদের কর্তৃক প্রকাশিত অতিস্বাভাবিক ঘটনাকে বলে **মু’জিযা**।

الكشف - **কাশ্ফ**: উন্মোচন; বাস্তবতা ও গোপন তথ্যাদি ওলির সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ হওয়া।

القرب - **ক্বারিব**: [প্রভুর] নিকটে; নৈকট্য। বা’ইদ বা দূরত্বের বিপরীতার্থে।

قلة طعام - **ক্বিল্লতে তা'আম:** অল্প আহার।
قلة كلام - **ক্বিল্লতে কালাম:** অল্প কথা।
قلة منعم - **ক্বিল্লতে মানআম:** অল্প নিদ্রা।
قلة إختلاطمع الأنام - **ক্বিল্লতে ইখতিলাত মা'আল আনাম:** মানুষেরসঙ্গেঅল্পমিলামিশা।
[এ চারটি বৈশিষ্ট্য হলো তরীকতপন্থীদের আদাব]

খ

الخادم - **খাদিম:** সুফি শায়খের মুরীদ; গোলাম।
الخانقاه - **খানক্বাহ:** সুফি-দরবেশদের আস্তানা; ইসলামী আধ্যাত্মিক চর্চার কেন্দ্র; দেখুন, পরিশিষ্ট ৩।
الخلوة - **খালওয়াহ:** নির্জনাশ্রয়; একাকীত্ব; সুফিদের একটি সচরাচর আমল।
الخواطر - **খাওয়াতির (একবচনে- খাতির):** গোপন ধারণাবাকল্পনা-অধিকাংশক্ষেত্রে নেতিবাচক ও ক্ষতিকর যা সুফিদের মনে আবির্ভূত হয় বা হানা দেয়; সাধারণত এরূপ কল্পনার উৎস হলো সালিকের নিজের নফসে আম্মারা যা শয়তানের বন্ধু।
الخوف - **খাওফ:** আল্লাহর গোস্বার উপর ভয়। বিপরীত শব্দ হলো রাজা'- যার অর্থ আল্লাহর রহমতের আশা।
الجضلان - **খিদ্বলান:** বান্দার ভুল-ত্রুটির জন্য শাস্তি হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে পরিত্যাগ করা।
الخرقه - **খিরক্বাহ:** সুফিদের লেবাস বা জামা; মোটা সুতার জামা যা সুফিরা পরিধানকরে থাকেন। দুনিয়া-বিমুখতার বাহ্যিক প্রতীক হিসাবে আগের যুগের সুফিরা খিরক্বা ব্যবহার করতেন। এটা ইসলামে তাসাওউফের গুরুত্ব বুঝাতেও ব্যবহৃত হতো।
الخلافات - **খিলাফত:** মুর্শিদ কর্তৃক মুরীদকে অনুমতি প্রদান; প্রতিনিধিত্ব।
خلافات إيصالت - **খিলাফতে ইসালতী:** পৌঁছানো।
البيعة - خلافات إجاجت - **খিলাফতে ইযাজতী / বাইআহ:** অনুমতি; অন্যকে বাইআত করানোর অনুমতি সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ খিলাফত প্রদান।
خلافات إجماع - **খিলাফতে ইজমায়ী:** মতৈক্য।
خلافات وارث - **খিলাফতে ওয়ারিসী:** উত্তরাধিকারী।
خلافات حكم - **খিলাফতে হুকমী:** নির্দেশমূলক।
خلافات تكلف - **খিলাফতে তাকাল্লুফী:** বাহ্যিক।

خلافات وائث - **খিলাফতে ওয়াইসী:** গায়েবী - হযরত ওয়েস করণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেভাবে খিলাফত পেয়েছিলেন।

خلافات إصلاح - **খিলাফতে ইসলাহী:** সংশোধনমূলক অনুমতি।

الخلق - **খুলুক্ব:** ভালো নৈতিক গুণাবলী, সচ্চরিত্র।

الخمول - **খুমূল:** অলসতা; দুর্বলতা; অবসন্নতা; অবসাদ।

الخروج من الدنيا - **খুরূজ মিন্‌আদ্দুনইয়া:** দুনিয়া থেকে বিদায়গ্রহণ বা বের হওয়া; সুফিদের আধ্যাত্মিক ভ্রমণের অংশ হিসাবে দুনিয়ায় জীবিত থাকতেই দুনিয়া থেকে আখিরাতের জীবনে পরিভ্রমণ; রূহানী উপায়ে বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি দর্শন; মৃত্যু।

الخشوع - **খুশু':** প্রভুর সম্মুখে বিনয়ভাব।

গ

الغفل - **গ্বাফালা:** আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশসমূহ সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া।

الغفر - **গ্বাফর:** পর্দা, আবৃতকরণ; আল্লাহ থেকে বঞ্চিত থাকার অবস্থা।

الغائب - **গ্বায়িব:** অদেখা, অদৃশ্য বিষয়; ঐশী রহস্যজগৎ যা সকলের নাগালের বাইরে। একমাত্র সত্যিকার উচ্চ পর্যায়ের সুফিরা 'এ ব্যাপারে আল্লাহ যেটুকু ইচ্ছা করেন' সেটুকু অবগত।

الغيبة - **গ্বাইবাহ:** মানসিক ও অনুরক্ত অবস্থায় "আল্লাহ থেকে অনুপস্থিত"; এর বিপরীত হলো 'হুদুর'।

الغيرة - **গ্বাইরাহ:** নিজের বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে 'অভিমান', অর্থাৎ একমাত্র তাঁর দিকে ফিরা ও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভুর পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ি বা নির্বন্ধ।

الغيبة - **গ্বিবাহ:** গীবত; অপরের দোষত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে কারো নিকট প্রকাশ করা; এই পাপ থেকে বিরত থাকা সুফিদের রাস্তায় চলার একটি পূর্বশর্ত।

الغضب - **গ্বাদ্বাব:** রাগ; গোস্বা।

الغرور - **গুরূর:** ধোঁকা, প্রতারণা, অহঙ্কার, বড়াই।

জ

الذرق - **জাওক্ব:** ইহলোকের দৃশ্যত অভ্যন্তরস্থ অবস্থার সত্যিকার 'সরাসরি স্বাদগ্রহণ'।

الذكر - **জিক্র:** আল্লাহ ও তাঁর নামসমূহের স্মরণ / স্মৃতি।

الجمع - **জামা':** একত্রীকরণ; আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতির অবস্থা।

الجمال - **জামাল**: প্রভু-সৌন্দর্য; আল্লাহ্‌র সদয় স্বরূপ; বিপরীত শব্দ হলো 'জালাল' যার অর্থ ঐশী রাজকীয় পরাক্রমশীলতা। দেখুন, জালাল।

الجهاد - **জিহাদ**: নফসে আম্মারা বা খারাপ স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (এর অপর নাম জিহাদে আকবর- বড়ো যুদ্ধ); ধর্মযুদ্ধ (এর অপর নাম জিহাদে আসগর- ছোট যুদ্ধ)।

الجلال - **জালাল**: ঐশী রাজকীয় পরাক্রমশীলতা; মাহাত্ম্য; মর্যাদা; কর্তৃত্ব; শান-শাওকত।

الجسمانى - **জিসমানী**: শারীরিক।

الجاهد - **জাহিদ (বহুবচনে জুহহাদ)**: দুনিয়া বিসর্জনকারী; কৃচ্ছ্রকৃচ্ছ্রতাব্রতী; আত্মনিরোধ; তাপস।

الظاهر - **জাহির**: বস্তু বা বিষয়ের বাইরের, উন্মুক্ত, দৃশ্যত স্বরূপ, অর্থ ও গুণাবলী। বিপরীত শব্দ হলো বাতিন।

الزهد - **জুহদ**: দুনিয়াবিমুখতা; জাগতিক মোহগ্রস্ততা ও আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকা; কৃচ্ছ্রতা।

الذوق - **জুক্ব**: স্বাদ গ্রহণ, স্বাদ নেওয়া।

الجود - **জূদ**: দানশীলতা।

ত

الفكرة : الفكر : التفكير - **তাফকির / ফিক্র / ফিকরাহ**: সাধুতা সম্বলিত ধ্যান-চিন্তা-গবেষণা; সুফি-দরবেশদের একটি সচরাচর আমল।

التحير - **তাহাইউর**: হতভম্বতা ও বুদ্ধিহীনতার স্তর।

التجلي - **তাজাল্লি**: প্রভুর আত্ম-উন্মোচন / আত্ম-প্রকাশ; দেখুন, বিপরীত শব্দ সাত্র।

التلوين - **তালউইন**: আধ্যাত্মিক অস্থিতিশীলতা। সালিকের স্তরের দ্রুত পরিবর্তন। বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'তামকিন' যার অর্থ স্থিতিশীল অবস্থা। দেখুন, পরবর্তী শব্দ।

التمكين - **তামকিন**: স্থিতিশীল আধ্যাত্মিক অবস্থা। যে কোনো 'হাল' (আধ্যাত্মিক অবস্থা) যখন স্থায়ী হয়ে যায় তখন এটাকে তামকিন বলে। দেখুন, (উপরের) তালউইন শব্দটি।

التقوىতাক্বওয়া: আল্লাহভীতি ও এ থেকে সৃষ্ট পরহেজগারী; সাধুতা; ন্যায়নিষ্ঠতা।

التفريف : التصرف - **তার্সারুফ (তাসরিফ)**: স্বাধীনভাবে নির্বাচন ও বিশেষ কোনো কাজ করার ক্ষমতা।

التصديق - **তাসদিক্ব**: নিশ্চিতকরণ।

التسليم - **তাসলীম**: আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ।

التصرف - **তাসরিফ**: দেখুন, তার্সারুফ।

التواضع - **তাওয়াদু’**: আল্লাহর সম্মুখে বিনয় ও নম্রতার ভাব; মিতাচার, সংযম, নিরহঙ্কারিতা।

الوتوجه : التوجه - **তাওয়াজ্জুহ : মুতাওয়াজ্জুহ**: মনোযোগ / মনোযোগী; ফিরেতাকানো।

التواجد - **তাওয়াজ্জুদ**: সামা’ শ্রবণের সময় সুফিদের মধ্যে যে পরমান্দদায়ক অভিজ্ঞতা অনুভূত হয়; দেখুন, ওয়াজ্দ ও উজূদ।

التوكل - **তাওয়াক্কুল**: আল্লাহর উপর ভরসা; সুফিরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করেন।

التوالى - **তাওয়ালি’**: শাব্দিক অর্থ একের পর এক সংঘটিত হওয়া; প্রভুর উপস্থিতির ‘উদয়’ সালিকের হৃদয়ে অনুভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা; দেখুন, লাওয়া’ইহ ও লাওয়ামি।

التوبة - **তাওবাহ / আওবা**: শাব্দিক অর্থ, ‘আল্লাহর দিকে ফিরা’; অনুশোচনা; দেখুন, ইনাবা ও আওবা।

التوفيق - **তাওফিক্ব**: আল্লাহ তা’আলার সাহায্য-সহযোগিতা।

التوحيد - **তাওহীদ**: আল্লাহর একত্ব। তাওহীদের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমেই আল্লাহর সঠিক মা’রিফাত বা পরিচিতি লাভ হয়। একমাত্র সুফি তরীকাপন্থী হয়েই এ স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব।

التصوف - **তাসাওউফ**: সুফিতত্ত্ব, আত্মশুদ্ধির রাস্তা, পীর-মুরীদী।

الطريقة - **তারীক্বাহ:** নিয়ম, নীতি, আচরণ; তাসাওউফের রাস্তা। পীর-মুরীদীর বিভিন্ন রাস্তা, যেমন: চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, কাদিরিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া ইত্যাদি।

التفويز و التسليم - **তাফবীয ও তাসলীম**: নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা।

التبتل- **তাবাত্তুল**: কর্তিত হওয়া; গ্বাইরুল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া।

تذكيا نفس - **তাযকিয়ায়ে নফস**: আত্মশুদ্ধি। তরীকাতের উদ্দেশ্যই এটা।

تبي محبت - **তাবায়ী মুহাব্বত**: প্রাকৃতিক মুহাব্বত।

الطمعا - **তামা’আ:** লালসা; অতিলোভ; বেশী খাওয়ার ইচ্ছা।

تسبيح فاتمة - **তাসবীহ্ ফাতিমী**: সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার), আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার), আল্লাহু আকবার (৩৪ বার) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পাঠ করা।

ছয় / তিন তাসবীহ্: সুবহানাল্লাহ (১০০ বার), আলহামদুলিল্লাহ (১০০ বার), লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১০০ বার) আল্লাহু আকবার (১০০ বার), আসতাগ¦ফিরুল্লাহ (১০০ বার)

ও দরূদ শরীফ (১০০ বার) ফজর ও মাগ¦রিবের নামাযের পর প্রত্যহ পাঠ করা। নির্দিষ্ট সময়ে না পারলে অন্য সময় দৈনিক দু'বার এই তাসবীহ অবশ্যই পাঠ করা উচিৎ।

তেরো / বারো তাসবীহ্: প্রথমে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (২০০বার), এরপর 'ইল্লাল্লাহ' (৪০০ বার), তারপর 'আল্লাহু আল্লাহ্' (৬০০ বার) এবং সবশেষে 'আল্লাহ্' (১০০ বার) জিকির করা। এর বিশেষ নিয়ম আছে। নিজের শায়খ এই জিকিরের তা'লিম দিয়ে থাকেন।

পাস আনফাস জিকির: শ্বাস-প্রশ্বাস বা দমের জিকির। প্রত্যেক শ্বাস ভেতরে নেওয়ার সময় মনে মনে খিয়াল রাখা, 'আল্লাহ্' শব্দটি। আর শ্বাস ছাড়ার সময় মনে মনে খিয়াল রাখা 'হু' অক্ষরটি। পাস আনফাসের জিকির সর্বদা জারী রাখার চেষ্টা চলাতে হবে। শুধু খিয়ালের মাধ্যমে এই জিকির পড়া হয়- মুখে কিছু উচ্চারিত হয় না।

দ

الدنيا - **দুনইয়া:** ইহলোক; বাহ্যিক মহাবিশ্ব; এই পৃথিবী; পৃথিবীর প্রতারণামূলক চাকচিক্য।

الدعاء - **দু'আ:** সনির্বন্ধ প্রার্থনা / উপাসনা (তবে কানুনী বা অবশ্যকরণীয় প্রার্থনা নয়- যেমন ফরয নামায)।

ন

الندامة - **নাদামাহ:** গভীর অনুশোচনা। এটা সুফি-দরবেশদের একটি গুণ।

النفس - **নাফাস:** শাব্দিক অর্থ 'শ্বাস'। এই শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সুফি তরীকাতের একটি শর্ত। প্রত্যেক শ্বাস নিতে ও ছাড়তে আল্লাহর স্মরণকে ধ্যানের মধ্যে রাখতে হয়। সারা জীবনের চেষ্টা-সাধনার ফলে এরূপ উচ্চ পর্যায়ের 'দমের জিকির' সম্ভব। দেখুন, পাস-আনফাস।

النفس - **নাফস:** [দুনিয়াকাঙ্ক্ষী] নিজ বা আত্মা।

امّارة نفس - **নাফসে আম্মারাহ:** খারাপ বাসনামূলক নিজ বা আত্মা।

لوّامة نفس - **নাফসে লাওয়ামাহ:** মন্দ বাসনামূলক কিন্তু লজ্জা ও অনুশোচনাশীল নিজ বা আত্মা।

مطمئنّة نفس - **নাফসে মুতমাইন্নাহ:** ভালো ও নেক বাসনামূলক নিজ বা আত্মা।

النصيحة - **নাসীহাহ:** [মুর্শিদ কর্তৃক মুরীদের প্রতি] উপদেশ (নসিহত) প্রদান।

النعامت - **নিয়ামত:** আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অনুগ্রহসূচক দান ও যাবতীয় উপকারসমূহ।

نفي و إثبات-**নফী ইসবাত:** 'লা-ইলাহা-' নফী- বিলুপ্ত, 'ইল্লাল্লাহ' -ইসবাত-স্থিত, এরূপ ভাবনা নিয়ে জিকির।

النسبت - **নিসবত:** সম্পর্ক। মুর্শিদ ও মুরীদের মধ্যে ভালো 'নিসবত' থাকা পীর-মুরীদীর পূর্বশর্ত।

ফ

الفناء - **ফানা:** আল্লাহর মধ্যে মা'রিফাতপন্থীর আত্মবিলুপ্তি। আল্লাহর মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করা। নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লোপ পাওয়া।

فناء الفناء- **ফানাউল ফানা:** বিলীনের মধ্যে বিলীন; সুফী রাস্তার উচ্চ পর্যায়ের একটি স্তর; নিজকে [আল্লাহর মধ্যে] বিলীন হওয়া সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অচেতনতা।

الفقر - **ফাক্বর:** নিঃস্বতা; মা'রিফাতের একটি স্টেশন বা স্তর।

الفرق - **ফারক:** বিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্নতা, দূরত্ব; আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্নতার স্তর।

الفكر - **ফিকর, ফিকরা:** গভীর চিন্তা; ধ্যান; আত্ম-সমালোচনা।

الفراسة - **ফিরাসাহ:** অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি; আলোকদৃষ্টি; অতিস্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্নতা।

الفقه - **ফিক্বহ:** যাহিরী আমলের উপর শীরয়তের জ্ঞান, ফিক্বহ শাস্ত্র, জ্ঞান, বোধ।

الفتوة - **ফুতুওয়াহ:** সৌজন্য ও শালীনতা, দ্বীনের ক্ষেত্রে বীরত্ব।

الفضل - **ফাদ্বল:** [আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি] অনুগ্রহ, দয়া, মেহেরবানি (ফযল)।

فائض باطن - **ফায়িজে বাতিন:** গুপ্ত বিষয়ে উপকার।

ব

البلاء - **বালা':** আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর পরীক্ষাস্বরূপ ক্লেশ-কষ্ট প্রদান; মুসিবত।

البقاء - **বাক্বা:** ফানা'র স্তরে উপনীত হওয়ার পর আল্লাহর মধ্যে অস্তিত্ব / বিদ্যমান থাকা; মাজযূব অবস্থা, আল্লাহতে বিলীন অবস্থা।

البصير - **বাসিরা:** অভ্যন্তর দিকের দৃশ্য; অন্তর্দর্শন।

البسط - **বাস্ত: স্ফীতি;** সালিকের আরাম, আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের একটি স্তর।

الباطن - **বাতিন:** গুপ্ত, অদৃশ্য বিষয়।

(البواده) (الهجوم - **বাওয়াদিহ / হুজুম:** মা'রিফাতপন্থীর উপর 'হামলা' বা 'আক্রমণ'এর স্তর।

البعد - **বা'ইদ:** 'ক্বারিব' (নৈকট্য) এর বিপরীত- অর্থাৎ আল্লাহ থেকে দূরে।

البخب - **বুখল:** কৃপণতা।

بيعات طريقة - **বাই'আতে তারীক্বাহ:** যাহিরী ও বাতিনী আমলের উপর গুরুত্বপ্রদানএবং শরীআতের বিধি-বিধান পালনে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া; মুরীদ হিসাবে মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ। তাসাওউফের রাস্তায় পাড়ি জমানোর প্রথম পদক্ষেপ হলো মুরীদ হওয়া।

ম

الحبيب : المحب - **মুহিব্ব / হাবীব:** প্রেমিক / প্রেমাস্পদ; সাধারণত সুফি শায়খ ও তাঁর প্রেমাস্পদ (প্রভু) বুঝায়।

محبت عقل - **মুহাব্বতে আক্বলী:** যৌক্তিক মুহাব্বত।

الحب : المحبة - **মুহাব্বাহ / হুব্ব:** শাব্দিক অর্থ প্রেম, প্রণয়, ভালোবাসা, প্রীতি, হৃদ্যতা, সম্প্রীতি। সুফি পরিভাষায় মরমী আল্লাহপ্রেম; আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক। দেখুন, ইশক ও শাওক্ব।

المحو - **মাহু:** নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করা; নিজেকে মেটানো। এই অবস্থার অপর শব্দ হলো 'নফি'। দেখুন, ইসবাত।

المكاسب - **মাকাসিব:** প্রাপ্তি, লাভ, উপকারিতা, সফলতা; একনিষ্ঠ ইবাদতের মাধ্যমেযা অর্জিত হয়। দেখুন, মাওয়াহিব।

المكر - **মাকর:** শাব্দিক অর্থ প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নৈপুণ্য। তাসাওউফের পরিভাষায় প্রভুর পক্ষ থেকে কূটচাল- সালিকের উপর আল্লাহ প্রদত্ত এক ধরনের পরীক্ষা।

الملكوت - **মালাকুত:** প্রভুর রাজ্য / প্রভুর রাজকীয় জগৎ।

المقام - **মাক্বাম (বহুবচনে মাক্বামাত):** তাসাওউফের রাস্তায় আধ্যাত্মিকস্টেশন, অবস্থান বা স্তর।

المعرفة بالله - **মা'রিফাহ বিল্লাহ:** আল্লাহ-পরিচিতি; তরীকতের শায়খ কর্তৃক অতীন্দ্রিয়, উন্মোচনযোগ্য আল্লাহ ও জগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন। আরো দেখুন, 'আরিফ।

المواهب - **মাওয়াহিব:** যোগ্যতা, উৎকর্ষতা, পারাকাষ্ঠা, নৈপুণ্য, কর্মদক্ষতা, সঠিক আমলের যোগ্যতা; ঐশী তুহফা ও অনুগ্রহ যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অবতরণ করেন শুধুমাত্র দয়ার বদৌলতে।

المحقق - **মুহাক্কিক্ব:** যে ব্যক্তি সত্যকে আবিষ্কার করেছেন; সত্যানুসন্ধানী; সত্যায়নকর্তা; একজন দক্ষ সুফি-দরবেশ।

المحاسبة - **মুহাসাবাহ:** নিজের আমল সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ; আত্ম-সমালোচনা।

المجاهدة - **মুজাহাদাহ:** আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ; সুফিরা নিজের নফসে আম্মারার জাগতিক আকাঙ্ক্ষা ও গাইরুল্লাহর প্রতি আকর্ষণের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা-সাধনা করেন তা-ই মুজাহাদাহ।

এটা হলো শরীয়তের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ-প্রাপ্তির সাধনা। তরীকতের রাস্তায় চলার একটি অবশ্যকর্তব্য শর্ত হলো মুজাহাদাহ।

مجاهدة الحقيقي - **মুজাহাদাহ হাক্বিক্বী**: মৌলিক মুজাহাদা; সঠিক রাস্তায় অটল থাকা; সঠিক সাধনা।

مجاهدة الأجمالي - **মুজাহাদাহ ইজমালী**: শারীরিক সাধনা; দৈহিক ইবাদতে অটলথাকা; সমষ্টিগত সাধনা।

مجاهدة التفصيلي - **মুজাহাদাহ তাফসীলি**: রূহানী সাধনা।

المعْجِزَة - **মু'জিযা**: নবী-রাসূলদের কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনা। ওলিদের কর্তৃক প্রদর্শিত অনুরূপ ঘটনাকে বলে কারামাত। উভয়টিই একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়- নবী ও ওলিআল্লাহরা মাধ্যম মাত্র।

المكابد - **মুকাবিদ**: [আল্লাহর রাস্তায়] আত্মবিসর্জনকারী, কষ্ট-দুঃখ সহ্যকারী, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি; দেখুন, মুজাহাদাহ।

المحاضرة - **মুহাদ্বারাহ**: [আল্লাহর বা তাঁর সম্মুখে] উপস্থিতি; দেখুন, হুদুর।

المكاشفة - **মুকাশাফাহ**: উন্মুক্তকরণ; দেখুন, কাশ্ফ।

مخالفة النفس - **মুখাল্লাফাতুন-নাফস**: নিজের নফসের বিরোধিতা; নফসের আত্মকেন্দ্রিক তীব্র দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল (অন্যায়- আল্লাহ অপছন্দনীয়) অনুরাগের বিরোধিতা; দেখুন, নাফস।

المنازل - **মানাযিল (একবচনে মানযিল)**: শাব্দিক অর্থ, ঘর, বাড়ি, বাসস্থান; আধ্যাত্মিক অবস্থান বা স্টেশনসমূহ; দেখুন, মাক্বাম।

المراقبة - **মুরাক্বাবাহ**: ধ্যান; আল্লাহর উপস্থিতির ধ্যান। যে কোনো বিষয়ের হাক্বিক্বাত (সত্য) উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে গভীর ধ্যান- যেমন কুরআন শরীফের আয়াত।

المريد - **মুরীদ**: শাব্দিক অর্থ, "আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি"। তাসাওউফের পরিভাষায় মুরীদ ঐ ব্যক্তি যিনি খোদাপ্রাপ্তির ওয়াসিলা হিসাবে কোনো শায়খের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ শায়খের হাতে বাইআত হয়েছেন। সুতরাং মা'রিফাত অর্জনের 'আকাঙ্ক্ষী' হচ্ছেন মুরীদ বা শিষ্য। দেখুন, মুর্শিদ।

مرعى - **মুরু'আ**: শাব্দিক অর্থ চারণভূমি; সুফি পরিভাষায় পুরুষত্ব; সুফিদের বীরত্বের একটি রীতিনীতি।

المشاهدة - **মুশাহাদাহ**: আল্লাহকে সরাসরি দর্শন কিংবা আসল বাস্তবতার প্রত্যক্ষদর্শন, [নিজেকে] প্রদর্শন। দেখুন, মু'আইয়ানাহ।

المرشد - **মুর্শিদ**: শাব্দিক অর্থ পথপ্রদর্শক। তাসাওউফের পরিভাষায় মুর্শিদ ঐ ব্যক্তি যিনি তরীকতের রাস্তা পাড়ি দিয়ে কামালিয়াত (পূর্ণতা) হাসিল করেছেন। নিজের শায়খ থেকে

খিলাফত বা (বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক) প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। অপরকে এই রাস্তা প্রদর্শনের যোগ্যতা রাখেন। এককথায়, যিনি নিজে কামিল ও অপরকে পথপ্রদর্শনের যোগ্যতা রাখেন তিনিই মুর্শিদ বা গুরু হতে পারেন। যাকে তিনি পথপ্রদর্শন করবেন তিনি হলেন মুরীদ।

المتصوف - **মুতাসাওয়িফ (বহুবচনে মুতাসাওয়িফা)**: তাসাওউফপন্থী (পীর-মশাইখ) ও যারা তাঁদের অনুসরণ করেন।

المعاينة- **মু'আইয়ানাহ**: [আল্লাহকে] দেখা; পরীক্ষা; পর্যবেক্ষণ; সার্ভে।

المحمود - **মাহমূদ**: প্রশংসনীয়।

المذموم - **মাযমূম**: দোষণীয়।

المزاج - **মুযাজ**: পীরের খলিফা।

المجذوب - **মাজযূব**: [আল্লাহর প্রতি] ভীষণ আকর্ষিত; আল্লাহর পাগল; তরীকতের উচ্চ পর্যায়ের শায়খ; আল্লাহর ধ্যানে সদা-নিমগ্ন ব্যক্তি।

المبتدئ - **মুবতাদী**: [তরীকতের পথে] নবিস, প্রাথমিক স্তরের মুরীদ; প্রথম পদক্ষেপকারী।

المنتهى - **মুনতাহী**: [তরীকতের পথে] আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছেন এমন কামিল ব্যক্তি।

المكلف - **মুকাল্লাফ**: আদিষ্ট।

المتلعا - **মুতালাআ'**: অধ্যয়ন।

المصييت - **মুসীবত**: দুঃখ-বিপদ।

الملهم - **মুলহিম**: ইলহাম বা কল্পনার দাতা; ইলহামের মাধ্যমে ওলিদেরকে বিশেষ জ্ঞানদান করা হয় প্রভুর পক্ষ থেকে। কাশফ, কারামত ও ইলহাম সত্য বলে বিশ্বাস রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাভূক্ত বিষয়।

র

الرغبة - **রাগ্বাহ**: ইচ্ছা; আকাঙ্ক্ষা; কামনা; অভিলাষ।

الرهبة - **রাহ্বাহ**: [আল্লাহর সম্মুখে] আতঙ্কবোধ; ভয়; ভীতি।

الرجاء - **রাযা'**: আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর আশা পোষণ। এর বিপরীতার্থে ব্যবহৃত শব্দ হলো 'খাওফ' বা আল্লাহভীতি।

الرضا - **রিদ্বা**: সন্তুষ্টি; প্রভু-প্রদত্ত যে কোনো সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

الرياضت - **রিয়াদ্বাত**: তপশ্চর্যাপূর্ণ আধ্যাত্মিক কঠোর অনুশীলন; আত্ম-প্রয়াস।

الربوبية - **রুবুবিয়্যাহ**: আল্লাহর পালনকারিতা।

الروح - **রূহ:** আত্মা; মানবদেহে পতিত ‘খোদায়ী স্ফুলিঙ্গ’।

الروحانى - **রূহানী:** মানসিক; আত্মিক।

رضا بلكذا - **রিদ্বা বিল কাযা:** তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رضاء تبائ - **রিদ্বায়ে তাবায়ী:** স্বাভাবিক সন্তুষ্টি।

رضاء أقلي - **রিদ্বায়ে আক্বলী:** বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তুষ্টি।

الرؤية - **রু’ইয়া:** [সজাগ বা নিদ্রাবস্থায়] স্বাপ্নিক অভিজ্ঞতা; [অপরজগতে দৃশ্যমান] আল্লাহ্‌র [যাত ও সিফাতের] দৃশ্যবলী।

الرياء - **রিয়া’:** লোক দেখানো আমল বা কর্ম; দর্শনেচ্ছু; এটা একটি কঠিন আত্মিক রোগ। তরীকতের রাস্তায় এটা বড় বাঁধা। যে কোনো মূল্যে এ থেকে মুক্ত হতে হবে। সকল কর্ম ও আমল হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায়।

ল

اللذة - **লায্যা:** [আল্লাহ্‌র সম্মুখে] আনন্দবোধ; [ইবাদতে] স্বাদ; মজা; তৃপ্তি।

اللوعة - লাওয়া’হ: শাব্দিক অর্থ জ্বলন, জ্বালা, দাহ, আসক্তি, যন্ত্রণা। সুফি পরিভাষায় এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র হুদ্বুর বা উপস্থিতি হেতু সালিকের অন্তঃপুরে ‘ক্ষণিক আলোক’ উদ্ভাসিত হওয়ার অভিজ্ঞতা। দেখুন, তাওয়ালি।

لطائف ستّة - **লাতাইফে সিত্তা:** দেহের ছয়টি সূক্ষ্ম স্থান; - নাফস: নিজ/আত্মা; - ক্বালব: হৃদয়; - রূহ: আত্মা; - সির: সূক্ষ্ম জিনিস; - খাফী: গোপন সূক্ষ্ম জিনিস; - আখফা: সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম গোপন জিনিস। আরো চারটে লতীফা আছে। দেহের মধ্যে এদের নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। এগুলো সর্বত্র বিরাজমান। এসব লতীফার নাম হলো: আব: পানি; আতশ: আগুন; খাক: মাটি ও বাদ: বাতাস।

শ

الشهادة - **শাহাদাহ:** সালিক কর্তৃক সরাসরি প্রভুদর্শনের অভিজ্ঞতা; দেখুন, মুশাহাদাহ।

الشاهد - **শাহীদ:** শাব্দিক অর্থ, ‘সাক্ষ্য’; তাসাওউফের পরিভাষায় খোদায়ী দৃষ্টি বা উপস্থিতির নিদর্শন যা সালিকের নিকট পরিদৃষ্ট হয়। সুফিদের ভাষায় শব্দটির আরেক অর্থ ‘সুদর্শন যুবক’।

الشهوة - **শাহওয়াহ:** আকাঙ্ক্ষা; প্রেমাকাঙ্ক্ষা, কাম রিপু।

الشكور - **শাকুর:** কৃতজ্ঞ ব্যক্তি।

الشوق - **শাওক্ব:** প্রেমময় আবেগ; বিরহ।

الشيخ - **শায়খ:** শাব্দিক অর্থ, ‘মুরুব্বি’। তরীকতের কামিল ওলি বা পীর।

الشكر - **শুকর**: কৃতজ্ঞতা- বিশেষ করে আল্লাহ্‌র প্রতি।
الشرب - **শুরব**: [ইশকে ইলাহীর সূরা] পান করা।
الشغل - **শুগুল**: নিমগ্নতা; ধ্যানের মাধ্যমে জিকির করা।

স

الصبر - **সাবর**: বিপদে ধৈর্যধারণ; এটা সুফিদের একটি বড় গুণ।
الصادق - **সাদিক্ব**: বিশ্বস্ত ব্যক্তি; বন্ধুজন।
الصفوى - **সাফা'**: বিশুদ্ধতা; পবিত্রতা।
السفر - **সাফার**: ভ্রমণ; সুফি পরিভাষায় মুর্শিদের সুহবতের উদ্দেশ্যে সালিকের যাওয়া-আসা; দ্বীনি দাওয়াতী সফর এবং হজ্জের ভ্রমণ।
الصحو - **সাহ্‌উ**: আত্ম-সচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ; বিপরীত শব্দটি হলো 'সুক্র' যার অর্থ আধ্যাত্মিকভাবে মাতাল বা আত্মহারা। সুক্র অত্যধিক প্রেমাসক্তির চরম অবস্থা।
السخاء - **সাখা**: মানবিক উদারতা; দেখুন, জুদ।
السكينة - **সাকীনাহ**: ঐশী উপস্থিতি; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ শান্তি অবতীর্ণ যা থেকে সালিকরা পরমানন্দ অনুভব করেন।
السماع - **সামা'**: সুফি কবিতা শ্রবণ করা; আধ্যাত্মিক গজল।
الصمت - **সামত**: নীরবতা; সুফি-দরবেশদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।
الستر - **সাতর**: প্রভু থেকে পর্দাবৃত অবস্থা, আবৃতকরণ; অপরদিকে তাঁরআত্ম-উন্মোচনকে বলে 'তাজাল্লি'।
الصديق - **সিদ্দীক্ব**: যিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত; উচ্চপর্যায়ের সুফি শায়খ; হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উপাধি।
الصدق - **সিদ্‌ক্ব**: [প্রভুর সম্মুখে] সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা; লক্ষ্যবস্তুর উপর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা অর্জন। দেখুন, ইখলাস।
السرّ - **সির**: সুফি-দরবেশদের 'হৃদয়ের হৃদয়'; প্রভুর সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্কের ক্ষেত্র। দেখুন, নাফস ও রূহ।
الصحبة - **সুহবাহ (সুহবত)**: শায়খদের মধ্যস্থ সঙ্গতা; প্রশিক্ষণ হেতু মুর্শিদের দরবারে মুরীদের অবস্থান; সুহবাত তরীকতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উসুল (নীতি)।
السكر - **সুকর**: মরমী উন্নত স্তরে অত্যধিক প্রেমাসক্তিতে 'মাতাল' বা সম্পূর্ণ 'আত্মহারা' অবস্থা, আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতা। দেখুন, শাওক্ব।
السلوك - **সুলূক**: তাছাওউফের রাস্তা; যে এ রাস্তায় পাড়ি জমায় তাকে বলে 'সালিক'।

السنة - **সুন্নাহ:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, আমল ও আমলের সমর্থন। তরীকতপন্থীর জন্য সুন্নাতের অনুসরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

السالك - **সালিক:** তাসাওউফের রাস্তায় ভ্রমণকারী; মুরীদ; আল্লাহ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী।

صلوة تت - **সালাতে তন:** দৈহিক নামায। সাধারণ মুসল্লিদের নামায।

صلوة نفس - **সালাতে নফস:** আত্মিক নামায। পূর্ণ মনোযাগী ব্যক্তির সালাত। এ নামায দৈহিক থেকে উত্তম।

صلوة قلب - **সালাতে ক্বলব:** অন্তরের নামায। একান্ত আনুগত্যশীল ব্যক্তির নামায। এ নামায আত্মিক থেকেও উন্নত।

صلوة روح - **সালাতে রূহ:** প্রাণের নামায। এ নামায আন্তরিত নামায থেকেও উচ্চ পর্যায়ের। আল্লাহর নৈকট্যের স্তরে উপনীত মু'মিনের নামায।

صلوة سرّ - **সালাতে সির:** বাহ্যিকতার ঊর্ধ্বে নামাযের প্রকৃত ও ভেতরের অবস্থা। এ নামায প্রাণের নামায থেকে উন্নত। এটা আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের নামায।

صلوة خفي - **সালাতে খফী:** গোপনীয় নামায। এ নামায ওলিআল্লাহদের জন্য খাস।

صلوة اخفى - **সালাতে আখফা:** নামাযে পরোক্ষ ও সূক্ষ্মতার সাথে যা অনুভব হয়। এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কামিল ওলিআল্লাহর নামায।

سير إلا الله - **সাইর ইলাল্লাহ:** আল্লাহর দিকে ভ্রমণ। অর্থাৎ তরীকতের সালিক। আল্লাহকে একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে মেনে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া।

سير فالله - **সাইর ফিল্লাহ:** আল্লাহর মধ্যে ভ্রমণ। অর্থাৎ আল্লাহর যাত ও সিফাতের মধ্যে ডুবন্তাবস্থা।

الصورت و السيرت - **সূরত ও সীরাত:** বাহ্যিক আকৃতি ও আত্মিক প্রকৃতি।

صورت مصيبت - সূরতে মুসীবত: বিপদের বাহ্যিক রূপ।

হ

الحال - **হাল:** আল্লাহর রাস্তায় চলন্ত সালিকের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অবস্থা বা ক্ষণস্থায়ী স্তর।

الحقيقة - **হাক্বীক্বাহ:** সত্যিকার বাস্তবতা; পরম সত্য, প্রকৃত অবস্থা।

حقيقت مصيبت - **হাকীকাতে মুসীবত:** বিপদের অভ্যন্তরীণ স্বরূপ।

الحلم - **হিলম:** সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্যতা।

هاجس - **হাজিস:** স্বল্পস্থায়ী কল্পনা।

حديث نفس - **হাদীসে নফস:** কল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতা।

هَمّ - **হাম্ম:** কল্পনা মুতাবিক আমলের উপর প্রাধান্য- কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমল করার উপর দৃঢ়তা না আসা।

الحق - **হাক্ব:** আসল; আসল বাস্তবতা; সত্য; (আল-হাক্ব) আল্লাহ্‌র নাম।

حق اليقين - **হাক্কুল ইয়াক্বীন:** বাস্তবতার সত্যতা; মা'রিফাতপন্থীর নিশ্চয়তার একটি অবস্থা। দেখুন, 'ইলমুল ইয়াক্বীন ও 'আইনুল ইয়াক্বীন।

الحسد - **হাসাদ:** ঈর্ষা; বিশেষ করে অপরের আধ্যাত্মিক উচ্চতর স্তরের প্রতি হিংসা পোষণ; এই পাপের কাজ থেকে দূরে থাকা তরীকতের সালিকের জন্য একটি পূর্বশর্ত।

الهاتف - **হাতিফ:** অদৃশ্য কথা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

الهواء - **হাওয়া (বহুবচনে আহওয়া):** নফসে আম্মারা বা মন্দ স্বভাবের ইচ্ছা ও কার্যাদি।

الحياء - **হায়া:** [আল্লাহ্‌র সম্মুখে] লজ্জা, শরম।

الهيبة - **হাইবাহ:** আল্লাহ্‌র সম্মুখে আতঙ্ক ও উত্তেজনার ভাব।

التحيرا : الحير - **হাইয়্যার; তাহইয়্যারা:** সদাপরিবর্তনশীল ঐশী-আত্মপ্রকাশ দর্শনে মা'রিফাতের সালিকের মধ্যে প্রকাশিত হতবুদ্ধিতা ও হতভম্বতার ভাব।

الحرية - **হুরিয়্যাহ:** [কর্মের] স্বাধীনতা।

الحضور - **হুদুর:** তনু-মন-প্রাণসহ সম্পূর্ণরূপে 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে উপস্থিত (হাজির) থাকা'। এ অবস্থার বিপরীত হলো 'গ্বাইবাহ'।

الحلم - **হুলম:** বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন, যার গূঢ়ার্থ সময় সময় নেতিবাচক হয়ে থাকে। এর বিপরীত হলো রুইয়া।

الحزن - **হুজন:** বিষণ্নতা ও নৈরাশ্য; এটা সুফিদের একটি উত্তম গুণ।

الحقد - **হিকদ:** মনোমালিন্য, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষা, ঘৃণা।

حب دنيا - **হুব্বে দুনইয়া:** দুনিয়ার মুহাব্বত; দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি অতি-আকর্ষণ। হুব্বে দুনইয়া একটি আত্মিক রোগ। এ রোগ থেকে মুক্তিলাভ সুফি তরীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

حب جاه - **হুব্বে জাহ:** পদমর্যাদা, সম্মান ও খ্যাতির আশা; এটাও একটি কঠিন আত্মিক রোগ। এ থেকে মুক্তি সালিকের জন্য অপরিহার্য।

حقوق - **হুকূক্ব:** শাব্দিক অর্থ অধিকার; নফসের চাহিদা যদ্বারা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা পায়।

الحرص - **হিরস্:** লোভ, লালসা, লিপ্সা, প্রলোভন; সালিকের জন্য একটি কঠিন আত্মিক রোগ।

পরিশিষ্ট ২

কতিপয় জিকির, শুগুল ও মুরাক্বাবা পদ্ধতি

নিম্নে তাসাওউফের কিছু জিকির, শুগুল ও মুরাক্বাবা পদ্ধতির উপর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরছি। আশা করি এ থেকে পাঠকরা উপকৃত হবেন। মনে রাখা প্রয়োজন, নিজের পীরের অনুমতি সাপেক্ষে বর্ণিত জিকির-শুগুল ও মুরাক্বাবা করা উচিৎ। পীর সাহেবকে না জানিয়ে এসব করলে উপকার হতে পারে, কিন্তু এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দ্বারা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং স্বীয় পীর সাহেবের অনুমতি নিয়েই এসব করবেন।

জিকিরের বিভিন্ন স্তর

জিকিরের মোট চারটে স্তর আছে। এগুলো হলো:

১. জিকিরে নাসূতী- জবানের জিকির।
২. জিকিরে মালাকূতী- ক্বলবের জিকির।
৩. জিকিরে জাবারুতী- রূহের জিকির।
৪. জিকিরে লাহুতী- সিরির জিকির।

শায়খ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি এসব জিকিরের স্বরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, জবানী জিকিরের অর্থ হলো জিসমি বা শারীরিক জিকির। ধ্যানের মাধ্যমে যে জিকির করা হয় তার নাম নাফসী বা মানসিক জিকির। মুরাক্বাবাও এক ধরনের জিকির। এটা মূলত ক্বালবি জিকির। মুশাহাদাহ (সমক্ষ দর্শন) হচ্ছে রূহানী জিকির। আর মুআয়ানা (উপস্থিত দর্শন) করাকে বলে সিরির জিকির।

উপরে বর্ণিত চারটে জিকিরের প্রত্যেকটির সঙ্গে একেকটি পবিত্র বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। সুতরাং আপনি যখন ‘জিকিরে নাসূতী’ করবেন তখন পড়বেন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। মালাকূতী জিকিরের সময় ‘ইল্লাল্লাহ

ইল্লাল্লাহ’, জাবারুতী জিকিরের সময় ‘আল্লাহ আল্লাহ’ এবং লাহুতী জিকিরের সময় পড়বেন ‘হুয়া হুয়া’।

জরব

জরব শব্দের অর্থ ধাক্কা দেওয়া। জিকিরকালীন দেহের নির্দিষ্ট স্থান বা লতীফার মধ্যে শব্দ উচ্চারণের সময় জরব লাগাতে হয়। এতে ঐ লতীফার মধ্যে জিকিরের তাসির বা প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। স্থায়ী হবে আল্লাহর জিকির।

জিকিরে ইসমে যাত

‘আল্লাহ’ নামের জিকিরকে ‘ইসমে যাত’ এর জিকির বলে। সালিককে এই জিকির দৈনিক সর্বোচ্চ ১ লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পর্যন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে আমরা দৈনিক ২৪ হাজার বার পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকি। সুতরাং সর্বনিম্ন ২৪ হাজার বার জিকিরে ইসমে যাত আদায় করলে প্রতিটি দম আল্লাহর স্মরণের মধ্যে কেটে যাবে।

‘ইসমে যাত’ জিকিরের চারটি পদ্ধতি

১. এক জরবী।
২. দুই জরবী।
৩. তিন জরবী।
৪. চার জরবী জিকির।

১. এক জরবীর নিয়ম: প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মাথা টেনে নিয়ে যাবেন। এরপর মাথা ঘুরিয়ে ‘আল্লাহ’ শব্দ উচ্চারণ করার সময় বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে (কিছুটা বুকের দিকে) স্থাপিত লতীফায়ে ক্বলবের উপর সজোরে জরব লাগাবেন।

২. দুই জরবী জিকিরের নিয়ম: প্রথমে বাম কাঁধের দিকে মাথা ঘুরিয়ে নেবেন। এরপর ‘আল্লাহ’ শব্দ উচ্চারণের সময় ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে (কিছুটা বুকের দিকে) স্থাপিত লতীফায়ে রূহের উপর সজোরে জরব লাগাবেন। এরপর মাথা ঘুরিয়ে

টেনে নেবেন ডান কাঁধের দিকে। মাথা ঘুরিয়ে 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকালে সজোরে জরব লাগাবেন লতীফায়ে ক্বলবের উপর। চোখ বুজে মনোযোগসহ জিকির করবেন।

৩. তিন জরবী জিকিরের নিয়ম: অনুরূপভাবে প্রথমে জরব লাগাবে ডান হাঁটুতে। দ্বিতীয়বার বাম হাঁটুতে এবং সবশেষে ক্বলবের উপর জরব লাগিয়ে 'আল্লাহ' শব্দ বা ইসমে যাতের জিকির করবেন।

৪. চার জরবী জিকির: ইসমে যাতের চার জরবী জিকিরের সময় প্রথমে ডান হাঁটু, এরপর বাম হাঁটু, তারপর রূহ ও সবশেষে ক্বলবের উপর জরব লাগিয়ে জিকির পড়বেন।

'যিয়াউল কুলুব' নামক গ্রন্থে শাইখুল মাশায়িখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত চার জরবী জিকির শেষে, সাত জরব পর্যন্ত জিকির করার নিয়ম বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কিবলামুখী হয়ে বসে এক হতে শুরু করে সাত জরবী পর্যন্ত জিকির করবেন।

সাত জরবী জিকিরের নিয়ম: সাত জরবী ইসমে যাতের জিকিরের সময় ডানে, বামে, সামনে, পেছনে, নীচে, উপরে এবং সবশেষে ক্বলবের উপর 'আল্লাহ' শব্দের জরব লাগাবেন। জিকিরের সময় মনে মনে খিয়াল রাখবেন এই পবিত্র আয়াতাংশের অর্থের প্রতি,

'فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ'

"যে দিকেই মুখ ফিরাবে সেকিদেই আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান।" [বাক্বারাহ : ১১৫]।

কাশফে কুবুরের জিকির

কাশফ শব্দের অর্থ উন্মোচন। কাশফের স্তরে উন্নীত হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তরীকতের শায়খরা অবশ্য একটি জিকির পদ্ধতির

বর্ণনা দিয়েছেন যা থেকে কবরের অবস্থা ও ফায়িজ কাশফের মাধ্যমে সালিকের অন্তরে উন্মোচন বা উপলব্ধ হতে পারে। সাধারণত কোনো ওলি বা বুজুর্গের কবরের নিকট বসে এই জিকির করা হয়। এর নিয়ম হলো: কবরের সামনে (কিবলামুখী অবস্থায়) চারজানু হয়ে বসবেন। এরপর 'চার জরবী' ইসমে যাতের জিকির শুরু করবেন। প্রথমে জরব দিবেন ডান দিকে, এরপর বামে, তারপর সামনের কবরে এবং সবশেষে নিজের ক্বলবের উপর খুব জোরে ধাক্কা (জরব) লাগাবেন। ইনশাআল্লাহ, এ জিকির থেকে কবরের অবস্থা উন্মোচন হবে এবং রূহানী ফুয়ুজ লাভে ধন্য হবেন।

উপরে বর্ণিত সকল প্রকার জিকির-শুগুল করাকালে অবশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে দিলকে রুজু রাখতে হবে। মনে রাখবেন কবরে শায়িত ওলির দ্বারা কিছুই হয় না। যা হবার তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ফজল ও করম। এছাড়া আর কিছুই নয়। তবে ওলিআল্লাহদের রূহানী ফায়েজ লাভ সম্ভব। আর এ কারণেই তাঁদের কবরপাশে বসে উক্ত জিকিরগুলো করার নিয়ম-পদ্ধতি তরীকতের উচ্চ পর্যায়ের মাশাইখরা বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, এখানে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো শাইখুল মাশাইখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'যিয়াউল কুলুব' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত হয়েছে।

ইসমে যাত কলন্দরী জিকির: 'মাক্বামে হুয়াইয়্যাত' হলো তরীকতপন্থীর একটি উচ্চতর স্তর। 'হু' শব্দ থেকে হুয়াইয়্যাত শব্দের উৎপত্তি। আর হু অর্থও আল্লাহ। এই জিকির একান্ত নির্জনে বসে করতে হবে। চারজানু হয়ে বসে প্রথমে মাথা নত করে নাভির উপর 'আল্লাহ্' শব্দের জরব লাগাবেন। এরপর মাথা উঁচু করে পুনরায় নত করার সময় 'হু' শব্দের জরব খুব সজোরো ক্বলবের উপর দেবেন। এই জিকির সর্বদা করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর গুণাবলীর আসল স্বরূপ জাকিরীনের অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবে। তরীকতের মাশাইখরা এই জিকিরের প্রতি খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

জিকিরে জারুব: চারজানু হয়ে কবর সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে বসবেন। বামদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বাম হাঁটুর দিকে খিয়াল রেখে 'লা-ইলাহা' উচ্চারণ করবেন ও মাথা ডানদিকে টেনে নেবেন। এরপর খুব জোরে নিজের ক্বলবের উপর 'ইল্লাল্লাহ' বলে জরব লাগাবেন।

জিকিরে হাদ্দাদী: এই জিকিরও মূলত নফি-ইসবাত (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর জিকির। বসাবস্থায় 'লা-ইলাহা' বলতে বলতে মাথা ডান কাঁধ পর্যন্ত নিবেন ও দাঁড়িয়ে যাবেন। এরপর উভয় হাত ঊর্ধ্বে তুলে সশক্তিতে দিলের বা ক্বলবের উপর নিয়ে 'ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে জরব লাগাবেন। কর্মকার যেভাবে হাতুড়ি উঠানামা করে ঠিক সেভাবে হাতদ্বয় উঠাবেন ও নামাবেন। হযরত মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, চিশতিয়া তরীকার শাইখুল মাশাইখ হযরত জালালুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার শায়খ আমাকে বড় প্রিয় এই জিকিরের তা'লিম দিতেন। এ জিকির করা প্রথমে প্রায় অসম্ভব মনে হলেও আল্লাহর অনুগ্রহে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে ওঠে।

জিকিরে আর্রার: উল্টা শ্বাসের সাথে 'লা-ইলাহা' বলে কাঁধ পর্যন্ত মাথা নিতে হবে। এরপর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় মাথা দ্বারা হাতুড়ির মতো খুব জোরে ক্বলবের উপর জরব লাগাবেন। অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের এই জিকিরের আরেকটি পদ্ধতি আছে। প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে জিহ্বা তালুর সঙ্গে লাগাবেন। এরপর শ্বাস ভেতরে নেওয়ার সময় নাভিমূল থেকে সজোরো 'আল্লাহ' শব্দটি (সশব্দে) বের করে নিয়ে আসবেন। টেনে কাঁধের নিকট নিয়ে আসার পর শ্বাস ছাড়ার সময় মাথা ক্বলবের দিকে নিয়ে খুব জোরে 'হু' শব্দ দ্বারা জরব লাগাবেন দিলের মধ্যে। এসময় খিয়াল রাখবেন, করাত দ্বারা ক্বলব বা দিলকে কেটে গুড়ো করে দিচ্ছেন! প্রতিটি গুড়া-কণা একেকটি নূরের ঝলক যা সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। দেহরাজ্যের সীমানা পেরিয়ে এই নূর ধীরে ধীরে সমগ্র সৃষ্ট জগততে আচ্ছাদিত করে নিচ্ছে। শ্বাস না ছেড়েই আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলীর ধ্যান করবেন। এসব গুণাবলী হলো তাঁর অসীম ইলম (জ্ঞান), কুদরত (শক্তি), হায়াত (জীবন), সামা' (শ্রবণ), বাসির (দৃষ্টি), ইরাদা (ইচ্ছা), তাকবীন (সৃষ্টি করা) ও কালাম (কথন)। এই জিকিরের স্বাদ খুব উচ্চ পর্যায়ের। এর বর্ণনা ভাষায় করা যাবে না।

শুগুলে সিপায়া: আল্লাহর তিনটি গুণবাচক নামের জিকিরকে শুগুলে সিপায়া বলে। এ নামগুলো হলো: 'আল্লাহু সামী'উন' - আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 'আল্লাহু বাছীরুন' - আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা এবং 'আল্লাহু 'আলীমুন' - আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। তরীকতের মাশাইখদের এই জিকিরের পদ্ধতি এরূপ: প্রথম চারজানু হয়ে বসে ধ্যান করবেন, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সাহায্যকারী মহা-রাজাধিরাজ (সুলতানান নাসীরা)। এরপর শ্বাস নিয়ে নাভি থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত রেখা টেনে নেবেন ও নিঃশব্দে 'আল্লাহু সামী'উন' বলে মস্তিষ্কে জরব লাগাবেন। মনে মনে খিয়াল রাখবেন, 'বি ইয়াসমা'উ' - আমার মাধ্যমে তিনি শুনেন। এরপর মস্তিষ্ক থেকে রেখা টেনে 'আল্লাহু বাছীরুন' উচ্চারণ করে নাভিমূলে নিয়ে জরব লাগাবেন। এসময় ধ্যান রাখবেন, 'বি ইয়ানতিকু' - আমার মাধ্যমেই তিনি কথন করেন। পুনরায় নাভিমূল থেকে রেখা টেনে বের করে মস্তিষ্কে নিয়ে 'আল্লাহু 'আলীমুন' এর জরব লাগাবেন। এসময় ধ্যান করবেন, আল্লাহ আমার মাধ্যমে সবকিছুর দ্রষ্টা। এভাবে নাভিমূল থেকে মস্তিষ্ক এবং সেখান থেকে নাভিমূলে তিনটি গুণবাচক নামের জরব লাগাতে থাকবেন। মনে রাখবেন এক শ্বাসের মধ্যেই তিনিটি নামের জিকির করতে হবে। প্রথমে একবার, এরপর দু'বার করে জিকির করবেন। ক্রমান্বয়ে আপনি এক শ্বাসে শতবার পর্যন্ত এই জিকির করতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ। এই জিকির দ্বারা অনেক উপকার লাভ হয়। এর মধ্যে তিনটি হলো: ১. নফল ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, ২. ফরয ইবাদতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও ৩. এই উভয় ইবাদতের হাক্বিক্বাত উন্মোচন।

সুলতানান নাসীরা শুগুল: শাইখুল মাশাইখ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি সানজারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ তরীকাতের শাইখরা এই শুগুলকে মনের কুধারণা ও শয়তানী খিয়াল থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ উপকারী বলেছেন। সকাল ও বিকালে চারজানু হয়ে বসে এই শুগুল করতে হয়। প্রথমে সুস্থির শান্তশিষ্ট মনে চক্ষু বন্ধ করুন। এরপর নিষ্পলকভাবে তারকার মতো একটি ঐশী আলোর প্রতি তাকিয়ে আছেন বলে কল্পনা করবেন। এটাকেই হাক্বীক্বাতের নূর হিসাবে ধরে নেবেন। এই ধ্যানে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিন। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেনো খবর না থাকে। প্রথমে এই শুগুলকে পরিপক্ক করতে কষ্টবোধ হয়। তবে চেষ্টা-

সাধনা করতে থাকলে এক পর্যায়ে তা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই শুগুলের স্বাদ উপলব্ধি হলে বার বার তা করার আগ্রহ মনের ভেতর জেগে ওঠবে।

সুলতানুল আজকার শুগুল: অতি ক্ষুদ্রকায়, অন্ধকার একটি কক্ষে বসে একান্ত একমনে এই শুগুল করতে হয়। সম্পূর্ণ নীরবতা খুব জরুরী। শুগুলের শুরুতে দরূদ শরীফ, ইস্তিগ¦ফার পাঠ করবেন। এরপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে অত্যন্ত মনোযোগসহ এই কালামটি ৩ বার পাঠ করুন:

اَللّٰهُ اَعْطِنِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ نُوْرًا

উচ্চারণ: “আল্লাহু আ’গতিনী নূরাওঁ, ওয়াজ’গাল্লী নূরাওঁ, ওয়া’যামলী নূরাওঁ, ওয়াজ’গালনী নূরা”।

অর্থাৎ “আল্লাহ আমাকে নূর দিন, আমার জন্য নূর দিন, আমাকে বড় করে নূর দিন, আমার পূর্ণ সত্তাকে আপনি নূর বানিয়ে দিন”।

এরপর শুয়ে, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ঢিলা করে দেবেন- যেনো আপনি মৃত। শরীরের এভাবে ‘লাশ ছাড়ার’ পর দশ লতীফা (ক্বলব, রূহ, সির, খফী, আখফা, নফস, আব, আতশ, বাদ ও খাক) ও যাবতীয় লোমকূপের দিকে খিয়াল করে শ্বাস গ্রহণের সময় ‘আল্লাহ’ ও ছাড়ার সময় ‘হু’ এর ধ্যান করবেন। প্রত্যেক লোমকূপের মাধ্যমে জিকির বের হচ্ছে মনে করবেন। সর্বদা এটা মনের ভেতর সজাগ রাখবেন যে, একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী [হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইউম]। এই শুগুলের মাধ্যমে সালিকের তনু-মন-প্রাণে একমাত্র আল্লাহর জিকির ও তাজাল্লি বিরাজমান হয়। সমগ্র শরীর নূরে ইলাহীর উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই শুগুলের স্বাদ ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়।

সুলতানুন আজকার জিকির: সুলনাতুন আজকার শব্দের অর্থ জিকিরের বাদশাহ। এই জিকির তা-ই। শায়খরা বলেছেন, এই জিকির করার পূর্বে সালিকের পঞ্চেন্দ্রিয়কে ‘বন্ধ’ করতে হবে। বাহ্যিকভাবে বন্ধ করার উপায় হলো নাক ও কানে তুলা দেওয়া। ত্বক বা চামড়ায় যাতে কোন কিছুর স্পর্শ পড়েনা সে ব্যবস্থা করা।চক্ষু

বন্ধ রাখা ও জিহ্বার মধ্যে কোনো স্বাদ যাতে থাকে না তা নিশ্চিত করা। এভাবে পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার পর 'আল্লাহ' নামের জিকির শুরু করবেন। প্রথমে নাভিমূল থেকে রেখা টেনে মস্তিষ্কে নিয়ে জরব দিবেন। সেখান থেকে পুনরায় রেখা টেনে নিয়ে যাবেন ক্বলবে এবং সেখানে জরব লাগাবেন। এরপর পূর্ণ ধ্যান-খিয়ালে বুকের কড়ির মধ্যখানে স্থাপিত (কিছু কিছু মতে) লতীফায়ে আখফার উপর জরব দিবেন। এই জিকিরে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পারলে অসংখ্য ব্যাপার সালিকের নিকট উন্মোচন হয়ে পড়বে। শায়খরা বলেছেন, সুলতানুন আজকারের ফলে আল্লাহর আরশে আজীম থেকে ক্ষুদ্রকায় এই পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু নূরে প্রজ্জ্বোল হয়েছে বলে দৃশ্যমান হবে জাকিরীনের অন্তরদৃষ্টিতে। যাবতীয় আলমসমূহও সালিক দেখতে পাবেন।

শুগুলে সারমদী: এই শুগুলের সময় চক্ষু বন্ধ করে কানের ভেতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে বাইরের সকল আওয়াজ শ্রবণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। এরপর মাথার উপর থেকে বৃষ্টির আওয়াজের মতো একটি শব্দ শ্রোতিগোচর হবে। এই সুর বা ঝুমঝুম শব্দের প্রতি একান্ত ধ্যানমগ্নভাবে নিজেকে নিবিষ্ট রাখবেন। আপনি তখন শুনতে পাবেন 'আল্লাহ, আল্লাহ' জিকিরের আওয়াজ। সুফিদের ভাষায় এই সুরকে বলে 'সাওতুন হাসান' (সুন্দর আওয়াজ) ও 'হামস'। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

"দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে, সুতরাং মৃদু গুনগুন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।" [সূরা ত্বা-হা : ১০৮]

এই শুগুলের স্বাদ এতো বেশী যে, সর্বদা এতে নিমগ্ন হতে মনে বিরাট আগ্রহ জন্মাবে। ওলিরা এই আওয়াজের মাধ্যমে 'ইলহাম' এর গৌরব লাভ করে থাকেন। আরিফরা আল্লাহর সম্যক পরিচয় তথা মা'রিফাত লাভে ধন্য হয়েছেন এই আওয়াজের মাধ্যমে। বিভোর হয়েছেন পরম সত্যের মিলন-পুলকে। উচ্চ পর্যায়ের এই শুগুল সবার ভাগ্যে জুটে না। উচ্চ স্তরে উপনীত মা'রিফাতপন্থীরাই এই শুগুল করে থাকেন। সুফিদের ভাষায় এই স্তরকে 'মাক্বামে কাশাকশ' বলে। কাশাকশ অর্থ

দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সকল জিকির-শুগুল-মুরাক্বাবার মতো নিজের পীরের অনুমতিক্রমে এই শুগুলও করতে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। অন্যথায় এর প্রভাব সালিকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

শুগুলে বিসাত: মানব মস্তিষ্কের ঠিক কেন্দ্রে সূর্যের মতো উজ্জ্বল একটি দাগ আছে। সুফি পরিষাভায় এই দাগটি যে স্থানে অবস্থান করছে সেটি হলো 'সিররে আখফা'। শুগুলে বিসাত এই সিররে আখফার প্রতি ধ্যান করে আদায় করতে হয়। কোনো কোনো বর্ণনা মতে গরীবে নিওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই শুগুল পদ্ধতি প্রাপ্ত হয়েছেন। এর বরকতেই খাজা সাহেব উচ্চতর বাতিনী ও রূহানী সম্মানে ভূষিত হন।

এই শুগুল আদায়ের নিয়ম হলো, প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে চারজানু হয়ে বসবেন। জিহ্বা তালুতে লাগিয়ে উম্মুদ্দিমাগ বা মস্তিষ্কের দিকে ধ্যান করে শ্বাস বন্ধ করে দেবেন। এরপর 'হু' অক্ষরের সঙ্গে কিছু লাল মিশ্রিত সুরমা বা ছাই রংয়ের সূর্যের মতো ধ্যান করবেন। মনে করবেন আপনার সমস্ত শরীরব্যাপী এই রং ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রমান্বয়ে শরীরের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে 'হু'-তে রূপান্তরিত হয়েছে বলে গভীর ধ্যান করবেন। এরূপ 'ফানা' বা বিলুপ্তির অবস্থাকে বলে 'তাজাল্লিয়ে যাত' [সত্তার জ্যোতি] এর দর্শন। একে 'লাহুতে মুহাম্মদী'-ও বলে। এই শুগুল পালনকালে কিছু নূর পরিদৃষ্ট হয়। যদি এ নূর হলুদ বর্ণের হয় তাহলে তা 'মালাকূতী নূর'। যদি এর রং হয় সবুজ তাহলে বুঝতে হবে এটা 'জাবারুতী নূর'। আর কালো হলে তা 'লাহুতী নূর'। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে এরূপ নূর দ্বারা বান্দাকে উপকৃত করা হয়।

মুরাক্বাবা

তরীকাতের সালিক জিকির-শুগলের মাধ্যমে এক পর্যায়ে বাহ্যিক ও গুপ্ত সকল প্রকার নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। তার শিরা-উপশিরায় জিকিরের প্রভাব স্থায়ী হয়। তার মধ্যে আল্লাহর স্মরণ 'জারি' হয়ে যায়। এ পর্যায়ে উন্নীত মুরীদকে তার শায়খ 'মুরাক্বাবা'র সবক দিয়ে থাকেন।

মুরাক্বাবার অর্থ একাগ্রমনে ধ্যান করা। সাধারণত পীর সাহেব মুরীদের বাহ্যিক ও আত্মিক অবস্থার উপর বিবেচনা করে বিশিষ্ট ধরনের মুরাক্বাবার সবক দিয়ে থাকেন। নিম্নে কয়েকটি মুরাক্বাবার বর্ণনা তুলে ধরছি। খিলাফতী বা ইযাজত পেয়েছেন এরূপ শায়খের জন্য বর্ণিত যে কোনো মুরাক্বাবা ইচ্ছা হলে পালন করতে কোনো অসুবিধা নেই। এতে অবশ্যই লাভবান হবেন। সাধারণ মুরীদের জন্য স্বীয় পীরের অনুমতি ছাড়া মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হওয়া উচিৎ নয়।

১. হাদ্বির-নাজির মুরাক্বাবা: আমরা সবাই জানি আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই হাদ্বির-নাজির। তিনি আমাদের শাহরগ থেকেও নিকটে। এই সত্যটি উদঘাটনের জন্য তরীকতের শায়খরা একটি মুরাক্বাবার উদ্ভাবন করেছেন। এর নিময় হলো: নামাযে শেষ বৈঠকের মতো বসবেন। হাঁটুর উপর মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে নিজের মন-মানসিকতাকে শূন্য করে দেবেন। এরপর খুব ধ্যানস্থ হয়ে মনোযোগসহ অর্থের দিকে খিয়াল রেখে 'আউযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' শরীফ পুরোটা পাঠ করবেন। তারপর খুব খুজু-খুশুর সঙ্গে 'আল্লাহু হাদ্বিরী, আল্লাহু নাজিরী, আল্লাহু মা'য়ী' [الله حضرى- الله ناظرى - الله معى] পাঠ করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বদাই আমার নিকট উপস্থিত, আল্লাহ সর্বদা আমাকে দর্শন করছেন, আল্লাহ সর্বদা আমার সঙ্গী। অর্থের দিকে খিলায় রেখে উক্ত তিনটি কালামের ধ্যানে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢুবিয়ে দেবেন। এই মুরাক্বাবাহ প্রথম দিকে কিছুটা কঠিন মনে হয়। কিন্তু বার বার চেষ্টা করতে থাকলে এর হাক্বিক্বাত উন্মোচন হবে। পরে এই মুরাক্বাবা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ফজল ও করমের উপরই আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২. মুরাক্বাবায়ে রু'ইয়াত: এই মুরাক্বাবা দ্বারা পরম সত্তার দর্শনের ধ্যান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ইরশাদ করেন:

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى

অর্থাৎ "সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?" [আলাক্ব : ১৪]

উক্ত আয়াতে করীমের উপর গভীর ধ্যান করাই হলো এই মুরাক্বাবার উদ্দেশ্য।

৩. মুরাক্বাবায়ে মা'য়িআত: এই মুরাক্বাবা দ্বারা পরম সত্তার সংসর্গের ধ্যান করা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।" [হাদীদ : ৪]

মুরাক্বাবার সময় উপরোক্ত আয়াতে করীমের আলোকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে গোপনে-প্রকাশ্যে, সুস্থতা-অসুস্থতায় যাবতীয় অবস্থাতে সর্বদা দেখছেন এবং আমার সঙ্গে আছেন। ইনশাআল্লাহ! ক্রমান্বয়ে উক্ত আয়তের হাক্বিক্বাত আপনার নিকট উন্মোচন হবে।

৪. মুরাক্বাবায়ে আকরাবিয়্যাত: এই মুরাক্বাবার উদ্দেশ্য হলো পরম সত্তার নৈকট্য লাভ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ইরশাদ করেন:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" [ক্বাফ : ১৬]

উক্ত আয়াতে পাকের অর্থ ও মর্মের প্রতি গভীর ধ্যান করবেন। এই মুরাক্বাবার ফায়দা বিরাট। আল্লাহ তা'আলা যে সর্বাপেক্ষা নিকটতম সত্তা তা আপনার নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. মুরাক্বাবায়ে ওয়াহদাত: আল্লাহ ব্যতীত আদৌ যে, কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই তা-ই উন্মোচন হবে এই মুরাক্বাবা দ্বারা। সালিক এই মুরাক্বাবার সময় প্রত্যক্ষ করবেন যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী শুধু একমাত্র আল্লাহর সত্তা চিরবিদ্যমান। এই অবস্থাকেই বলে 'হামা উস্ত'- সবকিছুতেই শুধু আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” [হাদীদ : ৩]

উক্ত আয়াতে করীমের মর্ম ও অর্থের প্রতি খিয়াল রেখে এই মুরাক্বাবা করতে হয়। ইনশাআল্লাহ! ক্রমান্বয়ে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের স্বরূপ আপনার নিকট উন্মোচন হবে।

৬. মুরাক্বাবায়ে ফানা: এই মুরাক্বাবা দ্বারা নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হয়। এটাকে তরীকতের ভাষায় ‘ফানা ফিল্লাহ’ বলে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।” [আর-আরহমান : ২৬-২৭]

উক্ত আয়াতে করীমদ্বয়ের মর্ম ও অর্থের প্রতি খিয়াল রেখে এই মুরাক্বাবা করতে হয়। ইনশাআল্লাহ! ক্রমান্বয়ে আপনি ‘ফানা ফিল্লাহ’র স্তরে উপনীত হবেন। একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই চিরবিরাজমান দেখতে পাবেন। নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত আপনার নিকট আর বোধগম্য হবে না। পরিষ্কার হয়ে ওঠবে, আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার অসারতা ও মূল্যহীনতা।

পরিশিষ্ট ৩

খানক্বাহ ও এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

‘খানক্বাহ’ (خانقاه - خانگاه) মূলত ফার্সি ভাষার একটি শব্দ। তবে শব্দটি আরবি ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ এমন এক স্থান যেখানে শরীয়ত, তারীকাত, হাক্বিক্বাত ও মা’রিফাতের সমন্বয়ে আত্মশুদ্ধির চর্চা হয়। সুফি-দরবেশ ও তরীকতের সালিকরা সাধারণত এক বা একাধিক খিলাফতপ্রাপ্ত ওলির সুহবত লাভের ইচ্ছায় খানক্বায় আগমন করেন। অতীতে খানক্বাহ সুফি-দরবেশদের ‘মুসাফিরখানা’ হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। অধিকাংশ খানক্বার সাথে মসজিদ, মাদ্রাসা ও কোনো ওলির সমাধিও সংযুক্ত থাকে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে খানক্বাহ শব্দের বদলে একই প্রতিষ্ঠানকে ‘رباط’ [রিবাত], ‘زاويه’ [জাভিয়া], এবং ‘تكيه’ [তেক্কি] বলে।

ইতিহাস: খানক্বাহ শব্দের ব্যবহার ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে ছিলো না। যেভাবে ‘ফিক্বাহ’, ‘মাজহাব’, ‘মাদ্রাসা’, ‘দারস’ ইত্যাদি শব্দব্যবহার পরবর্তীতে মশহুর ও গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেছিল ঠিক তদ্রূপ ইসলামী আধ্যাত্মিকতা বা রূহানিয়্যাতের ক্ষেত্রে সুফি-দরবেশরা ‘খানক্বাহ’ শব্দব্যবহার জনপ্রিয় করেন। তবে খানক্বায়ী কর্মতৎপরতা বা নিযাম শুরু হয় মসজিদে নববী শরীফ সংলগ্ন সুফফার অধিবাসী আসহাবে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা’আলা আজমাঈনের দ্বারা। পরের যুগে একটি খানক্বার মৌলিক কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে সুফফাবাসী সাহাবায়ে কিরামের কাজকর্মের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। যেমন, খানক্বার ইমারতের সাথে মসজিদ-মাদ্রাসা থাকা, জিকির-আজকার, জ্ঞানচর্চা, ইসলাহী তৎপরতা ও জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি কাজ।

যুগশ্রেষ্ঠ ওলি ইমাম জাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘সিয়ার আ’লামুন্ নুবালা’ (سير أعلام النبلاء) গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাগরিদ, প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিনের বেলা মসজিদে বসে 'তাফসীর', 'হাদীস' ও 'ফিক্বাহ' শাস্ত্রের উপর দারস দিতেন। রাতে তাঁর একটি বিশেষ দারস ছিলো। এই দারসে তিনি 'সুলুকের' পথ-পাথেয় এবং 'মৌলিক গুণাবলী থেকে সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার রাস্তার' উপর শাগরিদদের প্রতি নসিহত করতেন। বলা হয়ে থাকে, এই বিশেষ দারসে তাফসীর, হাদীস, ফিক্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, 'এসব প্রশ্ন শুধুমাত্র দিনের বেলা করবেন। তখন এ গুলোর উপর দারস বসে।' ইমাম জাহাবী বলেন, "খানক্বায়ী কাজের শুরু এখান থেকেই।"

আজকাল অভিধানে খানক্বাহ (خانقاه) শব্দের অর্থ দেওয়া হয়: একটি ইমারত যেখানে সুফি-দরবেশরা বাস করেন। এটা তাঁদের আস্তানা।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে ঈসায়ী দশম শতক থেকে 'খানক্বাহ' শব্দ ব্যবহার শুরু হয়। খানক্বাকে ইবাদতগাহ ও শরীয়ত এবং তরীকতের কেন্দ্র বলা হয়। অতীতে পুরো মুসলিম বিশ্বের শহরাঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র খানক্বাহ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বাংলাদেশে ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতকে সুফি-দরবেশরা খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। ইতিহাসব্যাপী মুসলিম সমাজে খানক্বাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে আসছে। সঠিকভাবে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মানুষ দলে দলে খানক্বায় এসে উপস্থিত হতেন। তবে বাহ্যিক এসব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছাড়াও আধ্যাত্মিক 'ইসলাহ' বা আত্ম-পরিশুদ্ধির প্রয়োজনও খানক্বাহ আঞ্জাম দেয়। আর এই ইসলাহ অর্জনের পরীক্ষিত সফল রাস্তার নাম পীর-মুরীদী। খানক্বাহ এই পীর-মুরীদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অতীতের মতো খানক্বার প্রভাব তেমনটি অবশিষ্ট না থাকলেও বাংলা-ভারত-পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে এখনও অনেক খানক্বাহ প্রতিষ্ঠিত আছে। আগের যুগে খানক্বার ইমারত প্রয়োজনীয় অনুমতিসহ সরকারী জায়গায় তৈরী হতো। বাংলাদেশে সরকারী বা ডিসি'র খতিয়ানভূক্ত কোনো জায়গায় অনুমতিসহ খানক্বাহ আজকাল আছে বলে

জানা নেই। সুফি-দরবেশরা ব্যক্তিগত কিংবা ভক্ত-অনুরক্তদের অনুদানভিত্তিক অর্থায়নে খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকেন।

খানক্বায় যেসব অতিরিক্ত কর্মের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলো: ১. হক্কানী পীর-মাশাইখ কর্তৃক নিয়মিত 'ইসলাহী' বয়ান। ২. হক্কানী পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ। ৬. তাসবীহাত ও জিকির করা। যথা: ৬ তাসবীহ, পাস-আপনফাস [দমের জিকির], তেরো তাসবীহ জিকির, ইসমে যাতের [আল্লাহ নামের] জিকির, মুরাক্বাবা, মুশাহাদা, রিয়াজত, মুজাহাদা, সুন্নাতী জীবন গড়ার উপর চর্চা, তিলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদির উপর তা'লিম ও আমল করা।

অপর আরেক ব্যাপার হলো, বেশ কয়েকটি 'বিদআতী' গ্রুপ আছে যারা খানক্বাহভিত্তিক 'ভণ্ড পীর-মুরীদী'র দিকে মানুষকে ধাবিত করছে। সকল মুসলমানের উচিৎ, সঠিক হক্কানী কোনো পীর বা মুর্শিদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'খানক্বাহ'র সঙ্গে জড়িত হওয়া। অন্যথায় পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আজকের এ বহুতরের ফিতনা ও বাতিল ফিরকাবাজির যুগে হক্বের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান 'তাবলীগ জামা'আত', 'হাক্ব ওয়াজ-নসিহত', 'মাদ্রাসায়ে ক্বওমিয়া', এবং 'হক্ব খানক্বায়ী নিযাম' চালু রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক দ্বীন শিক্ষা ও পালনের (ইলম ও আমলের) ক্ষেত্রে উল্লেখিত ক'টি পথ ও পাথেয় এ যুগের মুসলমানদের ভরসাস্থল।

চিশতিয়া তরীকার বিভিন্ন সিলসিলা ও যোগসূত্রের নক্সা

আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহ.
আহমদ আবদাল চিশতী রাহ.
মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতি রাহ.
আবু ইউসুফ চিশতী রাহ.
মাওদুদ চিশতী রাহ.
হাজী শরীফ জান্দানী রাহ.
উসমান হারুনী রাহ.
খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহ.
খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহ.
ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহ.

চিশতিয়া-সাবিরিয়া-কুদ্দুসিয়া সিলসিলা

আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী রাহ.
শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহ.
জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া রাহ.
আহমদ আবদুল হক রূদাওলাওয়ী রাহ.
আহমদ আ'রিফ রূদাওলাওয়ী রাহ.
মুহাম্মদ বিন আ'রিফ রূদাওলাওয়ী রাহ.

আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহ.
জালালুদ্দীন জলীল তানেশ্বরী রাহ.
নিযামুদ্দীন উমরী তানেশ্বরী বলখী রাহ.
আবু সাঈদ আসআদ গাঙ্গুহী রাহ.
মুহিব্বুল্লাহ ইলাহাবাদী রাহ.

চিশতিয়া-নিযামিয়া-হাবিবিয়া সিলসিলা

কামালুদ্দীন আল্লামা রাহ.
সিরাজুদ্দীন চিশতী রাহ.
মুহাম্মদ ইলমুদ্দীন রাহ.
মাহমুদ উরফা রাজান রাহ.
জামালুদ্দীন জামান রাহ.
আবু সালেহ হাসান মুহাম্মদ রাহ.
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ চিশতী রাহ.
ইয়াহইয়া মাদানী রাহ.
কালিমুল্লাহ জাহানাবাদী রাহ.
নিযামুদ্দীন আওরঙ্গাবাদী রাহ.
ফখরুদ্দীন চিশতী রাহ.
নূর মুহাম্মদ মাহারবী রাহ.
সুলায়মান তাওসাবী রাহ.
মুহাম্মদ আলী শাহ খায়রাবাদী রাহ.
হাবীব আলী শাহ রাহ.

চিশতিয়া-নিযামিয়া-কুদ্দুসিয়া সিলসিলা

নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাহ.
নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহলভী রাহ.
মাখদুম জাহা মানিরী রাহ.
সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী রাহ.
সায়্যিদ বুডডন বাহড়ায়িচী রাহ.
দরবেশ ইবনে মুহাম্মদ কাসিম আওধী রাহ.

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহ.
মুহাম্মদ মক্কী জাফরী রাহ.
অহিদুদ্দীন আমরুহী রাহ.
আবদুল হাদী আমরুহী রাহ.
আবদুল বারী সিদ্দিকী আমরুহী রাহ.
হাজী আবদুর রহীম রাহ.
মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহ.

চিশতিয়া-সাবিরিয়া-ইমদাদিয়া সিলসিলা

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ.
মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহ.
সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ.
ডাক্তার আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহ.
মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহ.

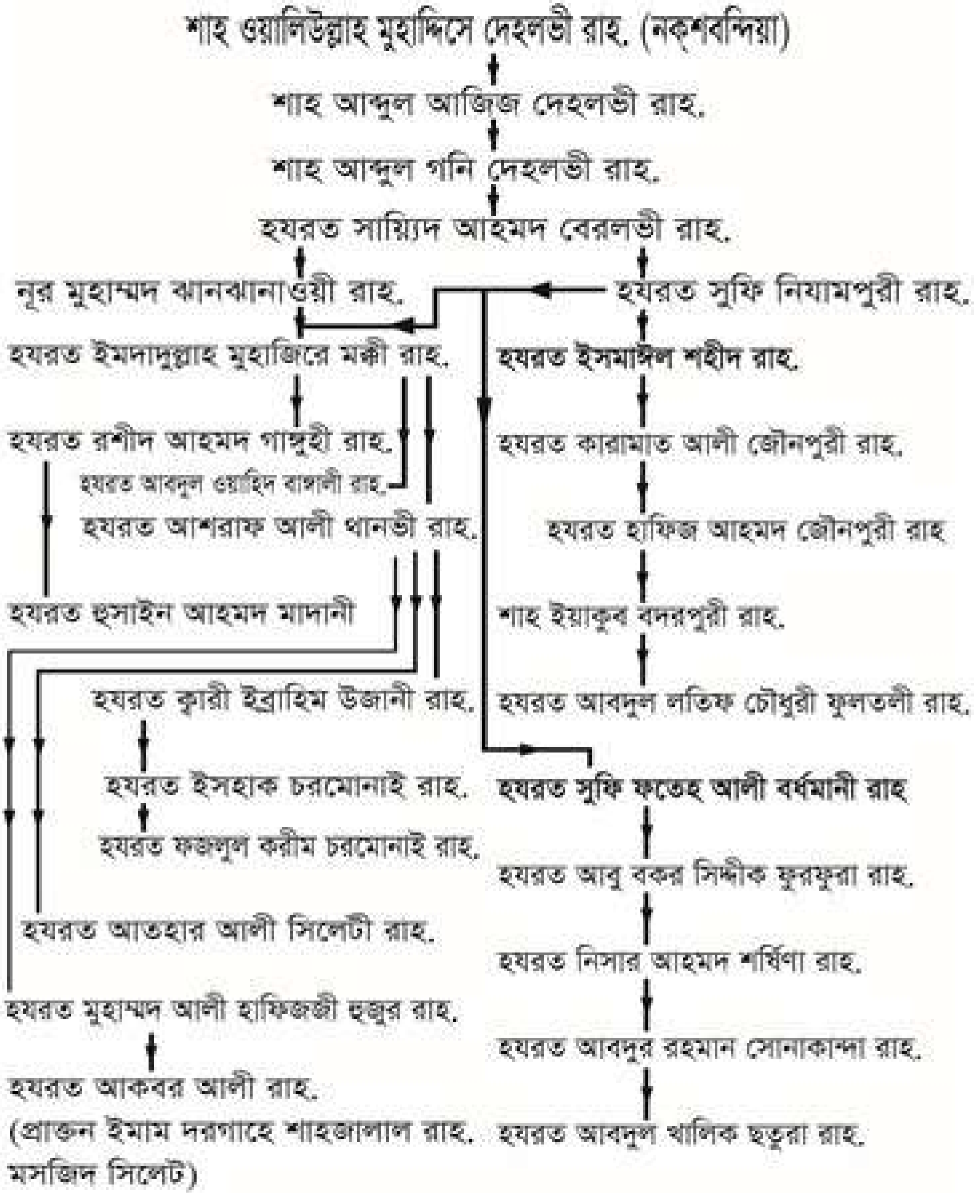
চিশতিয়া-নিযামিয়া-আশরাফিয়া সিলসিলা

সিরাজুল হক ওয়ালীন রাহ.
আলাউল হক পান্দবী রাহ.
আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী রাহ.

চিশতিয়া-নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দীদিয়া সম্পর্ক

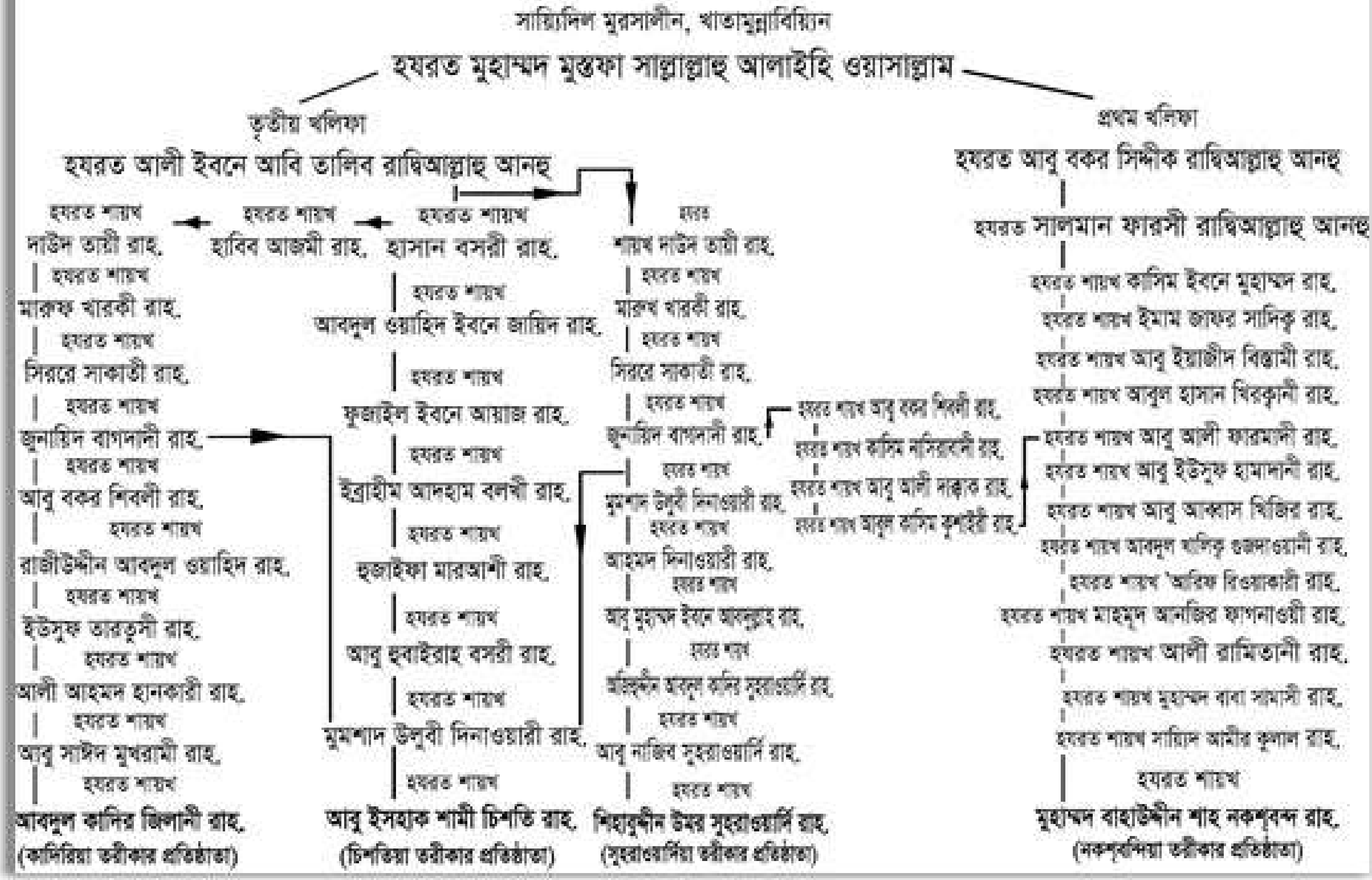
রুকনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
আবদুল আহাদ ফারুকী রাহ.
আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দীদে আলফে-সানী রাহ.

বাংলাদেশে ইলমে তাসাওউফের খিদমাত



দ্রঃ বাংলাদেশে আরো অনেক উলামা, পীর ও দরবেশ ইলমে তাসাওউফের খিদমাত করে গেছেন এবং এখনও করছেন। উক্ত লিস্টে সঙ্গত কারণেই সকলের নাম উল্লেখ সম্ভব নয়। জানা থাকা আবশ্যক যে, চার মূল তরীকা ও এদের শাখা-উপশাখার পীর-মাশাইখদের পদধূলিতে বাংলার মাটি অনেক আগে থেকেই ধন্য হয়ে আসছে। এ দেশের মুসলমান তাঁদের কাছে চিরঋণী হয়ে আছেন।

চার তরীকার সিলসিলা ও যুগসূত্রের নক্সা



কে কোথায় সমাহিত আছেন







